ইমাম আবু হানিফার রহ. রাজনৈতিক জীবন

মানাযির আহসান গিলানী

ইমাম আবু হানিফার রহ.
রাজনৈতিক জীবন

حضرت امام ابو حنیفہ (رح) کی سیاسی زندگی

হযরত ইমাম আবু হানীফা কী সিয়াসী যিন্দেগীর
অনুবাদ

মূল ঃ আল্লামা সায়্যিদ মানাযির আহ্‌সান গিলানী
তরজমা ঃ আবদুল জলীল

ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

ইমাম আবু হানীফার রহ. রাজনৈতিক জীবন

মূল : আল্লামা সায়্যিদ মানাযির আহ্সান গিলানী

তরজমা : আবদুল জলীল

ই. ফা. বা. প্রকাশনা : ১১৬৪/১

ই. ফা. গ্রন্থাগার : ২৯৭'৬১

প্রথম প্রকাশ : নভেম্বর, ১৯৭০

দ্বিতীয় প্রকাশ : জুন, ১৯৮৪

তৃতীয় প্রকাশ : আষাঢ়, ১৩৯৪
জিলকদ, ১৪০৭
জুন, ১৯৮৭

প্রকাশনায় : অধ্যাপক আবদুল গফুর,
প্রকাশনা পরিচালক
ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ
বায়তুল মুকাররম,
ঢাকা-২

মুদ্রণে : প্যাসিফিক প্রিণ্টিং এণ্ড প্যাকেজিং
৫০, টিপু সুলতান রোড,
ঢাকা

প্রচ্ছদ-শিল্পী : কামাল তালুকদার

বাঁধাইকার : আমিনুল বুক বাইণ্ডিং হাউস
২৪, শ্রীশ দাস লেন
বাংলাবাজার, ঢাকা

মূল্য : ৬৩'০০

IMAM ABU HANIFAR(R.) RAJNAITIK JIBAN : The Political Life of Imam Abu Hanifa (R.) written by Allama Syed Manajir Ahsan Gilani in Urdu, translated by Abdul Jalil into Bengali and published by the Islamic Foundation Bangladesh.

June 1987

Price : Tk. 63·00 U.S. $ 4·50

—IFB-86-87--P/1541--3250--15/3/1394-(30/6/1987)

টেলিগ্রাম চ্যানেল লিংক

https://t.me/islaMic_fdf

আমাদের কথা

শুধু বাংলাদেশের নয়, সারা বিশ্বের মুসলমানদের বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ হানাফী মযহাবের অনুসারী এবং এই সুবাদে তারা সবাই ইমাম আবু হানীফার ভক্ত। কিন্তু ইমাম আবু হানীফা সম্বন্ধে তাদের অধিকাংশের ধারণা কতিপয় ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র মছলা-মাছায়েল বা নিকাহ-তালাক ইত্যাদির ফতোয়াতে সীমাবদ্ধ। আমাদের খুব কম লোকই জানেন ইমাম আবু হানীফা বিপ্লবী রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক চিন্তাধারার অধিকারী ছিলেন এবং ইসলামী নবজাগরণের ক্ষেত্রে ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করে যান। তাঁর নিরাপোষ বৈপ্লবিক চিন্তাধারার কারণে তাঁকে জেল জুলুমসহ নানাবিধ নির্যাতন ভোগ করতে হয়।

ইমাম আবু হানীফার জীবনের এসব শিক্ষামূলক দিকই বর্তমান গ্রন্থে বিস্তারিতভাবে তুলে ধরেছেন আল্লামা সায়্যিদ মানাযির আহমদ গীলানী। তাঁর রচিত উর্দু-গ্রন্থের বাংলা তরজমা করে মওলানা আবদুল জলীল বাংলা ভাষাভাষী পাঠকদের এক অপরিশোধ্য ঋণে আবদ্ধ করেছেন। ইতিপূর্বে প্রকাশিত এ অনুবাদ গ্রন্থখানির ছুটি সংস্করণ ইসলামিক ফাউণ্ডেশনের পক্ষ থেকে প্রকাশ করতে পেরে আমরা আল্লাহ্‌র দরবারে জানাই অযুত শোকরিয়া।

ইসলামিক ফাউণ্ডেশন
বাংলাদেশ ।। ৩০,৬,৮৭

আবদুল গফুর
প্রকাশনা পরিচালক

প্রথম সংস্করণের প্রকাশকের কথা

যে কয়জন মনীষী মানবতার গতিধারাকে কল্যাণের পথে প্রবাহিত করে ইতিহাসের পাতায় অমর ও অক্ষয় হয়ে আছেন ইমাম আবু হানীফা (রঃ) তাঁদের মধ্যে একজন। খেলাফতে রাশেদার অন্তিমে বনী উমাইয়ার স্বৈরাচারী রাজতন্ত্রের দোর্দণ্ড প্রতাপের যন্ত্রণার যুগে তাঁর আবির্ভাব; ইসলামী ইতিহাসের সেই অবক্ষয়ের যুগে যে কুফা নগরী স্বৈরাচারী একনায়কত্বের দাবানলে সবচেয়ে বেশী জর্জরিত হয়েছিল সেখানেই তাঁর জন্ম। মহাপ্রতাপশালী রাজতন্ত্রের সামনে যখন অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বই টু শব্দটি করতে পারতেন না, ইতিহাসের সেই মহাসন্ধিক্ষণে ইমাম আবু হানীফা (রঃ) ছিলেন বাদশাহদের সামনে যোগ্যতম প্রতিবাদ। অত্যাচারী শাসকদের সামনে হক কথা বলেই তিনি ক্ষান্ত হন নি, বরং তাদের সাথে সম্পর্কহীনতা ও অসহযোগ আন্দোলনের ভূমিকাই তিনি পালন করে গেছেন সারাজীবন ধরে। বনী উমাইয়া ও বনী আব্বাসীয় বাদশাহীর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ও জিহাদে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে অংশগ্রহণ করে তিনি মানবতাকে সঠিক পথের সন্ধান দিয়ে গেছেন। আর এজন্যই বনী উমাইয়া ও বনী আব্বাসীয় শাসনদণ্ডের নির্মম অত্যাচার থেকে তিনি দৈহিকভাবেও রেহাই পান নি। ইতিহাস এর সাক্ষী।

ইসলামী আইনের ধারা-উপধারা প্রণয়ন ও বিচার বিভাগের সংস্কার সাধন করে অনাগত-যুগের দাবী মিটিয়েছেন তিনি অকৃপণভাবে। তাঁর প্রত্যক্ষ সংগ্রামের ফলেই বিচার বিভাগ শাসনকর্তাদের স্বেচ্ছাচারিতা থেকে মুক্তি পেয়েছিল। আইন প্রণয়নে মুসলমানদের অবিস্মরণীয় অবদানের পেছনে ইমাম আবু হানীফা (রঃ)-এর প্রত্যক্ষ প্রভাবকে কোনভাবেই খাটো করে দেখা যায় না। বরং তিনিই এক্ষেত্রে উদগাতা ও স্রষ্টা। বর্তমান যুগের প্রচলিত আইন-কানুন হল সে সবের বিকৃত চর্বিত চর্বণ মাত্র।

মূল বইটির নাম 'ইমাম আবু হানীফা কি সিয়াসী যিন্দেগী' (ইমাম আবু হানীফার রাজনৈতিক জীবন)। কিন্তু বক্ষ্যমান আলোচনাতে ইমাম আবু হানীফা (রঃ)-এর শুধু রাজনৈতিক জীবন নিয়ে আলোচনা করা হয়নি বরং তাঁর যুগের বিভিন্ন খেলাফতের অবস্থা এবং তাঁর শিক্ষা, সংস্কার ও ব্যবসা বাণিজ্যসহ সামগ্রিক জীবনের সংগ্রাম ও সাধনার এক উজ্জ্বল প্রতিচ্ছবি তুলে ধরা হয়েছে।

বাংলা ভাষাভাষী জ্ঞান পিপাসুদের কাছে বইটি সমাদৃত হলে আমরা ধন্য হব।

হাসান জামান

সূচীপত্র

১।	উপক্রমণিকা	১
২।	ইমাম সাহেবের যুগের রাজনৈতিক অবস্থার বিবরণ	৩
৩।	হযরত ওমর ইবন আবদুল আযীযের খিলাফত	৬
৪।	ইমাম সাহেবের প্রারম্ভিক শিক্ষার অনুরাগ	৮
৫।	ইমাম হাম্মাদের শিষত্ব গ্রহণ	১১
৬।	হযরত ওমর ইবন আবদুল আযীযের মৃত্যু এবং পরবর্তী খলীফাদের পদস্খলন	১১
৭।	খিলাফত এবং বাদশাহীর মধ্যে পার্থক্য	১৩
৮।	বায়তুলমাল সম্পর্কে খিলাফতে রাশেদার দৃষ্টিভঙ্গি	১৫
৯।	বনী উমাইয়াদের আমলে বায়তুলমাল	১৬
১০।	খিলাফতে রাশেদার আমলে ইনসাফ এবং হুকুমতের স্বরূপ	২১
১১।	উমাইয়াদের আমলে ইনসাফ	২১
১২।	কানুন ও ইনসাফ সম্পর্কে হযরত ওমরের ব্যাখ্যা	২২
১৩।	উমাইয়া আমলে কাযীদের উপর শাসনকর্তাদের ক্ষমতা	২৪
১৪।	দায়িত্বশীল ব্যক্তিদের কাযীর পদ গ্রহণে অস্বীকার	২৭
১৫।	ইসলামী হুকুমতের পরিসীমা	৩০
১৬।	বনী আব্বাসের আমলে ইমাম সাহেবের মক্কা হইতে কূফা প্রত্যাবর্তন	৩২
১৭।	মনসুর সম্পর্কে ইমাম সাহেবের কয়েকটি সত্য ভাষণ	৩২
১৮।	উমাইয়া এবং আব্বাসীয় আমলের দুই নরপশু	৩৫
১৯।	হাশমিয়া সম্প্রদায়ের ভ্রান্ত ধর্মবিশ্বাস	৩৫
২০।	হাজ্জাজের খামখেয়ালী	৩৬
২১।	প্রথম অমঙ্গলের দিন এবং প্রথম মুসলিম বাদশাহ	৩৮
২২।	ইমাম সাহেবের উপর প্রতিক্রিয়া	৩৯
২৩।	ইমাম সাহেবের রাজনৈতিক কার্যধারা	৩৯
২৪।	কাযী শরীফের চাকুরী গ্রহণ	৪০
২৫।	মুখ বন্ধ করার ব্যবস্থাপত্র	৪১
২৬।	ইমাম সাহেবের ব্যবসায়ের ব্যাপকতা	৪৪
২৭।	রেশমী বস্ত্রের দোকান	৪৬
২৮।	কূফার রেশমী কাপড়ের শ্রেষ্ঠ দোকান	৪৭

২৯। দাসদের দ্বারা ফেরী ৪৯
৩০। আমদানী-রফতানী ৪৯
৩১। যৌথ কারবার ৫০
৩২। ইমাম সাহেবের উস্তাদ ও ছাত্র সংখ্যা ৫২
৩৩। কোন কোন শহরে ইমাম সাহেবের ছাত্র ছিল ৫২
৩৪। ইমাম সাহেবের অপারিমিত মূলধন এবং কারবার সম্পর্কে বিস্তারিত ব্যাখ্যা ৫৪
৩৫। আমানত ৫৫
৩৬। আমানতের পরিমাণ ৫৭
৩৭। নির্ভরতার কারণ ৫৮
৩৮। প্রতিবেশীর সাথে সদ্ব্যবহারের একটি ঘটনা ৫৯
৩৯। উপঢৌকন ৬০
৪০। আলিম ও মুহাদ্দিসদের খেদমত ৬১
৪১। ফকীর ও অভাবগ্রস্তদের সাথে সদ্ব্যবহার ৬২
৪২। ছাত্রদের সাথে ব্যবহার ৬২
৪৩। ইমাম সাহেবের দানশীলতা সম্পর্কে শাকীক বলখীর বর্ণনা ৬৪
৪৪। সহনশীলতা ৬৫
৪৫। প্রতিবেশীর সহিত সদাচার ৬৬
৪৬। যিম্মীদের প্রতি সদ্ব্যবহার ৬৭
৪৭। ক্ষমাশীলতা ৬৭
৪৮। পরিষ্কার লেন-দেন ৬৮
৪৯। আমানত সম্পর্কে শরীয়তসিদ্ধ ব্যাখ্যা ৬৯
৫০। কাযী ইবন আবী লায়লার আদালতে ইমাম সাহেব ৭১
৫১। ব্যাপকভাবে কারবারের সম্ভাবনা ৭৪
৫২। ব্যাংক ব্যবস্থার প্রবর্তন ৭৫
৫৩। হুকুমতের সাহায্য গ্রহণ হইতে বেপরওয়া ৭৫
৫৪। ইমাম সাহেবের সাধনা ও পারিবারিক জীবন ৭৭
৫৫। ব্যবসায়ের উদ্দেশ্য ৭৮
৫৬। হকদার ও উৎপীড়িতের প্রতি সহানুভূতি ৭৯
৫৭। ইমাম সাহেবের সহনশীলতা ও মহত্ত্ব ৮১
৫৮। ইমাম সাহেবের স্বভাবগত মনযোগের প্রথম বহিপ্রকাশ ৮৩
৫৯। কূফার শাসনকর্তা খালিদের সীমাহীন উৎপীড়ন ৮৪
৬০। খালিদের বিস্ময়কর ফন্দি ৯১
৬১। হযরত যায়েদের সংক্ষিপ্ত পরিচয় ৯৩

৬২।	উপমহাদেশ ও নবী-পরিবার	৯৪
৬৩।	হযরত যায়দ সম্পর্কে ইমাম সাহেবের সাক্ষ্য	৯৫
৬৪।	হযরত হাসান ইবন মুহাম্মদের রচিত গ্রন্থ	৯৭
৬৫।	হযরত যায়দের জ্ঞান-গরিমা	৯৮
৬৬।	কুরআনের সাথে সম্পর্ক	৯৮
৬৭।	হযরত যায়দের একটি ভাষণ	৯৯
৬৮।	হযরত যায়দ কূফায়	১০১
৬৯।	কূফায় হযরত যায়দের ভক্তবৃন্দ	১০২
৭০।	হযরত যায়দের প্রতি ইমাম সাহেবের অনুরক্তি	১০৫
৭১।	হযরত যায়দের সমর্থনে ইমাম সাহেবের ঐতিহাসিক বর্ণনা	১০৬
৭২।	হযরত যায়দের জিহাদের জন্য দাওয়াত	১০৭
৭৩।	ইমাম সাহেবের রাজনৈতিক পদ্ধতির ব্যাখ্যা	১০৯
৭৪।	সৎকাজে আদেশ ও অন্যায় হইতে বিরত রাখা সম্পর্কে ইমাম সাহেবের দৃষ্টিভঙ্গি	১১১
৭৫।	হযরত যায়দের সঙ্গে ইমাম সাহেবের জিহাদে অংশ গ্রহণ না করার কারণ	১১৫
৭৬।	জিহাদের জন্য ইমাম সাহেবের আর্থিক সাহায্য	১১৮
৭৭।	কূফার অত্যাচারী শাসকের সামনে প্রথম সত্য প্রকাশ	১২৪
৭৮।	হুকুমতে বনী উমাইয়ার সাথে ইমাম সাহেবের সম্পর্ক	১২৬
৭৯।	ফতওয়ার জন্য ইমাম সাহেবের প্রথম আহ্বান	১২৬
৮০।	কুফায় যেহাক খারিজির আধিপত্য	১২৮
৮১।	ইমাম সাহেবের গ্রেফতারী	১২৮
৮২।	কুফায় হত্যাকান্ড	১২৯
৮৩।	যিহাকের সাথে ইমামের আলাপ-আলোচনা	১২৯
৮৪।	খারিজীদের পতন ও ইবন হুবায়রার শাসনামল	১৩০
৮৫।	ইবন হুবায়রার সাথে ইমাম সাহেবের সাক্ষাৎ	১৩১
৮৬।	নগিনার ঘটনা	১৩২
৮৭।	ইবন হুবায়রার আবেদন	১৩৩
৮৮।	ইমাম সাহেবের উত্তর	১৩৩
৮৯।	কোমলতার পর কঠোরতা	১৩৫
৯০।	উমাইয়া ও আব্বাসীয়াদের মধ্যে ক্ষকতার দ্বন্দ্ব	১৩৫
৯১।	ইমাম সাহেবকে প্রধান মন্ত্রীত্ব দানের প্রস্তাব	১৩৬
৯২।	ইমাম সাহেবের অস্বীকার	১৩৮
৯৩।	ফিকাহ্‌বিদদের পরামর্শ	১৩৮

৯৪।	ইমাম সাহেবের দ্বিতীয় পর্যায়ে অস্বীকার	১৩৯
৯৫।	জেলখানায় অন্য চাকুরীর প্রস্তাব	১৩৯
৯৬।	কাযীর পদ গ্রহণের জেদ	১৪০
৯৭।	ইমাম সাহেবের দৃঢ়তা	১৪১
৯৮।	মুক্তি লাভ	১৪২
৯৯।	সাময়িকভাবে ইমাম সাহেবের মক্কায় হিজরত	১৪৩
১০০।	আব্বাসী হুকুমত	১৪৫
১০১।	ইমাম সাহেবের কুফা প্রত্যাবর্তন	১৪৬
১০২।	কুফার আলিমদের সমাবেশে সাফ্ফার ভাষণ	১৪৭
১০৩।	আলিমদের পক্ষ হইতে ইমাম সাহেবের উত্তর	১৪৮
১০৪।	হেজাযে ইমাম সাহেবের কর্ম ব্যস্ততা	১৫৩
১০৫।	হেজাযের বিভিন্ন আলিমদের সাথে আলাপ আলোচনা	১৫৫
১০৬।	বাস্তবায়নের পূর্বে শরীয়তের নির্দেশ	১৫৭
১০৭।	কুফায় প্রত্যাবর্তন ও আইন প্রণয়ন	১৫৯
১০৮।	শৃংখলার সাথে প্রশ্ন করার স্বাধীনতা	১৬০
১০৯।	মজলিসে প্রণীতে আইনের সংখ্যা	১৬৪
১১০।	ইবরাহীম ইবন মায়মুন এবং ইমাম সাহেব	১৬৬
১১১।	আবু মুসলিম খোরাসানী	১৬৬
১১২।	আবু মুসলিম ও ইবরাহীমের বন্ধুত্ব	১৬৯
১১৩।	বিরোধ	১৬৯
১১৪।	আবু মুসলিম সম্পর্কে ইমাম সাহের সাথে পরামর্শ	১৭০
১১৫।	মতৈক্য	১৭১
১১৬।	জিহাদের জন্য ইমাম সাহেবের বায়'আত গ্রহণার্থে হস্ত সম্প্রসারণ	১৭১
১১৭।	ইমাম সাহেবের উত্তর	১৭৩
১১৮।	আবু মুসলিমের সম্মুখে ইবরাহীমের সত্য প্রকাশ	১৭৯
১১৯।	ইবরাহীমকে হত্যার মানসে আইনের ভাওতা	১৮০
১২০।	শাহাদাতের পূর্বে ইবরাহীমের আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ	১৮১
১২১।	ইবরাহীমের শাহাদত	১৮২
১২২।	আবু মুসলিমের হাতে নিহতদের সংখ্যা	১৮২
১২৩।	মেহদীর সমীপে হযরত সুফইয়ান সাওরী	১৮৪
১২৪।	আব্বাসী হুকুমতের প্রারম্ভে ইমাম সাহেবের নীরব সাধনা	১৮৭
১২৫।	সাধনার ব্যাখ্যা	১৮৭
১২৬।	বিচার বিভাগ সম্পর্কে শিষ্যদিগকে সঠিক শিক্ষাদান	১৮৮

১২৭।	জ্ঞানার্জনে প্রকৃত উদ্দেশ্য সম্পর্কে শিক্ষাদান	১৮৯
১২৮।	কাযীর পদ সম্পর্কে ইমাম সাহেবের অভিমত	১৯১
১২৯।	আদলতের যিম্মাদারদের সম্পর্কে ইমাম সাহেবের দৃষ্টিভঙ্গী	১৯২
১৩০।	আদালতের ক্ষমতা	১৯৩
১৩১।	ছাত্রদের উদ্দেশ্যে উপদেশ	১৯৩
১৩২।	ইমাম সাহের বিনয়	১৯৪
১৩৩।	বিচার সম্পর্কীয় রাষ্ট্রীয় নীতির সংশোধন	১৯৬
১৩৪।	আদালতের মীমাংসা সম্পর্কে ইমাম সাহেবের বিরামহীন হুঁশিয়ারী	১৯৭
১৩৫।	রওশনদানের মামলা	১৯৭
১৩৬।	পাগলের মামলা	১৯৮
১৩৭।	সাক্ষী সম্পর্কে ইমাম সাহেবের দৃষ্টিভঙ্গী	১৯৯
১৩৮।	জোলার কাহিনী	২০০
১৩৯।	আদালত গৃহে একটি মীমাংসা সম্বন্ধে সমালোচনা	২০২
১৪০।	আদালতের উপর হুকুমতের প্রভাব	২০৪
১৪১।	ইমাম সাহেবের সাধনার ফল	২০৫
১৪২।	ইমাম সাহেবের সৃষ্ট বিপ্লবের প্রতিক্রিয়া	২০৬
১৪৩।	আব্বাসী হুকুমতের সঙ্গে ইমামের সম্পর্কের সূত্রপাত	২১২
১৪৪।	আবু জাফর মনসুর	২১২
১৪৫।	বাগদাদ প্রতিষ্ঠার কাজে ইমাম সাহেবকে আহবান	২১২
১৪৬।	প্রাসাদ নির্মাণের তত্ত্বাবধায়ক	২১৩
১৪৭।	ইমাম সাহেব কেন এই কাজ গ্রহণ করিলেন	২১৪
১৪৮।	ইমাম ও মনসুরের সাক্ষাতের পূর্ণ বিবরণ	২১৭
১৪৯।	নির্মাণ কাজের তত্ত্বাবধায়ন	২১৮
১৫০।	শাহী তাঁবুতে ইমাম সাহেব	২১৯
১৫১।	একটি কৌতুকপ্রদ ঘটনা	২২০
১৫২।	হযরত ইমাম জাফর সাদিকের (রঃ) খিদমতে ইমাম সাহেবের প্রশ্ন	২২১
১৫৩।	খলীফার দরবারে ইমাম সাহেবের প্রভাব	২২২
১৫৪।	খলীফা ও বেগমের ঝগড়ায় ইমাম সাহেবের মীমাংসা	২২৩
১৫৫।	খলীফার দরবারে ইমামের শত্রু	১২৪
১৫৬।	ইমামকে মনসুরের প্রথম উপঢৌকন	২২৭
১৫৭।	মনসুরের দ্বিতীয় উপঢৌকন	২২৮
১৫৮।	ইমাম সাহেবের উত্তর	২২৯

১৫৯।	মনসুরের দরবারে ইমামের সত্য উদঘাটন	২৩০
১৬০।	আবু জাফরের আকাঙ্ক্ষা	২৩২
১৬১।	ইমাম সাহেবের উত্তর	২৩২
১৬২।	দ্বিতীয়বার শাহী দরবারে গমন	২৩৩
১৬৩।	ইমাম সাহেবের উত্তর	২৩৩
১৬৪।	নফসে যাকিয়ার বিদ্রোহের গুরুত্ব	২৩৭
১৬৫।	হাসানী সৈয়দ বংশ	২৩৭
১৬৬।	হযরত মুহাম্মদ ইবন আবদুল্লাহ নফসে যাকিয়া	২৩৮
১৬৭।	হাসানী বংশের জিহাদের কার্যকরী পরিকল্পনা	২৩৮
১৬৮।	আব্বাসী খিলাফত ধ্বংসের অভিপ্রায়	২৩৯
১৬৯।	আবু জাফরের সংবাদ প্রাপ্তি	২৪০
১৭০।	আব্বাসীদের বিরুদ্ধে সর্বশ্রেষ্ঠ বিপ্লবে ইমাম সাহেবের র অংশ গ্রহণ	২৪০
১৭১।	বিপ্লব সম্পর্কে ইমাম সাহেবের মতবাদ প্রকাশ	২৪১
১৭২।	বিপ্লবে প্রকাশ্য সাহায্য	২৪১
১৭৩।	আব্বাসীদের বিরুদ্ধে জিহাদের ফতওয়া	২৪৩
১৭৪।	ইসলামী আইন প্রবর্তনের জন্য ইমামের উৎসাহ উদ্দীপনা	২৪৬
১৭৫।	ইমাম সাহেবের ছাত্রদের জীবনের উপরও আশংকা	২৪৭
১৭৬।	ইমাম সাহেবের সাফল্য	২৪৮
১৭৭।	আব্বাসীদের প্রথম প্রধান সেনাপতি কাহতাবাহ	২৪৯
১৭৮।	আব্বাসীদের দ্বিতীয় সেনাধ্যক্ষ হাসান ইবন কাহতাবাহ	২৫০
১৭৯।	ইমামের দরবারে হাসান	২৫১
১৮০।	ইমামের উত্তর	২৫২
১৮১।	হাসানের প্রতিশ্রুতি	২৫২
১৮২।	নফসে যাকিয়া এবং ইবরাহীমের শাহাদত	২৫৩
১৮৩।	যুদ্ধে ইমাম কেন অংশ গ্রহণ করেন নাই	২৫৯
১৮৪।	শাহী দরবারে ইবরাহীমের বিচ্ছিন্ন মাথা	২৬৪
১৮৫।	বাগদাদ নির্মাণের অবশিষ্ট কাজ সম্পূর্ণ	২৬৭
১৮৬।	নির্মাণ কার্যের তত্ত্বাবধায়ক পদে হাজ্জাজ ইবনে আরতাত	২৬৭
১৮৭।	ইবরাহীমের সাহায্যকারীদের পরিণাম	২৬৮
১৮৮।	আবু জাফরের বিদ্বেষমূলক কাজ	২৬৯
১৮৯।	হযরত ইমাম মালিকের শাস্তি ভোগ	২৬৯

১৯০।	ইমাম মালিককে চাবুকের শাস্তি প্রদান	২৭১
১৯১।	হাজ্জায ইবন আরতাতের প্রথম অশুভ সূচনা	২৭২
১৯২।	ইমাম মালিকের নিকট রাজনৈতিক ক্ষমা প্রার্থনা	২৭৩
১৯৩।	ইমাম মালিকের সাথে সম্পর্ক প্রসার করার চেষ্টা	২৭৪
১৯৪।	মালিকী ফিকাহ সম্বন্ধে মনসূরের অভিমত	২৭৫
১৯৫।	রাজনৈতিক গোপন উদ্দেশ্য	২৭৫
১৯৬।	ইমাম মালিকের উত্তর	২৭৬
১৯৭।	আব্বাসী হুকুমত ইমাম মালিক হইতে নিরাশ	২৭৮
১৯৮।	ইমাম আবু হানীফা সম্বন্ধে মনসূরের শেষ সিদ্ধান্ত	২৭৮
১৯৯।	বাগদাদ নগর নির্মাণের সময়	২৭৯
২০০।	কুফার ইলমী পরিবেশ	২৭৯
২০১।	সুফইয়ান সাওরী, শরীফ ইবন 'আবদুল্লাহ, মা'ছার ইবন কুদাম এবং ইমাম আবু হানীফা (রঃ) -এর বাগদাদে আহ্বান	২৮০
২০২।	চারিজন 'আলিমের সম্মুখে মনসূরের উদ্দেশ্য জ্ঞাপন	২৮২
২০৩।	মা'ছার এবং সুফইয়ান কিভাবে মুক্তি পাইলেন	২৮৩
২০৪।	কাযীর পদ গ্রহণের প্রস্তাব ইমামের অস্বীকার	২৮৩
২০৫।	কাযী শরীফের কাযীর পদ গ্রহণ	২৮৫
২০৬।	কাযীউল কুযাতের পদ গ্রহণের প্রস্তাব	২৮৫
২০৭।	ইমামের শেষ পরীক্ষা	২৯৩
২০৮।	মন্ত্রী আবদুল মালিকের পরামর্শ	২৯৫
২০৯।	উৎপীড়ন সম্বন্ধে বিভিন্ন বর্ণনার সমালোচনা	২৯৫
২১০।	কাযীউল কুযাতের পদ সম্পর্কে আলাপ-আলোচনা	৩০০
২১১।	আব্বাসী হুকুমতের প্রতি ইমামের অনাস্থা	৩০১
২১২।	ইমাম সাহেবের গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক ভাষণ	৩০৪
২১৩।	আবু জাফরের শপথ	৩২১
২১৪।	ইমামের পাল্টা শপথ	৩২২
২১৫।	বেত্রাঘাত সম্পর্কে সঠিক বর্ণনা	৩২৩
২১৬।	ইমাম সাহেবকে মুফতী করার প্রস্তাব	৩২৫
২১৭।	কারাগারে	৩২৫
২১৮।	অন্তরীণ	৩২৬
২১৯।	রুসাফার কাযীর পদ গ্রহণ	৩২৬
২২০।	ইমাম সাহেবের আদালতে মামলা	৩২৮
২২১।	ইমাম সাহেবের ইন্তেকাল	৩২৯
২২২।	মৃত্যুর কারণ	৩৩০
২২৩।	গোসল	৩৩০

২২৪। জানাযায় লোক সমাবেশ ৩৩১
২২৫। দাফন ৩৩২
২২৬। ইমামের মৃত্যুর কারণ সম্পর্কে সমালোচনা ৩৩৩
২২৭। ইমাম সাহেবের ত্যাজ্য সম্পত্তি ৩৩৮

মেহদীর খিলাফত কাল

২২৮। ইমাম সাহেবের শিষ্যগণ ৩৩২
২২৯। কাযীউল কুযাতের পদ সৃষ্টি ৩৪২
২৩০। ইমাম যুফারকে কাযীউল কুযাত পদে বহালের প্রস্তাব ৩৪২
২৩১। ইমাম আবু ইউসুফ ৩৪৩

হারুন-উর রশীদের যুগ

২৩২। কাযীউল কুযাত পদে আবু ইউসুফ ৩৪৫
২৩৩। কাযীউল কুযাতের ক্ষমতা ৩৪৫
২৩৪। বিচার বিভাগের উপর ইমামের সাধনার প্রতিক্রিয়া ৩৪৮
২৩৫। খলীফাদের চরিত্র ও কার্যধারার উপর ইমামের সাধনার প্রতিক্রিয়া ৩৪৮
২৩৬। কাযীদের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব ৩৫১
২৩৭। কাযী আবু ইউসুফের গ্রন্থ কিতাবুল খারাজের ভূমিকার পর্যালোচনা ৩৫৪
২৩৮। আব্বাসী শাহযাদাদের হানাফী ফিকাহ অধ্যয়ন ৩৫৬
২৩৯। ইমাম আবু ইউসুফের ইন্তিকাল ৩৫৮
২৪০। কাযীউল কুযাত পদে কাযী ওয়াহাব ৩৫৮
২৪১। কাযী ওয়াহাবের হীন কার্যাবলী ৩৫৮
২৪২। গুরুত্বপূর্ণ পরীক্ষার সম্মুখীন ৩৬০
২৪৩। ইমাম মুহাম্মাদ ৩৬০
২৪৪। ইয়াহইয়া ইবন আবদুল্লাহর সংগ্রাম ৩৬০
২৪৫। হারুনের নিরাপত্তানামা ৩৬১
২৪৬। শরীয়ত মতে ছিদ্রান্বেষণ ৩৬১
২৪৭। ইমাম মুহাম্মদের উত্তর ৩৬২
২৪৮। কাযী ওয়াহাবের উত্তর ৩৬৩
২৪৯। ইমাম মুহাম্মাদের শাস্তি ভোগ ৩৬৩
২৫০। কাযী ওয়াহাবের পরিণতি ৩৬৫
২৫১। ইমাম মুহাম্মাদের কাযীউল কুযাত পদে নিয়োগ ৩৬৫
২৫২। ইমাম মুহাম্মদের ইন্তিকাল ৩৬৫

২৫৩। বয়স এবং সমাধি ৩৬৯
২৫৪। ইমাম মুহাম্মাদের মৃত্যুতে হারূনের উপর প্রতিক্রিয়া ৩৭০
২৫৫। কাযীউল কুযাত পদে ইয়াহইয়া ইবন আকছাম ৩৭০
২৫৬। কাযী ইয়াহইয়ার ধর্মীয় খিদমত ৩৭১
২৫৭। মু'তাসিম, মুতাওয়াক্কিল এবং ওয়াছিকের যুগ ৩৭২
২৫৮। কাযীউল কুযাত পদে আবূ 'আবদুল্লাহ ৩৭২
২৫৯। ইবন আবী শাওয়ারিব এবং দাগোন পরিবার ৩৭৩
২৬০। ইবন আবূ আবদুল্লাহর ভুল ৩৭৪
২৬১। অন্যান্য হুকূমতের বিচারালয়ের হানাফী প্রভাব ৩৭৯
২৬২। পরিশিষ্ট ৩৮১

টেলিগ্রাম চ্যানেল লিংক
https://t.me/islaMic_fdf

উপক্রমণিকা

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله و كفى و الصلوة و السلام على عباده

الذين اصطفى -

উছমানিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন ভাইস চ্যান্সেলর মাননীয় কাযী মুহাম্মদ হুসায়ন শিক্ষকদের শিক্ষাদানের বিষয়বস্তুসমূহ পূর্বাহ্নে আলোচনা করার মানসে একটি সংস্থা গঠন করিয়াছিলেন। সেই সংস্থার মিটিং-এ শিক্ষক মহোদয়গণ শিক্ষণীয় বিষয়ের বিভিন্ন দিক লইয়া আলাপ-আলোচনা করিতেন। আমার যখন আর্থিক সচ্ছলতা আসিল তখন আমি আমার কিতাব 'তাদবীনে ফিকাহ'-এর একটি অংশ বাছাই করিয়া কিতাব আকারে সাজাইয়া বিভিন্ন সভায় পাঠ করিতে আরম্ভ করিলাম। আর উহা ছিল ইমামে আজম আবূ হানীফা (রঃ)-এর রাজনৈতিক জীবনের ঘটনা। বিষয়বস্তু দীর্ঘ থাকায় কয়েকটি সভায় পাঠ করিয়াও শেষ করিতে পারিলাম না। আমার প্রত্যেকটি ভাষণ বেরেলীর 'আল-ফুরকান' নামক পত্রিকায় প্রকাশ করার মানসে মাসে মাসে পাঠাইয়া দেওয়া হইত। আবার 'আল-ফুরকান' হইতে অন্যান্য পত্রিকা প্রকাশ করিত। বিশেষ করিয়া বন্ধুবর মওলানা আবুল আ'লা মওদূদী সাহেব, আমীর, জামাআতে ইসলামী, একটি ভূমিকা লিখিয়া তাঁহার তরজুমানুল কুরআন জিলদ নং ১, ২, ৩ এবং ৪ সংখ্যায় প্রকাশ করেন।

তবুও বিষয়বস্তু অসম্পূর্ণ রহিয়া গেল। বন্ধুদের অনুরোধে পুনরায় ইহা সম্পূর্ণ করার ইচ্ছা বলবত হইল। গ্রন্থ যে এইরূপ বিরাটাকার হইবে প্রথমে এই ধারণা রইল না। কিন্তু যখন কলম ধরিলাম তখন আর উহাকে থামানো আমার আয়ত্তে ছিল না। কলম যেখানে থামিল আমিও সেখানে লেখা হইতে বিরত রহিলাম।

সত্য বলিতে কি, হানাফী ইতিহাসের কয়েকটি খুঁটিনাটি ঘটনা চোখে পড়ে। বনী উমাইয়া শাসনকালে কূফার গভর্নরদের মধ্যে একজন ছিলেন ইবনে হুবায়রা। তাঁহার ইচ্ছা ছিল ইমাম সাহেব যেন সরকারের অধীনে কোন একটি চাকুরী গ্রহণ করেন। ইমাম সাহেব

অস্বীকার করিলেন। এই অপরাধে ইবনে হুবায়রা তাঁহাকে কারাগারে পাঠাইলেন, নির্মমভাবে প্রহার করাইলেন।

আব্বাসীয় দ্বিতীয় খলীফা আবু জাফর মনসুর যখন শাসনদন্ড গ্রহণ করিলেন তখন বাগদাদ নগরী প্রতিষ্ঠা করার পর মনস্থ করিলেন ইমাম সাহেবকে বাগদাদের কাযীর পদে নিয়োগ করিবেন। ইমাম সাহেব অস্বীকার করিলে মনসুরও তাঁহাকে কারাগারে পাঠাইলেন—প্রহার করাইলেন।

মনে করুন এই ঘটনাদ্বয়কে কেন্দ্র করিয়াই উহার যে প্রকৃত বিবরণ হইতে পারে—উহাই এই গ্রন্থের বিষয়বস্তু। প্রকৃত ঘটনা উদ্‌ঘাটন করার পূর্বে ইমাম সাহেবের সময় তৎকালীন রাজনৈতিক অবস্থা কিরূপ ছিল সে সম্বন্ধে সামান্য আলোকপাত করা যুক্তিসঙ্গত হইবে বলিয়াই মনে করি।

প্রথম অধ্যায়

ইমাম সাহেবের যুগে রাজনৈতিক অবস্থার বিবরণ

হযরত ইমাম আবূ হানীফা (রঃ) বনী উমাইয়া খিলাফতের এমন এক সময় জন্মগ্রহণ করেন' যখন তাহাদের কুশাসন ও দুরাচারে সমস্ত মুসলিম জগত আতংকগ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছিল। তাহাদের দ্বারা এমন সব জঘন্য ও গর্হিত কার্য সমাধা হইতেছিল, যাহাদের উদাহরণ শুধু ইসলামের ইতিহাসেই নয়, বিশ্ব ইতিহাসেও বিরল। রসূলুল্লাহ্ (সঃ)-এর দৌহিত্র এবং তাঁহার পিপাসার্ত বংশধরদের প্রবাহিত রক্তধারা দিয়া ফোরাত নদীর তীরভূমি তাহার লোলুপ পিপাসা চরিতার্থ করিয়াছিল। হিরার ঘটনার প্রতিশোধ গ্রহণ মানসে রসূলুল্লাহ্র পবিত্র শহর মদীনায় লুটতরাজ চলিতেছিল। শুধু ধন-সম্পদ ও জীবনের উপর দিয়াই এই নিষ্ঠুর ঝঞ্ঝা প্রবাহিত হয় নাই বরং সেই সাথে অন্তপুরবাসিনীদের মান-ইয্যতও ধূলায় ধূসরিত করিয়া দেওয়া হইয়াছিল। বহুদিন পর্যন্ত একমাত্র সাহাবা হযরত সাঈদ ইবনে মুসাইয়াব ব্যতীত দ্বিতীয় কোন প্রাণী মসজিদে নববীতে নামায পড়িতে আসিতেন না।

পবিত্র কাবাগৃহও এই জালিমদের লজ্জাহীন অবমাননা হইতে রেহাই পায় নাই। মুসলিম জাহানের প্রথম খলীফার দৌহিত্র হযরত 'আবদুল্লাহ্ ইবনে যুবায়র তাহাদের হাতেই কা'বার আঙিনায় নির্মমভাবে শহীদ হন। অত্যাচারের মূর্ত প্রতীক হাজ্জাজের নিষ্ঠুর তরবারির আঘাতে সামান্য কথার জন্য হাযার হাযার মুসলমানের মস্তক দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া ধূলায় লুণ্ঠিত হইয়াছে। এই নিহতদের মধ্যে সাহাবায়ে কিরামদের সন্তান-সন্ততি এবং বুযুর্গ তাবিঈগণও শামিল ছিলেন।

মোটকথা, বনী উমাইয়া শাসকগণ ও তাহাদের বর্বর গভর্নরদের বর্বরতা সারা মুসলিম জগতে এমন এক নির্মমতার নজীর স্থাপন করিয়া রাখিয়াছিল, যাহা দর্শনে প্রত্যেকটি লোক হতবাক হইয়া গিয়াছিল। সকলেই ছিল দর্শক—বাধা দেওয়ার ক্ষমতা কাহারও ছিল না। নেতৃস্থানীয় লোকদের মুখেও কোন ভাষা ছিল না—প্রতিবাদ ছিল না।

ইয়াযীদ ইবনে যিয়াদ এবং হাজ্জাজের ন্যায় 'যুগের অভিশাপ' ছাড়াও যাঁহারা সদাচারী ও সহনশীল হিসাবে পরিগণিত হইতেন, তাঁহাদের

দরবারেও প্রবীণ সাহাবীদের সাথে যে কি ব্যবহার হইত তাহা নিম্নোক্ত ঘটনায় প্রকাশ পাইবে। হিরার ঘটনার পর মদীনাবাসীদের প্রতি যে অন্যায় ও উৎপীড়ন করা হইতেছিল, তাহাদিগকে গৃহকোণে অন্তরীণ রাখিয়া তাহাদের জীবিকা অর্জনের পথ বন্ধ করিয়া দিয়া তাহাদিগকে তিলে তিলে যেভাবে মরণের পথে লইয়া যাওয়া হইতেছিল উহার প্রতিকারার্থে বয়োবৃদ্ধ অন্ধ সাহাবী হযরত জাবির ইবনে আবদুল্লাহ্ মদীনা হইতে পায়ে হাঁটিয়া দামিশক আগমন করেন। তিনি খলীফা আবদুল মালিক ইবনে মারওয়ানের দরবারে দাঁড়াইয়া বিনীতভাবে আরয করিলেন ঃ

'আমীরুল মুমিনীন! মদীনার বর্তমান পরিস্থিতি আপনার নখদর্পণে। উহা পবিত্র শহর, আল্লাহ্র রসূলের দেওয়া নাম। মদীনাবাসিগণ কয়েদীর ন্যায় গৃহকোণে আবদ্ধ। আমীরুল মুমিনিন! যদি তাহাদের প্রতি আপনার দয়ার উদ্রেক হয় এবং তাহাদের অধিকার তাহাদিগকে ফিরাইয়া দেন তবে কতই না ভাল হইত!'

মদীনাবাসী, অবুঝ বালক-বালিকা, অন্তপুরবাসিনীদের দুরবস্থা জানাইয়া একজন বুযুর্গ সাহাবী করুণতর এক দরখাস্ত পেশ করিয়াছিলেন। কিন্তু উহা উপলব্ধি করার পরিবর্তে আবদুল মালিকের বক্ষদেশে অগ্নিশিখা জ্বলিয়া উঠিল, চক্ষুদ্বয় ক্রোধে লাল বর্ণ ধারণ করিল। সাহাবী অন্ধ ছিলেন। তাই আবদুল মালিকের অবস্থা দেখিতে না পাইয়া বারবার তিনি তাঁহার দরখাস্ত পেশ করিতেছিলেন। তাঁহার সাথেও রূঢ় ব্যবহার করার উদ্যোগ হইতেছিল। কিন্তু ঘটনাক্রমে কবীছা নামক তাঁহার একজন ছাত্র সেখানে উপস্থিত ছিলেন। তিনি উক্ত সাহাবীর হাত ধরিয়া দরবার হইতে বাহিরে লইয়া আসিলেন। তিনি অন্ধ উস্তাদকে বলিলেন, 'হুযুর! বনী উমাইয়াগণ তো এখন বাদশাহ।' অর্থাৎ আপনি কি এখনও তাহাদিগকে মুসলমানদের আমীর এবং খলীফা মনে করেন? তাঁহারা নিজদিগকে রসূলুল্লাহ্র অনুসারী বলিয়া মনে করেন না। তাঁহারা তো রোম ও ইরান অধিপতিদের অনুকরণে বাদশাহ হইয়া গিয়াছেন। কবীছা আবদুল মালিকের একজন আস্থাবান দরবারী ছিলেন—একথা সকলেই জানিত। তাই তিনি বলিলেন—'তুমিও তো কিছু বলিতে পার! তোমার কথা তো বাদশাহ শোনেন।'

ইহার উত্তরে কবীছা যাহা বলিলেন উহাতে এই সব খলীফার কার্যধারা কিভাবে প্রকাশ পায় দেখুন। তিনি বলিলেন, হযরত! তাহারা শোনেও এবং শোনেও না! যে কথা তাহাদের ইচ্ছা ও মরযী মুতাবিক হয় শুধু উহাই শোনে। (ইবনে সা'আদ)

মারওয়ানী খানদানের প্রথম খলীফারই ছিল এই অবস্থা। উহার পর যাহারা সালতানাতের কোলে প্রথম চোখ খুলিয়াছিলেন প্রভুত্বের রং তাহাদের দেহে কত গভীরভাবে লাগিয়াছিল। চিন্তা করুন, তাহাদের এই প্রকার বর্বরতার চরম অবনতি ঘটিয়াছিল ইমাম সাহেবের জন্মস্থান কুফায়। ইবনে যিয়াদ এবং হাজ্জাজের রক্তলোলুপ খোলা তরবারি একাদিক্রমে বিশ বৎসর পর্যন্ত কুফাবাসীদের মাথার উপর উহার ধার পরীক্ষা করিয়াছিল। তখন কুফাবাসী কি সংকটময় অবস্থার মধ্যে কালাতিপাত করিতেছিল—উহা বর্ণনাতীত। ইমাম আবু হানীফা (রঃ)-এর উস্তাদের উস্তাদ ইবরাহীম নখয়ী হাজ্জাজের মৃত্যুসংবাদ পাইয়া সাথে সাথেই সিজদায় পতিত হইয়াছিলেন। কথিত আছে, তখন তাঁহার গন্ডদেশ বাহিয়া অশ্রুধারা প্রবাহিত হইতেছিল।

লৌহদন্ডের প্রতাপে তাঁহারা এমন সন্ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করিয়াছিলেন যে, সেখানে কোন প্রকার সংশোধনের কথা মুখে বাহির করাই ছিল নিজের মৃত্যু ডাকিয়া আনা। তাই অতি বড় দৃঢ়চেতা এবং সত্যের সাধকও চুপ করিয়া থাকাকেই প্রাধান্য দিয়াছিলেন। মহাত্মা হাসান বসরী, ইবনে সীরীন, ইবরাহীম নখয়ী, শা'বী (রঃ)-এর ন্যায় মহান বুযুর্গ ও সত্যের একনিষ্ঠ সাধকগণও চুপ করিয়া থাকা ব্যতীত দ্বিতীয় কোন পথ খুঁজিয়া পাইতেছিলেন না।

তখন সকলের মনেই সন্দেহ চাড়া দিয়া উঠিল—যদি রাষ্ট্রের এই অবস্থাই বিদ্যমান থাকে তবে অচিরেই কুরআন ও হাদীসের নির্দেশানুযায়ী সৎকাজের আদেশ এবং অসৎ কাজ হইতে বিরত রাখার প্রচার কার্য চিরতরে বন্ধ হইয়া যাইবে। ফলে হযরত (সঃ) যেসব ইসলামী আইন-কানুন প্রবর্তন করিয়া গিয়াছিলেন, লোভ-লালসার পূজারী ক্ষমতালিপ্সু বাদশাহ ও তাহাদের কর্মচারীদের হাতে পর্যায়ক্রমে উহা একেবারে নিশ্চিহ্ন হইয়া যাইবে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

হযরত উমর ইবনে আবদুল আযীযের খিলাফত

তেরশত বৎসর হইতে ইসলামের ইতিহাস ইসলাম সম্বন্ধে পারস্পরিক-ভাবে যে অভিজ্ঞতার সাক্ষ্য দান করিয়া আসিতেছে ইমাম সাহেবের আঠার বৎসর বয়সের সময় উহা প্রকাশ লাভ করিল। অর্থাৎ ইসলাম তরী যখন বিপদের চরম আবর্তনে ঘূর্ণিপাক খাইতে থাকে, দর্শকগণ যখন উহা চিরতরে ডুবিয়া যাওয়ার ভবিষ্যবাণী করে, তখন কোন অদৃশ্য শক্তি প্রকাশিত হইয়া (انا له لحافظون আমি উহার রক্ষক) নিরাশার উক্ত ভবিষ্যদ্বাণীকে মিথ্যায় পর্যবসিত করিয়া দেয়।

আমার বক্তব্য এই যে—ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গিতে বনী উমাইয়ার শাসকেরা তখন কেবল মৃতদেহই নয়, গলিত লাশে পরিণত হইয়া চতুর্দিকে দুর্গন্ধ ছড়াইতেছে। তাঁহাদের কোন একজন খলীফা তাহার অপবিত্র দাসীকে নাপাক অবস্থায় আবা ও পাগড়ি পরাইয়া মসজিদে ইমামতি করিতে পাঠাইয়াছিলেন। বেচারা মুসল্লিগণ না জানিয়া তাহার পিছনেই সালাত আদায় করিলেন। কিন্তু মৃতদেহ হইতেই জীবিতকে নির্গতকারীর সেই মহান সত্তার এমনই কুদরত যে, এই মৃতদেহ হইতেই হযরত উমর ইবনে আবদুল আযীযের মত ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তিকে খিলাফতের আসনে সমাসীন করিলেন, যাহার ঈমানের শক্তিতে আবার ইসলামী রীতিনীতির প্রতিটি শাখা-প্রশাখায় জীবনের প্রবাহ নূতন-ভাবে প্রবাহিত হইতে লাগিল। এই সময় ইমাম সাহেব পরিপূর্ণ বয়সের একজন যুবক। হযরত উমর ইবনে আবদুল আযীয প্রথম যে ভাষণ দিয়েছিলেন, উহার প্রথম বাক্য ছিল: 'আল্লাহ্‌র নাফরমানী হইতে পারে—কেহ যেন আমার এমন আদেশ পালন না করে।'

ইহাই ছিল ব্যক্তি-স্বাধীনতার প্রথম সনদ—যাহা বনী উমাইয়া খলীফাদের মধ্যে হযরত ইবনে আবদুল 'আযীয প্রচার করিয়াছিলেন। প্রত্যেকটি অত্যাচারী গভর্নর সম্বন্ধে তিনি জ্ঞাত ছিলেন। একে একে সকলকেই অপসারণ করিলেন। প্রত্যেককে নির্দেশ দিলেন—ইসলামী রীতিনীতির যেখানে যেখানে ভাঙন ধরিয়াছে উহাকে পুনরায় সংশোধন

কর। ফল এই দাঁড়াইল যে, তরবারির ভয় দেখাইয়া যে সমস্ত মুখ বন্ধ করিয়া দেয়া হইয়াছিল উহা খুলিয়া গেল। সৎকাজে আদেশ এবং অসৎ কাজ হইতে বিরত রাখার যে আলো প্রায় নিবু নিবু হইয়া গিয়াছিল তাহা পুনরায় জ্বলিয়া উঠিল। মদীনার প্রসিদ্ধ ইমাম হযরত কাসেম ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আবুবকর বলিয়াছিলেন, 'যাহার বলার ক্ষমতা ছিল না সে এখন বলিবে।'

হযরত উমর ইবনে আবদুল' আযীযের এই প্রচারের অর্থ ছিল এক-দিকে জনসাধারণ তাহার আমলে নতুনভাবে স্বাধীনতা লাভ করিল, অন্যদিকে আরো একটি পরিবর্তন সেই যুগে দেখা দিল অর্থাৎ উমাইয়া খলীফাদের আমলে মানুষের মনে ইসলামের প্রতি বিরূপ ধারণার সৃষ্টি হওয়ায় কুরআন ও হাদীসের এবং ফিকাহ শাস্ত্রের প্রতি মানুষের আগ্রহ কমিয়া গিয়াছিল। ইসলামী ধারায় জীবনযাত্রা নিয়ন্ত্রণ করার প্রয়োজন যখন কমিয়া যায়, তখন ঐ জাতীয় শিক্ষারই বা কি প্রয়োজন থাকিতে পারে?

ইমাম সাহেবের একটি বর্ণনা হইতে জানা যায় যে, তিনি বলিয়াছেন, জনগণের শরীয়ত শিক্ষার প্রতি আগ্রহ কমিয়া গিয়া কবিতা ও সাহিত্যের প্রতি উহা ঝুঁকিয়া পড়িল। দীনী 'ইলমের গুরুত্ব ঐসব বিষয়ের প্রতি ছিল, যাহাতে দার্শনিক রঙ লাগানো থাকিত, ইহাকে সেই যুগে ইলমে কালাম বলা হইত। মনে হইত, ধর্মও জীবনের এক প্রকার আরাম-আয়েশের বস্তুতে পরিণত হইয়াছে।

তৃতীয় অধ্যায়

ইমাম সাহেবের প্রারম্ভিক শিক্ষার অনুরাগ

ইমাম সাহেব তাঁহার শিক্ষালাভ সম্বন্ধে নিজেই বলেন ঃ

প্রথমে আমি মনে করিতাম সমস্ত 'ইলমের মধ্যে 'ইলমে কালামের (তর্কশাস্ত্র বা যুক্তিবিদ্যা) স্থান সকলের উর্ধ্বে। কেননা, ইহাতে তো ধর্মের বুনিয়াদ সম্পর্কেই আলাপ-আলোচনা করা হইয়া থাকে। ফলে ইমাম সাহেব যে স্বাভাবিক মেধা শক্তির অধিকারী ছিলেন, ইলমে কালাম অধ্যয়ন করায় তাঁহার অনুরাগ ও বুদ্ধিমত্তা এতটা প্রখর হইয়া উঠিল যে' ইমাম সাহেব 'ইলমে-কালামে তাঁহার যুগের শ্রেষ্ঠ আসনের অধিকারী হইয়াছিলেন এবং সকলের দৃষ্টি তাঁহার প্রতি নিবদ্ধ ছিল। (মানাকিব)

জ্ঞানার্জনের ইতিহাস বর্ণনা করিতে গিয়া ইমাম সাহেব 'ইলমে কালামের প্রতি নিজের অনুরাগ সম্বন্ধে বলিয়াছেন ঃ 'প্রথমাবস্থায় ইলমে-কালাম সম্পর্কে আলাপ-আলোচনা ও তর্ক-বিতর্ক করিতে আমার খুবই আগ্রহ ছিল। এইভাবে বেশ কিছুদিন অতিবাহিত হইল এবং আমিও ইহার পিছনে লাগিয়া রহিলাম। এই বিষয়ে আমি লোকের সাথে তর্ক করিতাম এবং প্রশ্ন আহবান করিতাম।'

যৌবনের আগ্রহের এই আতিশয্যে যখন তর্ক-বিতর্ক করার মত কোন লোক কুফায় পাইতেন না, তখন ইলমে-কালামের পীঠস্থান বসরা চলিয়া যাইতেন এবং সেখানে ইলমে-কালামের বড় বড় পণ্ডিতদের সাথে তর্ক যুদ্ধ চালাইতেন। তিনি বলেন ঃ "তর্ক-বিতর্ক ও প্রতি-যোগিতা করার অভিলাষী বড় বড় দল বসরায় থাকিত। এই উদ্দেশ্যে আমি কমপক্ষে বিশ বার বসরা গিয়াছি এবং প্রায়ই বৎসর ব্যাপী সেখানে অতিবাহিত করিয়াছি।"

এই প্রকার বিতর্কে মুসলমানদের লিপ্ত থাকায় যেহেতু রাষ্ট্রের কোন ক্ষতি হইত না বরং নিত্য নতুন দলের সৃষ্টি হইয়া 'বিবাদ লাগাও হুকুমত কর' রাজনীতির চালই পরিপূর্ণ হইত। এই কারণে সরকার পক্ষ উহাতে বাধা না দিয়া প্রকারান্তরে উস্কানিই দিত। ইমাম সাহেবের বর্ণনা মতে দেখা যায়—তখনকার দিনে এই প্রকার বিতর্কবাদীদের জন্য বসরা ছিল প্রশস্ত ক্ষেত্র। তিনি বলেন ঃ 'আমি বসরায় খারিজী

ও বিভিন্ন মতবাদী যেমন 'আবাসিয়া ও সকরিয়াদের সাথে তর্ক-বিতর্ক করিয়াছি। হাশুবিয়া মতবাদ সমর্থনকারীদের বিভিন্ন দলের সাথেও আমার তর্ক-বিতর্ক হইয়াছে।

এই সমস্ত দার্শনিকের অবস্থা কিরূপ ছিল তাহাও ইমাম সাহেবের ভাষণেই শোনা উচিত। তাহাদের এই মনগড়া তর্ক-বিতর্ককে ধর্মের রঙে রঞ্জিত করার জন্য তাহারা উহার নাম দিয়াছিল কালাম। কিন্তু তাহাদের যে অবস্থা ছিল সে সম্বন্ধে ইমাম সাহেব বলেন ঃ

'না, তাহাদের আকৃতি ঠিক প্রাচীন বুযুর্গদের ন্যায় আর না হউক তাদের চালচলন ছিল সালেহীনদের মত। আমি দেখিতাম তাহারা ছিল কঠিন প্রকৃতির, তাহাদের অন্তর ছিল উপলব্ধিহীন। কুরআন ও সুন্নতের পরিপন্থী কোন কথা বলিতে তাহারা মোটেই দ্বিধাবোধ করিত না। তাহাদের মধ্যে না ছিল পরহেযগারী আর না ছিল লোকভীতি।'

মুসলমানদের এই অবস্থা আস্তে আস্তে বাড়িয়াই চলিতেছিল। যদিও তখন কুরআন, হাদীস ও ফিকাহ শাস্ত্রে জ্ঞানী লোক দেশে বিদ্যমান ছিলেন তথাপি আল্লাহ্ না করুন—যদি উমর ইবনে আবদুল আযীযের হুকুমত প্রতিষ্ঠিত না হইত তবে কে বলিতে পারিত যে ধর্মের পরিণতি কি হইত? উমর ইবনে আবদুল আযীয (রাঃ)তাঁহার প্রথম ভাষণে খলীফাদের প্রতি আনুগত্য থাকা সম্পর্কে যে নীতি বর্ণনা করিয়াছিলেন সেখানে দৃঢ়তার সাথে তিনি একথাও প্রচার করিয়াছিলেন যে ঃ

'আল্লাহ্ তা'আলা যদি আমার হাতে প্রতিটি বিদ'আত ধ্বংস করেন এবং আমার হাত দ্বারাই প্রতিটি সুন্নত পুনরুজ্জীবিত করেন, এই কাজে আমার দেহের প্রতিটি টুকরা কাজে আসে এবং পরিশেষে আমার জীবন যদি এই কাজে নিঃশেষও হইয়া যায়, তবুও আল্লাহ্র পথে আমার এই উৎসর্গ অতি সামান্য বলিয়াই বিবেচিত হইবে।'

এই সম্পর্কে তাঁহার নীতি ছিল—তাঁহার আমলে যে সমস্ত শাহী ফরমান গভর্নর ও কর্মচারীদের নামে জারি করা হইত, ঐতিহাসিকদের মতে উহাতে লিপিবদ্ধ থাকিত—কোন প্রকার অত্যাচার উৎপীড়নের নিরসন করা, কোন সুন্নতকে পুনরুজ্জীবিত করা অথবা কোন বিদ'আতী রীতি-নীতিকে মিটাইয়া দেওয়া বা কাহারও জন্য কোন প্রকার বৃত্তি নির্ধারণ করা অথবা কোন পুণ্যের কাজে আদেশ করা। জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত ইহাই ছিল তাঁহার ফরমানের বিষয়বস্তু।'

ইহার পরিণাম এই দাঁড়াইল যে, মানুষের আগ্রহের মোড় ঘুরিয়া দাঁড়াইল। কুরআন হাদীস হইতে যে আগ্রহ দূরে সরিয়া গিয়াছিল

উহাতে আবার হঠাৎ নূতন উৎসাহ ও উদ্দীপনার সঞ্চার হইল। যতদূর আমার মনে হয়—ইমাম সাহেবের উপরও ইহার প্রতিক্রিয়া আরম্ভ হইল। ইমাম সাহেব বলেন ঃ ইলমে কালামের গভীর সমুদ্রেই আমি নিমজ্জিত হইয়া ছিলাম। হঠাৎ আমার ধারণার পরিবর্তন হইল এবং এক যুগ ইলমে কালামের তর্ক-বিতর্কে লিপ্ত থাকার পর আমি আত্মবিশ্লেষণ ও আত্মসমীক্ষায় নিয়োজিত রহিলাম। তখন আমার অন্তর আমাকে বলিল;—আল্লাহ্‌র রসূল, সাহাবা এবং তাবিঈদের হইতে এমন কোন কাজ বাদ পড়ে নাই, যাহা আমরা পাইতে চাই। অথচ তাঁহারা এই সম্বন্ধে জানার বেশী শক্তি রাখিতেন, এই সম্বন্ধে তাহারা অধিক জ্ঞানী ছিলেন, উহার যথার্থতা সম্বন্ধেও অধিক পরিজ্ঞাত ছিলেন। কিন্তু এই প্রকার সমস্যা সম্পর্কে কখনও তাঁহারা তর্ক-বিতর্ক করেন নাই বরং চুপ করিয়াই রহিয়াছেন। অবশ্য শরীয়ত ও ফিকাহ্‌র নিয়ম-কানুন সম্পর্কে চিন্তা ভাবনা করিতেন; আলাপ-আলোচনা করিতেন। আপস চিন্তা-ভাবনা করিয়া কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হইতেন। পরে লোকদিগকে সেই সম্পর্কে জ্ঞাত করাইতেন, শিক্ষা দিতেন। প্রথম শতাব্দী—যে শতাব্দীতে সাহাবা ও তাবিঈগণ জীবিত ছিলেন—উহা এইভাবেই অতিবাহিত হইয়া গিয়াছে।

যাহা হউক আমার মনে হয় উমর ইবনে আবদুল আযীযের সংশোধনী রীতিনীতিই ইমাম সাহেবের জীবনে গভীর প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করিয়াছিল। তিনি এই সময় এতটা অভিভূত হইয়া পড়িয়াছিলেন যে, এই পর্যন্ত ইলমে-কালামের তর্ক-বিতর্কের যে সম্পদ সঞ্চয় করিয়াছিলেন মুহূর্তে উহাতে অগ্নি সংযোগ করিয়া দিলেন। এই সম্পর্কে তিনি বলেন,—ইলমে-কালাম সম্পর্কে উপরে বর্ণিত মতে যখন আমার ধারণা বদ্ধমূল হইল তখন আমি তর্ক-বিতর্ক পরিত্যাগ করিয়া এই বিষয়ে চিন্তা-ভাবনা করা হইতে বিরত রহিলাম। প্রাচীন বুযুর্গগণ যে পথের পথিক ছিলেন আমি সেই পথের অনুসারী হইলাম।

স্বভাবতই ইলমে-কালামের একজন বিজ্ঞ আলিমকে এই ইনকিলাবী পদক্ষেপে একজন সাধারণ লোকের পর্যায়ে আনিয়া উপনীত করিল। কেননা এই সময় পর্যন্ত তিনি শরীয়তের মসলা-মাসায়েল সম্পর্কে মোটেই দৃকপাত করেন নাই। বরং এ সম্পর্কে তিনি ছিলেন একেবারে অনভিজ্ঞ। তিনি বলেন—লোকে ঈলা সম্বন্ধে বলাবলি করিতেছিল। আমি আমার একজন বন্ধুর নিকটই জিজ্ঞাসা করিলাম—'ঈলা' আবার কি? বন্ধু উত্তর করিলেন ঃ আমি জানি না।

ইমাম হাম্মাদের শিষ্যত্ব গ্রহণ

তিনি ছিলেন উচ্চাভিলাষী। বয়স বেশী হওয়া সত্ত্বেও সেদিকে তিনি ভ্রূক্ষেপ না করিয়া নিজের অজ্ঞতা স্বীকার করিয়া শ্রেষ্ঠ শরীয়তবিদ ইমাম হাম্মাদ ইবনে সুলায়মানের মাদ্রাসায় নিয়মিতভাবে উপস্থিত হইতে লাগিলেন। এই বিষয়ে জ্ঞানার্জনের আগ্রহ সম্পর্কে তিনি নিজেই বলেন, 'আমি দশ বৎসর পর্যন্ত তাঁহার অধ্যাপনায় থাকি।'

লোকের বর্ণনা মতে 'ইলমে-শরীয়তে অভিজ্ঞতা অর্জন করার পরও তিনি নিজকে অভিজ্ঞ মনে না করিয়া আবার ইমাম হাম্মাদের মাদ্রাসায় উপস্থিত হইতে থাকেন। ইমাম সাহেব স্বয়ং বলেন, 'ইমাম হাম্মাদের মৃত্যু না হওয়া পর্যন্ত আমি তাঁহার নিকট হইতে পৃথক হই নাই।'

মোট কথা, হযরত উমর ইবনে আবদুল আযীযের বিপ্লবাত্মক শাসন-কালে একদিকে যেমন ইমাম সাহেবকে শরীয়তের জ্ঞানার্জনে আগ্রহশীল করিয়া তুলিয়াছিল, তেমনি অন্যদিকে উহার প্রচার এবং বনী উমাইয়া খলীফাদের দ্বারা ইসলামী রীতিনীতিতে যে ক্ষতি সাধন হইয়াছিল উহার প্রতিকারের সুযোগ মিলিয়া গিয়াছিল। ঘটনা ও অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে দেখা যায়—এই দুইটি বিষয়ই ইমাম সাহেবের উপর প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করিয়াছিল। জ্ঞানার্জন ও জ্ঞান বিস্তারের পূর্ণ সফলতাই আল্লাহ্ তাঁহাকে দান করিয়াছিলেন। কিন্তু হঠাৎ আবার সময়ের মোড় ঘুরিয়া দাঁড়াইল। যে ইলমের দ্বারা ইমাম সাহেব ইসলাহ্ এবং আমর বিল মা'রুফ ও নাহি 'আনিল মুনকারের (চরিত্র সংশোধন এবং সৎকাজে আদেশ ও অসৎ কাজ হইতে নিষেধ) ময়দানে অবতীর্ণ এবং নিজের ইচ্ছা পরিপূর্ণ করিতে চাহিয়াছিলেন সেই পথ কন্টকময় হইয়া উঠিল।

হযরত উমর ইবনে আবদুল আযীযের মৃত্যু এবং পরবর্তী খলীফাদের পদস্খলন

হযরত উমর ইবনে আবদুল আযীয প্রায় আড়াই বৎসরকাল শাসন করিয়া ইন্তিকাল করেন। তাঁহার পর আবদুল মালিকের পুত্র ইয়াযীদ সিংহাসনে আরোহণ করেন। সিংহাসনে আরোহণ করার পরই তিনি যে ফরমান জারি করেন, উহার কিয়দংশ এখানে উদ্ধৃত হইল ঃ

اما بعد فان عمر كان مغرور اغرر تمسوه انتم واصحابكم فاذا اتاكم كتابي هذا فدعوا ما كنتم تحرفون من عهده - اعيد الناس

الى صاحبتهم الاولى اخضروام اجل يبوا احبوا ام كرهوا احبوا ام ماتوا والسلام -

(ইকদুল ফরীদঃ ২য় জিলদ)

অতঃপর প্রকাশ থাকে যে, উমর ইবনে আবদুল আযীয গোমরাহীতে পতিত হইয়াছিলেন। তোমরা এবং তোমাদের সাথিগণ তাহাকে ধোঁকায় নিপতিত করিয়াছিলে। আমার এই ফরমান তোমাদের নিকট পেঁাছার এক মুহূর্তের মধ্যে ঐ সমস্ত কাজ পরিত্যাগ কর, যাহা উমরের শাসনকালে পালন করিতে। দেশের অবস্থা সচ্ছল হউক কিংবা অভাব অনটন থাকুক, লোকে পসন্দ করুক কিংবা না করুক, বাঁচুক বা মরুক— লোকদিগকে তাহাদের পূর্বাবস্থায় ফিরাইয়া আন।'

এই ফরমান জারি করার পর লোকের অবস্থা কি হইতে পারে, তাহা সহজেই অনুমেয়। ইয়াযীদের পর ইমাম সাহেবের জীবদ্দশায় ছয়জন বনী উমাইয়া খিলাফতের আসনে সমাসীন হন। তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই হযরত উমর ইবনে আবদুল আযীযের প্রদর্শিত নীতি পরিত্যাগ করিয়া নিজেদের পিতৃ পুরুষদের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া গিয়াছেন। তাঁহারা সকলেই নবুওয়তের পথ পরিত্যাগ করিয়া অনারব রাজা-বাদশাহ্দের নীতির অনুসারী ছিলেন এবং তাঁহাদের নিয়ম-কানুন মুতাবিক রাষ্ট্রীয় কার্য পরিচালনা করিতেন। ইয়াযীদ নিজে যিনি হযরত উমর ইবনে আবদুল আযীযের পর সিংহাসনে আরোহণ করেন, তাঁহার লাম্পট্য ও ইন্দ্রিয়সেবা চরম মাত্রা ছাড়াইয়া গিয়াছিল। এই সম্পর্কীয় সালামাহ ও হাবাবাহ্র সৌন্দর্য ও প্রেমের কাহিনী লোকের মুখে মুখে প্রচারিত হইয়া পড়িয়াছিল। ইহাও কথিত আছে যে, সালামাহ্র মৃতদেহের উপরও ইয়াযীদ পাশবিক অত্যাচার করিয়াছিল।

এই অবস্থায় হুকুমতের তরফ হইতে চরিত্র সংশোধনের প্রচারণা বা আন্দোলনের আশা কিভাবে করা যাইতে পারে? যে শাসক প্রজার সাথে এই প্রকার জুলুম করিতে পারে, যার হুকুম, বাঁচ কিংবা মর' যাহার হুকুমের এক চুল এদিক-সেদিক হইবার উপায় নাই— তাহাদের নিকট হইতে এই আশা কখনও পোষণ করা যাইতে পারে না যে, শরীয়তের আইন-কানুন পুনরুজ্জীবিত করিতে সে সাহায্য করিবে।

কিন্তু আন্তরিকতা ও একাগ্রতার সঙ্গে যে আন্দোলনের ভিত্তি স্থাপন করা যায়, স্বর্গীয় শক্তি অবশ্য উহাকে নিষ্ফল হইতে দেয় না। উমর ইবনে আবদুল আযীয মৃত্যুবরণ করার সাথে সাথেই উহা ধ্বংস করিয়া দেওয়ার চেষ্টা চলিতে লাগিল। কিন্তু যাহারা তাঁহার ঘোষণাকে মনে-

প্রাণে গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের অন্তরে উহা রনিয়া রনিয়া বাজিয়া উঠিতেছিল। এই সময় অন্য কোন ব্যক্তির কথা নয়, শুধু যিনি পরবর্তী-কালে ইমামে আজম আবু হানীফা নু'মান ইবনে সাবিত নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন, তাঁহার কথা বলাই আমার একমাত্র উদ্দেশ্য।

ইমাম সাহেবের মধ্যে যে 'ইলমী বিপ্লব সৃষ্টি হইয়াছিল, সেই ঘটনা অতি প্রসিদ্ধ। কিন্তু 'ইলম অর্জন করার উপর যে কাজের বোঝা মাথায় চাপে অর্থাৎ কার্যে পরিণত করার দায়িত্ব—সেই সম্পর্কে ইমাম সাহেব কি করিয়াছেন এবং এত বড় বিরাট প্রতিবন্ধকতার সম্মুখে তিনি কিভাবে জয়লাভ করিলেন? যদিও ঐতিহাসিকগণ উহার বিস্তারিত বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়া যান নাই, তবুও বিভিন্ন স্থানে বিচ্ছিন্নভাবে যে সব ঘটনা পাওয়া যায়, উহা হইতে অবশ্যই কিছু অনুমান করা যায়।

খিলাফত এবং বাদশাহীর মধ্যে পার্থক্য

ইমাম সাহেব তাঁহার কার্যধারা কিভাবে প্রণয়ন করিয়াছিলেন; সেই সম্বন্ধে স্বয়ং ইমাম সাহেব বা তাঁহার শিষ্যবৃন্দ যদি কিছু বলিয়া যাইতেন তবেই না উহার সঠিক রূপ নিরূপণ করা সহজ হইত। কিন্তু উহা কিভাবে নিরূপণ করা যাইতে পারে? ঐতিহাসিকগণও ধারা-বাহিকভাবে কিছু বলিয়া যান নাই। কিন্তু যদিও ইমাম সাহেবের রীতি-নীতির ধারাবাহিকতা আমাদের নিকট নাই, তথাপি তাঁহার কার্যাবলী তো আমাদের সম্মুখে বিদ্যমান রহিয়াছে। উহা দ্বারাই আমরা পথের সন্ধান পাইব। ফল দ্বারা অনেক বৃক্ষের পরিচয় পাওয়া যায়। আমার চেষ্টাও সেই পথে পরিচালিত হইবে।

আমি বলিয়াছি যে, ইমাম সাহেবকে যৌবনে আলোকপ্রাপ্তির পর অন্ধকারের সাথে মেলামেশা করিতে হইয়াছিল। উহা ছিল ইয়াযীদ ইবনে আবদুল মালিকের শাসনকাল এবং সেই হুকুমতের প্রথম ফরমান যাহা 'ইকদুল ফরীদ হইতে পূর্বে বর্ণনা করিয়াছি। সেই ফরমানের: اعيد والناس الى طبقتهم ;লোকদিগকে তাহাদের পূর্বাবস্থায় ফিরাইয়া আন"—বাক্যটির বিস্তারিত ব্যাখ্যার প্রয়োজন। এই ব্যাখ্যা দ্বারা ইমাম সাহেবের প্রাথমিক কর্মসূচীর কিছুটা পরিমাপ করা যাইবে বলিয়া আমার ধারণা।

এই বাক্যটির সহজ ও সরল ব্যাখ্যা এই যে, উমর ইবনে আবদুল আযীযের পূর্বে মুসলমানগণ যে অবস্থায় ছিল তাহাদিগকে সেই অবস্থায় ফিরাইয়া আন। ইয়াযীদ তাঁহার গভর্নরদিগকে এই নির্দেশই

দিয়াছিলেন। কিন্তু প্রশ্ন হইল মুসলমানগণ কি অবস্থায় ছিল যাহার প্রতি পুনরায় তাহাদিগকে ফিরাইয়া নেওয়ার নির্দেশ জারি করা হইয়াছিল ?

মতবিরোধ থাকিলেও আমার মতে শুধু সেই যুগেই নয় বরং প্রায় সব যুগেই শাসন ক্ষমতা বলে তাহারাই বিগড়াইয়া যায় যাহারা প্রকৃতপক্ষে নিজেরাই বিগড়াইয়া যাওয়ার আশা পোষণ করিয়া থাকে। বিশেষ করিয়া ধর্মীয় ব্যাপারে যতটা সম্ভব আমার এই মতামতকে সম্পূর্ণভাবে উপেক্ষা করা বা ভুল বোঝা যাইতে পারে না। সর্বোপরি এই অবস্থায় যাহার হাতে রাজ্যের শাসনদন্ড থাকে ও নিজেকে যে সেই ধর্মের অনুসারী বলিয়া পরিচয় দেয় এবং সে যদি নিজে ধর্মভ্রষ্ট ও মুনাফিক না হয়।

আমার কথার অর্থ এই যে, বনী উমাইয়া খলীফাদের নিজস্ব জীবন যাত্রা পদ্ধতি ধর্মের দিক হইতে যাহাই হউক না কেন, লোকদিগকে ইসলামী আকায়িদ পরিত্যাগ করাইয়া কুফরীর দিকে ফিরাইয়া আনিতে নির্দেশ দেওয়া হইয়াছিল—এই কথা বলা একেবারে নির্জলা মিথ্যা হইবে। যে হুকুমতের অধিকাংশ খলীফা নিজেরা জামা'আতের সাথে নামায পড়িতেন, নিজেরা ইমামতি করিতেন, রোযা রাখিতেন, হজ্জ করিতেন—তাঁহারাই যে এই সব কাজ করা হইতে অন্য মুসলমানকে বাধা দিবেন—একথা কেহই প্রমাণ করিতে পারিবে না। ইয়াযীদ ইবনে আবদুল মালিকের ফরমান দ্বারাও একথা কখনও প্রকাশ পায় নাই যে, তিনি মুসলমানদিগকে সালাত-সিয়াম পরিত্যাগ করাইয়া বেদীন করিয়া পূর্বাবস্থায় ফিরাইয়া আনিতে চাহিয়াছিলেন। কেননা তাঁহার পূর্ববর্তী বনী উমাইয়া কোন খলীফা এমন কিছু করেন নাই। সাধারণত কোন রাষ্ট্রীয় ক্ষমতাই প্রজা-সাধারণের ধর্মীয় ব্যাপারে সোজাসুজিভাবে অনধিকার চর্চা করে না।

প্রকৃতপক্ষে বাদশাহ বা আমীর উমরাদের ব্যক্তিগত অবস্থা দেখিয়া সাধারণত ঐ সমস্ত লোকই বিগড়াইয়া যায় যাহারা চরিত্রহীন এবং বুদ্ধিহীন। অতঃপর কোন সম্প্রদায়ের কিছু সংখ্যক লোক যখন বিগড়াইয়া যায়, তখন তাহাদের দেখাদেখি অন্যরাও সেই পথের অনুসারী হয়। কিন্তু নিজে ইচ্ছা করিলেই এই অবস্থা হয়। দৃঢ়চেতা ব্যক্তি যখন এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয় যে, জগতে যাহা কিছুই হউক না কেন আমি উহাতে দৃষ্টিপাত করিব না, তখন কোন রাষ্ট্রীয় শক্তিই তাহার পদস্খলন করাইতে পারে না। বিশেষভাবে আমি সে সময়ের কথা বলিতেছি,

যেই সময় হযরত উমর ইবনে আবদুল আযীযের অক্লান্ত চেষ্টায় ইসলামী জগতের প্রতিটি গলিকুচা আলিম ও ফাযেল দ্বারা পরিপূর্ণ, রাষ্ট্রের প্রত্যেকটি কেন্দ্রে এমন একটি আলিম সম্প্রদায় সৃষ্টি হইয়াছিলেন, ইসলামী কার্যকলাপ ও আকায়িদকে রক্ষণাবেক্ষণ করাই ছিল যাহাদের জীবনের একমাত্র ব্রত। ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় যে, এই কারণেই মুসলিম জাতি উমর ইবনে আবদুল আযীযকে মুজাদ্দিদুল উলামা খেতাবে ভূষিত করিয়া ছিল। ইবনে যাআদ প্রখ্যাত মুহাদ্দিস মায়মুন ইবনে মেহরান হইতে বর্ণনা করেন, 'উমর ইবনে আবদুল আযীয আলিমদের মুয়াল্লিম ও উস্তাদ ছিলেন।'

যাহা হউক আর কোন শাসনকালে এইরূপ কিছু হউক বা না হউক কিন্তু যে সময় ইমাম সাহেব যুবক ছিলেন, সে সময় বিভিন্ন কারণে মুসলমানদের মযহাব ও তাহাদের ধর্ম সুলতান ও আমীরদের সাহায্য হইতে বঞ্চিত ছিল। কম ও বেশী আমার তো তাহাই মনে হয়। ইহা সত্ত্বেও মুসলনমাদের জীবনের দুইটি বিষয় অর্থাৎ নিরাপত্তা ও ইনসাফ হুকুমতের আওতায় ছিল। আর বিষয় দুইটি এমনই যে, হুকুমত ব্যতীত উহার রক্ষণাবেক্ষণ করার ক্ষমতা আর কাহারও নাই। খিলাফতের নামে ইসলাম হুকুমতের যে দৃষ্টিভঙ্গি পেশ করিয়াছিল মোটামুটি বিশেষভাবে এই দুইটি বিষয়ে উহার যে সূক্ষ্ম দৃষ্টি ছিল খিলাফতের অস্তিত্বকে যখন রাজত্বের ছাঁচে পরিবর্তিত করা হইল তখন এই সম্পর্কে হুকুমত যে কার্যপদ্ধতি গ্রহণ করিল, যদিও প্রত্যেকটি লেখাপড়া লোক ঐ সম্বন্ধে জ্ঞাত, তথাপি আমি যাহা বলিতে চাই কয়েকটি আংশিক উদাহরণ পেশ না করা পর্যন্ত উহার স্বরূপ ফুটিয়া উঠিতে পারে না।

বায়তুলমাল সম্পর্কে খিলাফতে রাশেদার দৃষ্টিভঙ্গি

বায়তুলমাল সম্পর্কে খিলাফতের দৃষ্টিভঙ্গির ব্যাখ্যা হযরত উমর (রাঃ)-এর ঐ ঘটনা হইতে অবগত হইতে পারা যায়, যাহা বিশুদ্ধভাবে ইতিহাসের পাতায় লিপিবদ্ধ রহিয়াছে। কথিত আছে—কূফার একজন কর্মচারী হযরত উমর (রাঃ)-এর দরবারে আসিলেন। হযরত উমর (রাঃ) তখন বাড়ীর মধ্যে ছিলেন, কর্মচারীকে সেখানেই ডাকিয়া আনা হইল। কর্মচারী যখন দেখিলেন এশিয়া ও আফ্রিকার এত বড় বাদশাহ যবের শক্ত রুটি যয়তুনের তৈল দ্বারা খাইতেছেন, তখন তাহার বিস্ময়ের আর সীমা রহিল না।

কর্মচারী বলিলেন ঃ হযরত! আপনার অধীনস্থ রাষ্ট্রে প্রচুর পরিমাণ গম উৎপন্ন হওয়া সত্ত্বেও আপনি কেন যবের রুটি খাইতেছেন?

হযরত উমর (রাঃ) বলিলেন, প্রত্যেক মুসলমানই গমের রুটি খাইতে পারে—সত্যই কি এই গম উৎপন্ন হয়?

কর্মচারী বলিলেন, এই কথার যিম্মাদারী তো আমি লইতে পারি না। হযরত উমর (রাঃ) তখন খিলাফতের দৃষ্টিভঙ্গি এই কথায় প্রকাশ করিলেন—যতক্ষণ পর্যন্ত আমার এলাকায় প্রতিটি মুসলমান গমের রুটি খাইতে না পারে, ততক্ষণ পর্যন্ত মুসলমানদের আমীর কিভাবে গমের রুটি দ্বারা নিজের উদর পূর্ণ করিবে?

একদিন একজন গোলাম কিছু ঘি ও পনির আনিয়া সম্মুখে রাখিল। হযরত উমর (রাঃ) বলিলেন ঃ সাধারণ মুসলমানদের অবস্থা আমি কি ভাবে অবগত হইতে পারিব যতক্ষণ পর্যন্ত তাহারা যাহা খায় আমি তাহা না খাইব (কামেল ইবনে আসীর ও ইবনে সাআদ)।

বনী উমাইয়াদের আমলে বায়তুল মাল

খিলাফতকে যখন সালতানাতের (রাজত্বের) কাঠামোর মধ্যে পুরিয়া দেওয়া হইল, তখন মুসলমানদের সেই আমীর (যাহার কর্তব্যের যিম্মাদারী যত বড় গুরুত্বপূর্ণই হউক না কেন, আর্থিক অধিকারে তাহাকে সকলের পিছনের ব্যক্তি হিসাবে পরিগণিত হইতে হইত) এমন বাদশাহ হইয়া সমস্ত সম্পদের একচ্ছত্র অধিপতি হইয়া বসিল। হযরত (সঃ)-এর গদির উপর উপবেশনকারীকে খিলাফতের আমলে এই অবস্থায়ই দেখা যাইত। ইমাম মালিক হযরত আনাস (রাঃ) হইতে বর্ণনা করেন—'উমর ইবনে খাত্তাব যখন মুসলমানদের আমীর ছিলেন, তখন আমি দেখিয়াছি তাহার জামায় তিনটি তালি লাগানো রহিয়াছে—একটি অন্যটির সাথে মিলিত ছিল।'

ইহা তো ইমাম মালিকের ন্যায় সতর্কবান রাবীর বর্ণনা। অন্যথায় অন্যান্য বর্ণনায় দশ-দশটি, বার-বারটি তালির কথাও উল্লেখ রহিয়াছে। কখনও লাল চামড়া দ্বারা তালি দেওয়া হইত। তোশাখানার কর্মচারী বলেন—কখনও কখনও হযরত উমর (রাঃ) নির্দিষ্ট সময়ে বাড়ী হইতে বাহির হইতে পারিতেন না। কারণ জিজ্ঞাসা করা হইলে সেই সময়কার পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ শাসনকর্তা উত্তর দিতেন—'কাপড় ধুইয়া দিয়াছিলাম। শুকানোর পর তোমাদের নিকট আসিলাম।' (ইজালাতুল খিফা)

কিন্তু রসূলুল্লাহ্‌র এই আসনই যখন মদীনা হইতে দামিশকে নীত হইল, তখন উহার উপবেশনকারীর সাধারণ সফরে নয় বরং হজ্জের

সফরেও দেখা গিয়াছিল—ছয়শত উটের উপর বোঝাই ছিল তাহার পোশাক।" (ইকদুল ফরীদ—পৃঃ ৩৬৬, ১ম জিলদ)

তিনি ছিলেন আবদুল মালিকের পুত্র হিশাম—বনী উমাইয়ার পঞ্চম খলীফা। কালের কি পরিহাস! অথচ মুসলমানদের এই সম্পদের যিম্মাদারীর উপলব্ধি এক সময় কত ভীষণ ছিল। বাহরায়ন হইতে কিছু মৃগনাভী আসিল। হযরত উমর (রাঃ) উহা ওজন করিতে চাহিলে তাঁহার স্ত্রী আতিকা বলিলেন—আমাকে আদেশ করিলে ওজন করিয়া উহার পরিমাণ আপনাকে বলিতে পারি……হযরত উমর (রাঃ) কিছুকাল চুপ করিয়া থাকার পর যে উত্তর দিলেন উহার উদাহরণ না পূর্বে ছিল আর না আজ পর্যন্ত পাওয়া গিয়াছে। স্ত্রীকে উদ্দেশ্য করিয়া তিনি বলিলেন—"আমি ইহা পছন্দ করি না যে, তুমি মৃগনাভী পাল্লায় রাখ আর এমন কর (হাত দ্বারা ইঙ্গিত করিলেন)।"

বর্ণনাকারী বলেন—হযরত উমর (রাঃ)-এর কথার তাৎপর্য এই যে—মৃগনাভী স্পর্শ করায় তোমার হাতে কিছুটা লাগিয়া যাইবে আর তুমি উহা নিজের দেহে লাগাইবে। তখন অন্যান্য মুসলমানের তুলনায় আমাদের অংশে বেশী পড়িয়া যাইবে।

বায়তুলমালের সম্পদে পূর্বে যেমন প্রত্যেক মুসলমানের অধিকার ছিল, আজও সেই অধিকার রহিয়াছে। কিন্তু খিলাফতের নামে যাহারা রসূলুল্লাহ্‌র ওয়ারিশ হওয়ার দাবি করিয়া বাদশাহী করে তাহারাই বায়তুলমালের অর্থ খরচ করিয়া থাকে। কিন্তু তাহারা কিভাবে খরচ করিত? ইবনে আবদে রাব্বিহির ভাষায় শুনুন। ইকদুল ফরীদে লিখিত আছে--ওয়ালীদ মদীনার গভর্নরকে লিখিলেন--আশ'আবকে (ভাঁড়)আমার নিকট পাঠাইয়া দাও।[১] আশ'আব দামিশকে পেঁাছিলে ওয়ালীদ তাহাকে লেজ সংযুক্ত বানরের চামড়ার মধ্যে ভরিয়া বলিলেন—এই অবস্থায় যদি

১। আশ'আব বনী উমাইয়া আমলের ভাঁড়। হাস্য-কৌতুকময় কাহিনী বর্ণনায় তাহার মত সেই যুগে আর কেহ ছিল না। একবার কেহ জিজ্ঞাসা করিল—মিয়া! কোন হাদীস তোমার স্মরণ আছে কি? সে বলিল—হাঁ—নাফে ইবনে উমর হইতে বর্ণনা করেন যাহার মধ্যে দুইটি স্বভাব বিদ্যমান সে সৎস্বভাব-সম্পন্ন। উহার একটি স্বয়ং নাফে-এর স্মরণ ছিল না, অন্যটি আমি ভুলিয়া গিয়াছি। আশ'আব বলিত কবরস্থানে মৃতকে দাফন করার সময় কোন দুই ব্যক্তিকে কানাকানি করিয়া কথা বলিতে দেখিলে মনে হয়—মৃত ব্যক্তি আমাকে কিছু দেওয়ার অসিয়ত করিয়া গিয়াছেন, সেই সম্বন্ধেই আলোচনা হইতেছে।

তুমি আমার সামনে নৃত্য-গীতি করিতে পার তবে তোমাকে হাযার আশরফী পুরস্কার দেওয়া হইবে।

আশ'আব ওয়ালীদের সামনে নাচিল, গান করিল। ওয়ালীদের পছন্দ হওয়ায় হাযার আশরফী পুরস্কার দিলেন।

ইহা কোন অলীক ঘটনা নয়। উমর ইবনে আবদুল আযীয ব্যতীত অন্য সকল খলীফাই বায়তুলমালকে নিজস্ব সম্পদ মনে করিয়া নিজের ইচ্ছামত খরচ করিতেন। কাহাকে দেওয়া হইতেছে, কত দেওয়া হইতেছে, আর কেনই বা দেওয়া হইতেছে—এই জাতীয় প্রশ্নের কোন বালাই ছিল না।

এইরূপ ঘটনায় ইতিহাসের পাতা পরিপূর্ণ। হযরত উমর ইবনে আবদুল আযীযের পূর্ববর্তী খলীফা হিশাম এবং পরবর্তী খলীফা ইয়াযীদের দুইটি ঘটনা এই উদ্দেশ্যে উল্লেখ করিলাম যে, ইয়াযীদ কোন্ দিকে প্রজা সাধারণকে ফিরাইয়া আনিতে আদেশ জারি করিয়াছিলেন। ইহাদের মধ্যে সবচেয়ে কঠিন সমস্যাই ছিল বায়তুলমালের। হযরত উমর ইবনে আবদুল আযীয শুধু নিজের ও পরিবারবর্গের ব্যাপারেই বায়তুলমালের যথাযথ ব্যবহার করেন নাই বরং তিনি এমন উদাহরণ স্থাপন করিলেন, খিলাফতে রাশেদা ব্যতীত যাহার দ্বিতীয় নজীর নাই। তিনি তাঁহার সর্বশক্তি নিয়োগ করিয়া দেশ হইতে ইসলাম বিরোধী কার্যাবলী দূর করিতে চাহিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার মৃত্যুর পর খলীফাগণ আবার ভোগের পঙ্কিলে ডুবিয়া গেলেন।

বনী উমাইয়াদের স্বভাব এতটা খারাপ হইয়া গিয়াছিল যে, হযরত উমর ইবনে আবদুল আযীয যেই দিন প্রচার করিলেন—বায়তুলমালে সকল মুসলমানের সমান অধিকার; আল্লাহ্ এবং আল্লাহ্র রসূলের নীতি অনুসারেই উহা বন্টন করা হইবে, সেদিন বনী উমাইয়াদের মধ্যে বেশ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হইয়াছিল। কিন্তু একদিন তিনি ক্রোধান্বিত হইয়া মিম্বরে দন্ডায়মান হইয়া বলিলেন ঃ

"আমার মনে হয় আল্লাহ্র তরফ হইতে বনী মারওয়ানদের উপর কঠিনভাবে তরবারির আঘাত পড়িবার সময় হইয়াছে। আল্লাহ্র কসম, সেই আঘাত যদি আমাকেই করিতে হয় তবে আমি পিছপা হইব না।" বর্ণনাকারী বলেন—মারওয়ান বংশীয় লোকেরা জানিত—উমর তাঁহার কথার অটল। হয়তো এমন একটা কিছু করিয়াও বসিতে পারেন। তাই তাহারা চুপ করিয়া রহিল। (ইবনে সা'আদ)

একবার নেতৃস্থানীয় লোকদের একটি দল তাঁহার নিকট আসিয়া আরয করিলেন—আপনার পূর্ববর্তী খলীফাগণ আমাদের সাথে যে ব্যবহার

করিতেন আপনি উহা হইতে আমাদিগকে অনেক নীচে নামাইয়া দিয়াছেন। অতঃপর তাহারা হযরত উমরকে ভালমন্দ অনেক কিছুই বলিলেন। (ইবনে সা'আদ)

এই দলে মারওয়ান বংশীয় ছোট-বড় প্রায় সব লোকই ছিল। তাহাদের কথার উত্তরে হযরত উমর (রাঃ) যাহা বলিয়াছিলেন —উহা শুনিয়া তাহাদের কলিজার পানি শুকাইয়া গিয়াছিল। উমরের মৃত্যুর পর শেষ ভরসাটুকু যাহা ছিল উহাও শেষ হইয়া যাইতেছে দেখিয়া চুপ করিয়া ফিরিয়া আসিল। হযরত ইবনে আযীয বলিয়াছিলেন— "তোমরা যদি এই কথা লইয়া পুনরায় আমার কাছে আস, তবে আমি তখনই মদীনায় চলিয়া যাইব এবং হুকুমতকে মুসলমানদের পরামর্শের উপর ছাড়িয়া দিব।"

এই কথার অর্থ এই যে, মুসলমানদের হুকুমত এবং বায়তুলমাল তোমাদের হাত হইতে সরাইয়া মুসলমানদের হাতে সোপর্দ করিয়া দিব। সেই দলের মধ্যে এমন লোকও ছিল যাহারা হযরত উমরের মৃত্যুর পর বাদশাহ্ হওয়ার স্বপ্ন দেখিত। এই সাধের স্বপ্ন চুরমার হইয়া যাওয়ার ভয়েই তাহারা একেবারে চুপ হইয়া গিয়াছিল।

ইহা তো গেল বায়তুলমালের কাহিনী। খিলাফতে রাশেদার পর রাজস্বের সাথে সাথে লোভ-লালসাও অস্বাভাবিকভাবে বাড়িয়া যাইতেছিল। উদাহরণস্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, মিসরের যিম্মীগণ ইসলাম গ্রহণ করিতে আরম্ভ করিলে জিযিয়ার আমদানি কমিয়া গেল। এই অবস্থা দেখিয়া উমাইয়া খলীফাগণ মিসরের গভর্নরকে নির্দেশ দিলেন —আর কোন যিম্মী যেন ইসলাম গ্রহণ না করে (না'উযুবিল্লাহ)। হযরত উমর ইবনে আবদুল আযীয খলীফা না হওয়া পর্যন্ত এই অবস্থাই চলিতে লাগিল। খলীফা হওয়ার পর তিনি এই আদেশ রহিত করিয়া দিলেন। আবার দলে দলে লোক ইসলাম গ্রহণ করায় জিযিয়ার আয় কমিয়া গেল। মিসরের গভর্নর শারীহ ইবনে হাব্বার পূর্ববর্তী খলীফার দরবারে লিখিলেন—"যিম্মী প্রজাগণ অনবরত ইসলাম গ্রহণ করিয়া যাইতেছে। ফলে জিযিয়ার আমদানী কমিয়া যাইতেছে।"
হযরত ইবনে আযীয উত্তর দিলেন—

অতঃপর জানিয়া রাখ যে, আল্লাহ্ তা'আলা হযরত মুহাম্মদ (সঃ)-কে ইসলাম প্রচার করার জন্য প্রেরণ করিয়াছিলেন—কর আদায় করার জন্য পাঠান নাই। আমার এই আদেশ যখন তোমার নিকট পেঁাছে এবং যিম্মীগণ ইসলাম গ্রহণ করায় জিযিয়ার আমদানী কমিয়া যাইতেছে দেখ, তখন তুমি হিসাব-কিতাবের খাতা বন্ধ করিয়া আমার নিকট চলিয়া আস।"

এই আদেশ জারি করিয়াই তিনি নীরব রহিলেন না বরং সমস্ত প্রদেশের গভর্নরদের লিখিলেন—জিযিয়া প্রদানকারীদিগকে ইসলাম গ্রহণের আমন্ত্রণ জানাও।

মারওয়ানী হুকুমতের দ্বারা নষ্ট চরিত্র একজন আমীর এই নির্দেশের পরিপ্রেক্ষিতে আরযনামা পাঠাইল—এই সমস্ত লোক আন্তরিকতার সাথে ইসলাম গ্রহণ করিতেছে না। এইজন্য উচিত ইসলাম গ্রহণ করার সাথে সাথে খাতনা করাও অবশ্য কর্তব্য বলিয়া যেন পরিগণিত হয়। সে মনে করিয়াছিল—এই কথায় কাজ উদ্ধার হইবে। কিন্তু হযরত উমর ইবনে আবদুল আযীয উত্তর দিলেন—খাতনার জন্য কি ঐ সমস্ত লোককে ইসলাম গ্রহণ করা হইতে বিরত রাখিব? তাহারা যখন ইসলাম গ্রহণ করিবে এবং ইসলামের প্রতি যখন তাহাদের গভীর ভালবাসা জন্মিবে, তখন তাহারা স্বতঃস্ফূর্তভাবেই খাতনা করিবে।

বর্ণনাকারী বলেন—শুধু এই কোমল ব্যবহারের জন্য একমাত্র খোরাসানে চারি হাযার লোক ইসলাম গ্রহণ করিয়াছিল।

যাহা হউক, ইহা তো একটি আনুষাঙ্গিক ঘটনা। আমি বলিতেছিলাম যে, খরচের ন্যায় আমদানির মধ্যেও কোন প্রকার ইসলামী নীতির পরওয়া করা হইত না। এই ব্যাপারে তাহাদের লালসা এতটা বাড়িয়া গিয়াছিল যে, সম্পদ সঞ্চয়ের আশায় ইসলামের ক্ষতিকে অতি সহজভাবে বরণ করিয়া লইত। হযরত ইবনে আযীয রাজস্ব বিষয়ে সংশোধন করার চেষ্টাও করিয়াছিলেন। এই সংশোধনের ফলে রাজ-ভান্ডারে যে পরিমাণ অর্থের ঘাটতি পড়িয়াছিল এবং সেইজন্য তাহাকে যে অভিযোগ শুনিতে হইয়াছিল উহা সহ্য করার মত শক্তি কয়জন লোকের ছিল?

মায়মূন ইবনে মেহরান হইতে বর্ণিত আছে—কোন এক এলাকার কর্মচারী আসিলে তাহার নিকট আদায়কৃত রাজস্বের পরিমাণ জিজ্ঞাসা করিলেন। কর্মচারী জমার পরিমাণ বলিলে দেখা গেল—বিগত খলীফাদের আমলের চেয়ে অনেক কম। কারণ জিজ্ঞাসা করিলে কর্মচারী বলিল—আপনি অমুক অমুক বিষয়ের আমদানী বন্ধ করিয়া দিয়াছেন। হযরত উমর বলিলেন—আমি রাজস্ব আদায় করা বন্ধ করি নাই, বন্ধকারী তো আল্লাহ্। (ইবনে সা'আদ)

ঐ সমস্ত খলীফার আমলে বায়তুলমালের যে অবস্থা হইয়াছিল আমার এই বর্ণনাটুকুই তজ্জন্য যথার্থ হইবে বলে মনে করি।

খিলাফতে রাশেদার আমলে ইনসাফ এবং হুকুমতের স্বরূপ

এখন আমি দ্বিতীয় সমস্যা সম্বন্ধে আলোচনা করিব অর্থাৎ এই সব খলীফা 'ইনসাফ' করার সময় মুসলমানদের সাথে কিরূপ ব্যবহার করিতেন। কতই না পরিতাপের বিষয় যে, কুরআন ইনসাফ করার বেলায় কাফির এবং মুসলমানদের কোন পার্থক্য নির্ণয় না করিয়া বরং সকলের প্রতি সমান ব্যবহার করিতে আদেশ করিয়াছে। বনী উমাইয়া খলীফাগণ কি সেই আদেশ পালন করিয়াছিলেন? যেই শরীয়তের প্রচারক হযরত (সঃ) এক চোরের বিচার করার সময় বলিয়াছিলেন —"মুহাম্মদ কন্যা ফাতিমাও যদি চুরি করে তবে আমি তাহারও হাত কাটিয়া দিব।"

জাবালাহ ইবনে আয়হামের ন্যায় মহাশক্তিশালী দলপতির দাম্ভিকতাও একজন গরীব বেদুঈনের ইনসাফের সময় চিরতরে খর্ব করিয়া দেওয়া হইয়াছিল। প্রাণহীন একটি মূর্তির নাকের পরিবর্তে একজন জীবিত মুসলিম সেনানীর নাক কাটার আদেশ এইজন্য দেওয়া হইয়াছিল যে— ইনসাফ কায়েম থাকুক, আইনের মর্যাদা অক্ষুণ্ণ থাকুক।[১]

উমাইয়াদের আমলে ইনসাফ

কিন্তু খিলাফতের অবসান হইয়া বাদশাহী আরম্ভ হইলে তখন কি হইতেছিল? বলিতে লজ্জা হয় যে, আইন প্রয়োগ করার বেলায়ই শুধু আপন-পর, দোস্ত-দুশমনের পার্থক্য করা হইত তা নয় বরং মনে হইত ইসলামী আইন-কানুন নিজের স্বার্থে লাগাইবার জন্য যে ব্যাখ্যার প্রয়োজন উহাও এই সমস্ত খলীফা বা তাহাদের কর্মচারীদের ব্যক্তিগত সম্পত্তি ছিল।

খলীফা আবদুল মালিকের নির্দেশক্রমে মদীনার গভর্নর আমর ইবনে সাঈদ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়রের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য

১। মিসরের গভর্নর আমর ইবনে আসের সময় একজন মুসলিম সেনা একটি যীশু মূর্তির নাক ভাঙিয়া দিয়াছিলেন। মূর্তির মালিক আমেরের নিকট নালিশ করিলে আমর মালিককে অভিযুক্ত সৈনিকের নাক কাটিয়া নেওয়ার নির্দেশ দিয়াছিলেন।

হযরত আবু শরীহ এই কথা বলিয়া চুপ রহিলেন যে, 'আমি নবীজীর সাথী ছিলাম আর তুমি অনুপস্থিত ছিলে! নবীজীর আদেশ ছিল তোমরা যাহারা উপস্থিত আছ তাহারা অনুপস্থিতদের নিকট আমার বাণী পেঁছাইয়া দাও। তাই আমি তোমাকে পেঁছাইয়া দিলাম। শোনা না শোনা তোমার কাজ।"

মদীনা হইতে সৈন্য সংগ্রহ করিতেছিল। রসূলুল্লাহ্‌র সাহাবা হযরত আবু শরীহ দাঁড়াইয়া বলিলেন—

"হে আমীর! আমাকে আদেশ করিলে আমি এমন একটি কথা বলিতে চাই—যে কথা মক্কা বিজয়ের পর দিন নবী করীম (সঃ) বলিয়াছিলেন। আমার কর্ণদ্বয় উহা শুনিয়াছে, অন্তর স্মরণ করিয়া রাখিয়াছে। আর যে সময় নবীজী বলিতেছিলেন, সেই সময় আমার চক্ষুদ্বয় তাঁহাকে দেখিতেছিল।"

আবু শরীহ্‌ নিজের কথাকে জোরদার করার পর হুযুর (সঃ)-এর বিখ্যাত নির্দেশ উচ্চারণ করিলেন ঃ "হারাম শরীফে খুন-খারাবি ইত্যাদি চিরদিনের জন্য হারাম করা হইল।"

সব কিছু শোনার পর আমর ইবনে সাঈদ, যে নিজেকে ইসলামী আইন-কানুনের ব্যাখ্যাকারী মনে করিত—আবু শরীহকে ধমক দিয়া বলিল—

"আবু শরীহ! আমি তোমার চেয়ে অনেক আলিম এবং এই বিষয়ে জ্ঞাত। হারাম শরীফ কোন নাফরমান এবং হত্যাকারী, পলায়নকারীকে আশ্রয় দেয় না।"

কানুন ও ইনসাফ সম্পর্কে হযরত উমরের ব্যাখ্যা

কানুন এবং ইনসাফের সাথে খলীফাদের এই কার্য-রীতিই ছিল, যাহার সংশোধনের ইচ্ছা করিয়া হযরত উমর ইবনে আবদুল আযীয প্রচার করিয়াছিলেন—

"আমি ফয়সালাকারী নই, (খলীফা হওয়ায় আমার কাজ) শুধু প্রয়োগ করা। তোমাদের কাহারও চেয়ে আমি শ্রেষ্ঠ নই, কিন্তু আমার বাহু অধিক বোঝা বহনকারী এবং আমাকে বেশী জিজ্ঞাসাবাদ করা হইবে। শরীয়তের আইন-কানুনে কম-বেশী করার হক্কও আমার নাই বরঞ্চ যে অবস্থায় আমি আইন পাইয়াছি উহার অনুসরণ করাই আমার কর্তব্য।"

প্রকৃতপক্ষে এই তিনটি না-সূচক বাক্যই ইসলামী খিলাফতের ইনসাফের মূল এবং উমাইয়া বাদশাহদের আদালত সম্পর্কীয় মূল নীতির পার্থক্য ফুটাইয়া তোলে। প্রথম বাক্য—আমি ফয়সালাকারী কাযী নই বরং খলীফা হওয়ায় আমার কাজ শুধু প্রয়োগ করা। মারওয়ানী খলীফা ও তাহাদের কর্মকর্তাগণ এই কার্যধারার বিরোধী ছিলেন। তাঁহারা নিজদিগকেই শরীয়তের ব্যাখ্যা করার একমাত্র অধিকারী মনে করিতেন।

দ্বিতীয় বাক্য—আমি তোমাদের কাহারও চেয়ে শ্রেষ্ঠ নই—ইহা এমন একটি ভুল ধারণার খন্ডন ছিল, খলীফা ও তাঁহাদের কর্মচারিগণ যাহার অন্তভুক্ত হইয়াছিলেন। অর্থাৎ সাধারণ প্রজাদের চেয়ে তাঁহারা নিজদিগকে উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন মনে করিতেন। তাই তাঁহারা মনে করিতেন সাধারণ প্রজাদের উপর যে আইন প্রয়োগ হইতে পারে, সেই আইন তাঁহাদের উপর প্রযোজ্য নয়। তৃতীয় বাক্য – ধর্ম এবং শরীয়তের আইন-কানুনে কমবেশী করার হক আমার নাই বরং আমার কাজ শুধু শরীয়তের আদেশ পালন ও অনুসরণ করা। শরীয়তের আইনের নামে খলীফাগণ নিজের ইচ্ছামত যে অযথা খরচ করিতেন এই কথা দ্বারা উহার প্রতিই ইঙ্গিত করা হইয়াছে। তিনি তাঁহার এই কথা দ্বারা এই জঘন্য প্রথাকে চিরতরে ধ্বংস করিয়া দিতে চাহিয়াছিলেন। প্রকৃতপক্ষে খিলাফতে রাশেদার পর যদিও প্রতিটি কেন্দ্রস্থলে আদালত প্রতিষ্ঠা করা হইয়াছিল তথাপি লোকে ইহাকে কর আদায় করার কেন্দ্র হিসাবেই মনে করিত। ইহার দিকে ইঙ্গিত করিয়াই হযরত উমর ইবনে আবদুল আযীয বলিয়াছিলেন, "আল্লাহ্ তাঁহার রসুলকে কর আদায়কারী করিয়া প্রেরণ করেন নাই।" তাঁহাদের শাসনকালে এই বিভাগের গুরুত্ব পর্যায়ক্রমে কমিয়া আসিতেছিল। এমন এক যুগও ছিল যখন কাযী মনোনয়ন একমাত্র খলীফারই ব্যক্তিগত ব্যাপার ছিল।

শাহ ওয়ালীউল্লাহ্ (রঃ) তাঁহার ইযালাতুল খিফায় লিখিয়াছেন—এই নিয়মের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন হযরত উমর ফারুক (রাঃ)। তিনি প্রত্যেকটি প্রদেশের জন্য নিজে তিনজন কর্মকর্তা নিযুক্ত করিতেন। একজন শাসনকর্তা, দ্বিতীয় জন কাযী বা বিচারপতি, তৃতীয় জন রাজস্ব আদায়ের কর্মচারী। তিনজনের কাহারো উপর কাহারো কোন কর্তৃত্ব থাকিত না। বরং সকলেই নিজ নিজ কার্যের জন্য দরবারে খিলাফতে দায়ী থাকিতেন। শাহ্ সাহেব লিখিয়াছেন—

"কুফা, বসরা এবং অন্যান্য শহরে হযরত উমর (রাঃ) শাসনকর্তা, বিচারপতি এবং রাজস্ব আদায়কারী ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তিকে নিযুক্ত করিতেন। ইহা এমনই বিশেষত্ব পূর্ণ ছিল যে—এমন উদাহরণ হযরত ফারুকে আজমের পূর্বে আর কখনও পাওয়া যায় না।"

এই নিয়মের ফলাফল এই ছিল যে, কোন বিশেষ প্রদেশ হইতে নয়, বরং সমস্ত দেশ হইতে মর্যাদাসম্পন্ন লোকদিগকে মনোনীত করা হইত। সর্বোপরি কাযীদের উপর শাসনকর্তাগণ কোন প্রকার চাপ দিতে পারিতেন না বলিয়া কাযীগণ নির্ভয়ে তাঁহাদের বিচার-বুদ্ধি মুতাবিক বিচার ফয়সালা করিতে সক্ষম হইতেন।

উমাইয়া আমলে কাযীদের উপর শাসনকর্তাদের ক্ষমতা

মদীনার খিলাফত দামিশকে স্থানান্তরিত হওয়ার পর বিচার বিভাগের গুরুত্ব এতটা কমাইয়া দেওয়া হইয়াছিল যে, প্রত্যেক প্রদেশের শাসনকর্তাকে ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছিল—তাহারা যেন নিজেদের ইচ্ছামত ঐ প্রদেশ হইতে যাহাকে ইচ্ছা তাহাকে কাযীর পদে বহাল করে।

অল্পদিন পর মারওয়ানের শাসনকালে উহার ফলাফল দেখা দিল। মারওয়ান মিসর পৌঁছিয়া তথাকার কাযীকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। কাযীর নাম ছিল আবেস। কাযী আবেসের লেখাপড়ার দৌড় কতটা সে সম্বন্ধে 'আলমুহাযিরা' নামক ইতিহাসে লেখা আছে—'কাযী আবেস লিখিতে-পড়িতে জানিত না।' মারওয়ান কাযীকে জিজ্ঞাসা করিলেন—তুমি কুরআন পাঠ করিয়াছ?

কাযী—না।

মারওয়ান—মিরাস সম্বন্ধে তোমার পরিপক্ব জ্ঞান আছে?

কাযী—না।

এই উত্তরে মারওয়ান হতভম্ব হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—তবে তুমি কোন্ বুদ্ধি দ্বারা বিবাদ মীমাংসা কর?

বেচারা আবেস এই কথার উত্তর আর কি দিতে পারিত—চুপ করিয়া রহিল।

মোটকথা, খলীফার পরিবর্তে কাযীদের মনোনয়ন শাসনকর্তাদের হাতে ছাড়িয়া দেওয়ার ফল এই প্রকার ছিল। তাহারা নিজেদের দলের লোককে সে উপযুক্ত না হইলেও কাযীর পদে বহাল করিতেন।

কাযী আবেসের নিয়োগ সম্বন্ধে লিখিত আছে—হযরত মুআবিয়া (রাঃ) মিসরের শাসনকর্তা মাসলামাকে আদেশ করিলেন—লোকের নিকট হইতে ইয়াযীদের জন্য আনুগত্যের শপথ গ্রহণ কর। নির্দেশ মত মাসলামা কাজ আরম্ভ করিলেন। কেহই উহাতে বাধা দিল না। কিন্তু প্রসিদ্ধ সাহাবা মিসর বিজয়ী আমর ইবনে আসের পুত্র হযরত আবদুল্লাহ্ জ্ঞান-বুদ্ধিমত্তায় এবং আখলাক-চরিত্রে "পিতার চাইতেও বেশী মর্যাদা-সম্পন্ন ছিলেন। তিনি ইয়াযীদের বায়'আত গ্রহণ করিতে অস্বীকার করিলেন। ইহাতে মাসলামা ক্রুদ্ধ হইয়া প্রচার করিলেন—"আবদুল্লাহ্কে সোজা পথে কে আনিতে পারিবে?"

কথিত আছে, আবেস ইবনে সাঈদ দাঁড়াইয়া বলিয়াছিল—"আমি এই কাজের দায়িত্ব গ্রহণ করিলাম।" অতঃপর সে রক্ষীবাহিনী লইয়া হযরত আবদুল্লাহ্‌র বাড়ী ঘেরাও করিয়া বলিয়া পাঠাইলেন—ইয়াযীদের বায়'আত সম্পর্কে এখন আপনার অভিমত কি? হযরত আবদুল্লাহ্ পূর্বমত অস্বীকার করিলেন।

আবেস তখন তাহার বাড়ীর চারিদিকে কাষ্ঠ জমা করিল। উদ্দেশ্য, বাড়ীতে আগুন লাগাইয়া দেওয়া। নিতান্ত দায়ে পড়িয়া হযরত আবদুল্লাহ্ আবেসের সামনে আসিলেন এবং যাহা বলিতে বলিল—হযরত আবদুল্লাহ তাহা বলিয়া নিষ্কৃতি পাইলেন।

এই সুকর্মের জন্যই আবেসকে কাযীর পদে বহাল করা হইয়াছিল। এই সুকর্মের দরুনই কুরআন-হাদীসে অজ্ঞ আবেসকে মালামালের ও জানমালের রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব অর্পণ করা হইয়াছিল। আমি উদাহরণ স্বরূপ একটি মাত্র ঘটনার উল্লেখ করিলাম। উমাইয়া আমলে কাযী নিয়োগের ব্যাপারে এমন অসংখ্য ঘটনায় ইতিহাসের পৃষ্ঠা কলঙ্কিত হইয়া রহিয়াছে।

এই সমস্ত কাযী যাহারা নিজেদের জ্ঞান, বুদ্ধিমত্তা, পরহিযগারী এবং সাধুতার ভিত্তির উপর নয় বরং শাসনকর্তাদের মেহেরবানীর উপর বহাল থাকিত তাহারা নিজেরা যাহা কিছু করিত তাহা তো সহজেই বোঝা যায়। তদুপরি শাসনকর্তাদের চাপে পড়িয়া যে কত কি করিত তাহা বলিয়া আর কি হইবে। দুর্ভাগ্যবশত কোন কাযী যদি নিজের ইচ্ছামত কিছু করিত তবে তাহার আর উপায় ছিল না। সুলায়মান ইবনে আবদুল মালিকের রাজত্বকালে তালহা ইবনে হরম মক্কার কাযী ছিলেন, তখন মদীনার শাসনকর্তা ছিলেন খালিদ ইবনে আবদুল্লাহিল কুরা। শিবী সম্প্রদায়ের দুইজন লোকের মধ্যে এক টুকরা জমি লইয়া বিবাদ বাধে। কাযী সাহেব এক দলের পক্ষে, যাহার নাম আ'যাম ছিল, রায় দিলেন। দ্বিতীয় পক্ষ শাসনকর্তা খালিদের দরবারী লোক ছিল তাহারা তখনই মদীনা পৌঁছিয়া খালিদের নিকট কাযীর নামে অভিযোগ করিল।

খালিদ কাযীর রায়ের বিরুদ্ধে পাল্টা হুকুম দিলেন। এই ঘটনায় কাযী তালহা মর্মাহত হইয়া চুপচাপ খলীফা সুলায়মানের দরবারে একখানা পত্র লিখিয়া নিজের পুত্র মুহাম্মদকে পাঠাইয়া দিলেন। সুলায়মানও ছিলেন একরোখা মানুষ। সুলায়মান তখনই এক নির্দেশ-নামা লিখিয়া কাযী সাহেবের পুত্র মুহাম্মদকেই খালিদের নিকট পাঠাইয়া দিয়া বলিলেন—খালিদকে বলিও সে যেন আ'যামের ব্যাপারে কোন প্রকার হস্তক্ষেপ না করে।

মুহাম্মদ খালিদের দরবারে পেঁাছিয়া খলীফার কথা বলিতেই খালিদ রাগে অগ্নিশর্মা হইয়া উঠিলেন এবং খলীফার পত্র পাঠ না করিয়াই জল্লাদকে আদেশ করিলেন—'ইহাকে একশত চাবুক মার।' কাযী তালহা পুত্রের রক্তাক্ত মৃতদেহ ও জামা-কাপড় খলীফার নিকট পাঠাইয়া দিলেন। উহা দেখিয়া খলীফার ধৈর্যের সীমা ভাঙিয়া গেল। তিনি আদেশ করিলেন খালিদের হাত কাটিয়া ফেলা হউক। কিন্তু কিছুসংখ্যক আমীরের সুপারিশে ঘটনা সেখানেই মিটিয়া গেল। (ইকদুল ফরিদ—পৃষ্ঠা ২৬০, ২য় জিলদ)

শুধু এই একটি ঘটনাই নয়। খুলাফায়ে বনী উমাইয়া হইতে খুলাফায়ে বনী আব্বাসিয়ার হারুনুর রশিদ পর্যন্ত এইরূপ শত শত ঘটনার পুনরাবৃত্তি হইয়াছে। ঐতিহাসিক সুয়ূতী তাহার প্রসিদ্ধ গ্রন্থ 'হুসনুল মুহাদিরা' নামক গ্রন্থে বনী উমাইয়াদের সময়কার কাযী খায়র ইবনে নয়ীমের ঘটনায় বলিয়াছেন—

একজন সিপাহী কোন এক ব্যক্তিকে গালি দিয়াছিল। সেই ব্যক্তি কাযী খায়েরের এজলাসে মামলা দায়ের করিল এবং ঘটনা প্রমাণার্থে মাত্র একজন সাক্ষী পেশ করিল। কাযী সাহেব দ্বিতীয় সাক্ষী পেশ না করা পর্যন্ত আসামীকে হাজতে রাখার নির্দেশ দিলেন। মিসরের শাসনকর্তা আবু আওন আবদুল মালিক ইবনে ইয়াযিদ নিজস্ব লোক পাঠাইয়া সিপাহীকে হাজতখানা হইতে বাহির করিয়া আনিলেন। কাযী সাহেব এই সংবাদ জানিতে পারিয়া কাযীর পদ হইতে সরিয়া গেলেন। আবু আওন কাযী সাহেবের নিকট (হয়ত ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া) লোক পাঠাইলেন। কাযী সাহেব উত্তর দিলেন—যতক্ষণ পর্যন্ত আসামীকে পুনরায় হাজতে প্রেরণ না করা হইবে ততক্ষণ পর্যন্ত কাযীর গ্রহণ করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। কাযী সাহেব তাঁহার কথায় অটল রহিলেন।

দ্বিতীয় ঘটনা—তাশ কুবরাযাদাহ 'মিফতাহুস সা'আদাত' নামক গ্রন্থে উল্লেখ করিয়াছেন—হারুনুর রশিদ হাফস ইবনে গিয়াসকে বাগদাদের কাযী নিযুক্ত করেন। ঘটনাক্রমে হারুনুর রশিদের প্রিয়তমা স্ত্রী যুবায়দার প্রধান দেহরক্ষীর নামে কাযীর আদালতে নালিশ করা হইল। প্রধান দেহরক্ষী ঋণগ্রস্ত ছিল। কাযী সাহেব তাহার বিরুদ্ধে রায় প্রদান করিলে বেগম যুবায়দা ক্রুদ্ধ হইয়া বলিল—আমার লোক জানা সত্ত্বেও কাযী সাহেব কিভাবে তাহার বিরুদ্ধে রায় দিলেন? অতঃপর বাদশাহ্ মহলে আসিলে কাযীকে বরখাস্ত করানোর জন্য চাপ দিলেন। হারুনুর রশিদ তাহার কথামত কাযীকে বরখাস্ত করিলেন।

যদিও ইহা একটি অতি নগণ্য ঘটনা তথাপি ইহা স্মরণ রাখিতে হইবে—পরবর্তীকালে এই হারূনুর রশিদ এবং এই রাজ্যের মালিক··· যিনি ইমাম সাহেবের সুপারিশক্রমে আবূ ইউসুফকে কাযীর পদে বহাল করিয়াছিলেন—তিনি শুধু বেগম বা আমীর-উমরাহদেরই নয় বরং স্বয়ং খলীফার মরযীর বিরুদ্ধেও রায় প্রদান করিয়াছিলেন। তখন খলীফার চুপ করিয়া থাকা ব্যতীত আর কোন উপায় ছিল না।

কিন্তু এই প্রকার আমূল পরিবর্তনের কারণ কি? উহার পিছনে কাহার একাগ্রতা এবং স্বার্থের কুরবানী ছিল? পরিতাপের বিষয়, ঐতিহাসিকগণ সেই সম্বন্ধে কোন প্রকার মন্তব্য প্রকাশ করেন নাই। যাহা হউক এতদিন পর বিচ্ছিন্ন ঘটনাগুলি সমবেত করার পর যে ফলাফল সৃষ্টি হইবে—উহা যথাস্থানে বর্ণনা করা হইবে। এখন আমার বক্তব্য শুধু এই যে—ঐ সমস্ত খলীফার দ্বারা যে ইনসাফ হইত উহার স্বরূপ কেমন ছিল?

দায়িত্বশীল ব্যক্তিদের কাযীর পদ গ্রহণে অস্বীকার

খলীফাদের এই প্রকার অন্যায় পক্ষপাতিত্বের ফলাফল এই হইয়াছিল যে, শুধু ইমাম সাহেবই নন বরং সেই যুগের আরও বহু পরহিযগার ও দায়িত্বশীল ব্যক্তি হুকুমতের পক্ষ হইতে বারবার অনুরোধ সত্ত্বেও কেহ কাযীর পদ গ্রহণ করিতে রাযী হইতেন না। জোর-জবরদস্তি করিয়া কাহাকেও রাযী করাইলেও তিনি সাহস করিয়া খলীফার নিকট হইতে প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করিতেন যে—তাঁহার বিচারকার্যে কেহ কোন প্রকার ব্যক্তিগত চাপ প্রয়োগ করিতে পারিবে না। অতঃপর তাহাকে সান্ত্বনা দেওয়ার মানসে ওয়াদাও করা হইত। কিন্তু সেই ওয়াদা কখনও পালন করা হইত না।

এই প্রসঙ্গে কাযী শরীফের সাথে যে ঘটনা সংঘটিত হইয়াছিল, উহা দ্বারা খলীফাদের কার্যনীতি পরিস্ফুটিত হইয়া ওঠে। কথিত আছে—আবূ জাফর মনসুর আব্বাসী কাযী শরীফকে ডাকিয়া আনিয়া কাযীর পদ গ্রহণ করিতে বলেন। প্রথম তো তিনি টালবাহানা করিতে লাগিলেন। অবশেষে নিরুপায় হইয়া খলীফাকে উদ্দেশ্য করিয়া বলিলেন—আমি আমার বিবেক বুদ্ধি মত বিচারকার্য পরিচালনা করিব এবং কাহার বিপক্ষে আমি রায় দিতেছি—সে চিন্তা আমি করিব না। খলীফার আপন লোক হউক কিংবা দরবারী লোক হউক—সে বিষয়ে আমার কোন সম্পর্ক থাকিবে না। মুখের কথা বলায় খলীফা মনসুরের ক্ষতি কোথায়? তাই তিনি বলিলেন—"আপনি আমার এবং আমার সন্তান-সন্ততিদের সম্পর্কেও ফয়সালা করিতে পারিবেন।"

সম্ভবত এ কথাই বলিতে চাহিয়াছিলেন যে—আমি নিজেই হক বিচার পসন্দ করি। এ বিষয়ে আবার প্রতিশ্রুতি দেওয়ার প্রয়োজন কি?

এ কথায়ও কিন্তু কাযী সাহেব পরিপূর্ণভাবে আশ্বস্ত হইতে পারিলেন না। সেই যুগের খলীফার চেয়েও বেশী ভয় ছিল খলীফার দরবারীদের। তাই তিনি প্রকাশ্যভাবে বলিলেন—"আপনি আমাকে আপনার দরবারী এবং আমীর-উমরাদের হাত হইতে রক্ষা করিবেন।" খলীফা এই বিষয়েও প্রতিশ্রুতি দিলেন।

সব বিষয়ে পাকাপাকি করার পর কাযী সাহেব যেদিন প্রথম এজলাসে বসিলেন, দুর্ভাগ্যবশত সেদিনকার প্রথম মামলাই ছিল খলীফার মাওলাতে (আযাদকৃত দাসী) যে অন্য কোন একটি লোকের সাথে জড়িত ছিল। বিচার এজলাসের রীতিনীতি প্রথম হইতেই বিগড়াইয়া রহিয়াছে। এজলাসে যখন উভয় পক্ষ হাযির হইল, তখন দাসী খলীফার দাসী ছিল বলিয়া তাহার প্রতিপক্ষের সমান স্থানে দন্ডায়মান হওয়া অপমানজনক মনে করিয়া সামনে অগ্রসর হইয়া কাযী সাহেবের সম্মুখে দাঁড়াইল। দাসী নিশ্চিত ছিল যে, শাহী লোকদের সাথে আদালত এইরূপ ব্যবহারই করিয়া থাকে। কিন্তু দাসী জানিত না যে, সে যেমন নিজকে শাহী মর্যাদা-সম্পন্ন মনে করিতেছিল—নতুন কাযী সাহেবও তেমনি শাহী প্রতিশ্রুতি মত নিজের মর্যাদার কথা চিন্তা করিয়া বিভোর হইয়া রহিয়াছে। কিন্তু—"হে নাপাক রমণী! পিছনে সরিয়া যা"—কাযী সাহেবের মুখে এই কথা শুনিয়া দাসীর চমক ভাঙ্গিল।

কাযী সাহেবের এই কথা বলার অর্থ এই ছিল যে—আদালতে খলীফার এবং একজন সাধারণ প্রজার মধ্যে কোন ব্যবধান নাই—আইনের চোখে উভয়েই সমান যদিও কাযী সাহেব জানিতেন সেই যুগ আর এখন নাই, তথাপি খলীফার প্রতিশ্রুতি মনে করিয়াই তিনি দাসীকে এমন কথা বলিতে সাহস করিয়াছিলেন। আল্লাহ্ই জানেন, খলীফার প্রতিশ্রুতির কথা দাসী জানিত কিনা? মনে হয় জানিত। কারণ বহুদিনের এক নীতির বিরুদ্ধে খলীফা যে প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন—উহা কাহারও অজানা থাকার কথা নয়। যাহা হউক, সে যদিও জানিত তবে সে এ কথাও জানিত যে, খলীফার এই প্রতিশ্রুতির মূল্য কত? তথাপি রাজ্যের শ্রেষ্ঠ কাযীকে সেই দাসী বলিয়া ফেলিল—'বৃদ্ধ তুমি আহাম্মক।'

একজন সাধারণ দাসীর মুখে এই কথা শুনিয়া ইসলামের একজন প্রসিদ্ধ আলিম হতবাক হইয়া গেলেন এবং নিজের কৃতকার্যের জন্য

আফসোস করিতে করিতে বলিলেন—"আমার সম্বন্ধে এই কথা (আমি আহাম্মক) খলীফাকে বলিয়াছিলাম—কিন্তু তোর প্রভু আমার সেই কথা বিশ্বাস করেন নাই।"

কাযী সাহেব তো উত্তর দিলেন। কিন্তু আদালতের এই প্রকাশ্য অবমাননায় মনসুর আদালতের সাধারণ নীতির জন্য না হউক, ইসলামী আদালতের বুনিয়াদের উপায় না হউক, অন্তত নিজের প্রতিশ্রুতির মর্যাদার প্রতি খেয়াল করিয়াও কি দাসীর নিকট কোন কৈফিয়ত তলব করিয়াছিলেন? খলীফার এবং তাঁহার সন্তান-সন্ততির বেলায়ও যাহাকে বিচার ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছিল—একজন দাসী তাহাকে অপমান করিল আর মনসুর নীরবে তাহা সহ্য করিয়া গেলেন। অধিকন্তু কাযী সাহেবকেই অপসারিত করা হইল। যদিও পরবর্তীকালে মেহদীবিল্লাহ্‌র শাসনকালে পুনরায় কাযী শরীহ কাযীর পদ গ্রহণ করিয়াছিলেন তথাপি মনসুরের আমলে তাহার চাকুরীর এই অবস্থা হইয়াছিল। তাই দেখা গিয়াছে যাহারা নিজেদের ধর্ম ও ইলমের হেফাজত করিতে চাহিতেন—তাহারা খলীফাদের কথায় ও প্রতিশ্রুতিতে ভরসা রাখিতেন না।

ইবনে খাল্লিকানে লিখিত আছে—খলীফা মেহদী হযরত সুফিয়ান সাওরীকে বন্দী করিয়া দরবারে আনিলেন এবং কাযীর পদ গ্রহণ করার জন্য বলিলেন। হযরত সুফিয়ান গ্রহণ করিবেন না—খলীফাও সহজে ছাড়িতেছেন না। উভয়ের মধ্যে এই সময় যে তর্ক-বিতর্ক হইয়াছিল, পরে এই সম্বন্ধে আলোচনা হইবে। তখন একথাও জানিতে পারা যাইবে যে, নিজেদের মত অধিক সংখ্যক লোক পাওয়া সত্ত্বেও কেন এই সমস্ত বুযুর্গদের উপর জোর-জবরদস্তি করা হইত। যাহা হউক অস্বীকার করার সময় হযরত সুফিয়ান খলীফা ও তাঁহার দরবারীদের অনধিকার চর্চা সম্বন্ধে বলিলেন। মেহদী তখন তাঁহার পিতা মনসুরের ন্যায় মৌখিক নয় বরং লিখিত প্রতিশ্রুতি দিলেন। তিনি মীর মুনশীকে আদেশ দিলেন—কুফায় কাযী বহাল করার নিয়োগপত্রে এই শর্ত লিখিয়া দাও যে, তাহার রায়ের কোন প্রকার বিরোধিতা করা হইবে না।

নিয়োগপত্র হযরত সুফিয়ানের হাতে দেওয়া হইল। হযরত সুফিয়ান নিয়োগপত্র হাতে লইয়া দরবার কক্ষ হইতে বাহির হইয়া আসিলেন এবং পথিমধ্যে উহা তাইগ্রীস নদীতে নিক্ষেপ করিয়া দিয়া অদৃশ্য হইয়া গেলেন। (ইবনে খাল্লিকান, পৃষ্ঠা—২১০, ১ম জিলদ)

মেহদীর আমলে কাযী উবায়দুল্লাহ্‌ ইবনে হাসানের এক ঘটনা

উল্লেখ করিয়া খতীব বর্ণনা করিয়াছেন যে—একজন ব্যবসায়ী ও একজন সেনাধ্যক্ষের মধ্যে একটুকরা জমি লইয়া বিবাদ ছিল। কাযীর দরবারে মামলা দায়ের করা হইল। এদিকে মেহদী গোপনে কাযীকে লিখিলেন—"দেখ! অমুক ব্যবসায়ী এবং অমুক সেনাধ্যক্ষের মধ্যে যে জমি সম্পর্কে তোমার আদালতে বিচার দায়ের করা হইয়াছে, উহার ফয়সালা যেন সেনাধ্যক্ষের পক্ষে হয়।"

(তারীখে বাগদাদ, পৃষ্ঠা ৩০৯, ১ম জিলদ)

কাযী উবায়দুল্লাহ্ খলীফার পত্রের পরোয়া না করিয়া ন্যায়ভাবে ব্যবসায়ীর পক্ষেই রায় দিয়াছিলেন, কিন্তু উহার পরিণামে কি হইল? মেহদী এই সংবাদ পাওয়ার সাথে সাথেই কাযীকে পদচ্যুত করিলেন। ইহা হইতেই অনুমান করা যাইতে পারে যে, এই সমস্ত খলীফার সময় আদালতের মর্যাদা ও ন্যায়পরায়ণতার স্বরূপ কি ছিল।

ইসলামী হুকুমতের পরিসীমা

ইনসাফ ও ন্যায়পরায়ণতার এই ঐতিহাসিক পর্যালোচনার সময় আমরা এখন মূল বিষয়বস্তু সম্পর্কে আলোচনা করিব। একথা কে না জানে যে, ইসলামী হুকুমত মুসলিম জীবনের সর্বদিক পরিবেষ্টন করিয়া রহিয়াছে? শান্তি-শৃংখলা বজায় রাখা, দেশের আযাদী রক্ষা করা, রাষ্ট্রের সীমান্তের হেফাজত করা, সৈন্য বিভাগ সুবিন্যস্ত করা, পৃথিবীর অন্যান্য রাষ্ট্রের সাথে সম্পর্ক বজায় রাখা এবং অন্যান্য বিষয়ে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখা হুকুমতেরই কাজ। সাথে সাথে মুসলমানদের মাথার চুল হইতে হাতের নখের খবর রাখাও তেমনি কর্তব্য। ইসলামের প্রথম শাসনকর্তা স্বয়ং হযরত নবীয়ে করীম (সঃ) এর উজ্জ্বল প্রমাণ। একথা কে না জানে যে, হুযুর (সঃ)-এর দৃষ্টিকোণ কোন্ বস্তুর উপর ছিল? এমন কি শৌচ ব্যবস্থাও আমরা আমাদের নবীর নিকট শিক্ষা গ্রহণ করিয়াছি। উস্কখুস্ক চুল, ময়লাযুক্ত দাঁত দেখিয়া নবীজী লোকদিগকে কিভাবে যে তাগিদ করিতেন—উহা হাদীস গ্রন্থে অতি সযত্নে রক্ষিত আছে। হযরত আবু আইয়ুব আনসারী (রাঃ) বড় নখযুক্ত এক ব্যক্তির সাথে করমর্দনকালীন বলিয়াছিলেন—

"এক ব্যক্তি হযরত (সঃ)-এর নিকট আগমন করিয়া আসমানের বিষয় জিজ্ঞাসাবাদ করিলেন। হুযুর (সঃ) তাহাকে দেখিয়া বলিলেন, তোমাদের মধ্যে কোন ব্যক্তি আসিয়া আসমানের সংবাদ জিজ্ঞাসা করিতে থাকে। অথচ তাহার হাতের নখ পাখীর নখের ন্যায় বড়, যাহার মধ্যে বহু প্রকার ময়লা ও অপবিত্র বস্তু জমিয়া থাকে।"

এই কথা নবী করীম (সঃ) পর্যন্তই সীমাবদ্ধ ছিল না। তাঁহার খলীফাগণও এই নীতিকে সামনে রাখিয়া মুসলমানদের জীবনের প্রত্যেকটি বিষয়ের তদারক করিতেন। এই প্রসঙ্গে হযরত উমর (রাঃ) সম্বন্ধে একটি প্রসিদ্ধ ঘটনা রহিয়াছে। একবার উস্কখুস্ক লম্বা দাড়ি বিশিষ্ট এক ব্যক্তি হযরত উমর (রাঃ)-এর সামনে আসিল। তাহাকে দেখা মাত্রই হযরত উমর (রাঃ) অগ্রসর হইয়া বলিলেন—"তোমাদের মধ্য হইতে এমন কিছু সংখ্যক লোক আমার সম্মুখে এমন অবস্থায় আসে যেন হিংস্র জন্তুদের মধ্যে কোন একটি।"

অতঃপর তিনি কাঁচি আনাইয়া তাহার দাড়ি কাটিয়া ঠিক করিয়া দিলেন।

মোটকথা, ব্যক্তিগত জীবন হউক বা সমষ্টিগত অথবা আল্লাহ্ ও বান্দার মধ্যে যে সম্পর্ক বিদ্যমান রহিয়াছে ইসলাম ইহার সকলের উপরই পরিবেষ্টন করিয়া রহিয়াছে। প্রতিটি আইন-কানুন এবং রীতিনীতি প্রয়োগ ও কার্যকর করা ইসলামী হুকুমতের দায়িত্ব। কিন্তু খুলাফায়ে রাশেদীনের আমল শেষ হওয়ার পর যাঁহারা ইসলামী হুকুমতের কর্ণধার হইয়াছিলেন, তাঁহারা সেই পথ পরিত্যাগ করিয়া পরিশেষে এমন পর্যায়ে আসিয়া পৌঁছিলেন যে, সর্বশেষ দুইটি বস্তু অর্থাৎ মুসলমানদের সম্পদ যাহা বায়তুলমালে আসিলে জমা হইত এবং মুসলমানদের পারস্পরিক বিবাদ-বিসম্বাদ ফয়সালা করার জন্য ইসলাম যে নীতির প্রবর্তন করিয়াছিল—উহা হইতে তাহারা বেপরোয়া হইয়া গিয়াছিলেন।

পঞ্চম অধ্যায়

বনী আব্বাসের আমলে ইমাম সাহেবের মক্কা হইতে কুফা প্রত্যাবর্তন

বনী উমাইয়াদের বাদশাহ হউক আর বনী আব্বাসীয়দের বাদশাহই হউক এই ব্যাপারে সকলের অবস্থাই প্রায় সমান সমান ছিল। ইমাম আবূ হাফস কবীরের পুত্র আবূ হাফসের উদ্ধৃতি দিয়া 'কিতাবুল মানাকিব'—এ বর্ণিত আছে ঃ

"ইমাম আবূ হানীফা মক্কা চলিয়া গেলেন এবং বনী আব্বাসীয়দের শাসন ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত না হওয়া পর্যন্ত সেখানেই বসবাস করিতে থাকেন। পরে কূফা ফিরিয়া আসেন।"

ইমাম সাহেব মনে করিয়াছেন নূতন হুকুমত তাহাদের প্রচার মুতাবিক হয়ত বনী উমাইয়া খলীফাদের অন্যায়ের ক্ষতি পূরণ করিবে—তাই তিনি মক্কা শরীফ হইতে কূফায় ফিরিয়া আসিয়াছিলেন। কিন্তু পর্যায়ক্রমে এই নূতন শাসক গোষ্ঠীর দ্বারা ইমাম সাহেব যে অভিজ্ঞতা অর্জন করিয়াছিলেন উহাতে আবূ মনসূর ও মেহেদীর ঘটনা দ্বারাই প্রমাণ হইয়া গিয়াছে। এমন কি হারূনুর রশিদও উহা হইতে বাদ যান নাই। আব্বাসীয় খলীফাগণ ইমাম সাহেবের সাথে যে নির্দয় ব্যবহার করিয়াছেন উহা প্রমাণের জন্য স্বয়ং ইমাম সাহেবের প্রতি কৃত বর্বরতাই যথেষ্ট—অন্য উদাহরণের আর প্রয়োজন হয় না।

মনসূর সম্পর্কে ইমাম সাহেবের কয়েকটি সত্য ভাষণ

আব্বাসীয় বংশের দ্বিতীয় খলীফা ইমাম সাহেবের জন্য কিছু অর্থ প্রেরণ করিলে ইমাম সাহেব উহা গ্রহণ করিতে অস্বীকার করেন। খলীফা সেই অর্থ গ্রহণ করিয়া খয়রাত করিয়া দেওয়ার পরামর্শ দিলে। তিনি বলিয়াছিলেন—

"ইহা কি সদুপায়ে অর্জিত ? ইহা কি সদুপায়ে অর্জিত ?"

ইহার চেয়ে আবূ জাফরের ঘটনা আরও মজার। ইমাম সাহেবের মৃত্যুর পর যখন তাঁহাকে সাধারণ গোরস্থানে দাফন করা হইল না, তখন একদিন আবূ জাফর ফাতিহা পাঠ করার জন্য তাঁহার কবরের নিকট আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন- এখানে কেন তাঁহাকে দাফন করা হইয়াছে ?

লোকে উত্তর করিল, "ইমাম সাহেবের ওসীয়তই এমন ছিল। কারণ তিনি মনে করিতেন যেই জমির উপর বাগদাদ শহর আবাদ করা হইয়াছে উহা অবৈধ উপায়ে লোকের নিকট হইতে জোর-জবরদস্তি-পূর্বক হস্তগত করা হইয়াছে। তাই তাঁহার ওসীয়ত ছিল—বাগদাদে যেন তাহাকে দাফন করা না হয়।" এই কথা শুনিয়া আবু জাফর বলিয়াছিলেন, "জীবিতাবস্থায় এবং মৃত্যুর পরও এই ব্যক্তি হইতে কে আমাকে নিরাপদ রাখিতে পারে ?"

ইহা তো ছিল হুকুমতের রাজস্ব আয়ের অবস্থা। অন্যান্য ব্যয়ভূষণ সম্পর্কে মনসুরের সাথে ইমাম সাহেবের যে কথোপকথন হইয়াছিল এবং ইমাম সাহেবের নিজের মতামত কিভাবে প্রকাশ করিয়াছিলেন সে সম্বন্ধে বর্ণিত আছে—'অন্য কোন এক সময় মনসুর ইমাম সাহেবকে কিছু অর্থদানের প্রস্তাব করেন। ইমাম সাহেব নিজের স্বভাব মুতাবিক তাহা গ্রহণ করিতে অস্বীকার করিলে মনসুর জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেন আপনি অস্বীকার করিতেছেন ?"

ইমাম সাহেব অবৈধ উপায়ে অর্জিত বলার পরিবর্তে বিশৃঙ্খল অবস্থার প্রতি ইঙ্গিত করিয়া বলিলেন, 'আমীরুল মুমিনীন তাঁহার নিজস্ব সম্পদ হইতে আমাকে এমন কিছু দান করেন নাই যাহা গ্রহণ করিতে আমি অস্বীকার করিয়াছি। আমি জানি, বায়তুলমাল হইতে কিছু গ্রহণ করার অধিকার আমার নাই। আমি যদি সিপাহীদের ন্যায় কোন যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করিতাম তবে না হয় মনে করিতাম তাহাদের ন্যায় বায়তুলমালের অর্থ গ্রহণ করার অধিকার আমারও আছে। অথবা আমি গরীব মুসলমানও নই যে, উহা হইতে আমি অর্থ গ্রহণ করিতে পারি।" (মানাকিবে মুফিক, ২১৪ পৃষ্ঠা, প্রথম জিলদ)

আমার মনে হয়—ইমাম সাহেব খলীফাকে বুঝাইতে চাহিয়াছিলেন যে—বায়তুলমালের অর্থের অধিকার সম্পর্কে হকদার ও না-হকদার বিচার না করিয়াই তাঁহারা তাঁহাদের ইচ্ছামত যাহাকে ইচ্ছা তাহাকে দিয়া থাকেন। নিজের ব্যক্তিগত সম্পদের মতই তাঁহারা উহার ব্যবহার করিয়া থাকেন। নিজস্ব সম্পদ যেভাবে ব্যয় করা হয়—বায়তুলমালের অর্থও সেইভাবে খরচ করিয়া থাকেন। নিজস্ব সম্পদ এবং যে সম্পদের রক্ষক লোকে হইয়া থাকে উহাদের মধ্যে যে পার্থক্য বিদ্যমান এবং যাহা খলীফাগণ ভুলিয়া যাইতেছিলেন উহাই বুঝানোর ইচ্ছা তাঁহার ছিল।[১]

১। মনসুর কোন সরকারী চাকুরেকে পদচ্যুত করিলে তাহার বিষয়-সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করিয়া কোন একটি কোঠায় আবদ্ধ করিয়া

তদ্রূপ মুসলমানদের আদালত ও ইনসাফ সম্বন্ধীয় যে কানূন মুসলিম শাসনকর্তাদের উপর ন্যস্ত ছিল – সেই আইন-কানূন যেভাবে অপপ্রয়োগ করা হইত, উহার উদাহরণ পূর্বে বর্ণিত হইয়াছে। মনসুর যখন ইমাম সাহেবকে কাযীর দায়িত্ব গ্রহণ করার জন্য চাপ দিতেছিলেন তখন ইমাম সাহেব উহা প্রকাশ করিয়াছিলেন। যতবারই ইমাম সাহেবকে চাপ দিতে-ছিলেন ততবারই তিনি ভিন্ন ভিন্ন উত্তর প্রদান করিয়াছিলেন। একবার তিনি মনসুরকে বলিয়াছিলেন, "আমিরুল মুমিনিন! আপনার আশে-পাশে যাহারা আছে তাহাদের তো এমন বিচারকের প্রয়োজন—যাহারা আপনার খাতিরে তাহাদিগকে সমীহ করিয়া চলে।"

এই কথার অর্থ তো ইহাই হইতে পারে যে—আপনার দরবারী পার্শ্বচর এবং আত্মীয়-স্বজনগণ বিচারে সমতাকে পছন্দ করেন না। তাহাদের ধারণা আমরা খলীফার আপন লোক, আত্মীয়-স্বজন তাই জনসাধারণের প্রতি যে আইন প্রয়োগ করা যায় আমাদের প্রতি উহা প্রয়োগ হইতে পারে না। অতঃপর ইমাম সাহেব খলীফাকে উদ্দেশ্য করিয়া বলিলেন, "যদি আপ-নার নামে কোন নালিশ আমার দরবারে পেশ করা হয় আর আপনি যদি চাহেন যে, কানূন মুতাবিক আমি উহা ফয়সালা না করি এবং আমাকে ভয় দেখান হয় যে, আপনার ইচ্ছা মতে ফয়সালা না করিলে আমাকে নদীতে ডুবাইয়া মারা হইবে, তবে স্মরণ রাখিবেন যে, বে-ইনসাফী করার চেয়ে নদীতে ডুবিয়া মরাই আমি শ্রেয় মনে করিব।" (মুনাকিব ১৭০ পৃষ্ঠা, ২য় জিলদ।)

আর একবার তিনি খলীফা মনসুরকে বলিয়াছিলেন—এমন ব্যক্তিই কাযী হওয়ার উপযুক্ত যিনি নিজের বিরুদ্ধে, আপনার বিরুদ্ধে, আপনার সন্তানদের বিরুদ্ধে এবং আপনার সেনাপতির বিরুদ্ধে ফয়সালা করার ক্ষমতা রাখেন। (মুনাকিব ২১৫ পৃঃ ১ম জিলদ)

"মোটকথা মুসলমানদের এই শেষ দুইটি বিষয় যাহা রাষ্ট্রের সাহায্য ব্যতীত কাহারও কিছু করার ক্ষমতা নাই," ইমাম সাহেবের বর্ণনা দ্বারাই উহার অনুমান করিতে পারা যায়।

রাখিতেন এবং দরজার উপর মালিকের নাম লিখিয়া রাখিতেন। মৃত্যুর সময় তাহার ছেলে মেহদীকে বলিয়াছিলেন, "এই জমাকৃত সম্পত্তির প্রকৃত মালিক বা তাহার উত্তরাধিকারীকে ফেরত দিবে। তাহা হইলে তুমি তাহাদের ও জনসাধারণের সহানুভূতি লাভ করিবে। অন্যের সম্পত্তি এইভাবে আটক রাখিয়া জীবনে তাহাকে কষ্ট দেওয়া কি ইনসাফ?"

উমাইয়া ও আব্বাসীয় আমলের দুই নরপশু

বনী উমাইয়াগণ হাজ্জাজের ন্যায় হিংস্র এবং আব্বাসীয়গণ মুসলিমের ন্যায় দংশনকারী কুকুরকে মুসলমানদের উপর যেমন বল্গাহীনভাবে ছাড়িয়া দিয়াছিল—এবং সেই সুযোগে এই নরাধমদ্বয় যে নিষ্ঠুর ও নির্মম ব্যবহার করিয়াছিল—উহার উদাহরণ জগতের ইতিহাসে বিরল। যাহার অন্তরে রসূলুল্লাহ্‌র উম্মতের জন্য সামান্য পরিমাণও দরদ ছিল—তিনি অস্থির হইয়া উঠিয়াছিলেন যে—এই অবস্থায় কি করা যায়? দুই হুকুমতের এই দুই হিংস্র পশু—উম্মতে মুহাম্মাদিয়ার রক্ত প্রবাহিত করাকে বর্ণনাতীত ছেলেখেলায় পরিণত করিয়াছিল। তাহাদের খামখেয়ালী-মতে যখন যে কোন মুসলমানের মাথা দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া দিত অথচ এই সম্বন্ধে কাহারও কিছু বলিবার বা প্রশ্ন করার সাহস বা অধিকার ছিল না।

আল্লাহ জানেন এই ভয়-ভীতি ও নৈরাশ্যের করাল ছায়ায় পতিত হওয়ারই ফল ছিল, না অন্য কিছু। ইয়াযীদ ইবনে মালিকের আমলে চল্লিশজন বুযুর্গ লোক সাক্ষ্য দিয়াছিলেন ঃ

اتوه اربعين شيخا شهد والله ان الخلافاء لا يحاسبهم ولا يعذب يوم القيامة ○

চল্লিশজন শায়খ আসিলেন এবং সাক্ষী দিলেন যে, কিয়ামতের দিন খলীফাদের নিকট কোন প্রকার হিসাব গ্রহণ করা হইবে না এবং তাহাদের কাজের জন্য শাস্তি দেওয়া হইবে না। (তারীখে আল-ইয়াফী ২২৪ পৃষ্ঠা)

যাহাই হউক না কেন—ইহা দ্বারা সেই যুগের অবস্থা জানা যায় যে, লোকের চরিত্র-শক্তি খলীফাদের হাতে কেমনভাবে পর্যুদস্ত হইয়া রহিয়াছিল। আর এই সমস্ত বুযুর্গ বা শায়খগণ কোন অর্থে বুযুর্গ ছিলেন ঃ শুধুমাত্র মুলে সাদা দাড়িশোভিত শায়খ (পীর) ছিলেন, না অন্য কিছু?

হাশমিয়া সম্প্রদায়ের ভ্রান্ত ধর্ম-বিশ্বাস

আরও বিস্ময়কর যে, সেই যুগে মুহাদ্দিসীনদের বড় একটি দল সৃষ্টি হইয়াছিল যাহারা তাহাদের মনগড়া মতবাদকে ধর্মের অঙ্গ হিসাবে বিশ্বাস করিত। আবু বকর জাসসাস তাহার তাফসীরে লিখিয়াছেন—হাশমিয়া নামে একটি বড় দল ছিল মুহাদ্দিসদের মধ্যে। তাহাদের মতে ইসলাম

বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ এবং তাহাদিগকে হত্যা করা ছিল নাজায়েয। অস্ত্রের সাহায্যে শরীয়ত মুতাবিক রাষ্ট্র পরিচালনা করার দাবী করাও নাজায়েয ছিল। এই প্রকার দাবী করাকেও তাহারা বিদ্রোহ মনে করিত। অর্থাৎ বিদ্রোহী সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে যেখানে অস্ত্র ধারণের প্রয়োজন হইত উহাকেও এই হাশমিয়া সম্প্রদায়ের লোক ফিতনা-ফাসাদ মনে করিত। কয়েক লাইন পর এই ধর্মবিশ্বাসের বিস্তারিত ব্যাখ্যা স্বরূপ লিখিয়াছেন—অত্যাচার-অনাচার, নির্দোষি লোকদিগকে হত্যা করা যদি বাদশাহ কর্তৃক হয় তবে উহার বিরোধিতা করা শরীয়ত মুতাবিক অবৈধ। তবে হ্যাঁ, জনসাধারণকে শুধু মৌখিকভাবে বাধা দেওয়া যায়, কোন মতেই অস্ত্র ধারণ জায়েয হইবে না।

এই সমস্ত মুহাদ্দিসীনদের রচিত কিতাবে আজ পর্যন্ত দেখা যায় ইমাম সাহেব এই অভিমতের বিরোধিতা করায় তাঁহাকে তরবারির আঘাতে নিহত হওয়ার যোগ্য ব্যক্তি বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। ইমাম সাহেব যে বিরোধিতা করিয়াছিলেন উহার প্রমাণ স্বরূপ বহু মুহাদ্দিসের বর্ণনা আল-খতীব তাহার রচিত 'তারীখে বাগদাদ' এ লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন অর্থাৎ ইমাম সাহেব হাশমিয়া সম্প্রদায়ের দৃষ্টিভঙ্গিকে অস্বীকার করিয়াছিলেন এবং ভ্রান্ত বলিয়া প্রচার করিয়াছিলেন।

হাজ্জাজের খামখেয়ালী

আবূ বকর জাসসাস তাঁহার তাফসীরের অন্যত্র হাজ্জাজ সম্বন্ধে উল্লেখ করিয়াছেন—শুক্রবার হাজ্জাজ দুপুরের সময় ঘর হইতে বাহির হইয়া মিম্বরে দাঁড়াইয়া ভাষণ দিতে আরম্ভ করিল। তাহার ভাষণে কখনও সে সিরিয়াবাসীদের অকুণ্ঠ প্রশংসা আবার কখনও ইরাকবাসীদের দুর্নাম রটনা করিতেছিল। ভাষণ এত দীর্ঘ ছিল যে মসজিদের মিনারে সূর্যের লাল আভা ব্যতীত আর কিছুই আমাদের দৃষ্টিগোচর হইতেছিল না। হাজ্জাজের নির্দেশক্রমে আযান দেওয়া হইল, আমরা তাহার পিছনে নামায পড়িলাম। সাথে সাথে আসরের আযান দেওয়া হইল, আমরা হাজ্জাজের পিছনেই সালাত আদায় করিলাম। অতঃপর মাগরিবের আযান হইলে হাজ্জাজ আমাদের ইমামতি করিল।[১]

১। হাজ্জাজ স্কুল মাস্টারী ছাড়িয়া সৈন্যদলে ভর্তি হইয়াছিল। এই সময় আবদুল মালিকের সৈন্যদের মধ্যে কাজের কোন শৃংখলা ছিল না। আবদুল মালিক তাহার উযীরের নিকট এই সম্বন্ধে অভিযোগ

জামাতে বহু সম্মানিত লোক থাকা সত্ত্বেও কেহ কিছু বলিতে পারিতেছিলেন না। জাসসাস হযরত হাসান বসরীর একটি উক্তি উল্লেখ করিয়া বলেন, হাজ্জাজ মিম্বরে দাঁড়াইয়া আবোল-তাবোল কথা আরম্ভ করিত আর এ দিকে সালাতের ওয়াক্ত শেষ হইয়া যাইত। না সে খোদাকে ভয় করিত, আর না খোদার সৃষ্ট জীবকে লজ্জা করিত। উপরে তাহার আল্লাহ আর নীচে ছিল লাখ বা লাখের চেয়ে বেশী তাহার আজ্ঞাবহ। কিন্তু কেহই একথা বলিতে সাহস করিত না যে, সালাতের ওয়াক্ত চলিয়া যাইতেছে।

ভবিষ্যতে যাহা কিছু হইতেছিল উহার প্রতিই ছিল ইঙ্গিত। প্রত্যেক ব্যক্তির মাথার উপরে ঝুলানো থাকিত খোলা তরবারী। মুখের কথা মুখে থাকিতেই মাথা হইতে দেহ বিচ্ছিন্ন হইয়া যাইত। হযরত হাসান বসরী বলিয়াছেন—এই সমস্ত ব্যাপারে তরবারী ও চাবুক আসিয়া সামনে দাঁড়াইত।

এইরূপ ঘটনা হাজ্জাজের আমল পর্যন্তই সীমাবদ্ধ ছিল না। রাষ্ট্রের

করিলে উযীর হাজ্জাজের নাম করিয়া বলিলেন যে, তাহাকে দেখা-শুনার দায়িত্ব দিলে সব ঠিক হইয়া যাইতে পারে। তাহাই হইল। এক দিন খলীফার সাথে সৈন্যদলের কোথাও যাওয়ার কথা ছিল। হাজ্জাজ দেখিল তাহার সুপারিশকারী মন্ত্রীর অধীনস্থ সৈন্যগণ তখনও তৈয়ার হয় নাই। হাজ্জাজ কারণ জিজ্ঞাসা করিলে সৈন্যগণ তাহার বর্তমান পদ-মর্যাদা অজ্ঞাত থাকায় বলিল—আরে! তুমি তো দেখি নিজেই খলীফা হইয়া গিয়াছ? আর যায় কোথায়, হাজ্জাজ সকলকে চাবুক মারা আরম্ভ করিল। যে যেদিকে পারিল পালাইল। এমন কি মন্ত্রী মহোদয়ও তাহার চাবুকাঘাত হইতে রেহাই পাইল না। খলীফার নিকট নালিশ হইল। খলীফা হাজ্জাজকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করায় সে একেবারে অস্বীকার করিয়া বসিল। আবদুল মালিক জিজ্ঞাসা করিলেন, তবে কে করিল? হাজ্জাজ—আপনি। মালিক—আমি? হাজ্জাজ—হ্যাঁ—আপনি। আমার কি ক্ষমতা যে এরূপ কাজ করি। আপনার আদেশেই আমি এরূপ করিয়াছি। আমার হাত, আমার চাবুক, আমার ইচ্ছা সব কিছুই যে এখন আপনার। আবদুল মালিক বুঝিলেন এমন লোকেরই আমার প্রয়োজন। পরবর্তীকালে সে কূফার শাসনকর্তা হইয়াছিল। তাহার ক্ষমতা এতটা বাড়িয়া গিয়াছিল যে, সে হযরত নবী করীম (সঃ)-এর প্রিয় সাহাবা হযরত আনাস (রাঃ) কেও অপমান করিতে দ্বিধাবোধ করে নাই।

পক্ষ হইতে লোকের মনে এইরূপ ভয়-ভীতি এইজন্য সৃষ্টি করিয়া দেওয়া হইয়াছিল যে, যদি কেহ কখনও কোন কিছু করার ইচ্ছা করে তবে যেন হাজ্জাজের আমলের প্যাইকারীভাবে হত্যার কথা ও কারাগারের কঠিন শাস্তির কথা স্মরণ করিয়া নীরব থাকে। সেই সময় চল্লিশজন শায়খ সাক্ষী দিয়াছিলেন যে, খলীফাদের কাজের জন্য আল্লাহ্‌র নিকট জবাবদিহি করিতে হইবে না, তাহারা তাহাদের কৃত অপরাধের জন্য কোন শাস্তি পাইবে না বরং তাহারা যাহা ইচ্ছা তাহাই করিতে পারেন—ধর্ম তাহাদিগকে সেই অধিকার দিয়া রাখিয়াছে। এই সাক্ষী প্রদানে খলীফা এবং তাহাদের কর্মচারীদের পাশবিক ইচ্ছা চরিতার্থ করার ময়দান কতটা প্রশস্ত করিয়া রাখিয়াছিল তাহা সহজেই অনুমান করা যায়। খুলাফায়ে রাশেদীনের যুগে ব্যক্তিগত স্বাধীনতার যে অর্থ ছিল 'আবদুল মালিকের এক দিনের ভাষণেই তাহা ধুইয়া-মুছিয়া পরিষ্কার হইয়া গিয়াছিল অর্থাৎ খুলাফায়ে রাশেদীনের আমলে একজন সাধারণ মুসলমানেরও স্বয়ং খলীফাকে "হে আমীরুল মুমিনীন! আল্লাহ্‌কে ভয় করুন" বলার পূর্ণ অধিকার ছিল। ছোট বড় নির্বিশেষে সকলেই এই সতর্কবাণী উচ্চারণ করার অধিকারী ছিল।

প্রথম অমঙ্গলের দিন এবং প্রথম মুসলিম বাদশাহ

রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষমতা 'আবদুল মালিকের হাতে আসার পর একদিন তিনি মদীনায় রসূলুল্লাহ্‌র মিম্বরে দাঁড়াইয়া প্রচার করিলেন—"আল্লাহর কসম আমি দুর্বল খলীফা নই। ইহা হযরত উসমানের প্রতি ইঙ্গিত ছিল। কিংবা আমি মিষ্টভাষী বিনয়ী খলীফাও নই। ইহা ছিল হযরত মুআবিয়ার দিকে ইঙ্গিত। তোমরা আমাদিগকে (খলীফাদিগকে) আদেশ করিয়া থাক, কিন্তু নিজেদের সম্পর্কে, ভুলিয়া যাইতেছ। আজ হইতে যদি কেহ আমাকে হুকুম কর অর্থাৎ 'আল্লাহ্‌কে ভয় কর' এই কথা বল তবে সাথে সাথেই দেহ হইতে তাহার মাথা বিচ্ছিন্ন হইয়া যাইবে।

আবু বকর জাস্‌সাস বলেন, এই প্রথম অমঙ্গলের দিনে প্রথম বাদশাহ জনসাধারণের জিহ্বা কাটিয়া দিলেন অর্থাৎ সৎ কাজে আদেশ ও অসৎ-কাজে বিরত থাকা হইতে নিষেধ করিতে বারণ করিয়া দিলেন। হাজ্জাজ পর্যন্ত পৌঁছিতে পৌঁছিতে এই প্রকার তিক্ততা সীমা অতিক্রম করিয়া গিয়াছিল। যদিও হাজ্জাজ মরিয়া গিয়াছিল তথাপি সে যে নিষ্ঠুর রীতিনীতি ও অত্যাচার মুসলমানের উপর চাপাইয়া দিয়াছিল হযরত

উমর ইবনে 'আবদুল আযীযের আড়াই বৎসরকাল শাসন আমলেও উহা সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করিয়া ফেলিতে সক্ষম হন নাই। যদিও কিছুদিনের জন্য লোকে নিজেদের মতামত প্রকাশ ও কথা বলার স্বাধীনতা পাইয়াছিল, কিন্তু তাহার প্রতিক্রিয়া বেশী দিন টিকিয়া থাকিতে পারে নাই। হযরত হাসান বসরী (রঃ) হাজ্জাজের মৃত্যুর পর দোয়া করিয়াছিলেন—"হে পরওয়ারদিগার! তুমি যেমন এই নিষ্ঠুর ব্যক্তিকে ধ্বংস করিয়াছ তেমনি তাহার প্রচলিত রীতিনীতিকেও শেষ করিয়া দাও।"

বনী উমাইয়ার পতনের পর আশা করা গিয়াছিল যে, তাহাদের প্রবর্তিত আইন-কানুন এবং রীতিনীতি চিরবিদায় গ্রহণ করিবে। কিন্তু আব্বাসীয়দের অবস্থা উহার চেয়ে ভাল ছিল না। বনী উমাইয়ার নরপশু হাজ্জাজের স্থান আব্বাসীয়দের আবু মুসলিম দখল করিয়াছিল। গ্রন্থের কলেবর বাড়িয়া যাইবে, অন্যথায় দেখানো যাইত যে, তাহার নিষ্ঠুরতা ও বর্বরতা যদিও হাজ্জাজকে অতিক্রম করিয়া যায় নাই তথাপি তাহার চেয়ে কোন অংশে কম ছিল না।

ইমাম সাহেবের উপর প্রতিক্রিয়া

দেশের এই দুরবস্থা ইমাম সাহেবের সম্মুখে ছিল, যে সম্বন্ধে পূর্বে বর্ণিত হইয়াছে এবং ভবিষ্যতেও বর্ণনা করা হইবে। ইমাম সাহেব কি মুসলমানদের দুরবস্থা দেখিয়া নিশ্চেষ্ট হইয়া বসিয়াছিলেন? তিনি অবশ্য কিছু করিতে চাহিয়াছিলেন। কিন্তু কোন্ পথ অবলম্বন করিয়াছিলেন? আমি পূর্বেই বলিয়াছি যে—আমার নিকট উহা প্রমাণ করার মত এমন কোন ঐতিহাসিক ঘটনা নাই। তবে একথাও বলিয়াছি এবং এখনও বলিতেছি যে, তিনি যাহা কিছু করিয়াছিলেন উহা দ্বারাই আমি এই প্রশ্নের সমাধান করিতে চাই এবং উহাকেই আমি ইমাম সাহেবের রাজনৈতিক পদ্ধতি মনে করি।

ইমাম সাহেবের রাজনৈতিক কার্যধারা

এই বিষয়ে সর্বপ্রথম ইমাম সাহেবের জীবনের যে দৃষ্টিভঙ্গি আমাদের চোখের সামনে ভাসিয়া উঠে উহার বিস্তারিত ব্যাখ্যা করিতে চাহিলে অত্যাচারী সরকারের সাথে সম্পর্কচ্ছেদ বা অসহযোগ আন্দোলন শব্দ দ্বারা করা যাইতে পারে। কিন্তু যে ব্যক্তি সরকারী আর্থিক সাহায্য ব্যতীত জীবন ধারণে অক্ষম তাহার পক্ষে এরূপ সম্পর্কচ্ছেদের আন্দোলন করা সম্ভব হয় না। মানুষ ফিরিশ্তা নয়, আদম সন্তান—স্বাভাবিক প্রয়োজন তাহার থাকিবেই। মানুষের এই দুর্বলতার

সুযোগ গ্রহণ করিয়াই প্রত্যেকটি অত্যাচারী সরকার নিজের কার্য-সিদ্ধি করিয়াছে। ইমাম সাহেবের সময়ও ইহার ব্যতিক্রম হয় নাই। গলায় শিকল ও পায়ের বেড়ীই জঙ্গলের সিংহকে কাবু করিয়া রাখে। ইমাম সাহেবের সময়ও এমন বহু পুরুষ সিংহ ছিলেন। কিন্তু তাঁহারা বনী উমাইয়া এবং বনী আব্বাসীয় খলীফাদের শৃঙ্খল ও বেড়ী দ্বারা আবদ্ধ ছিলেন। সত্য বলিতে কি 'চল্লিশ চোরের' ঐ দলটি যাহারা খলীফাকে যাবতীয় অন্যায়ের উর্ধ্বে পবিত্র বলিয়া ফতওয়া দিয়াছিলেন—সম্ভবত তাহারাও নিজেদের প্রয়োজনের তাকীদে এবং খলীফাদের ভয়ে পরকাল বিক্রি করিয়া ইহকাল খরিদ করিয়াছিল।

কাযী শরীফের চাকুরী গ্রহণ

কাযী শরীফ (যাহার সম্বন্ধে পূর্বে কিছু বলা হইয়াছে এবং ভবিষ্যতেও হইবে) আব্বাসীয় আমলে কাযীর পদ কিভাবে গ্রহণ করিয়াছিলেন ইহা তো ভিন্ন কথা। কিন্তু কাযীর পদ গ্রহণ করার পর যখন বেতন গ্রহণ করার যোগ্যতা অর্জন করিলেন, ঐতিহাসিক মাসউদী সেই সম্বন্ধে বলেন ঃ

কাযী শরীফের বেতনের জন্য চেক দেওয়া হইল। চেকের অর্থ প্রদানকারী লিখিত পরিমাণের চেয়ে কিছু কম দিতে চাহিলে কাযী সাহেব তর্কাতর্কি করেন। সে কাযী সাহেবকে বলিল—আপনি কিসের পারিশ্রমিক চাহিতেছেন ? আপনি কি কাপড় বিক্রি করিয়াছেন ?

এই কথার উত্তরে কাযী সাহেব যাহা বলিয়াছিলেন, যদিও তিনি ঠাট্টাচ্ছলে বলিয়াছিলেন, তথাপি ইহার মধ্যে সত্য নিহিত ছিল। তিনি বলিয়াছিলেন, "আল্লাহ্‌র কসম! আমি তো কাপড়ের চেয়েও মূল্যবান বস্তু বিক্রয় করিয়াছি; আমি আমার ধর্ম বিক্রয় করিয়াছি এবং উহার দামই গ্রহণ করিতে আসিয়াছি।"

কাযী সাহেব যদিও কথা প্রসঙ্গে নিজের ধর্ম বিক্রয়ের কথা বলিয়াছিলেন, কিন্তু ব্যক্তিগতভাবে উহার সহিত তাহার চরিত্রের কোন সামঞ্জস্য নাই। তিনি এমনই একজন বুযুর্গ পরহেযগার এবং আল্লাহ ভক্ত লোক ছিলেন যে ইমাম বুখারী ও মুসলিমের ন্যায় মুহাদ্দিসও তাঁহার বর্ণিত হাদীস তাঁহাদের গ্রন্থে সন্নিবেশিত করিয়াছেন। কিন্তু অমুখাপেক্ষী অবস্থায় মানুষের মধ্যে যে শক্তি ও সামর্থ্য পাওয়া যাইত, হুকুমতের মুখাপেক্ষী হইয়া সেই শক্তি একেবারেই হারাইয়া ফেলিয়াছিল। সম্ভবত ধর্ম-বিক্রি দ্বারা কাযী সাহেব এই দুর্বলতার

প্রতিই ইঙ্গিত করিয়াছিলেন। বর্ণিত আছে ইমাম সাহেবের সমসাময়িক হযরত সুফিয়ান সাওরী প্রথমে কোন শাসনকর্তার দান গ্রহণ করিয়াছিলেন। কিন্তু সেই দান গ্রহণ করার পর তিনি নিজের মধ্যে যে পরিবর্তন লক্ষ্য করিয়াছিলেন তাহাতে তিনি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছিলেন আর কখনও হুকুমতের কোন দান গ্রহণ করিবেন না। (ইবনে সা'আদ)

প্রয়োজন অনুসারে ইমাম সাহেবও ব্যবসায়-বাণিজ্য আরম্ভ করিয়াছিলেন। তিনি কয়েকজন বিশ্বাসী লোককে মূলধন দিতেন। এই মূলধন দ্বারা কারবার করিয়া যাহা মুনাফা হইত উহা ইমাম সাহেবের নিকট আনিয়া জমা করিত। কিন্তু তাহার নিয়ম ছিল সর্বদা দুইশত দীনার নিজের নিকট রাখিতেন। লোকে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিতেন, "আমার নিকট যদি ইহা না থাকিত তবে লোকে (খলীফা ও তাহার সাঙ্গপাঙ্গ) আমাকে তাহাদের মুখ মুছিবার রুমালে পরিণত করিত।"

মুখ বন্ধ করার ব্যবস্থাপত্র

খলীফারাও টাকা দিয়া কাঠের পুতুলের মুখ খোলার রহস্য অবগত ছিলেন। ধর্মীয় এবং চারিত্রিক যিম্মাদারীর সমস্ত শক্তি এই পথে ব্যয় করিয়া ফেলিয়াছিলেন। অন্যান্যদিগকেও নিজেদের সাথে তুলনা করিতেন। সত্য বলিতে কি তাহাদের এরূপ তুলনা করা ভুলও ছিল না। রাজভোগ দ্বারা লোকের মুখ বন্ধ করার নীতি বনী উমাইয়াদের ও বনী আব্বাসীয়দের এক বিশেষ উপায় ছিল। হয়ত এই ব্যাপারেও তাহাদের পূর্ণ অভিজ্ঞতা ছিল। শুধু খলীফাগণই নয়, প্রাদেশিক শাসনকর্তা ও তাঁহাদের অধীনস্থ আমীর উমরাহ্দের দস্তরখানের বদান্যতা ও অকৃপণতার কাহিনীও বহুল পরিমাণে পাওয়া যায়। লোকের মুখ বন্ধ করার জন্যই এইরূপ খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা করা হইত। কথায় বলে 'মুখে খাইলে চোখে লাজ।'

কাযী শরীফের একটি ঘটনা বর্ণনা করিলেই বুঝিতে পারা যাইবে যে, এই ব্যবস্থার পিছনে তাহাদের কি উদ্দেশ্য নিহিত ছিল। পূর্বেই বলিয়াছি কাযী শরীফ সরকারী কোন পদ গ্রহণ করিতে অস্বীকার করিয়াছিলেন। পরিশেষে তিনি হুকুমতের সাথে অসহযোগ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। কারণ সরকারী কোন পদ গ্রহণ করাকে তিনি ধর্ম বিক্রি করার শামিল মনে করিতেন। কিন্তু পরবর্তীকালে তিনি কেন কাযীর পদ অথবা শাহাযাদাদের শিক্ষা দেওয়ার ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন।

মাসঊদী এই সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন—আবুজাফর মনসুরের পুত্র হাদী ও হারুনের পিতা মেহদী বিল্লাহ একদিন কাযী শরীফকে দরবারে ডাকাইয়া আনিলেন। মেহদী কাযী সাহেবের নিকট তিনটি প্রস্তাব পেশ করিয়া বলিলেন—ইহার যে কোন একটি আপনাকে অবশ্যই গ্রহণ করিতে হইবে। তিনটি প্রস্তাব ছিল—

১. আমার হুকুমতে কাযীর পদ গ্রহণ করুন; অথবা
২. আমার ছেলেদের শিক্ষা দেওয়ার ভার গ্রহণ করুন; অথবা
৩. অন্ততঃপক্ষে একবার শাহী মহলের রান্না খাইতে হইবে।

চাকুরী গ্রহণ করিতে কাযী সাহেব প্রথম হইতেই নারায ছিলেন। তৃতীয় প্রস্তাব সম্বন্ধে চিন্তা করিলেন—ইহা তো সাময়িক কাজ। ইহার সাথে কোন প্রকার চিরস্থায়ী সম্পর্ক নাই। তাই তিনি একবার খাইতে স্বীকার করিলেন।

মেহদী বাবুর্চীখানায় বিশেষভাবে খাদ্য তৈয়ার করার নির্দেশ দিলেন। তিনি বলিলেন—নানা প্রকার খাদ্যের সাথে মিসরী ও মধুর তৈরী ডিমের হলুদ হালুয়া তৈরী করিয়া কাযী সাহেবকে দেওয়া হউক। খানা এবং হালুয়া তৈরী করিয়া কাযী সাহেবের সামনে পেশ করা হইল।

মাসঊদী বলেন—কাযী সাহেব আহার সমাপনান্তে মেহদীর নিকট হইতে বিদায় লইয়া রওয়ানা হইলেন। তখন প্রধান বাবুর্চী আসিয়া মেহদীকে বলিল—"আমরুল মুমিনীন! এই খানা খাবার পর কাযী সাহেব আর অসহযোগে কৃতকার্য হইতে পারিবেন না।"

এই ঘটনার বর্ণনাকারী ফযল ইবনে রবী বলেন—পরিণামে কার্যত তাহাই হইয়াছিল অর্থাৎ আল্লাহ্‌র কসম! ইহার পর কাযী সাহেব মেহদীর ছেলেদিগকে হাদীস শিক্ষা দিয়াছিলেন এবং কাযীর পদও গ্রহণ করিয়াছিলেন।

খোদা জানেন, ফযলের এই ধারণা কতদূর সত্য। শেষ বয়সে তিনি হুকুমতের সকল প্রকার খেদমতই করিয়াছিলেন। তবে তিনি বাদশাহী ভোজ খাওয়ার জন্য কিংবা অন্য কোন কারণে ইহা করিয়াছিলেন কিনা তাহা বলা দুষ্কর। কাযী সাহেবের মত একজন বুযুর্গ লোক সরকারী ভোজ গ্রহণের দরুনই যে সারা জীবনের সাধনা নষ্ট করিয়া দিয়াছিলেন—ইহা বিশ্বাসযোগ্য নহে। বরং ইহা বিশ্বাসযোগ্য যে, শেষ বয়সে সর্ববিষয়ে অসহযোগ করার ইচ্ছা পরিত্যাগ

করিয়াছিলেন। কিংবা হয়ত হুকুমতের জোর-জবরদস্তির নিকট তাহাকে হার মানিতে হইয়াছিল। আল্লাহ্ই জানেন তাহাদের এই জোর-জবরদস্তির সামনে কত সিংহকে মেষশাবকে পরিণত হইতে হইয়াছিল।

ঘটনা যাহাই হউক না কেন—এই সমস্ত শাসকদের ধারণার উদ্দেশ্য তো ইহা দ্বারাই বুঝা যায় যে, এই খানা-পিনার অন্তরালে কোন্ বিষয় কার্যকরী ছিল? আমার কথার অর্থ এই যে, মেহদী হাদীস শিক্ষা দেওয়ার এবং কাযীর পদ গ্রহণ করার যে দুইটি ভিন্নমুখী প্রস্তাব পেশ করিয়াছিলেন—উহা দ্বারাই অনুমান করা যায় যে, মুখ বন্ধ করার এই প্রক্রিয়ার উপর তাহাদের কতটা ভরসা ছিল। তাই ইমাম সাহেব গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করিতেছিলেন হুকুমত কি কি উপায়ে লোকদিগকে তাহাদের শিকারে পরিণত করিতেছিল। তিনি আরও দেখিতেছিলেন প্রয়োজনের তাকীদেই বড় বড় লোকের পদস্খলন হইতেছিল। এখানে কাযী সাহেবের মত একজন বুযুর্গ লোকের দৃঢ় সংকল্প ধ্বংস হইয়া যায়; অটল প্রতিজ্ঞাও তৃণ-খণ্ডের মত স্রোতের টানে ভাসিয়া যায়।

এই অবস্থায় হুকুমতের সাথে শুধু অসহযোগিতা করা কখনও ফলপ্রসূ হইতে পারে না এবং অল্পেতুষ্টি ও সহনশীলতার অনুশীলন করিয়া যদিও কৃতকার্য হওয়া যায় তথাপি এই ব্যক্তিগত সামান্য পরিমাণ কাজ দ্বারা অর্থাৎ হুকুমতের সাথে সহযোগিতা না করিয়া কখনও কেহ তাহার মনস্কামনা যথার্থরূপে পূর্ণ করিতে পারে না।

আমি বলিয়াছি এই সম্পর্কে স্বয়ং ইমাম সাহেবের বা অন্য কাহারও কোন বর্ণনা পাওয়া যায় না, যাহা এখানে লিপিবদ্ধ করিতে পারি। কিন্তু তিনি যে কাজ করিয়াছেন—এখানে উহাই দেখাইতে চাই।

ষষ্ঠ অধ্যায়

ইমাম সাহেবের ব্যবসায়ের ব্যাপকতা

সাধারণ ঐতিহাসিকদের মতে ইমাম সাহেব ব্যবসা-বাণিজ্য করিতেন। আবার কেহ কেহ লিখিয়াছেন, ইমাম সাহেব 'খুয'[১] নামক এক প্রকার বিশেষ কাপড়ের ব্যবসায় করিতেন। 'খুয' এমন এক প্রকার কাপড় যাহার প্রচলন ইসলামের প্রথম শতাব্দীতে বহুল পরিমাণে ছিল। কিন্তু ইমাম সাহেবের এই কারবারের পরিধি কিরূপ ছিল সেই দিকে অনেকে দৃষ্টিপাত করেন নাই। এই সময় সূতী কাপড়ের দাম কত সস্তা ছিল ইবনে সা'আদের বর্ণনায় উহা অবগত হওয়া যায়। যখন ইমাম সাহেবের বয়স দশ বৎসর তখন আবুল আলিয়া আর রিয়াহী ইনতিকাল করেন। আবুল আলিয়া সম্বন্ধে ইবনে সা'আদ বলিয়াছেন—"একদিন আবুল আলিয়া তাহার শিষ্যবৃন্দকে বলিলেন—এখন আমার গায়ে পনর দিরহামের পোশাক রহিয়াছে।" জামা, পাগড়ী এবং চাদর ছিল এই পোশাকের সমষ্টি।

পনর দিরহাম বর্তমান যুগের চারিশত টাকার প্রায় সমান। এই মেশিনের যুগেও যখন এই মূল্য আশ্চর্যজনক তখনকার দিনে যে আরও বিস্ময়কর হইবে উহাতে আশ্চর্য হওয়ার কিছুই নাই অর্থাৎ তাহার শাগরিদগণ জিজ্ঞাসা করিলেন—আপনি করিতেন কি? উত্তরে

১। 'খুয' এমন এক প্রকার কাপড় যাহার 'বানা' বিভিন্ন প্রকার সূতা যেমন উল, পশম ও তুলার সূতায় এবং 'তানা' শুধু রেশমের সূতায় তৈরী হইত। আবার কোন কোন ফিকাহ্‌র কিতাবে লিখিত আছে 'খুয' এক প্রকার সামুদ্রিক জীবের পশম দ্বারা তৈরী হইত। ইহাকে সাধারণত রেশমী কাপড় বলিয়াই আমরা এখন উল্লেখ করিব। সাহাবায়ে কিরামের মধ্যে মুষ্টিমেয় কয়েকজন বুযুর্গ ব্যতীত আর সকলেই এই খুয ব্যবহার করিতেন। এই কাপড়ের বিশেষত্ব এই যে, রেশমের চেয়ে ইহা খুব টেকসই হইত। আর রেশম ব্যবহার করা পুরুষের পক্ষে হারাম। তাই ইহার বৈধ পন্থা বাহির করিবার জন্য রেশমের সাথে অন্যান্য উপাদান মিশ্রণ করা হইত।

তিনি বলিলেন—আমি বার দিরহাম দ্বারা একখান রাযী কারবাস [১] ক্রয় করিয়া উহার দ্বারা জামা এবং পাগড়ী তৈয়ার করিতাম এবং তিন দিরহামের অন্য কাপড় খরিদ করিয়া লুঙ্গি বানাইয়া জামার নীচে ব্যবহার করিতাম। (তবকাত, ৮২ পৃঃ ৭ম জিলদ)

এই ঘটনায় ইহাও অবগত হওয়া যায় যে, সেই যুগে বর্তমান যামানার ন্যায় খাটো জামা ব্যবহার করা হইত না। জামা এত লম্বা হইত যে উহার নীচে লুঙ্গি পরিলে লুঙ্গি দেখা যাইত না। দুইখান খুয সম্বন্ধে বর্ণনা প্রসঙ্গে বলিয়াছেন ঃ

بعت احدهما بعشرين دينارا -

আমি উহার একখান বিশ আশরাফীর পরিবর্তে বিক্রয় করিলাম। ইহাতে বুঝা যায় যে, সাধারণত একখান রেশমী কাপড় বিশ আশরফীতে ক্রয়-বিক্রয় হইত। আবুল ফযল ইবনে খাযশাম হইতে বর্ণিত আছে ইমাম সাহেবের অসাক্ষাতে তাঁহার একজন শিষ্য একখান রেশমী কাপড় মদীনার কোন এক ব্যক্তির নিকট এক হাযার দিরহামে বিক্রয় করিয়াছিলেন। চারিশত দিরহামের পরিবর্তে এক হাযার আশরফীতে বিক্রয় করার বিষয় পরে জানিতে পারিয়া ইমাম সাহেব শিষ্যকে তিরস্কার করিয়াছিলেন। (মানাকিবে মুফিক, ১৯৯ পৃঃ, ১ম জিলদ)

ইহা তো ছিল রেশমী বস্ত্রের গুরুত্ব। কিন্তু ইমাম সাহেব এই মূল্যবান বস্ত্রের কারবার কিভাবে করিতেন। বর্ণনা মতে এই সম্পর্কে চারিটি বিষয় অবগত হওয়া যায়—

১। ইমাম সাহেব শুধু রেশমী বস্ত্রের ব্যবসায়ীই ছিলেন না বরং এই রেশমী বস্ত্র তৈয়ার করার নিজস্ব কারখানাও কূফায় ছিল।

২। কূফার বাজারে দোকান ছিল,

৩। দাসদের দ্বারা ফেরী করাইয়া বিক্রয় করা হইত, এবং

৪। বহু দূর-দূরান্ত, যেমন বাগদাদ, নিশাপুর ইত্যাদি, স্থানে ইহা রফতানী করা হইত এবং সেখান হইতে আমদানীও করিতেন।

১। রাযী কাপড় যে শহরে তৈরী হইত। সবচেয়ে সস্তা ছিল হিরাতের কাপড়, আব্বাসীয় দ্বিতীয় খলীফা আবু জাফর মনসুর হিরাতের সস্তা কাপড় ব্যবহার করিতেন এবং কার্পণ্য করিয়া উহাতে তালিও লাগাইতেন। ইমাম জাফর সাদিক (রাঃ)-এর নিকট এই ঘটনা বর্ণনা করা হইলে তিনি বলিয়াছিলেন, "আল্লাহ্‌র মেহেরবানী যে, বাদশাহ্‌দের মধ্যে ফকীরীর উপলব্ধি বিদ্যমান রহিয়াছে।"

রেশমী বস্ত্রের দোকান

খতীব বাগদাদী তাঁহার ইতিহাসে লিখিয়াছেন ঃ

كان ابو حنيفة خزازا ودكانه معروف في دار عمرو بن حريث ০

ইমাম আবু হানীফা রেশমী বস্ত্রের ব্যবসায়ী ছিলেন এবং তাঁহার দোকান আমর ইবনে হারীসের কুঠিতে জনসাধারণের নিকট মশহুর ছিল। প্রথমত, معروف শব্দ দ্বারা বুঝা যায়—দোকান সর্বজনবিদিত ও সুপ্রসিদ্ধ ছিল। দ্বিতীয়ত, دار শব্দ দ্বারা যদি বাংলা অর্থ কুঠি, দালান বা ঘর বুঝানো হয় তবে আরবী ভাষা সম্বন্ধে অজ্ঞ হিসাবেই বিবেচিত হইবে। ইবনে হুমাম 'ফতহুল কাদীর' নামক গ্রন্থে লিখিয়াছেন ঃ

الدار اسم لساحة ادير عليها الحدود تشتمل على بيوت واصطبل وصحن غير مسقف ০

دار এমন ময়দানকে বলা হয় যাহার চতুর্দিকে দেয়াল থাকে। সেই দেয়াল ঘেরা স্থানের মধ্যে ছাদবিহীন ঘর; আস্তাবল থাকে। আরবী ভাষায় دار (দার) শব্দের ব্যাখ্যা বর্তমান যুগের সাথে তুলনা করা যাইতে পারে। উমর ইবনে হারীসের এই কুঠি সম্পর্কে ইবনে সা'আদ লিখিয়াছেন—উমর ইবনে হারীস কূফা আগমন করার পর মসজিদের নিকটে একটি অট্টালিকা তৈরী করান। উহা আকারে খুব বড় এবং প্রসিদ্ধ ছিল।

ইহাতে বুঝা যায় কূফা শহরে ইহা সামান্য ঘর ছিল না। যদি তাহাই হইত তবে 'ঘর' শব্দের পর বড় এবং প্রসিদ্ধ শব্দদ্বয় ব্যবহার করিতেন না। এই বর্ণনা মতে ইমাম সাহেবের দোকান কূফার মসজিদ সংলগ্ন ছিল। দোকান শব্দ দ্বারা বর্তমান যুগে যেরূপ দোকান বুঝা যায়, অর্থাৎ একটি কোঠার সম্মুখে বারান্দায় পণ্যদ্রব্য রাখিয়া যেমন বেচা-কেনা হইয়া থাকে, উহা সেরূপ ছিল না। বরং উমর ইবনে হারীসের পূর্ণ গৃহে রেশমী কাপড় বেচা-কেনা এবং তৈরীর কারখানা ছিল। ইহার পরেই ইবনে সা'আদ লিখিয়াছেন, "এই গৃহে রেশমী বস্ত্র বয়নকারীগণ থাকিত।"

ইহার অর্থ তো এই বুঝায় যে ইমাম সাহেব এখানে রেশমী বস্ত্র তৈরীর কারখানা খুলিয়াছিলেন এবং কারখানার কর্মচারিগণ এই গৃহে থাকিত। অথবা ইহাও বুঝা যায় যে রেশমী বস্ত্র বয়নকারীদের একটি সম্প্রদায় এখানে থাকিত এবং ইমাম সাহেব তাহাদের নিকট হইতে ক্রয় করিয়া বিক্রয় করিতেন। কোন কোন বর্ণনায় দেখা যায়, বাহিরের

রেশমী বস্ত্র বয়নকারিগণ তাহাদের বস্ত্র ইমাম সাহেবের নিকট বিক্রয় করিতে আনিত। কোন কোন সময় তিনি শুধু এক ব্যক্তির নিকট হইতেই আট-দশ হাযার দীনারের বস্ত্র ক্রয় করিয়া রাখিতেন।

জামেউল মাসানীদে আবু বকর 'আইয়াশের বর্ণনা মতে যে কাহিনী বর্ণনা করা হইয়াছে আমার মতে তাহার জন্যই ইমাম সাহেবকে হুকুমত প্রদত্ত কারাদন্ড ভোগ করিতে হইয়াছিল। আবু বকর আইয়াশ বলিয়াছেন "হুকুমতের ইচ্ছা ছিল রেশমী বস্ত্র বয়নকারীদের তত্ত্বাবধায়কের চাকুরী ইমাম সাহেব গ্রহণ করুন। কিন্তু তিনি অস্বীকার করেন।"

এই বর্ণনা মতে ইহাও অবগত হইতে পারা যায় যে, রেশমী বস্ত্র বয়নকারীদের একটি বড় সম্প্রদায়ের সাথে ইমাম সাহেবের সম্পর্ক ছিল। হয়ত তাহারা ইমাম সাহেবের কারখানায় কাজ করিত নয়ত বহিরাগত লোকেরা তাহাদের তৈরী কাপড় ইমাম সাহেবের নিকট বিক্রয় করিত। কেননা, এমন লোককেই কোন সম্প্রদায়ের তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত করা হয় তাহাদের সম্বন্ধে যে বিশেষভাবে অবগত থাকে। আল-ইয়াফী স্পষ্ট ভাষায়ই বলিয়াছেন, "ইমাম সাহেবের বড় একটি কুঠি ছিল যেখানে রেশমী বস্ত্র তৈরী হইত এবং বয়নকারিগণ সেখানে থাকিত।"

সুতরাং ইহাই প্রমাণিত হয় যে, ইমাম সাহেবের খুব বড় কারখানা ছিল এবং সেখানে শ্রমিকরা কাজ করিত।

কুফার রেশমী কাপড়ের শ্রেষ্ঠ দোকান

নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে যে, ইমাম সাহেব ব্যাপক-ভিত্তিতে ব্যবসা-বাণিজ্য করিতেন। ইমাম সাহেবের সময় কুফার জনসংখ্যা ছিল লক্ষাধিক। সেই যুগেও কুফার ন্যায় প্রতারক ও রাজদ্রোহী শহরেও ইমাম সাহেবের রেশমী বস্ত্রের দোকানই ছিল সর্বশ্রেষ্ঠ। ইমাম সাহেবের দোকানে এমন সব মূল্যবান কাপড় পাওয়া যাইত যাহা অন্য কোন দোকানে ছিল না। ইমাম সাহেবের কারবার সম্বন্ধে ইবনে খুশনান বলিয়াছেন, "ইমাম সাহেব রেশমী বস্ত্র ব্যবসায়ী ছিলেন এবং বেচাকেনার সময় গভীরভাবে পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও দক্ষতার সাথে কাজ করিতেন।"

ইহার অর্থ আমি তো ইহাই বুঝি যে—অন্যতম রেশমী বস্ত্র সংগ্রহ করার মানসে ইমাম সাহেবকে বেশ কষ্ট স্বীকার ও দক্ষতার সাথে যাচাই-বাছাই করিতে হইত। কেননা ইহার পরই বর্ণনা করা হইয়াছে; বিভিন্ন প্রকার সওদা খরিদ করার জন্য মদীনা হইতে এক ব্যক্তি কুফায়

আগমন করেন। ভাল রেশমী বস্ত্রের অনুসন্ধান করিলে লোকে তাহাকে বলিয়াছিল—এই প্রকার অন্যতম রেশমী বস্ত্র এখানকার ফকীহ ফিকাহ শাস্ত্রবিদ ইমাম আবু হানীফার দোকান ব্যতীত আর কোথাও পাওয়া যাইবে না।

অতঃপর সেখানকার ক্রয়-বিক্রয়ের নিয়ম সম্বন্ধেও মদীনাবাসীকে অবগত করানো হইয়াছিল। "সেই দোকানে যাওয়ার পর তোমার প্রার্থিত বস্তু বাহির করিয়া দিলে যে দাম বলিবে সেই দামেই তোমাকে ক্রয় করিতে হইবে।"

আজকাল বড় বড় কোম্পানী এবং বড় বড় দোকানে অযথা দামাদামী না করিয়া অল্প সময়ের মধ্যে বেচা-কেনা সম্পন্ন করার জন্য প্রত্যেকটি বস্তুর মূল্য নির্ধারিত করিয়া দেওয়া হয়। ইহাতে ক্রেতা ও বিক্রেতা কাহারও সময় নষ্ট হয় না। সাধারণত যেখানে কেনা-বেচার ভিড় বেশী থাকে সেখানেই এই নিয়ম অনুসৃত হইয়া থাকে। অন্যথায় যেখানে ভিড় নাই এবং অল্প মূলধন লইয়া কাজ করে তাহারাই দুই পয়সা বেশী লাভের আশায় ক্রেতার সাথে দরদস্তুর করিয়া সময় নষ্ট করে। অথচ দেখা যায় ইমাম সাহেব ব্যতীত তাঁহার দোকানে তাঁহার ছেলে হাম্মাদ এবং কয়েকজন ছাত্রও বেচা-কেনার কাজ করিতেন। কাজের আধিক্যবশত তিনি প্রত্যেক পণ্য-দ্রব্যের মূল্য নির্ধারিত করিয়া দিয়াছিলেন যেন দরদস্তুর করিয়া অযথা সময় নষ্ট না হয়। রেশমী বস্ত্র ব্যতীত অন্যান্য পণ্যদ্রব্য, যাহা তাঁহার দোকানে বিক্রয়ার্থে মওজুদ থাকিত, লোকের চাহিদামত উহা সরবরাহ করিতেন। (মানাকিবে মুফিক, ২১৮ পৃঃ ১ম জিলদ)

যাহাই হউক না কেন ওয়াকেদী রচয়িতা মুহাম্মাদ ইবনে সা'আদ (মৃত্যু ৩৩০ হিজরী সন) সাহাবা উমর ইবনে হারীসের সেই কুঠি সম্বন্ধে লিখিয়াছেন—"এই গৃহে রেশমী বস্ত্র বয়নকারিগণ তখন পর্যন্ত ছিল।"

ইমাম সাহেবের মৃত্যুর অর্ধ শতাব্দী পরও যে সেই গৃহে রেশমী বস্ত্রাদি তৈরী হইত উক্ত বর্ণনা উহারই প্রমাণ। ইমাম সাহেবের কারবারের ব্যাপকতা ও প্রশংসা অর্জনের ক্ষমতাও প্রমাণ করে যে, তাঁহার ইন্তিকালের পর কুঠিকেই লোকে রেশমী বস্ত্র তৈরী ও কেনা বেচার উপযুক্ত স্থান হিসাবে বিবেচনা করিত।

দাসদের দ্বারা ফেরী

সেই যুগে মালিকগণ দাসদের সাহায্যেও ব্যবসা-বাণিজ্য করিতেন। এই উদ্দেশ্যে পণ্যদ্রব্য দিয়া তাহাদিগকে বিভিন্ন শহরে প্রেরণ করা হইত। এই উদ্দেশ্যে ব্যবসায়ী গোলামদের জন্য ফুকাহাদের (ফিকাহ্ শাস্ত্রবিদদের) আইন প্রবর্তন করিতে হইয়াছিল। ইমাম সাহেবও তাঁহার দাসদের মারফত ব্যবসা-বাণিজ্য করিতেন। ইমামুল আয়িম্মা আবুবকর যানজাবীর একটি কাহিনী উল্লেখ করিয়া মুফিক বলিয়াছেন, "ইমামের একজন দাস সত্তর হাজার দিরহাম লইয়া ফিরিয়া আসিল।"

দাসদের কৃত ব্যবসায়ে ইমাম সাহেব কি পরিমাণ মুনাফা করিতেন সেই সম্পর্কে হাফিজ ইবনে আবদুহুর বর্ণনা উল্লেখ করিয়া আবু সাঈদ সাম'আনী বলিয়াছেন—

"ইমাম আবু হানীফার একজন দাস ব্যবসা করিত। ইমাম সাহেব তাহাকে ব্যবসা করিবার জন্য বহু পরিমাণ মূল্যের পণ্যদ্রব্য দিয়া রাখিয়াছিলেন। একবার সেই দাস ত্রিশ হাযার দিরহাম মুনাফা করিল।"

যখন এক একজন দাস ত্রিশ হাযার দিরহাম মুনাফা করিয়া ইমাম সাহেবের খেদমতে পেশ করিল তখন ইহা দ্বারাই অনুমিত হয় যে, ব্যবসায়রত দাসগণ কি পরিমাণ অর্থ রোজগার করিত। আমার মনে হয়, এইভাবে ইমাম সাহেব প্রচুর অর্থ উপার্জন করিতেন, হয়ত এই উপায়ে উপার্জন করা ইমাম সাহেবের একটি স্থায়ী আয়ের পন্থা ছিল। তাই অন্যান্য উপায়ে যে ইমাম সাহেবের লক্ষ লক্ষ টাকা আয় হইত উহাতে আর বিচিত্র কি ?

আমদানী-রফতানী

এই সম্বন্ধে কোন বর্ণনাকারী বিশেষ আলোকপাত না করিলেও কিন্তু জীবনের অন্যান্য ঘটনার ছিটেফোঁটা যাহা কিছু পাওয়া যায় সে বিষয়ে আমি বিশেষভাবে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করিয়া অবগত হইতে পারিয়াছি যে, ইমাম সাহেব কুফার বাহিরে অন্যান্য দেশ হইতেও পণ্যদ্রব্য আমদানী করিতেন।

আব্বাসিয়া খিলাফতের পূর্বে এলাকার বিভিন্ন প্রসিদ্ধ শহরে ইমাম সাহেবের প্রতিনিধি ছিল। তিনি কুফা হইতে এই সমস্ত প্রতিনিধির নিকট পণ্যদ্রব্য পাঠাইয়া দিতেন। আবার তাহারাও তথাকার পণ্যদ্রব্য ইমাম সাহেবের নিকট কুফায় প্রেরণ করিত।

যৌথ কারবার

হাফস ইবনে 'আবদুর রহমানের সাথেই হযরত ইমাম সাহেব বেশীর ভাগ যৌথ কারবার করিতেন। বাগদাদের ইতিহাসে আল-খাতীব বলেন, হাফস ইবনে' 'আবদুর রহমান ইমাম আবু হানীফার কারবারে ভাগী ছিলেন এবং বাহির হইতে ইমাম সাহেবের নিকট পণ্যদ্রব্য প্রেরণ করিতেন। হাফস ইবনে 'আবদুর রহমান ইমাম সাহেবের মূলধন দ্বারা যে কারবার করিতেন কোন কোন ইতিহাসে এ কথারও উল্লেখ রহিয়াছে।

আল-মুফিকও একস্থানে লিখিয়াছেন ঃ

হাফস ইবনে 'আবদুর রহমান কারবারে ইমাম সাহেবের অংশীদার ছিলেন এবং কূফার বাহির হইতে তাঁহার নিকট পণ্যদ্রব্য প্রেরণ করিতেন। একবার কয়েকজন বন্ধুর সাথে তিনি পণ্যদ্রব্য প্রেরণ করিয়াছিলেন।

যাহা হউক ইহার ব্যাখ্যা বিভিন্ন ঐতিহাসিকও করিয়াছেন যে, "ইমাম সাহেবের সাথে আবু হাফস ত্রিশ বৎসর পর্যন্ত কারবার করিয়াছেন। হাফস নিশাপুরের অধিবাসী ছিলেন। ইমাম আবু হানীফার নিকট হইতে হাদীস এবং ফিকাহ্ ও রওয়ায়ত করিতেন। তিনি একজন সৎ ও বুযুর্গ ব্যক্তি ছিলেন।"

হাফস ইবনে 'আবদুর রহমান নিজে বলিয়াছেন—আমি ত্রিশ বৎসর পর্যন্ত ইমাম আবু হানীফার সাথে অংশীদার হিসাবে কারবার করিয়াছি। (মুফিক ২৪৩ পৃঃ, ১৪ জিলদ)

কিন্তু ইমাম সাহেব কোথায় তাঁহার নিকট পণ্যদ্রব্য প্রেরণ করিতেন উহা সঠিকভাবে জানা যায় নাই। যেহেতু তিনি সর্বসম্মতিক্রমে নিশাপুরের অধিবাসী ছিলেন এবং নিশাপুরের কাযীর পদ গ্রহণ করিয়া ছিলেন সেহেতু নিশাপুরেই পণ্যদ্রব্য পাঠাইতেন বলিয়া অনুমিত হয়। কিন্তু পরবর্তীকালে এই জন্য অনুতাপ করিয়া কাযীর পদে তিনি ইস্তফা দিয়াছিলেন এবং নির্জনতায় ইবাদত বন্দেগীতে মগ্ন হইয়া কালাতিপাত করিতেন। তাঁহার বুযুর্গীর এমন মর্যাদা ছিল যে, ইবনুল মুবারকের ন্যায় প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিসও নিশাপুর আগমন করিলে তাঁহার সাথে দেখা না করিয়া যাইতেন না।

ইমাম সাহেব যে হাফসের সাথে কারবার করিতেন তিনিই কি এই বুযুর্গ ব্যক্তি ছিলেন, না অন্য আর কেহ সে সম্বন্ধে আল্লাহ্ই অধিক জ্ঞাত। আল-হাকেম তাঁহার ইতিহাসে লিখিয়াছেন—আবু দাউদ এবং নাসাঈ তাঁহার নিকট হইতে হাদীস রওয়ায়ত করিয়াছিলেন। সে

যাহাই হোক আমার মতে হাফস ইমাম সাহেবের নিকট হইতে নিশাপুরেই মাল আমদানী করিতেন।

কেন্দ্রীয় রাজধানী বাগদাদ তখন শ্রেষ্ঠ বাণিজ্য-কেন্দ্র ছিল। এখানেও ইমাম সাহেবের প্রতিনিধি ছিল। আল-খাতীব 'তারীখে বাগদাদে' লিখিয়াছেন—হাসান ইবনে রবী বলিয়াছেন—

কায়েস ইবনে রবী ইমাম আবু হানীফা সম্বন্ধে আমার নিকট বলিতেন—"ইমাম সাহেব বাগদাদ হইতে পণ্যদ্রব্য খরিদ করিয়া কুফায় পাঠানোর জন্য মূলধন প্রেরণ করিতেন।"

কিন্তু বাগদাদে ইমাম সাহেবের লোক কে ছিলেন? হয়ত বিভিন্ন ব্যবসায়ীর সাথে তাঁহার কারবার ছিল। আল-খতীবের বর্ণনা হইতে জানা যায় যে, ইমাম সাহেব কুফা হইতে, যেমন অন্যান্য শহরে মাল প্রেরণ করিতেন তেমনি অন্যান্য শহরের পণ্যদ্রব্যও কুফায় আমদানী করিতেন।

বাগদাদ ও নিশাপুর ব্যতীত অন্যান্য যে সমস্ত শহরের সাথে কারবারের সম্পর্ক ছিল উহাদের মধ্যে 'মার্ভ'-এর নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। আবু গানিম ইউনুসের পরিচয় দিতে গিয়া মুফিক তাঁহার মানাকিবে লিখিয়াছেন—তিনি মার্ভ-এর ইমামদের মধ্যে পরিগণিত ছিলেন। শামসুল আয়িম্মা আল কারদরী আবু গানিম সম্বন্ধে লিখিয়াছেন, "আবু গানিম মার্ভের প্রখ্যাত ইমামদের মধ্যে পরিগণিত ছিলেন। তিনি উমর ইবনে আবদুল আযীয এবং ওয়াহাব ইবনে মুনাব্বাহ্‌র সাহচর্যে থাকিয়া উপকৃত হওয়ার সুযোগ লাভ করিয়াছিলেন। আবু গানিম প্রখ্যাত ইমাম আবদুল্লাহ্ ইবনে মুবারকের উস্তাদ ছিলেন।" ইবনুল মুবারক লিখিয়াছেন—আবু গানিমই আমার জীবনের প্রথম ব্যক্তি যাঁহার নিকট আমি জ্ঞান লাভ করিবার জন্য গমনাগমন করিতাম।

হাফিজ বলেন—আবু গানিম মার্ভের কাযীও ছিলেন। তাঁহার প্রকৃত নাম ছিল ইউনুস ইবনে নাফে খুরাসানী আবু গানিম মারুরী। তিনি ১৫৯ হিজরীতে ইমাম আবু হানীফার নয় বৎসর পর ইনতিকাল করেন। মুফিকের মতে আবু গানিম মার্ভে ইমাম সাহেবের কারবারী প্রতিনিধি ছিলেন। তিনি ইমাম সাহেবের নিকট হাদীসও বর্ণনা করিতেন। ইহা দ্বারাই ইমাম সাহেবের কারবারের ব্যাপকতা ও বিস্তৃতি সম্পর্কে জানা যায়। মনে হয় হাযার হাযার মাইল দূরবর্তী শহরেও তাঁহার কারবার ছিল।

মুজিমুল মুসান্নিফীন লিখিয়াছেন—

"ইমাম আবূ হানীফা সম্বন্ধে বর্ণিত আছে, তিনি রেশমী বস্ত্রের একজন সফল ব্যবসায়ী ছিলেন। এই সম্পর্কে তাঁহার প্রচুর অভিজ্ঞতাও ছিল। কূফায় তাঁহার দোকান ছিল। তাঁহার কারবারে বহু অংশীদার ছিল—তাহারা রেশমী বস্ত্র ক্রয়-বিক্রয়ের জন্য নানাস্থানে যাতায়াত করিত।"

উপরোক্ত বর্ণনাতে দেখা যায়—ইমাম সাহেবের নিযুক্ত প্রতিনিধিরা নানাস্থানে ঘুরিয়া ফিরিয়া ইমাম সাহেবের পক্ষ হইতে রেশমী বস্ত্র ক্রয়-বিক্রয় করিতেন।

ইমাম সাহেবের উস্তাদ ও ছাত্র সংখ্যা

কোন কোন ঐতিহাসিক বলিয়াছেন যে, ইমাম সাহেব চারি হাযার উস্তাদের নিকট শিক্ষা লাভ করিয়াছিলেন যাহাদের মধ্যে তাবিঈদের মত প্রসিদ্ধ বুযুর্গ ব্যক্তিও ছিলেন। তেমনি তাঁহার নিকট যাঁহারা ফিকাহ্ শাস্ত্র শিক্ষা গ্রহণ করিয়াছিলেন,—তাঁহার সংখ্যাও ছিল চারি হাযার।

ইহাকে যদিও সংখ্যাধিক্য বলিয়া মনে হয়—কিন্তু হানাফী ছাত্র হিসাবে যাহাদের নাম ঐতিহাসিকগণ উল্লেখ করিয়াছেন,—তাহাতে ইহাকে অস্বীকার করা যায় না। শামসুল আয়িম্মা আল-ফারূকী ইমাম সাহেবের ছাত্র সংখ্যার বিস্তৃত তালিকা দেওয়ার পর লিখিয়াছেন—এই সাত শত ত্রিশ জন লোক যাহারা বিভিন্ন শহরের প্রধান ব্যক্তি হিসাবে পরিগণিত ছিলেন ইহারা ছিলেন আবূ হানীফার ছাত্র।

মুজিমের গ্রন্থকার উল্লেখিত বর্ণনার পরও সংযোজিত করিয়াছেন—"খাওয়ারিযমী যে ছাত্র সংখ্যা বর্ণনা করিয়াছেন উহার সাথে যদি আমার বর্ণিত নামগুলি সংযোজন কর তাহা হইলে ইমাম সাহেবের ছাত্র সংখ্যা হইবে আট শত আশি।"

নামধাম ও পরিচয়ের সাথে যে সমস্ত ছাত্রদের বিষয় জানা গিয়াছে তাহার সংখ্যাই ছিল আট শত আশি।

কোন্ কোন্ শহরে ইমাম সাহেবের ছাত্র ছিল

আমরা ইহাও দেখিতে পাই যে, কোন নির্দিষ্ট শহর বা কূফা ও উহার পার্শ্ববর্তী সীমাবদ্ধ শহরের মধ্যেই তাঁহার ছাত্র সংখ্যা নিবদ্ধ

ছিল না বরং আব্বাসী হুকুমতের অধিকাংশ শহরে তাহারা ছড়াইয়া ছিল অর্থাৎ কূফার পার্শ্ববর্তী শহর বসরা, বাগদাদ, ওয়াসিত, মুসলিম, মক্কা, মদীনা, দামেশক্ এবং যেখানে ইসলামী শিক্ষার কেন্দ্র ছিল উহাতেই সীমাবদ্ধ ছিল না। আশ্চর্যের বিষয় যে, আব্বাসী খিলাফতের অন্তর্গত শহর মিসর, রামাল্লা, ইয়ামন, ইয়ামামাহ্, বাহরায়ন, রাকাহ ইত্যাদি স্থানের লোকও তাঁহার ছাত্র ছিল। প্রাচ্যের শহরগুলির অবস্থা তো এই যে, সেখানে এমন কোন স্থান ছিল না যেখানে ইমাম সাহেবের কোন শাগরিদ পাওয়া যাইত না। মনে করুন, কোথায় কূফা আর কোথায় জুরজান, তাবরিস্তান, দামেগান, কিন্নাসরীন, নাহওয়ান্দ, আস্তারাবাদ, হালওয়ান, ইসফাহান, কিরমান, মার্ভ, বুখারা, নাসা, সমরখন্দ, সারখাস, কাস, সাগনিয়া, তারমাদ, বলখ, হিরাত, কোহিস্তান, রোম, খাওয়ারিযম, ইত্যাদি শহর হইতেও বহু লোক ইমাম সাহেবের নিকট শিক্ষা গ্রহণ করিতে আসিতেন। জ্ঞানার্জন করার পর আবার তাহারা তাহাদের স্বদেশে ফিরিয়া যাইতেন।

আমি বর্ণনা করিয়াছি যে, যদিও ঐতিহাসিকগণ পূর্বাঞ্চলের শহরস্থ ইমাম সাহেবের ছাত্রদের সাথে খিলাফতের পশ্চিমাঞ্চলের লোকদের বর্ণনা করিয়াছেন, তথাপি এই তালিকার প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে অর্থাৎ এই সমস্ত শহর হইতে কোন্ কোন্ শহরের কত ছাত্র ইমাম সাহেবের নিকট আসিয়াছিলেন তাহা অনুমান করা যায়। বোঝা যায় পশ্চিমাঞ্চলের শহরগুলির চেয়ে পূর্বাঞ্চলের শহরের লোকদের দৃষ্টি ইমাম সাহেবের প্রতি বেশী ছিল। কূফা এবং বসরা যাহা ইমাম সাহেবের জন্মস্থানের মর্যাদা রাখিত। ইহা ছাড়াও বনী উমাইয়া খিলাফতের শেষ আমলে ইমাম সাহেব দুই অথবা আড়াই বৎসর কাল হেজাযে ছিলেন। ইবনে হুবায়রা তখন হেজাযের শাসনকর্তা ছিল। ইবনে হুবায়রার অত্যাচারে অতিষ্ঠ হইয়া তিনি পবিত্র হারাম শরীফে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। ইহা ছাড়াও শেষ বয়স পর্যন্ত ইমাম সাহেব প্রায়ই মক্কা ও মদীনা শরীফ গমনাগমন করিতেন। সকল ঐতিহাসিকের মতেই ইমাম সাহেব পঞ্চান্ন বার হজ্জব্রত পালন করিয়াছিলেন।

মনে হয়, চৌদ্দ পনের বৎসর বয়স হইতেই তিনি প্রতি বৎসর হজ্জ করিতে যাইতেন। অন্যথায় সত্তর বৎসর বয়সে পঞ্চান্নবার হজ্জ করা সম্ভবপর হইত না। হেজাযে অবস্থানকালে তিনি অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা কাজে লিপ্ত ছিলেন। তাই হেজাযে মক্কা ও মদীনা শহরে তাহার অনেক শাগরিদ ছিল।

কিন্তু আব্বাসীয় খিলাফতের পূর্বাঞ্চলীয় শহরগুলির ছাত্র সংখ্যাই ছিল অধিক। বিশেষভাবে সমরখন্দ, বুখারা, বল্‌খ, হিরাত ইত্যাদি স্থানের সংখ্যা ছিল সবচেয়ে বেশী। ইমাম সাহেবের ছাত্রদের তালিকা দেখিলে মনে হয় এই সংখ্যাধিক্যের কারণ ছিল ইমাম সাহেব নিজে অনারব ছিলেন। বিশেষভাবে তাঁহার নিজস্ব মাতৃভাষা আরবী ব্যতীত ফারসী ভাষাতেও তাঁহার গভীর জ্ঞান ছিল। লোকের সাথে তিনি ফারসী ভাষায় আলাপ-আলোচনা করিতেন।

যাহা হউক আমি একথাই বলিতে চাই, যাহা পূর্বেই বলিয়াছি যে, ইমাম সাহেবের দোকানে তাঁহার পুত্র হাম্মাদ এবং অন্যান্য ছাত্রও কাজ করিতেন। এই সমস্ত পূর্বাঞ্চলীয় শহরগুলিতে তাঁহারই ছাত্রদের দ্বারা যে তিনি আমদানী-রফতানীর কাজ করিতেন ইহাতে আশ্চর্য হওয়ার কিছুই নাই। ইমাম সাহেবের কারবারে অংশীদার হাফিজ ইবনে আবদুর রহমান, আবূ গানিম ইউনুস তাঁহারই ছাত্র ছিলেন। তাহারা ব্যতীত বুখারা, সমরখন্দ, হিরাত, বলখ ইত্যাদি শহরে ইমাম সাহেবের যে সমস্ত ছাত্র ছিল তাহাদের মধ্যে যে কিছু সংখ্যক লোক ব্যবসা-বাণিজ্য করিবে—ইহা অসম্ভব কথা নয়। ইমাম সাহেবের পিতা কোথাকার অধিবাসী ছিলেন এই সম্বন্ধে ঐতিহাসিকদের মধ্যে মতভেদ রহিয়াছে। আল-খাতীব প্রচোর শহর নাসা, আনবার এবং তারান্দের নাম উল্লেখ করত বাবেল শহরের দিকেই বেশী জোর দিয়াছেন।

আমার তো মনে হয়, এই সমস্ত শহরের সাথে ইমাম সাহেবের বিশেষ সম্বন্ধ ছিল, আর এই বিশেষ সম্পর্কের জন্যই লোকে প্রচার করিয়া দিয়াছে তাহার পূর্বপুরুষগণ ঐ সমস্ত শহরের অধিবাসী ছিলেন। হইতে পারে এই সমস্ত শহরে ইমাম সাহেবের কারবারী সম্পর্ক ছিল।

যাহা হউক ইমাম সাহেব কর্তৃক গৃহীত কারবারী নীতি যাহা ইতিহাসে লিপিবদ্ধ রহিয়াছে উহাকে অস্বীকার করার কোন কারণ আপাত দৃষ্টিতে পাওয়া যায় না।

ইমাম সাহেবের অপরিমিত মূলধন এবং কারবার সম্পর্কে বিস্তারিত ব্যাখ্যা

অবশ্য এখানে একটি চিত্তাকর্ষক প্রশ্নের উদয় হইতে পারে যে, এই বিরাট আকারের কারবারের জন্য বিরাট পরিমাণ মূলধনেরও প্রয়োজন।

ইমাম সাহেব একজন অনারব ছিলেন। সেই যুগে বিরাট ধন-সম্পত্তির মালিক তো আরব বংশোদ্ভব লোকেরাই ছিলেন। ইমাম সাহেব এই বিরাট পরিমাণ মূলধন কোথায় পাইলেন—যাহা দ্বারা তিনি মার্ভ, নিশাপুর, বাগদাদ এবং অন্যান্য শহরে তাঁহার কারবার সম্প্রসারিত করিয়া রাখিয়াছেন।

হযরত ইমাম যে অনারব ছিলেন সে সম্বন্ধে স্বয়ং তিনি একবার উক্তি করেন। যখন মনসুর তাঁহাকে কূফার কাযীর পদে নিয়োগ করার প্রস্তাব করিয়াছিলেন তখন উহা প্রত্যাখ্যান করিয়া তিনি বলিয়াছিলেন—"আমার পিতা একজন রুটি প্রস্তুতকারক ছিলেন। কূফাবাসী ইহা কখনও পছন্দ করিবে না যে একজন রুটি প্রস্তুতকারকের ছেলে তাহাদের কাযী নিযুক্ত হউক। (মুনাফিক, ১৬২ পৃষ্ঠা, ১ম জিলদ)

ইহার সাথে ইমাম সাহেবের দাদা সম্পর্কে এই বর্ণনাও উদ্ধৃত করা যাইতে পারে—

নওরোজের দিন ইমাম সাহেবের দাদা হযরত আলী (রাঃ)-এর খেদমতে কিছু ফালুদা পেশ করিয়াছিলেন। হযরত 'আলী (রাঃ) বলিয়াছিলেন—প্রত্যেক দিনই আমার জন্য নওরোজ। আবার কেহ বলেন—মেহেরজানের কার্যদিনে কিছু উপঢৌকন পেশ করায় হযরত 'আলী (রাঃ) বলিয়াছিলেন—আমার পক্ষে প্রত্যহ মেহেরজানের পর্বদিন। (আল-খাতীব ৩২৬ পৃঃ ১৩শ জিলদ)

এই উদ্ধৃতি হইতে বুঝা যায়, ইমাম সাহেবের দাদা একজন মর্যাদা সম্পন্ন লোক ছিলেন। কেননা খলীফা পর্যন্ত জানাশুনা থাকার জন্য অবশ্য কিছুটা পদ-মর্যাদাসম্পন্ন হওয়া দরকার। কিন্তু মর্যাদাসম্পন্ন হইলেই যে ধনশালী হইতে হইবে এমন কোন বাঁধা-ধরা নিয়ম নাই। যদি তিনি ধনশালীই হইতেন তাহা হইলে যে ধন-সম্পত্তির উপর নির্ভর করিয়া তিনি তাঁহার কারবার আরম্ভ করিয়াছিলেন তাহাতে পিতাকে রুটি প্রস্তুতকারক হিসাবে পরিচয় দেওয়ার কোন প্রয়োজন ছিল না। কোন কোন গ্রন্থে লিখিত আছে—ইমাম সাহেব তাঁহার পিতার পরিত্যক্ত সম্পত্তির ওয়ারিস হিসাবে দশ হাযার দিরহাম (বর্তমান যুগের দুই আড়াই হাযার টাকার সমান) পাইয়াছিলেন। এই সামান্য মূলধনের উপর নির্ভর করিয়া এত বিরাট কারবারের পত্তন করা অসম্ভব।

আমানত

তবে হাঁ ইমাম সাহেবের জীবনে আমরা এমন একটা বিশেষত্ব দেখিতে পাই যাহা দ্বারা এই সমস্যার সমাধান হইতে পারে। ইমাম সাহেবের

জীবন-চরিত রচয়িতাগণ বিভিন্ন স্থানে উল্লেখ করিয়াছেন যে, লোকে তাহাদের অর্থ ইমাম সাহেবের নিকট গচ্ছিত বা আমানত রাখিত।

হযরত যায়দ ইবনে 'আলী বনী উমাইয়াদের বিরুদ্ধে যখন বিদ্রোহ ঘোষণা করার সিদ্ধান্ত করেন তখন তিনি ইমাম সাহেবকেও তাঁহার সাথে শরীক হওয়ার আমন্ত্রণ করেন। ইমাম সাহেব তাঁহাকে আর্থিক সাহায্য দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়া নিজে অংশ গ্রহণ সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন—লোকের গচ্ছিত অর্থ আমাকে অংশগ্রহণ করিতে বাধা দিয়া রাখিতেছে। (আল-ফারুরী—২৫৫ পৃষ্ঠা)

ইমাম সাহেবের এই বাক্যেই আমার অন্তরে প্রথমত এই প্রশ্নের উদয় হইয়াছিল যে, ধর্মীয় এইরূপ প্রয়োজনের সময়ও কেন ইমাম সাহেব অংশ-গ্রহণ করেন নাই অথচ ইমাম সাহেব নিজেই বলিয়াছেন—

خروجه يضاهى خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر -

যায়দ ইবনে আলীর এই যুদ্ধ হুযুর (সঃ)-এর বদর যুদ্ধের সমান। এই বিষয়ে আরও দেখা যায় এই যুদ্ধে হযরত যায়দ ইবনে আলী শাহাদত বরণ করার পর যখনই তাঁহার বিষয় আলোচনা হইত তখনই ইমাম সাহেব কাঁদিয়া ফেলিতেন।

যুদ্ধের সাহায্য হিসাবে ইমাম সাহেব প্রথম কিস্তিতে দশ হাযার দির-হাম প্রেরণ করিয়াছিলেন। (মু'ফিক,৬০-৬১ পৃষ্ঠা)

এখন প্রশ্ন হইতে পারে যে প্রায়শ ঘটনাই এইরূপ আমানতের মাস-য়ালা উঠিতে পারে। যেমন হজ্জ বা অন্য কোন উদ্দেশ্যে কেহ বিদেশ যাত্রা করিলে তখন সে ব্যক্তি কোন বিশ্বাসী লোকের নিকট কিছু অর্থ আমানত রাখিয়া যায়। ইমাম সাহেবের নিকটও হয়ত এইরূপ কিছু আমানত ছিল। কিন্তু এরূপ সাধারণ আমানত রাখার দায়িত্ব পালনার্থে এমন দায়িত্বশীল কাজে শরীক হওয়া হইতে কেন তিনি বিরত রহিলেন এবং ইহা কোন অসাধারণ কারণও হইতে পারে না। মনে করুন, যেমন এই বর্ণনায়ই আছে যে, ইমাম সাহেব বলিয়াছেন—কাযী ইবনে আবূ লায়লাকে আমি এই অর্থ গচ্ছিত রাখার জন্য বার বার অনুরোধ করায়ও তিনি স্বীকৃত হইলেন না। কিন্তু কূফার মত বিরাট শহরে আরও এমন বহু বিশ্বাসী লোক ছিলেন যাঁহাদের নিকট সেই অর্থ গচ্ছিত রাখিয়া জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহ্‌তে অংশগ্রহণ করয়া সৌভাগ্যশালী হইতে পারিতেন।

এই প্রকার প্রশ্ন যখন আমার মনে উদয় হইতে লাগিল তখন এই গচ্ছিত অর্থের প্রকার ও পরিমাণ কি ছিল সে সম্বন্ধে অনুসন্ধান আরম্ভ করিলাম। অনুসন্ধানের পর যাহা আমার দৃষ্টিতে আসিল উহা দেখিয়া বিস্ময়াভিভূত হইয়া পড়িলাম। আর আমি ইহাও বুঝিতে পারিলাম যে, এই বিরাট কারবার পরিচালনা করার জন্য যে মূলধনের প্রয়োজন ছিল,—তিনি উহা কোথায় পাইলেন?

আমানতের পরিমাণ

অন্যান্য লেখক শুধু ইহাই লিখিয়া যবনিকা টানিয়া দিয়াছেন যে, ইমাম সাহেবের নিকট লোকে তাহাদের অর্থ গচ্ছিত রাখিত। কিন্তু এই আমানতের পরিমাণ ও প্রকার সম্বন্ধে সকলেই নীরব। ইমাম সাহেবের জীবন-চরিত রচয়িতাগণ সকলেই একবাক্যে বলিয়াছেন ঃ

مات ابو حنيفة وهي بيته للناس ودائع خمسين الف الف -

ইমাম সাহেবের মৃত্যুর পর দেখা গেল তাঁহার গৃহে তখন লোকের গচ্ছিত অর্থের পরিমাণ ছিল পাঁচ কোটি দিরহাম।

স্মরণ রাখিতে হইবে যে, ইমাম সাহেবের মৃত্যুর পর তাহার গৃহে লোকের গচ্ছিত অর্থের পরিমাণ ছিল আট কোটি। আর একথাও মনে রাখিতে হইবে যে, তিনি পরিণত বয়সে অর্থাৎ সত্তর বৎসর বয়সের সময় ইনতিকাল করিয়াছিলেন।

ইমাম সাহেবের ন্যায় একজন সতর্ক ব্যক্তি সম্বন্ধে যদি এই ধারণা করা হয় যে, তিনি তাহার বৃদ্ধাবস্থায় খেয়াল করিয়া যতদূর সম্ভব লোকের গচ্ছিত অর্থ ফিরাইয়া দিয়াছিলেন তবে উহা অনর্থক ও ভিত্তিহীন হইবে না। চরিত্রবান ও সৎ স্বভাবসম্পন্ন ব্যক্তিগণই যদি নিজেদের বৃদ্ধাবস্থার কথা চিন্তা করিয়া এমন কাজ করিতে পারেন তবে ইমাম সাহেবের ন্যায় লোকের পক্ষে কেনই বা সম্ভব হইবে না? সুতরাং আমার ধারণা অন্যান্য গচ্ছিত অর্থ ফেরত দেওয়ার পরও তাহার নিকট এই পাঁচ কোটি রহিয়া গিয়াছিল। যদি না দিয়াও থাকেন তবু, সেই যুগে একজন লোকের নিকট অন্যের এই পরিমাণ অর্থ আমানত থাকা একটুখানি কথা নয়। আমাদের যুগে টাকার যে এত ছড়াছড়ি তবুও এমন কোন লোক পাওয়া যাইবে কি যাহার নিকট এই পরিমাণ অর্থ লোকে আমানত রাখে।

যাহা হউক আমার তো এই ধারণা যে, ইহার চেয়ে বেশী পরিমাণ অর্থও ইমাম সাহেবের নিকট আমানতস্বরূপ থাকিত। তাঁহার জীবদ্দশায়

যে সমস্ত লোক কূফার বাহিরে ছিল এবং যাহাদের আমানতের টাকা তিনি দিয়া যাইতে পারেন নাই অথবা অপ্রাপ্ত-বয়স্কদের আমানত শুধু তাহারই পরিমাণই ছিল পাঁচ কোটি।

মু'ফিক বলেন—"একজন তেলী (তৈল ব্যবসায়ী) ইমাম সাহেবের নিকট এক লক্ষ সত্তর হাযার দিরহাম আমানত রাখিয়াছিলেন।" একজন তেলী (তৈল ব্যবসায়ী) যখন এই পরিমাণ বিরাট অঙ্কের পরিমাণ জমা রাখিতে পারে তখন অন্যান্য ধনবানের আমানতের পরিমাণ কি হইতে পারে তাহা সহজেই অনুমেয়। পরিতাপের বিষয়! ঐতিহাসিকগণ এই বিষয়ে সবিস্তার আলোচনা না করিয়া শুধু ঘটনা প্রসঙ্গে অল্প বিস্তর আলোচনা করিয়াছেন। এইরূপ আরও অনেক বিচ্ছিন্ন ঘটনা পাওয়া যায়। কিন্তু আমার উদ্দেশ্য সাধনের জন্য উপরোক্ত বর্ণনাগুলি যথেষ্ট অর্থাৎ ইমাম সাহেবের নিকট লোকে কোটি কোটি দিরহাম আমানত রাখিত। ফিকাহ ও হাদীসের প্রসিদ্ধ ইমাম ওয়াকী ইবনে জারাহ্ বলিতেন—"ইমাম আবু হানীফা একজন বড় আমানতদার ছিলেন।"

নির্ভরতার কারণ

জনসাধারণের সাথে ইমাম সাহেব কিরূপ ব্যবহার করিতেন সেই সম্বন্ধে কাযী আবু ইউসুফ বলেন--কোন অভাবগ্রস্ত বা সমস্যা-জর্জরিত লোক ইমাম সাহেবের নিকট নিজের অভাব বা সমস্যার কথা জানাইয়া হতাশ হইয়া ফিরিয়া যায় নাই। (মুফিক, ২৫৭ পৃঃ, ১ম জিলদ)

কোন অপরিচিত লোকও যদি তাহার দরবারে আসিয়া বসিত এবং দরবার ভঙ্গের পর কোন কথা না বলিয়া যাওয়ার জন্য উঠিয়া দাঁড়াইত তখন তিনি নিজে তাহার আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করিতেন; তাহার কোন প্রয়োজন হইলে উহা সমাধান করিয়া দিতেন। কাহারও কোন প্রকার অসুস্থতার কথা শুনিলে তাহার নিকট উপস্থিত হইয়া সেবাশুশ্রূষা করিতেন এবং আশা-ভরসার কথা শুনাইতেন।

এই প্রকার ব্যবহারের জন্যই ইমাম সাহেব সর্বজনপ্রিয় হইয়াছিলেন এবং সকলে তাঁহাকে বিশ্বাস করিত।

সপ্তম অধ্যায়

প্রতিবেশীর সাথে সদ্ব্যবহারের একটি ঘটনা

এই সম্পর্কে কোন কোন ঘটনা এমন যে, ইহা শুনিলে গল্প বা রূপকথা বলিয়া সন্দেহ হয়। ইমাম সাহেবের জীবনী রচয়িতাগণ যে সমস্ত ঘটনা বলিয়াছেন—উহার একটি সংক্ষিপ্তসার এখানে উল্লেখ করিতেছি।

কূফা শহরে একজন ধনশালী লোক কালের আবর্তন-বিবর্তনে একেবারে কপর্দকহীন হইয়া পড়েন। কিন্তু তিনি ব্যক্তিত্বসম্পন্ন লোক হওয়ায় কাহারও নিকট নিজের দৈন্য প্রকাশ না করিয়া অতি কষ্টে কালাতিপাত করিতেছিলেন। একদিন তাহার একটি ছোট মেয়ে তাজা শশা দেখিয়া মায়ের নিকট দৌড়াইয়া আসিল এবং শসা কিনিতে পয়সা চাহিল। কিন্তু বেচারী মা কোথা হইতে পয়সা দিবেন। বাবা বসিয়া বসিয়া এই তামাশা দেখিতেছিলেন। অশ্রুতে তাহার দু'চোখ ভরিয়া আসিল এবং ভাবিলেন এখন কাহারও নিকট কিছু সাহায্য চাওয়া দরকার। ঐতিহাসিকগণ বলেন—

وقصد مجلس البركة وهو مجلس ابو حنيفة -

"অবশেষে তিনি মজলিসে বরকতে যাওয়ার মনস্থ করিলে। ইমাম আবু হানীফার দরবারের নাম ছিল মজলিসুল বরকত।"

কূফার ইমাম সাহেবের মজলিস বরকতের মজলিস নামে সুপ্রসিদ্ধ ছিল। পার্থিব বা পারলৌকিক যে কোন বিষয়ই হউক না কেন সেখান হইতে কিছু না লইয়া কোন লোক খালি হাতে ফিরিত না।

সেই ব্যক্তি ইমাম সাহেবের দরবারে পৌঁছিলেন। কিন্তু যে ব্যক্তি কোন দিন কাহারও নিকট দৈন্যের হাত প্রসারিত করেন নাই আজও তিনি বলি বলি করিয়াও কিছু বলিতে পারিলেন না। অবশেষ কিছু না বলিয়াই তিনি চলিয়া গেলেন।

কিন্তু ইমাম সাহেবের দৃষ্টি এড়াইল না। তিনি মনে করিলেন, এই ব্যক্তি কিছু বলার প্রয়োজনে আসিয়া থাকিলেও ভদ্রতার খাতিরে কিছু না বলিয়াই চলিয়া গেল। ইমাম সাহেব তাঁহার পিছনে পিছনে গিয়া তাহার বাড়ী চিনিয়া আসিলেন। রাতে পাঁচশত দিরহামের একটি থলি হাতে করিয়া তাঁহার বাড়ী উপস্থিত হইয়া দ্বারে আঘাত করিলেন। খুব অন্ধকার ছিল। গৃহস্বামী বাহির হইয়া আসিলেন। ইমাম সাহেব গৃহদ্বারে থলিটি রাখিয়া

এই বলিতে বলিতে চলিয়া আসিলেন, "দেখ তোমার গৃহদ্বারে একটি থলে —ইহা তোমারই জন্য।"

গৃহস্বামী থলিটি উঠাইয়া লইলেন, কিন্তু কে দিয়া গেল তাহাকে চিনিতে পারিলেন না। বাড়ীর মধ্যে গিয়া দেখিলেন—পাঁচশত দিরহামের সাথে এক টুকরা কাগজে লেখা রহিয়াছে—

"আবু হানীফা এই অর্থ লইয়া আসিয়াছিল, ইহা হালাল উপায়ে অর্জিত হইয়াছে। প্রয়োজনবোধে তুমি ইহা খরচ করিয়া তৃপ্তি লাভ কর।"

কাযী আবু ইউসুফ তাঁহার সম্বন্ধে বলিয়াছেন—

ইমাম সাহেব তাঁহার পরিচিত লোকদের সাথে সদ্ব্যবহার করিতেন। তিনি অভাবগ্রস্ত লোকদের আশরাফী দান করিতেন। কিন্তু অন্যের সম্মুখে উহার জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশকালে দুঃখিত হইতেন এবং একথাও বলিতেন যে—এই জীবিকা আল্লাহ তোমাদের নিকট পেঁছাইয়াছেন। তোমরা আল্লাহ্‌র রসুলের এই হাদীস শুন নাই।

انما انا خازن اضع حيث امرت -

আমি তো খাজাঞ্চী মাত্র। যেখানে আদেশ করেন সেখানেই রাখিয়া দিই।

উপঢৌকন

লোককে উপঢৌকন দেওয়ার স্বভাব ইমাম সাহেবের খুব ছিল। সুফইয়ান ইবনে উয়াফনিয়া বলেন—"ইমাম আবু হানীফার উপঢৌকন এত প্রচুর পরিমাণে আমার নিকট আসিত যে, আমি উহার আধিক্য দেখিয়া ঘাবড়াইয়া যাইতাম।"

কথিত আছে, ইবনে উয়ায়নিয়া কোন এক ব্যক্তির নিকট এই সম্বন্ধে অভিযোগ করিলে সেই ব্যক্তি বলিয়াছিলেন—"সাঈদ ইবনে আবু আরাবা-হর নিকট ইমাম সাহেব যে পরিমাণ উপঢৌকন পাঠান আপনি উহা দেখিলে—আল্লাহ্‌ই জানেন, আপনি না জানি কি বলিতেন।" অতঃপর সে ব্যক্তি বলিলেন—ইমাম সাহেব যথোপযুক্ত উপঢৌকন এবং সদ্ব্যবহার করা ব্যতীত তাঁহার নিকট আগত কোন মুহাদ্দিসকে বিদায় করিতেন না।"

তাঁহার আরও একটি নিয়ম ছিল তাঁহার নিকট কেহ কোন উপঢৌকন পাঠাইলে তিনি উহার চেয়ে মূল্যবান এবং ভাল উপঢৌকন

পাঠাইয়া দিতেন। একবার কোন এক ব্যক্তি তিন দিরহাম মূল্যের কোন বস্তু তাহার নিকট পাঠাইলে তিনি উহার পরিবর্তে পঞ্চাশ দিরহাম মূল্যের এক টুকরা রেশমী কাপড় পাঠাইয়া দিয়াছিলেন।

আলিম ও মুহাদ্দিসদের খেদমত

এই সম্পর্কেও ইমাম সাহেবের জীবন-চরিত রচয়িতাগণ সবিশেষ আলোকপাত করিয়াছেন। ইমাম সাহেবের সাধারণ নিয়ম ছিল—প্রত্যেক বৎসর নির্দিষ্ট মূল্যের কিছু পণ্যদ্রব্য কূফা হইতে বসরা প্রেরণ করিতেন এবং বাগদাদ হইতে আনাইয়া কূফায় বিক্রি করিতেন। উহাতে যাহা মুনাফা হইত প্রথমত উহা দ্বারা কূফার মুহাদ্দিসদিগকে খানাপিনায় আপ্যায়িত করিতেন এবং পোশাক-পরিচ্ছদ দান করিতেন। উহার পর যে মুনাফা ও মূলধন অবশিষ্ট থাকিত উহাও তাহাদের মধ্যে বন্টন করিয়া দিবার সময় বলিতেন—

আপনাদের প্রয়োজনমত খরচ করুন এবং আল্লাহ্ ব্যতীত আর কাহারও নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিবেন না। কেননা আমি আমার ধন-দৌলতের কিছুই আপনাদিগকে দিতেছি না। বরঞ্চ আপনাদের সম্বন্ধে আমার উপর আল্লাহ্র অনুগ্রহ হইয়াছে এবং ইহা আপনাদের মূলধনেরই মুনাফা আপনাদের নাম করিয়া যে মূলধন বিনিয়োগ করিয়াছিলাম ইহা উহারই মুনাফা।" (মুফিক, ২৬২ পৃঃ)

উক্ত ঘটনায় মনে হয়, যাকাতের যে পরিমাণ অর্থ বাহির হইত সম্ভবত যাকাত দেওয়ার পূর্বে আরও বর্ধিত করার মানসে উহাকে মূলধন করিয়া কারবারে লাগাইয়া দিতেন। এই জন্যই বলিতেন—"ইহা আপনাদের মূলধনেরই মুনাফা—আমার কিছুই নয়।" কূফার নেতৃস্থানীয় আলিম ইমাম সাহেবের সমসাময়িক লোক আবূ জাফর মনসূর যাহাকে ইমাম সাহেবের কাযীর পদ গ্রহণ করার জন্য আহবান করিয়াছিলেন সেই বুযুর্গ মা'সার ইবনে কুদাম বলেন,—

ইমাম সাহেবের নিয়ম ছিল তাঁহার সন্তানাদির যে বস্ত্র খরিদ করিতেন —'আলিম ও বুযুর্গদের জন্য অবশ্য সেই বস্তু খরিদ করিতেন। নিজের জন্য যখন যেরূপ পোশাক তৈরী করাইতেন আলিমদের জন্য তখন সেইরূপ পোশাক তৈরী করাইতেন। যে মৌসুমের যে ফল নিজের পরিবারবর্গের জন্য ক্রয় করিতেন আলিমদের জন্যও অবশ্য উহা ক্রয় করিতেন।

'আলিম ও অন্যান্যদের জন্য বাজারের শ্রেষ্ঠ জিনিস ক্রয় করিতেন। কিন্তু নিজের বা পরিবারবর্গের জন্য যাহা কিছু ক্রয় করিতেন তাহার ভাল-মন্দের প্রতি মোটেই ভ্রূক্ষেপ করিতেন না।

ফকীর ও অভাবগ্রস্থদের সাথে সদ্ব্যবহার

'আলিম ও মুহাদ্দিসগণ ছাড়াও ফকির-দরবেশ ও গরীবের সাথে সর্বদা সদ্ব্যবহার করিতেন। পুত্র হাম্মাদকে আদেশ দিয়া রাখিয়াছিলেন-প্রত্যহ দশ দিরহামের রুটি ক্রয় করিয়া গরীবদিগকে দান করিবে। ইমাম সাহেব যখন খাইতে বসিতেন তখন রুটি তরকারী গরীবদের জন্য পাঠাইয়া দিতেন

ছাত্রদের সাথে ব্যবহার

ইমাম সাহেব তাঁহার ছাত্র সম্প্রদায় এবং সাথীদের সাথে কিরূপ ব্যবহার করিতেন ? বর্তমান জগতে ছাত্র-শিক্ষক যে সম্পর্ক গড়িয়া উঠিয়াছে উহা সত্যই দুঃখজনক ও লজ্জার বিষয়। ছাত্রদের সাথে সম্পর্ক সম্বন্ধে বর্ণিত আছে—

"ইমাম সাহেব গোপনে প্রত্যেক ছাত্রদের অবস্থা অবগত হইতেন। কোন প্রয়োজন থাকিলে তাহা মিটাইয়া দিতেন। তাহাদের মধ্যে কেহ অসুস্থ হইলে বা তাহাদের পিতা-মাতা কেহ রোগাক্রান্ত হইলে তাহাদের তত্ত্ব তালাশী করিতেন বা কেহ মারা গেলে তাহার জানাযায় শরীক হইতেন। বিপদাপন্ন হইলে সাহায্য করিতেন।" তাঁহার ছাত্রগণ তাহার সদ্ব্যবহার সম্বন্ধে যে বর্ণনা দিয়াছেন উহা পাঠ করিলে বিস্ময়াভিভূত হইতে হয়। বসরা দেশীয় ইউসুফ ইবনে খালিদ নামক একজন ছাত্র বলেন,—কোন একজন হাজী সাহেব একবার এক হাযার জুতা উপঢৌকন স্বরূপ প্রেরণ করেন। পরদিন দেখি ইমাম সাহেব তাঁহার পুত্রের জন্য বাজার হইতে জুতা ক্রয় করিতেছেন। ইহা দেখিয়া আমি বলিলাম, এখনও তো আপনার নিকট এক হাযার জোড়া জুতা রহিয়াছে তবে কেন আবার খরিদ করিতেছেন। ইমাম সাহেব বলিলেন-"আমার নিয়ম উপঢৌকনের বস্তু আমি আমার ছাত্র ও সাথীদের মধ্যে বণ্টন করিয়া দিই।"

এই ইউসুফ ইবনে খালিদই বলেন—প্রত্যেক শুক্রবার ইমাম সাহেব ছাত্রদিগকে দাওয়াত করিয়া খাওয়াইতেন। নিয়ম ছিল—শুক্রবার বিভিন্ন রকমের আহার্য বস্তু তৈয়ার করাইতেন। কিন্তু নিজে তাহাদের সাথে খাইতে

বসিতেন না। বলিতেন "তোমাদের লৌকিকতা দূর করিবার জন্যই আমি তোমাদের সাথে আহারে অংশ গ্রহণ করি না।"

ইহা ছাড়াও প্রত্যেকটি পর্ব উপলক্ষে প্রত্যেক ছাত্রের সাথে ভাল ব্যবহার করিতেন এবং প্রত্যেককে তাহার মর্যাদা অনুযায়ী উপঢৌকন দিতেন। (মুফিক, ২৫৯, পৃঃ ১ম জিলদ)

ছাত্রদের মধ্যে যাহাদের প্রয়োজন হইত বিবাহ করাইয়া দিতেন এবং বিবাহের যাবতীয় খরচ নিজে বহন করিতেন।

ইহা ছাড়া ছাত্রদিগকে তিনি মাসিক বৃত্তি দান করিতেন। ভিন্ন ভিন্ন ভাবে ইমাম সাহেব প্রত্যেক ছাত্রের সাথে সহৃদয় ব্যবহার করিতেন এবং তাহারা যাহা বর্ণনা করিয়াছে উহার তালিকা অনেক দীর্ঘ। কাযী ইউসুফের বর্ণনায়ই অনুমান করা যায় যে, তিনি বলিয়াছেন—দীর্ঘ বিশ বৎসর পর্যন্ত তিনি আমার এবং আমার পরিবারের খরচ বহন করিয়াছেন। (মুজিম, ১৭১ পৃঃ ২য় জিলদ)

হাসান ইবনে যিয়াদ নামক ইমাম সাহেবের একজন প্রিয় ছাত্র বলেন, —আমি ইমাম সাহেবের নিকট অধ্যয়ন করিতাম। আমার পিতা একদিন ইমাম সাহেবের নিকট আসিয়া বলিলেন,…'হুযুর ! আমার কয়েকটি মেয়ে আছে। ছেলেদের মধ্যে একমাত্র হাসান। আপনি তাহাকে বুঝাইয়া বলুন, সে যেন আমার বোঝা লাঘব করিবার জন্য কিছু উপার্জনের চেষ্টা করে।'

তারপর ইমাম সাহেব আমাকে ডাকিয়া বলিলেন,—'হাসান' তোমার পিতা আসিয়া আমাকে এই কথা বলিয়া গিয়াছেন। তুমি লেখাপড়া করিবে আর কোন আলিম না খাইয়া মরিবেন ইহা আমি দেখিতে পারিব না।'

ইহার পর ইমাম সাহেব আমার লেখা-পড়া শেষ না হওয়া পর্যন্ত আমাকে প্রত্যেক মাসে বৃত্তি দিতেন। (মুফিক, ২৬৪ পৃঃ ১ম জিলদ)

জনপ্রিয়তা বলুন আর সকলের ভালবাসা লাভ করাই বলুন দানশীলতার চেয়ে অধিক প্রতিক্রিয়ামন্ডিত ব্যবস্থা আর কিছুই নাই। এমন মহান ব্যক্তিদিগকে শুধু উপকৃত লোকেরাই ভালবাসে না বরং সকলেই সমানভাবে ভালবাসে। উপকৃত লোকেরা কেন ভালবাসে সে কথা তো প্রকাশ্যই। আর যাহারা কখনও উপকৃত হয় নাই তাহাদের আশা থাকে প্রয়োজনবোধে আমরাও উপকৃত হইব। এই আশায়ই মানুষকে এমন সব ব্যক্তির প্রতি টানিয়া লইয়া যায়।

ইমাম সাহেবের দানশীলতা সম্পর্কে শাকীক বলখীর বর্ণনা

ইমাম সাহেবের দানশীলতার হাযার ঘটনার মধ্যে উদাহরণস্বরূপ পূর্বে মাত্র কয়েকটি ঘটনা উল্লেখ করা হইয়াছে। এই সমস্ত ঘটনার প্রতি খেয়াল করিলে সহজেই বুঝা যাইবে যে, ইমাম সাহেবের প্রতি কেন লোকের এমন আস্থা ও নির্ভরশীলতা ছিল। ইমাম সাহেব সম্বন্ধে যে সমস্ত ঘটনা ঐতিহাসিকগণ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন উহা পাঠ করিলে বিস্ময়াভিভূত না হইয়া পারা যায় না। চিন্তা করি আস্থা ও নির্ভর করা ব্যতীত এই প্রকার লোকের সাথে অন্য আর কোন্ প্রকার ব্যবহার করা যাইত ?

তৎকালীন প্রসিদ্ধ সাধক ও মহান বুযুর্গ হযরত শাকীক বলখী নিজে একটি ঘটনা বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি বলেন—"একদিন আমি ইমাম আবূ হানীফার সাথে যাইতেছিলাম। এমন সময় দেখিলাম দূর হইতে এক ব্যক্তি আমাদের দিকেই আসিতেছে। কিন্তু আমাদিগকে দেখামাত্রই অন্য আর একটি গলির দিকে চলিতে আরম্ভ করিল। আমি বিষয়টা তত লক্ষ্য না করিলেও ইমাম সাহেব সেই ব্যক্তিকে ডাকিয়া বলিলেন—"যে পথে তুমি আসিতেছিলে সে পথেই আস অন্য পথে আবার কেন যাইতেছ ?" ইমাম সাহেবের কথা শুনিয়া সে দাঁড়াইয়া গেল। ইত্যবসরে আমরাও তাহার নিকট গেলাম। দেখিলাম সে যেন লজ্জিত।

ইমাম সাহেব বলিলেন—"তুমি কেন পথ পরিবর্তন করিলে ?" সে ব্যক্তি বলিল—"আপনার পাওনা দশ হাযার দিরহাম এখনও আমি পরিশোধ করিতে পারি নাই এবং বর্তমানে পরিশোধ করার ক্ষমতাও আমার নেই। কোন মুখে আপনার সামনে দাঁড়াইব, তাই অন্য পথে চলিয়া যাইতেছিলাম।"

ইমাম সাহেব বলিলেন—"সুবহানাল্লাহ্ ! এই সামান্য কারণে তুমি রাস্তা পরিবর্তন করিয়া আমার নিকট গোপন থাকিতে চাহিতেছ। যাও আমি উহা মাফ করিয়া দিলাম।"

দশ টাকা বিশ টাকা নয়—দশ হাযার দিরহাম বিনা দ্বিধায় কোন প্রকার চিন্তা-ভাবনা না করিয়া মাফ করিয়া দিলেন। শুধু মাফ করাই নয় তারপরও বলিলেন—"ভাই আমাকে দেখিয়া তোমার মনে যে লজ্জা ও ভয় সৃষ্টি হইয়াছে, আল্লাহর ওয়াস্তে আমাকে ক্ষমা করিয়া দাও।"
(মুনাফিক, ৩৬০ পৃঃ ১ম জিলদ)

যে ব্যক্তির সাথে ইমাম সাহেব এই আশাতিরিক্ত কাজ করিয়াছিলেন চিন্তা করুন তাহার অবস্থা কি হইয়াছিল। আর সেই যুগে যাহারা এই কাহিনী শুনিয়াছিল—তাহাদের অন্তরে ইমাম সাহেব কেমন আসন প্রতিষ্ঠা করিয়া রাখিয়াছিলেন ? অন্যের কথা বলিতে পারি না কিন্তু এই কাহিনী শুনিয়া আমার শরীরের সূক্ষ্ম লোমই তো দাঁড়াইয়া গিয়াছে।

আপনিই বলুন, নিজেদের অর্থ গচ্ছিত রাখার জন্য ইমাম সাহেবের চেয়ে নির্ভরশীল লোক আর কোথায় পাওয়া যাইত ? কোন বিশেষ স্তরের লোকের সাথেই তিনি এইরূপ ব্যবহার করিতেন না ; বরং সকল স্তরের লোকই তাহার নিকট সমান ব্যবহার পাইত। ইমাম সাহেব একজন পাক্কা সুন্নী ছিলেন—অথচ শিয়াদের সাথে কখনও রূঢ় ব্যবহার করিতেন না।

সহনশীলতা

ইমাম সাহেবের এই ধরনের বদান্যতা ও জনপ্রিয়তা দেখিয়া কিছু সংখ্যক লোকের মনে ঈর্ষা সৃষ্টি হইয়া গিয়াছিল। এই ঈর্ষাপরায়ণ লোকেরা সময় সময় ইমাম সাহেবের পিছনে শহরের সেরা গুন্ডাদিগকে লেলাইয়া দিত এবং তাহারা ইমাম সাহেবকে গালাগালি করিত। কিন্তু এমন কোন দৃষ্টান্ত আজ পর্যন্ত পাওয়া যায় নাই যে, তজ্জন্য ইমাম সাহেব তাহাদের সাথে রূঢ় ব্যবহার করিয়াছেন।

একবার এক গুন্ডা ইমাম সাহেবকে গালি দিতে দিতে তাঁহার পিছনে পিছনে যাইতেছিল। সে ইচ্ছা করিতেছিল ইমাম সাহেবও গালির পরিবর্তে কিছু বলুন। কিন্তু ইমাম সাহেব মাথা নীচু করিয়া পথ চলিতে চলিতে বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিলেন। গুন্ডা তাঁহার ব্যবহারে বিরক্ত হইয়া বলিল—"আমাকে কি ঘেউ ঘেউকারী কুকুর মনে করিলে যে, আমার কথার কোন উত্তর দিলে না ?"

ইমাম সাহেব মৃদুস্বরে বলিলেন—"ইহার চেয়ে বেশী আর কি মনে করিব !"

অনুরূপ আর একটি ঘটনায় ইমাম সাহেব গৃহদ্বারে পৌঁছিয়া বলিলেন, —'লও ভাই ! আমি তো বাড়ীর মধ্যে চলিয়া যাইব' তোমার সাধ না মিটিলে আরও বল—আমি দাঁড়াইলাম।'

এই প্রকার উত্তরের যে কি পরিণতি হয় উহা ইমাম সাহেবের বেলায় ঘটিত অর্থাৎ এইরূপ অন্যায়কারী নিজের ব্যবহারে লজ্জিত হইয়া তওবা করিত।

প্রতিবেশীর সাথে সদাচার

একজন মুচি ইমাম সাহেবের প্রতিবেশী ছিল। দিনভর বাজারে কাজ করিয়া পানাহারের বস্তু লইয়া সে রাত্রে বাড়ীতে প্রত্যাবর্তন করিত। সারা রাত নেশার অবস্থায় হৈ-হাঙ্গামা করিত বহু বার এই কবিতাংশটি পাঠ করিত—

اضاعونى وانى فتى اضاعوا - ليوم كريهة وسداد ثغر -

'লোকে আমাকে ধ্বংস করিয়া ফেলিল। আর এমন একজন নওজোয়ানকে ধ্বংস করিল যে সংকটের দিনে এবং সীমান্ত রক্ষার ব্যাপারে কাজে আসিত।'

লোকে তাহার হৈ-হাঙ্গামা সহ্য করিতে না পারিয়া তাহাকে কোতওয়ালের হাওয়ালা করিল। সে তাহাকে জেলখানায় আবদ্ধ করিল। পর রাত্রে ইমাম প্রতিবেশী মাতালের মাতলামী শুনিতে না পাইয়া সমস্ত বিষয় অবগত হইলেন। মাতাল প্রতিবেশী কারাগারে আবদ্ধ শুনিয়া তিনি দুঃখিত হইলেন এবং তাহাতে মুক্ত করিয়া আনার জন্য পরদিন আদালতে উপস্থিত হইলেন। আদালতের হাকিম ইমাম সাহেবের আগমন বার্তা পাইয়া দৌড়াইয়া আসিয়া তাঁহাকে ভিতরে লইয়া গিয়া তাঁহার আগমন হেতু জিজ্ঞাসা করিলেন।

ইমাম সাহেব আগমন হেতু বর্ণনা করিয়া বলিলেন—"এইবার তাহাকে যিম্মাদারীতে ছাড়িয়া দেওয়া হউক।"

একজন ফাসিকের প্রতি ইমাম সাহেবের দয়া দেখিয়া হাকিমের বিস্ময়ের অবধি রহিল না। মুচিকে মুক্ত করিয়া দেওয়া হইল। মুচি বাহির হইয়া আসিলে ইমাম সাহেব তাহার হাত ধরিয়া বলিলেন—

"কেমন ভাই! আমি তোমাকে ধ্বংস হইতে দিলাম না।"

মুচি মাথা নীচু করিয়া বলিল—"হে আমার নেতা! হে আমার মনিব! যাহাতে আপনার কষ্ট হয় আমি জীবনে আর এমন অন্যায় করিব না।"

কথিত আছে, সেই মুচি তওবা করিল এবং ইমাম সাহেবের সাহচর্যে থাকিয়া কালে কূফার একজন গণ্যমান্য ফকীহ্ হইয়াছিলেন।

যিম্মিদের প্রতি সদ্ব্যবহার

মুচি তো একজন মুসলমান ছিল। কিন্তু আমরা তো দেখি যে, ইমাম সাহেবের সদাশয়তার বর্ষণ হওয়ার জন্য ইসলাম গ্রহণ করা কোন শর্ত ছিল না। ইবনে বাশকায়ানের মতে 'মুজিম' এর গ্রন্থকার বলেন—

"ইমাম আবু হানীফা এক যিম্মীর (ইসলামী রাষ্ট্রে অমুসলিম প্রজা) জন্য আব্বাসী খলীফা আবু জাফর মনসুরের দরবারে একদিনে পাঁচ বার সুপারিশ করিয়া পাঠাইয়াছিলেন। প্রথম চারিবার তাহার সংবাদ বাহককে এবং পঞ্চম বারে নিজে উপস্থিত হইয়া তাহার কাজ করিয়া দিয়াছিলেন।" (মুজিম, ১৬৮ পৃঃ, ২য় জিলদ)

একজন যিম্মীর জন্য শত্রুর দরবারে সুপারিশ করা ইমাম সাহেবের ন্যায় প্রশস্ত হৃদয়ের অধিকারীরই কাজ; এখন চিন্তা করার বিষয় যে, এমন লোকের উপর মানুষের আস্থার মাত্রা যত উপরেই উঠুক না কেন উহাতে বিস্ময়ের কিছুই থাকিতে পারে না।

ক্ষমাশীলতা

ইমাম সাহেবের মধ্যে যে ক্ষমা ও গুণ ছিল আজকার লোক হয়ত উহা বিশ্বাস না-ও করিতে পারে। ইমামুল আয়িম্মা আবু বকর জানজায়ী বলেন—এক ব্যক্তি ইমাম সাহেবের নিকট আসিয়া বলিল—"হযরত! আমার এক বিশেষ প্রয়োজনে ক্ষমা করিবেন আপনার পক্ষ হইতে এবং আপনার উপর ভরসা করিয়া অমুক ব্যবসায়ীর নিকট পত্র দিয়াছিলাম যে, কর্জ হিসাবে ত্রিশটি আশরাফী পাঠাইয়া দাও। সে পাঠাইয়া দিয়াছে এবং উহা দ্বারা আমার প্রয়োজন সমাধা করিয়াছি।"

ইমাম সাহেব একথা শুনিয়া ক্রুদ্ধ হওয়ার পরিবর্তে নরম স্বরে বলিলেন—"এইভাবে যে উপকৃত হওয়া যায়—ইহা তো আমি জানিতাম না। আপনি যদি এ কাজ করিয়া উপকৃত হইয়া থাকেন তবে ধন্যবাদ।"

অনুরূপ আর একটি ঘটনার আবদুল মাহাসিন মারগীনানী বর্ণনা করিয়াছেন,—'ইমাম সাহেবের কোন পরিচিত লোক তাঁহার পক্ষ হইতে জুরজানের গভর্নরের নিকট চারি হাযার দিরহাম চাহিয়া পাঠাইয়াছিলেন। গভর্নর পত্র পাওয়া মাত্র চারি হাযার দিরহাম পাঠাইয়া দিলেন।' (মুনাকিব, ৪৬৫, পৃঃ ৩য় জিলদ)

ইমাম সাহেব এই কথা জানিতে পারিয়া প্রথমোক্ত ঘটনার ন্যায়ই বলিয়াছিলেন।

ইহা প্রশস্ত হৃদয়ের উদারতা ব্যতীত আর কি হইতে পারে ? ছোট-বড় নির্বিশেষে সকলের নিকট তিনি যে বড় আস্থাবান ছিলেন –এই ঘটনা দ্বারা উহাও প্রমাণিত হয়। সাধারণ একটি চিঠির উপর নির্ভর করিয়া একবার ত্রিশটি আশরাফী এবং আর একবার একজন গভর্নরের চারি হাযার দিরহাম দেওয়া একজন মানুষের প্রতি কতটা আস্থার ব্যাপার তাহা চিন্তাও করা যায় না।

পরিষ্কার লেনদেন

ইমাম সাহেবের ব্যবসায় সম্বন্ধে আমি পূর্বে বলিয়াছি যে, তাঁহার পণ্যদ্রব্যের মূল্য নির্ধারণ ছিল। এই সম্বন্ধে বর্ণিত আছে, ঘটনাক্রমে ইমাম সাহেব একদিন দোকানে উপস্থিত ছিলেন না। তাঁহার দোকানে একজন কর্মচারী কোন এক গ্রাহকের নিকট হইতে নির্ধারিত মূল্যের চেয়ে কিছু বেশী দামে কাপড় বিক্রয় করে। ইমাম সাহেব দোকানে আসিয়া হিসাব-কিতাবের পর দেখিলেন—বিক্রিত কাপড়ের দাম কিছু বেশী লওয়া হইয়াছে। তিনি কর্মচারীর দিকে রোষ-কষায়িত নেত্রে চাহিয়া বলিলেন—তোমরা লোককে ধোঁকা দাও, অথচ আমার সাথেই দোকানে থাক।"

কথিত আছে, সেই গ্রাহক ছিলেন মদীনাবাসী। কাপড় ক্রয় করার পর মদীনা চলিয়া গিয়াছিলেন। ইমাম সাহেব মনে করিলেন—এই অতিরিক্ত মূল্য ধোঁকা দিয়া লওয়া হইয়াছে। কারণ গ্রাহক জানিত, ইমাম সাহেবের দোকানে এক দাম। তাই যাহা চাহিয়াছে তাহা দিয়াই কাপড় লইয়া গিয়াছে। গ্রাহকের এই বিশ্বাস না থাকিলে মূল্য কমানোর জন্য নিশ্চয়ই সে দরদস্তুর করিত। তাই ইমাম সাহেব শুধু এই কাজের জন্য মদীনা চলিয়া গেলেন এবং ব্যাপারটা পরিষ্কার করিয়া আসিলেন।

ইহা তো ছিল একটি নীতির অনুসরণ। ইহা ছাড়াও বর্ণিত আছে—প্রায়শই লোক তাহাদের পণ্যদ্রব্য বিক্রয় করার জন্য ইমাম সাহেবের দোকানে আসিত। বিক্রেতা নিজের মুনাফা হিসাব করিয়াই দাম চাহিত। কিন্তু ইমাম সাহেব যদি মনে করিতেন ইহার দাম আরও বেশী হইতে পারে তবে তিনি বলিতেন—"না, তোমার জিনিস তো আরও বেশী দামের।" অতঃপর ইমাম সাহেব যে বেশী দাম বলিতেন, উহা গ্রহণ করার জন্য বিক্রেতাকে বাধ্য করিতেন।

ইমাম সাহেবের জীবনের এই সমস্ত ঘটনা পর্যালোচনার উদ্দেশ্য এই যে, লোকে তাঁহার নিকট যে বিরাট পরিমাণ অর্থ আমানত রাখিত উহাতে আমাদের বিস্ময়ের সৃষ্টি হয় যে, একজন লোকের নিকট এই পরিমাণ অর্থ কোন্ আস্থার বলে আমানত রাখিতে পারে ?

আমি মনে করি, যে সমস্ত ঘটনা আপনাদের সম্মুখে বলা হইল-উহার সম্বন্ধে গভীরভাবে চিন্তা করিলে বিস্ময় কাটিয়া যাইবে। যে ব্যক্তির লেন-দেন এত পরিষ্কার যাঁহার মহানুভবতা ও দয়া-দাক্ষিণ্য এত প্রশস্ত যে, তাঁহার নিকট পৃথিবীর সমস্ত সম্পদ আমানত রাখিতেই বা দ্বিধা কোথায় ?

ইহা তো গেল আস্থা, নির্ভরশীলতা এবং চারিত্রিক বিষয়। বিভিন্ন প্রমাণ সাপেক্ষে আমার মনে যে কথার উদয় হয় উহা যদি শুদ্ধ হয় তবে চারিত্রিক অবস্থা ব্যতীতও এক গুরুত্বপূর্ণ কানুনী আস্থার কারণও প্রতিষ্ঠা হয়। আর উহা দ্বারা ইহাও বুঝা যাইবে যে, উক্ত আমানতের প্রকার কি ছিল ? আমি যাহা বলিতে চাই উহা বলার পূর্বে হানাফী ফিকাহ্র একটি কানুন অবশ্য মানিয়া লইতে হইবে।

আমানত সম্পর্কে শরীয়তসিদ্ধ ব্যাখ্যা

একথা সকলেই অবগত যে, ঝগড়া-বিবাদ-ন্যায়-অন্যায়ের মীমাংসা করা ব্যতীতও—আরও কিছু সংখ্যক কাজ সম্পাদন করাও মুসলিম কাযীদের উপর ন্যস্ত ছিল। ইহার মধ্যে কাযীদের স্বীয় এলাকাস্থ য়াতীমদের সম্পত্তি হুকুমতের পক্ষ হইতে নিজের দায়িত্বে রাখিতেন। এই সম্বন্ধে ফিকাহ্র কিতাবে বহু জটিল বিষয়ের আলোচনা ও উহার সমাধান লিপি-বদ্ধ। উহাদের মধ্যে একটি এই যে, যে সম্পত্তি কাযীর তত্ত্বাবধানে থাকিত উহা কর্জস্বরূপ লাগাইতে পারিবে। কারণ যে সম্পদ আমানত রাখা যায় —উহা যদি ক্ষতি হইয়া যায় তবে কাযীর নিকট হইতে উহা আদায় করা যাইবে না। কিন্তু আমানতের পরিবর্তে যদি উহা কর্জস্বরূপ দেওয়া হয় তবে কর্জ গ্রহণকারী উহার যামিন হইবে এবং কোন প্রকারে ক্ষতি হইলে উহা আদায় করিতে পারিবে। হঠাৎ কোন প্রকার য়াতীমের সম্পত্তি নষ্ট না হইয়া যাওয়ার জন্যই এই পন্থা বাহির করা হইয়াছে। কাযীর আমানতী অর্থের আদায় সম্পর্কে অনেকটা নির্ভরশীল হওয়ার পর উহাকে কর্জ হিসাবে লাগানো হয়। য়াতীমের সম্পদ রক্ষা করাই হইল—এই নিয়মের প্রকৃত উদ্দেশ্য। অধিকন্তু সুদবিহীন কর্জের একটি পথও মুসলমানদের জন্য খোলা হইয়া গেল।

এই সম্পর্কে বহু সূক্ষ্ম ঘোর-প্যাঁচ থাকিলেও আমার ইহাও দেখানো উদ্দেশ্য যে, য়াতীমদের সম্পত্তি বিপদমুক্ত রাখার জন্য ইমাম সাহেব আমানত রাখার পরিবর্তে কর্জে রাখার নীতি প্রবর্তন করিয়াছিলেন। এই নীতি অনুসারে আমানত রক্ষক এক একটি পয়সা আদায় করিতে বাধ্য থাকিবে।

ইমাম সাহেব য়াতীমদের সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণের জন্য যখন এই নীতি প্রবর্তন করিয়াছিলেন—তখন অন্যান্য জনসাধারণের আমানতের ক্ষেত্রেও ইহার ব্যতিক্রম করেন নাই অর্থাৎ যাহারা আমানত রাখিত তাহাদিগকে একথা বলিয়া দেওয়া হয় যে—এই টাকা-পয়সা আমাকে কোন কারবারে লাগানোর অধিকার দেওয়া হউক। যদি মালিক অধিকার দেয় তবে সাথে সাথে উহা কর্জে পরিণত হয়। কর্জ শব্দ উল্লেখ করার কোন প্রয়োজন থাকে না। তদুপরি আমানতকারী যদি বলে—আমার লাভ-লোকসানের প্রয়োজন নাই, মূলধন পাইলেই হয়—তবে সে ক্ষেত্রে লাভ-লোকসান যাবতীয় কিছু আমানত-রক্ষকের দায়িত্বে থাকিবে।

আমার মনে হয়, ইমাম সাহেবের নিকট গচ্ছিত আমানতের প্রকার ইহাই ছিল আর এ বিরাট কারবারের মূলধন এই ভাবেই সংগ্রহ হইত। মানুষের অগাধ বিশ্বাস ছিল-তাই সকলের সম্পদই তাহার নিকট আনিয়া আমানত রাখিত। শুধু আমানত রাখিলে উহার নিরাপত্তা সম্বন্ধে কোন নিশ্চয়তা থাকে না তিনি কর্জস্বরূপ রাখিয়া একদিকে যেমন আমানতকারীকে তাহার সম্পদের নিরাপত্তা দেওয়া হইত, অন্যদিকে তেমনি ব্যাপক আকারে ব্যবসা-বাণিজ্য করার মূলধনও পাওয়া যাইত।

অষ্টম অধ্যায়

কাযী ইবনে আবী লায়লার আদালতে ইমাম সাহেব

বোধ হয় ইমাম সাহেবকে এই পন্থা অবলম্বন করিতে দেখিয়া সেই যুগের 'আলিম এবং ইমাম সাহেবের শত্রু ইবনে আবী লায়লা' যিনি নানা উপায়ে তাঁহাকে বিপদে জড়িত করিতে চেষ্টা করিতেন তিনি কুফার কাযী ছিলেন। একবার কোন এক ব্যক্তি কাযী ইবনে আবী লায়লার মধ্যস্থতায় কিছু অর্থ ইমাম সাহেবের নিকট আমানত রাখে। কাযী সাহেব উক্ত টাকার তোড়ায় নিজের সীল মোহর লাগাইয়া এই শর্ত আরোপ করিলেন যে, মালিকের আদেশ ব্যতীত এই অর্থ কোন কাজে লাগানো যাইবে না। কাযী সাহেব অথবা আমানতকারীর সন্দেহ ছিল যে, এই শর্ত আরোপ করা সত্ত্বেও ইমাম সাহেব এই অর্থ তাঁহার কাজে লাগাইবেন। আর এই সুযোগে ইমাম সাহেবকে বিপদে ফেলিয়া জিজ্ঞাসা করা হইবে যে, মালিকের অনুমতি ব্যতীত তিনি তাহার গচ্ছিত অর্থ কিভাবে কাজে লাগাইলেন?

ইহার কিছুদিন পরই কোন এক ব্যক্তি কাযী ইবনে আবী লায়লার আদালতে দরখাস্ত করিল যে, অমুকের গচ্ছিত অর্থ ইমাম সাহেব তাঁহার পুত্রকে কারবার করার জন্য দিয়াছেন। কাযী সাহেব তো এই সুযোগের অপেক্ষায়ই ছিলেন। তিনি তখনই ইমাম সাহেবকে আদালতে হাযির হওয়ার জন্য নোটিশ দিলেন। ইমাম সাহেব আদালতে হাযির হইলে বিবাদী পক্ষের দাবী শুনানো হইল।

ইমাম সাহেব পরিষ্কার ভাষায় অস্বীকার করিয়া বলিলেন—সেই টাকার তোড়ায় তো আপনারই সীল মোহর লাগানো রহিয়াছে। যদি আমি উক্ত অর্থ নিজের কাজে লাগাইয়া থাকি তবে সীল মোহর অবশ্যই ভাঙ্গা থাকিবে। আপনি আপনার লোক পাঠাইয়া আমার কথার সত্যতা প্রমাণ করিতে পারেন।

কাযী সাহেব লোক পাঠাইলেন। কিন্তু ইমাম সাহেবের ন্যায় একজন সতর্ক বয়স্ক ব্যক্তি কখনও এমন কাজ করিতে পারেন? কাযী সাহেবের প্রেরিত লোক বলেন—"লোকের আমানতের অর্থের তোড়ায় একটি ঘর পরিপূর্ণ ছিল। অনেক অনুসন্ধান করার পর নির্দিষ্ট তোড়াটি বাহির

করিলেন এবং উহাতে পূর্বকৃত সীল মোহর অক্ষত অবস্থায় ছিল।''

সেই ব্যক্তি ফিরিয়া আসিয়া কাযী সাহেবের নিকট রিপোর্ট পেশ করিলেন—'যে অর্থ সম্বন্ধে ইমাম সাহেবের নামে যে মোকদ্দমা দায়ের করা হইয়াছে উহা একেবারে মিথ্যা। তোড়ায় পূর্বৎ সীলমোহর অক্ষয় অবস্থায় রহিয়াছে।''

আদালত যে বিষয় পরিদর্শন করার জন্য লোক পাঠাইয়া ছিল ইহাতো তৎসম্পর্কীয় সাক্ষী। পরিদর্শনকারী রিপোর্টের সাথে ইমাম সাহেবের সাধুতা সম্পর্কে যে কথা যোগ করিয়াছিলেন উহাই প্রণিধানযোগ্য। তিনি লিখিয়াছেন—

وعنده من الاموال والودائع مالا يحتاج الى هذه —

''ইমাম সাহেবের নিকট অর্থ সম্পদ ও আমানতের এত আধিক্য যে—এই সামান্য পরিমাণ অর্থে হাত দেওয়ার তাঁহার কোন প্রয়োজনই থাকিতে পারে না।''

রিপোর্টের শেষে এই কথা সংযোজন করার অর্থ এই যে, কারবারে লাগানোর জন্য যাঁহার নিকট এই বিরাট পরিমাণ অর্থ মওজুদ থাকে তাঁহার পক্ষে আমানতের খেয়ানত করিয়া পুত্রকে অন্যের অর্থ দেওয়ার কি প্রয়োজন? ইহাতো শরীয়ত অথবা আইন—কোন মতেই সিদ্ধ নহে।

এই কথায় আমাদের নিকট আরও একটি বিষয় পরিষ্কার হইয়া যায় যে, সাধারণ ধন-সম্পদ এবং আমানত যাহা লোকে ইমাম সাহেবের নিকট জমা রাখিত উহা নিজের কারবারে লাগানোর জন্য বা প্রয়োজনবোধে খরচ করার আদেশ মালিকের নিকট হইতে গ্রহণ করিতেন। যদি তাহাই না হইত তবে বর্ণনাকারী الاموال (অর্থ সম্পদ)-এর সাথে الودائع (আমানত) শব্দ যোগ করিতেন না। এই জন্যই বর্ণনাকারী বলিয়াছেন—''কারবার করার জন্য যাহার নিকট এত ধন-সম্পদ ও আমানতের অর্থ মওজুদ থাকে তিনি কখনও এমন অর্থে হাত দেন না যাহা ব্যবহার করার অধিকার মালিক দেয় না।''

অধিকন্তু আমি ইহাও বলিতে চাই যে, সীলমোহরকৃত অর্থও কারবার করিবার জন্য ছেলের হাতে দিয়াছিলেন বলিয়া ইমাম সাহেবের বিপক্ষে আদালতে যে দাবী উত্থাপন করা হইয়াছিল—তাতে একথাও প্রমাণিত হয় যে, লোকে ইমাম সাহেবের নিকট যে কোন প্রকার অর্থই জমা রাখিত তিনি

স্বভাব সিদ্ধভাবে সকল অর্থই নিজের কারবারে বিনিয়োগ করিতেন। কিন্তু অজ্ঞের দল কখনও তলাইয়া দেখে নাই যে, ইমাম সাহেবের ন্যায় একজন সতর্ক ধার্মিক লোক কোন্ অর্থ কোন্ কাজে লাগানো যায় উহার তারতম্য না করিয়া কিভাবে উহা যদৃচ্ছা ব্যবহার করিতে পারেন? রিপোর্টের শেষ বাক্য—"ইমাম সাহেবের নিকট সাধারণ সম্পদ ও আমানতের অর্থের যে বিরাট পরিমাণ রহিয়াছে উহা তিনি কারবারে নিয়োগ করিতেন"—ইহা একটি ঐতিহাসিক সাক্ষ্য বহন করে। মনে হয় হানাফী ইমামদের মধ্যে আমানত সম্পর্কীয় আমানত ও জামানতের—এই প্রকার নীতির প্রচলন ছিল।

'আল-খতীব' বাগদাদের ইতিহাসে যদিও তাহার স্বভাব কাযী আবূ ইউসুফ (রঃ)-এর নীতি সম্পর্কে এবং উহার নিন্দাবাদে এই বর্ণনা করিয়াছেন, এক ব্যক্তি কাযী আবূ ইউসুফের সম্পর্কে বিরূপ সমালোচনা করিতে গিয়া বলিয়াছেন—তাহার বর্ণিত হাদীস এই জন্য রওয়ায়ত করা জায়েয নহে; কারণ—

انه كان يعطى اموال اليتامى مضاربة ويحمل الربح لنفسه -

"তিনি য়াতীমের সম্পত্তি 'মুযারিবাত'[১] হিসাবে লোকদিগকে দিতেন এবং তিনি নিজে উহার মুনাফা ভোগ করিতেন।"

অকল্যাণকামী সর্বদাই শুভকে অশুভ দৃষ্টিতে দেখিয়া থাকে বলিয়া প্রবাদের প্রচলন রহিয়াছে—উহা সত্য। যদি এই ঘটনা সত্য হয় তাহা হইলে সত্য হিসাবে তাহা বিশ্বাস করিতেও কোন অসুবিধা নাই; কারণ খতীব ইয়াযীদ ইবনে হারূনের ন্যায় একজন বুযুর্গ ও সতর্ক রওয়ায়েতকারী হইতে ইহা উল্লেখ করিয়াছেন—তাই আমার মনে হয় তিনি অযথা কোন এক অসত্য বর্ণনা ইমাম সাহেব সম্বন্ধে উল্লেখ করেন নাই। কিন্তু আসল কথা হইল এই পন্থা য়াতীমদের পক্ষে লাভজনক ছিল না ক্ষতিকর? পরিতাপের বিষয় যে, প্রতিপক্ষ গভীর জ্ঞানের অভাবে প্রকৃত রহস্য বুঝিতে সক্ষম হয় নাই। ইয়াযীদ ইবনে হারূনের ন্যায় একজন জ্ঞানবান্ লোকও সাধারণ লোকের ন্যায় ভুল বুঝিয়াছেন।

---

১. মুযারিবাত অর্থ একের মূলধন দ্বারা অন্যের কারবার করা, মুনাফা ব্যবসায়ী এবং পুঁজি বিনিয়োগকারীর মধ্যে নির্দিষ্টভাবে ভাগাভাগি করিয়া লওয়া।

আমি পূর্বেও বলিয়াছি যে, যদি শুধু আমানত হিসাবে য়াতীমের সম্পদ রাখা হয় এবং কোন কারণে উহা নষ্ট হইয়া গেলে আইন মুতাবিক উহা আদায় করার কোন পন্থা বাকী থাকে না। কিন্তু যদি 'মুযারিবাত' হিসাবে কাহাকেও দেওয়া হয় তবে মুনাফার বেলায় অবশ্য য়াতীমের উপকার হইবে। তবে একথাও সত্য যে, ব্যবসায়ে লাভ-লোকসান উভয়েরই সম্ভাবনা থাকে। লোকসানের ব্যাপারে লাভ তো দূরের কথা সময়ে মূলধনও শেষ হইয়া যায়। এই অবস্থায় য়াতীমের মাথার উপর আকাশ ভাঙিয়া পড়িবে। সুতরাং তাহার আসল যাহাতে নষ্ট না হইয়া যায় সে ব্যবস্থা করাই ভাল···তাই কাযী আবু ইউসুফ নিজে কর্জ হিসাবে রাখিয়া মুযারিবাত করিতেন। এই অবস্থায় লোকসান হইলেও আমানত ক্ষতি না হইয়া কর্জ ক্ষতি হয় এবং য়াতীমের সম্পত্তি কোন প্রকারে নষ্ট হয় না—কাযী সাহেব সেই অর্থ আদায় করার যিম্মা থাকিতেন। তাই যিনি ক্ষতিপূরণ করিবেন—তিনিই মুনাফার মালিক হইবেন। অন্যথায় লাভের অর্থ গ্রহণ করিয়া ক্ষতিপূরণ করার বেলায় অস্বীকার করিলে তাহা তো প্রকাশ্য সুদ।

আমরা বুঝিতে পারিতেছি না যে, ইয়াযীদ ইবনে হারুনের ন্যায় একজন বুযুর্গ ব্যক্তি কি চাহিয়াছিলেন? তিনি কি ইহাই চাহিয়াছিলেন যে, য়াতীমের সম্পত্তি কোন মতে নষ্ট হইয়া গেলে উহা যেন আর ফিরিয়া না পায়। অথবা এই ইচ্ছা ছিল যে, কাযী আবু ইউসুফ মুসলিম য়াতীম দিগকে সুদখোরে পরিণত করেন। পরে আমি দেখিলাম হাফিজ ইবনে হজর "লিসানুল মিযান" গ্রন্থে ইয়াযীদ ইবনে হারুনের বর্ণনা উদ্ধৃত করিয়া উহার ব্যাখ্যা করিয়াছেন—কাযী আবু ইউসুফ য়াতমীদের সম্পত্তি নিজে কর্জস্বরূপ গ্রহণ করিয়া অন্যকে কারবার করিতে মূলধন স্বরূপ দিতেন।" কিন্তু কি করিবেন—কাযী আবু ইউসুফ য়াতীমদের সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণের জন্য যে পন্থা অবলম্বন করিয়াছিলেন—উহাকে লোকে য়াতীমদের জন্য জুলুমস্বরূপ প্রমাণ করিয়াছে।

ব্যপকভাবে কারবারের সম্ভাবনা

প্রকৃতপক্ষে লোকে ইমাম সাহেবের জীবনের এই দিকটার প্রতি মোটেই খেয়াল করে নাই। অন্যথায় দেখিতে পাইত ব্যাপক আকারে কারবারের জন্য ইমাম সাহেব একটি সুন্দর ও সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা গড়িয়া তুলিয়াছিলেন। একদিকে সংসারের ব্যয় বহন করার পর যাহা কিছু

উদ্ধৃত থাকিত, উহা চোর-ডাকাতের হাত হইতে নিরাপদ রাখার জন্য আইনগত ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। তেমনি অন্যদিকে ব্যবসায়-বাণিজ্য করার জন্য যে মূলধনের প্রয়োজন হইত উহারও সুব্যবস্থা হইয়া গিয়াছিল।

ব্যাঙ্ক ব্যবস্থার প্রবর্তন

ঐতিহাসিকদের মতে ইমাম সাহেবের নিকট যে পরিমাণ সম্পদ ও আমানত রাখা হইত ঐ সম্বন্ধে চিন্তা করিলে একথা বলা মোটেই অত্যুক্তি হইবে না যে, যে কুঠিতে ইমাম সাহেবের কারবার চলিত উহা বর্তমান যুগের বড় বড় ব্যাংকের কারবারের ন্যায় ছিল। আমি প্রথমেই বলিয়াছি—যে পরিমাণ অর্থের কথা ঐতিহাসিকগণ উল্লেখ করিয়াছেন উহা তো ছিল ইমাম সাহেবের মৃত্যুর পরে আমানতের পরিমাণ। সত্তর বৎসর বয়সে মৃত্যুর পূর্বে তিনি যে সকলের আমানত প্রত্যর্পন করার চেষ্টা করিয়াও এই পরিমাণ অর্থ ফিরাইয়া দিতে পারেন নাই একথা অবশ্যই বিশ্বাস করিতে হইবে। তবুও মনে হয় ব্যাপক আকারে কারবার থাকায়, চেষ্টা সত্ত্বেও তিনি পাঁচ কোটি পরিমাণ অর্থ ফিরাইয়া দিতে পারেন নাই। কিন্তু আদায় করিবার প্রস্তুতি নিয়াছেন।

সুতরাং এ কথা যদি সত্য হয় যে, ইমাম সাহেবের মৃত্যুর পরও পাঁচ কোটি পরিমাণ আমানতের অর্থ তাঁহার নিকট লোকের প্রাপ্য ছিল তবে একথা অবশ্য মানিয়া লইতে হইবে যে, অন্যান্য দিনে কি বিরাট পরিমাণ অর্থ তাঁহার নিকট ছিল। কুফায় যে কুঠিতে ইমাম সাহেব কারবার করিতেন উহার আয়তন ও পরিধি সম্বন্ধে বিভিন্ন ইতিহাসে বিশেষভাবে ইহার উল্লেখ রহিয়াছে।

যাহা হউক একথা বিশ্বাস করিতে হইবে যে, ইমাম সাহেবের কারবার ও মূলধন সামান্য ছিল না। ইমাম সাহেবের দান খয়রাত ও ব্যয়-ভূষণ দ্বারাও উহার বিরাটত্ব প্রমাণ হয়। এখন প্রশ্ন হইল, ইমাম সাহেবের এই বিরাট আকারের কারবারের—ভিতরগত অবস্থা কি ছিল।?

হুকুমতের সাহায্য গ্রহণ হইতে বেপরওয়া

ইমাম সাহেব হুকুমতের সাহায্য গ্রহণ করা হইতে মুক্ত ছিলেন উহা তিনি নিজেও বিভিন্নরূপে প্রকাশ করিয়াছেন। আল-খতীবের মতে ইমাম সাহেব প্রায়ই—এই কবিতা পাঠ করিতেন।

عطاء ذى العرش خير من عطائكم - وسيبه واسع يرجى وينتظر انتم
بكدر ما تعطون منكم - والله يعطى بلا ولا من كدر -

"আরশের মালিকের দান তোমাদের দান খয়রাতের চেয়ে ভাল, তাঁহার মেহেরবানীর মেঘ বিস্তৃত প্রশস্ত যাহা হইতে আশা করা যায় এবং যাহার জন্য অপেক্ষা করা যায়। তোমরা (বাদশাহ ও সভাসদ) যাহা কিছু দাও উহা ময়লা করিয়া দাও। আর আল্লাহ যাহা দেন উহা উপকার বলিয়া বেড়ানোর বিপদ থাকে না এবং উহাতে কোন প্রকার ময়লা থাকে না।"

এই কবিতায় যে كم (তোমরা) শব্দ ব্যবহার করা হইয়াছে উহা দ্বারা তখনকার যুগের দরবারে খিলাফতের আমীর উমরাহের প্রতি ইঙ্গিত করা হইয়াছে। ইহাদিগকে লক্ষ্য করিয়াই ইমাম সাহেব বলিয়াছেন—

'যদি আমার এই সন্দেহ না হইত যে, তাহাদের নিকট আমার হাত প্রসার করিতে হইবে তাহা হইলে আমি আমার নিকট একটি দিরহামও রাখিতামও না।

এ সম্বন্ধে অন্যেরাও বলিয়াছেন—

"ইমাম আবূ হানীফা (রঃ) হুকুমতের নিকট হইতে একটি পাইও গ্রহণ করিতে অন্যের চেয়ে বেশী সতর্ক ছিলেন।"

প্রত্যক্ষদর্শী বলেন—

"ইমাম আবূ হানীফা (রঃ) কখনও হুকুমতের নিকট হইতে একটি আশরাফী বা দিরহাম গ্রহণ করেন নাই।"

ইসলামের ইতিহাস পাঠক আলিম সম্প্রদায় জানেন—আমীর উমরাহ্‌দের সাথে ইমাম সাহেবই শুধু অসহযোগ করেন নাই বরং দেশে অনৈসলামিক কাজ আরম্ভ হইতেই প্রত্যেক যুগের মহান বুযুর্গ ও আলিমদের একটি দল হুকুমত ও হুকুমতের অর্থের প্রতি ভুলও দৃষ্টিপাত করেন নাই। পূর্ববর্তী অধ্যায়সমূহ সুফইয়ান সওরী এবং মাসয়াব ইবনে কুদাম যাহারা ইমাম সাহেবের সমসাময়িক ছিলেন তাহাদের সম্বন্ধে বর্ণিত হইয়াছে—তাহারা আজীবন এই পথের পথিক ছিলেন।

এখন প্রশ্ন হইল, হুকুমতের নিকট মুখাপেক্ষী না হওয়ার জন্য ইমাম সাহেব কেন এই বিরাট আকারের ব্যবসায়-বাণিজ্য করিতেন? এই

পর্যায়ের বুযুর্গগণ তো সর্বদাই অল্পে তুষ্ট থাকিয়া কালাতিপাত করিয়া গিয়াছেন। মাসয়াব ইবনে কুদাম নিজে বলিয়াছেন—"যে ব্যক্তি নিজেকে ভাজি এবং সেরকাতে সন্তুষ্ট থাকার অভ্যাস করিয়াছেন—তাহাকে কখনও দাসে পরিণত করা যায় না। যাহারা স্বাধীনতার এই রহস্য অবগত ছিলেন তাহারা কেন এই ঝঞ্ঝাটে নিজকে নিয়োজিত করিয়াছিলেন। বিশেষ করিয়া ইমাম সাহেবের মত লোক যিনি পার্থিব সুখ-স্বাচ্ছন্দের প্রতি মোটেই আসক্ত ছিলেন না—তিনি কেন ইহা করিলেন?"

ইমাম সাহেবের সাধনা ও পারিবারিক জীবন

এই বিরাট কারবারী সংস্থা প্রতিষ্ঠা করার পিছনে ইমাম সাহেবের যে কোন প্রকার আন্তরিক আবেগের প্রয়োজন ছিল—ইহা মনে হয় না। সত্য বলিতে কি ইমাম সাহেবের রিয়াযাত ও মুজাহিদা সম্পর্কে বিভিন্ন কিতাবে যে বর্ণনা রহিয়াছে উহা দেখিয়া এ কথা বলিতে হয় যে—

كان جهاده كله الى قبر -

"তাহার সমস্ত সাধনা ছিল কবরের দিকে।"

ইমাম সাহেবের সাথে সম্পর্কহীন যাহবীও লিখিতে বাধ্য হইয়াছেন—"ইমাম সাহেবের রাত্রি জাগরণ এবং তাহাজ্জুদ সম্বন্ধে এত বর্ণিত আছে যে, উহা অবিশ্বাস করার কোন উপায় নাই।"

ইমাম সাহেবের কুরআন খতম করা সম্বন্ধে যাহবী বিস্ময়কর ঘটনা উল্লেখ করিয়াছিলেন—ইমাম সাহেব যে স্থানে মৃত্যুবরণ করেন সে স্থানে বসিয়া সাত হাযার বার কুরআন শরীফ খতম করিয়াছিলেন।

হইতে পারে ইহা অতিরঞ্জিত। আর এই সমস্ত ব্যাপারে লোকে অতিরঞ্জিত কিছু বলিয়াও থাকে। সে যাহাই হোক না কেন—আমি এ কথাই বলিতে চাই যে, পৃথিবী ও ধন-সম্পদের প্রতি আসক্ত হইয়া ইমাম সাহেব যে, ব্যাপকাকারে কারবার করিতেন—ইহা কখনও ঠিক নহে। যদি তাহাই হইত তবে বনী উমাইয়া ও বনী আবদাসীয়দের যুগে স্বয়ং পৃথিবী আসিয়া তাঁহার হাতে ধরা দিয়াছিল, কিন্তু ইমাম সাহেব প্রত্যাখ্যান করা ব্যতীত আর কোন উত্তর দেন নাই। এই সম্বন্ধে সামনে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করিব—ইনশাআল্লাহ। যে সমস্ত ঐতিহাসিকগণ ইমাম সাহেবের ব্যবসা-বাণিজ্য সম্পর্কে বিস্তারিত

আলোচনা করিয়াছেন—তাহারাই ইমাম সাহেবের নিজস্ব মাসিক খরচ সম্বন্ধে ইমাম সাহেবের ভাষণ উদ্ধৃত করিয়াছেন—"আমি আমার নিজের জন্য প্রতি মাসে কখনও দুই দিরহামের বেশী খরচ করি নাই। আমার দৈনন্দিন আহার্য ছিল কখনও রুটি আবার কখনও ছাতু।"
(মুজিম, ১৬৮ পৃষ্ঠা)

সেই সস্তার যুগে যাহারা শুধু ভাজি আর সিরকাতে সন্তুষ্ট থাকিতেন তাহাদের জন্য ইহা বিস্ময়কর কিছু নহে। তাঁহার ঘরের আসবাব পত্র সম্বন্ধে সহল ইবনে মাযাহিম বলিয়াছেন—"ইমাম সাহেবের ঘরে আমি চাটাই ব্যতীত আর কোন আসবাব-পত্র দেখি নাই।" তাছাড়া পারিবারিক গলগ্রহও তাহার বেশী কিছু ছিল না। একমাত্র ছেলে হাম্মাদ ব্যতীত তাঁহার আর কোন সন্তান-সন্ততি ছিল না। যতদূর জানা যায় হাম্মাদের মা ব্যতীত ইমাম সাহেবের আর কোন স্ত্রীও ছিল না।

ঐতিহাসিকগণ বলেন—আব্বাসী খলিফা মনসুরের সাথে যখন বনি-বনা ছিল এবং খলীফাও ইমাম সাহেব হইতে নিরাশ হন নাই—তখন একবার খলীফা মনসুর ইমাম সাহেবের জন্য দশ হাযার দিরহাম এবং একজন দাসী পাঠাইয়া দেন। অন্যান্য সময় ইমাম সাহেব যে কারণে টাকা গ্রহণে করেন নাই এবার সেই কারণে টাকা গ্রহণ করিতে অস্বীকার করিলেন। দাসী সম্বন্ধে বলিয়া পাঠাইলেন—

"রমণী সম্বন্ধীয় ব্যাপারে আমি একেবারেই দুর্বল হইয়া পড়িয়াছি। আমি যে কাজের নই, সেই অবস্থায় এই দাসীকে গ্রহণ করা আমার পক্ষে জায়েয হইবে না। দ্বিতীয়ত আমীরুল মুমিনীনের সম্পত্তি হইতে যে দাসী পাঠানো হইয়াছে—উহাকে বিক্রি করিয়া দেওয়াও আমি পসন্দ করি না।"

কারাবাসে থাকাকালীন ইমাম সাহেব ভুল বর্ণনা দ্বারা কোন কার্যোদ্ধার করেন নাই। তাই রমণীদের সম্বন্ধে তিনি যে বর্ণনা দিয়াছেন—উহ তাঁহার জীবনের ঘটনাবলীর একটি উদাহরণ মাত্র।

ব্যবসায়ের উদ্দেশ্য

আলোচনা দীর্ঘ হইয়া পড়িতেছে। আমার যাহা বক্তব্য উহা বলার সুযোগ পাই নাই। সংক্ষিপ্ত সার এই যে—ইমাম সাহেবের এই কারবারের পিছনে যে উদ্দেশ্য নিহিত ছিল আমার যতদূর মনে হয়

সালাম ইবনে সালেম নামক ইমাম সাহেবের একজন বখিল ছাত্র যাহা বর্ণনা করিয়াছেন উহাই ঠিক। ইমাম মুফিক—সালাম সম্বন্ধে বলিয়াছেন—"সালাম বলখবাসীদের ইমাম। বহুদিন পর্যন্ত ইমাম আবু হানীফার সাহচর্যে ছিলেন এবং তাহার নিকট হইতে বহু মাসয়ালা বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম সাহেবের বলখী ছাত্রগণ আবু মুতি এবং মাকাতিল ইবনে সুলায়মানের সঙ্গী ও ছাত্রদের মধ্যে পরিগণিত ছিলেন।"

সালাম ইবনে সালে বলিয়াছেন—"আমি বড় বড় আলিমদের সঙ্গ লাভ করিয়াছি। কিন্তু হুযুর (সঃ)-এর উম্মতদের প্রতি ইমাম আবু হানীফা (রঃ)-এর যে গভীর সম্মান প্রদর্শনের আবেগ ছিল উহা আর কাহারও মধ্যে দেখি নাই।"

হকদার ও উৎপীড়িতের প্রতি সহানুভূতি

আমি তো ইহাই মনে করি যে—ইমাম সাহেবের স্বভাবসিদ্ধ সহানুভূতিই তাঁহাকে সব কিছু করাইতে বাধ্য করিয়াছিল। হুযুর (সঃ)-এর উম্মতদের উপর তৎকালীন আমীর উমরাহদের যে উৎপীড়ন চলিত উহাতেই ইমাম সাহেব সর্বদা অস্থির থাকিতেন। আমরা দেখিতে পাই হুযুর (সঃ)-এর উম্মতদের এই দুর্দশা দূর করার জন্য ইমাম সাহেবের পূর্বে যে মহান ব্যক্তিগণ কাজ করিয়াছিলেন—হুকুমতের প্রভাবশালী ব্যক্তিগণ তাহাদিগকে গলা টিপিয়া শেষ করিয়া দিয়াছিল। বর্ণনাকারিগণ বলিয়াছেন—ইমাম সাহেব যখন এই সমস্ত উৎপীড়িতদের কথা স্মরণ করিতেন তখন অঝোর নয়নে কাঁদিতেন। এই মহান ব্যক্তিদের সম্পর্কে পরে বর্ণনা করিব—ইনশাআল্লাহ।

কিন্তু তাহাদের পরিণতির কথা শুনিয়া ইমাম সাহেবের কি অবস্থা হইত? ইতিহাসের সাক্ষ্য শুনুন!—এই পথে তাহার সামনে প্রথম কুরবানী ছিল ইমাম হযরত যয়নুল আবেদীনের পুত্র যায়িদ (রঃ)। বনী উমাইয়াদের নির্মম হাতে তিনি শহীদ হইয়াছিলেন। রওয়ায়েতকারী বলেন, যায়িদ ইবনে আলীর শাহাদাতের কথা যখনই ইমাম সাহেব বলিতেন তখনই কাঁদিতেন।

হযরত যায়িদের পর নানার উম্মতের ব্যথায় ব্যথিত হইয়া আহলে বায়তের হযরত ইমাম হাসান (রঃ)-এর পৌত্র হযরত মুহাম্মদ ইবনে 'আবদুল্লাহ' যিনি—'নফসে যাকিয়া' নামে প্রসিদ্ধ ছিলেন, মদীনায় বিদ্রোহ ঘোষণা করিলে আব্বাসী খলীফা মনসুরের ভাই ঈসার হাতে

শহীদ হন। আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়রের পুত্র হাসান বলেন—আমি দেখিয়াছি, মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে হাসান (রাঃ)-এর শাহাদাতের কথা বলার সময় ইমাম আবু হানীফা অঝোর নয়নে কাঁদিতেছিলেন।

এই মুহাম্মদ নফসে যাকিয়ার আপন ভাই ইবরাহীম ইবনে আবদুল্লাহ যখন আব্বাসীদের বিরুদ্ধে বসরায় ঝান্ডা উড্ডীন করেন তখন ইমাম সাহেব যাহা কিছু করিয়াছিলেন উহা তাঁহার জীবনের বিশেষ ঘটনা। এই সম্বন্ধে পরে বর্ণনা করিব।

অতঃপর ইমাম সাহেবের বন্ধু মতান্তরে তাঁহার ছাত্র ইবরাহীম ইবনে মায়মুন সায়েগ আব্বাসী সেনাপতি আবু মুনসিমের হাতে যখন শহীদ হন তখনকার অবস্থা সম্বন্ধে আবু বকর জাস্‌সাস হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মুবারক হইতে বর্ণনা করেন—

ইবরাহীম সায়েগের শাহাদাতের সংবাদ পাইয়া ইমাম সাহেব এত কাঁদিতে লাগিলেন যে, আমাদের মনে হইল, কাঁদিতে কাঁদিতে তিনিও মরিয়া যাইবেন।

তাবইয সহীফা হইতে মুজামের গ্রন্থকার বলেন—"একদিন ইমাম আবু হানীফা এবং ইবনে মুতামার[১] (ইমাম সাহেবের সমসাময়িক একজন বুযুর্গ) আস্তে আস্তে আলাপ-আলোচনা করিতেছিলেন। কখনও কাঁদিতেছিলেন আবার কখনও কথাবার্তা বলিতেছিলেন। কথাবার্তা শেষ হইলে ইমাম সাহেবেরই একজন লোক জিজ্ঞাসা করিলেন—আপনারা কেন কাঁদিতেছিলেন? ইমাম সাহেব উত্তর করিলেন—বর্তমান যুগে সত্যের উপর অসত্যের বিজয় ডংকা বাজিতে দেখিয়া আমরা কাঁদিতেছিলাম।"

(মুজিম্, ১৬৫ পৃঃ)

যাহা হউক ইতিহাসের আলোকে ইমাম সাহেবের এই প্রকৃতিগত স্বভাব এবং উদ্দেশ্য অতি সহজেই জানা যাইতে পারে। আমার মতে

---

১. ইবনে যুবায়রার জোর-যবরদস্তীতে তিনি কাযীর চাকুরী গ্রহণ করেন। তাহার এজলাসে মুকাদ্দমা দায়ের হইলে উভয় পক্ষের জবানবন্দী শুনিয়া বলিতেন—তোমাদের বক্তব্য বুঝিলাম কিন্তু এখন কি করিতে হইবে উহাই বুঝিতে পারিতেছি না। ইবনে হুবায়রা একথা শুনিয়া তাহাকে মুক্তি দিলেন। মুতামের বলিতেন—ভাই! সৎ নিয়তে আমি ইলম শিখি নাই। কিন্তু উহা এখন আমাকে সঠিক পথে আনিয়াছে।

ইমাম সাহেবের জীবনের সমস্ত ঘটনাবলী পর্যালোচনা করিলেই তাঁহার অন্তরের খবর পাওয়া যায়। সালাম ইবনে সালেমের নিজস্ব পর্যবেক্ষক একদিকে রাখুন অর্থাৎ তিনি ইসলাম জগতের বড় বড় আলিমের সাথে মেলামেশা করিয়াছেন, কিন্তু ইমাম সাহেবের ন্যায় আর কাহারও মধ্যে উম্মতে মুহাম্মাদীর জন্য এমন দরদ দেখেন নাই। সালাম ইবনে সালেম জীবনের বহু বৎসর ইমাম সাহেবের সাথে অতিবাহিত করিয়াছেন। ইমাম সাহেব সম্পর্কে তিনি তাহার দ্বিতীয় অভিজ্ঞতা সম্পর্কে বলেন ঃ

"আমি যে সমস্ত মহান বুযুর্গের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়াছি তাহাদের মধ্যে আমি এমন একজনও পাই নাই, যাহাদের কাজ এবং কথার মধ্যে মিল ছিল যেমন ছিল ইমাম আবু হানীফা (রঃ)-এর।" ইহা হইতেও অনুমান করিতে পারেন যে,—ইমামের অন্তরে হুযুর (সঃ)-এর উম্মতের জন্য এত দরদ এবং সম্মান ছিল—তাঁহার সমসাময়িকদের মধ্যেও তাহার উদাহরণ পাওয়া যাইবে না। অন্ততঃপক্ষে সালামের মতে ইহাই প্রমাণিত হয় যে, সেই যুগে অন্তত এমন কোন হৃদয়বান লোক ছিল না।

ইমাম সাহেবের সহনশীলতা ও মহত্ব

তাহা ছাড়া ইহাও চিন্তার বিষয় যে, অত্যাচারী খলীফা ও আমীর উমরাহদের দ্বারা উম্মতে মুহাম্মাদীর উপর যে উৎপীড়ন চলিত, যাহা স্মরণ করিলে আজও অন্তর কাঁপিয়া উঠে। এই সমস্ত ঘটনায় ইমাম সাহেবের সহনশীলতা সম্বন্ধে বিভিন্ন গ্রন্থে যাহা বর্ণিত আছে উহা ব্যতীতও আরও বহু নজীর বিদ্যমান রহিয়াছে। প্রসিদ্ধ সুফী হযরত শকীক বখলী (রঃ) বলেন—একদিন আমরা ইমাম সাহেবের সাথে মসজিদে বসিয়াছিলাম। মসজিদ ছিল লোকে পরিপূর্ণ। ইমাম সাহেব সেখানে উপবিষ্ট ছিলেন। হঠাৎ একটি সাপ সেখানে আসিয়া পড়িল। সকলেই ভয়ে সাপ! সাপ! করিয়া চিৎকার করিয়া উঠিল এবং যে যেদিকে পারিল পলায়ন করিল। আমিও পলায়ন করিলাম। কিন্তু ইমাম সাহেব ধীর স্থিরভাবে নিজের আসনেই বসিয়া রহিলেন—তাঁহার মুখে চোখে কোন ভাবান্তরও পরিলক্ষিত হইল না। (মুফিক, ২৬৭ পৃঃ, ১ম খন্ড)

এই ঘটনারই বিবরণ দিতে গিয়া আবদুল্লাহ্ ইবনে মুবারক বলিয়াছেন—

সাপটি ইমাম সাহেবের কোলের উপর পড়িল। আল্লাহ্‌র বান্দা ডাইনে-বামে কোন দিকেই ভ্রূক্ষেপ করিলেন না। তিনি শুধু কাপড় ঝাড়া দিয়া সাপটিকে দূরে নিক্ষেপ করিয়া দিলেন।

লোকে জিজ্ঞাসা করিল—আপনিও কি পলায়ন করিয়াছিলেন? উত্তরে বলিলেন—আরে ভাই! আমি তো সকলের চেয়ে বেশী জোরে দৌড়াইয়াছিলাম। তবে পলায়নকারীদের প্রথম দলে ছিলাম না।

মোটকথা এইরূপ আরও অন্যান্য ঘটনা হইতে জানা যায় যে—যাহারা সাধারণ ঘটনায় বেসামাল ও অস্থির হইয়া পড়েন ইমাম সাহেব তাহাদের মত ছিলেন না। বরং তিনি যে কোন ঘটনাই অসীম ধৈর্য ও গাম্ভীর্যের সাথে গ্রহণ করিতেন। ইমাম সাহেবের জীবনের ঘটনাবলী হইতে বিষয়টি প্রমাণিত হয়। ইহা সত্ত্বেও হুকুমতের পক্ষ হইতে কাহারও উপর কোন প্রকার অত্যাচার-উৎপীড়ন হইলে তিনি কাঁদিয়া ফেলিতেন। ইবনে মুবারকের ন্যায় একজন সতর্ক মুহাদ্দিসও বলিয়াছেন—"হয়ত কাঁদিতে কাঁদিতে তিনি মরিয়া যাইবেন।"

প্রকৃতপক্ষে এই ঘটনাবলীর দ্বারা তাঁহার অভ্যন্তরীণ অবস্থা এবং গাম্ভীর্য সম্বন্ধে অবগত হওয়া যায়।

নবম অধ্যায়

ইমাম সাহেবের স্বভাবগত মনযোগের প্রথম বহিঃপ্রকাশ

এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে যে, ইমাম সাহেবের জন্ম ছিল কূফায়। তাঁহার পূর্বে এবং তাঁহার বাল্যাবস্থায়ও জনসাধারণের উপর অত্যাচার চলিতেছিল এবং সেই অত্যাচারে এই কূফা শহর জর্জরিত হইয়া পড়িয়াছিল। বনী উমাইয়াদের অত্যাচারী শাসনকর্তা হাজ্জাজের মৃত্যুর সময় ইমাম সাহেবের বয়স ছিল পনর বৎসর। হযরত মুহাম্মদ (সঃ)-এর উম্মতের সাথে যাহার সামান্যতম সম্পর্কও আছে, হাজ্জাজের ঘটনাবলী শুনিয়া তাহার হৃদয়েও প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। অল্প বয়স্ক হইলেও ইমাম সাহেব যে প্রকৃতি প্রদত্ত স্বভাব লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, জ্ঞানে হউক—অজ্ঞানে হউক ঐ সমস্ত ঘটনা বলতে তাঁহার অন্তরেও প্রতিক্রিয়া না হওয়ার কোন কারণ থাকিতে পারে না। বিশেষতঃ তিনি যাহা করিয়াছিলেন উহা কূফার সাথেই সম্পর্কযুক্ত ছিল। তবুও ঐতিহাসিকদের বর্ণনা মতে যতটা দেখা যায়—ইমাম সাহেবের জীবনের প্রাথমিক দিনগুলিতে 'রাজনৈতিক বিষয়ের প্রতি মনযোগ' ছিল বলিয়া কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। এই সম্পর্কে যাহা কিছু পাওয়া যায় উহা প্রথমেই বর্ণনা করিয়াছি।

অর্থাৎ প্রাথমিক জীবনে ফিকাহ্‌র পরিবর্তে ইলমে কালামের প্রতিই তাঁহার যাবতীয় মনযোগ সীমাবদ্ধ ছিল। ইলমে কালামের পন্ডিতদের সাথে তর্ক-বিতর্ক করার জন্য প্রায়ই বসরা গমন করিতেন। কোন কোন সময় সারাটা বৎসরই বসরায় অতিবাহিত করিতেন। বসরা ব্যবসা-বাণিজ্যের কেন্দ্রস্থল থাকায় হয়ত ইমাম সাহেবও বসরায় কারবার করিতেন। কিন্তু কারবারের সাথে সাথে ইসলামের শত্রুদের সাথে বাচনিক জিহাদে লিপ্ত থাকাও তাঁহার একটি প্রধান আনন্দদায়ক কাজ ছিল।

কিন্তু ইলমে কালামের প্রতি যখন আগ্রহ কমিয়া আসিল এবং তাঁহার উস্তাদ হাম্মাদ ইবনে আবু সুলায়মানের নিকট ফিকাহ্‌ শাস্ত্র অধ্যয়ন করিতে আরম্ভ করেন তখন এমন কোন ঘটনা পাওয়া যায় না যাহা দ্বারা প্রমাণ করিতে পারা যায় যে, তিনি রাজনীতির প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছিলেন। কিন্তু ১২২ হিজরীতে যখন তাহার উস্তাদ হাম্মাদ ইবনে সুলায়মান মৃত্যুবরণ করেন এবং তিনি নিজে ৪২ বৎসরে পদার্পণ করেন তখন

বনী উমাইয়াদের শাসনামল ছিল। এই সময় যে রাজনৈতিক ইনকিলাব হইয়াছিল তখনই সর্বপ্রথম আমরা ইমাম সাহেবকে রাজনীতিতে অংশ-গ্রহণ করিতে দেখি। কিন্তু এই ঘটনা বর্ণনার পূর্বে সে যুগের রাজ-নৈতিক অবস্থার কিছু বর্ণনা দেওয়া যাইতে পারে।

কূফার শাসনকর্তা খালিদের সীমাহীন উৎপীড়ন

হিশাম ইবনে মালিক যখন ইসলাম জগতের শাসনকর্তা তখন কূফার গভর্নর ছিলেন খালিদ ইবনে আবদুল্লাহ্ কুসরী। ১০৫ হিজরী হইতে ১২০ হিজরী অর্থাৎ একাদিক্রমে পনর বৎসর পর্যন্ত তিনি কূফার শাসন-কর্তার পদে বহাল ছিলেন। উমাইয়াদের ইতিহাসে বিরাট ব্যক্তিত্বসম্পন্ন হিসাবে তাহার নাম উল্লেখ রহিয়াছে। লোকে তাহাকে খৃষ্টানের ছেলে বলিত। ইমাম সাহেবের পঁচিশ বৎসর বয়স হইতে ৪০ বৎসর বয়স পর্যন্ত খালিদ কূফার শাসনকর্তা ছিলেন।

ইতিহাস পর্যালোচনা করিলে দেখা যায়, খালিদের পিতা আবদুল্লাহ্ ছিলেন আরবের বনী নাজীলা সম্প্রদায়ের লোক। মা ছিলেন খৃস্ট ধর্মাবলম্বী। তাহার মা আমরণ খৃস্ট ধর্মেই সুপ্রতিষ্ঠিত ছিল। খালিদ প্রকাশ্যে মুসলিম ছিল। কিন্তু ঐতিহাসিকগণ বলেন, "খালিদের শাসন-ভুক্ত এলাকায় অমুসলিম শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল।"

কামিল বলেন, "মুসলিমগণ সেই যুগে হীন ছিলেন; শাসন ব্যবস্থা যিম্মী বা অমুসলিমদের হাতে ছিল।" খালিদের পদচ্যুতির পর ইউসুফ ইবনে উমর যখন কূফায় আসেন। তখন ইয়াহিয়া ইবনে নওফেল নামক একজন কবি বলিয়াছিলেন, ইউসুফ ইবনে উমর এমন এক সময় শাসনকর্তা হইয়া আসিলেন যখন মুশরিকরা আমাদের নিকট হইতে রাজস্ব আদায় করিতেছিল এবং তাহারাই প্রকাশ্যে আমাদের উপর হুকুমত করিতেছিল।

একথা লিখিত আছে—মুয়াযযিনগণ মসজিদের মিনারে দাঁড়াইয়া অন্যের বাড়ীর বৌ-ঝির প্রতি দৃষ্টিপাত করে[১] এই অজুহাতে খালিদ

১. খালিদ তাহার হীন মনোবৃত্তি যে কবিতার মাধ্যমে প্রকাশ করিত উহার অর্থ ছিল এইরূপ ঃ—আফসোস! আমিও যদি মুয়াযযিন হইতাম তবে ছাদের নীচে অবস্থানকারীদিগকে দেখিতে পাইতাম এবং তাহা-দিগকে আমার প্রেম নিবেদন করিতাম। তাহারাও প্রত্যুত্তরে তাহাদের প্রেম নিবেদন করিত। (নাউযুবিল্লাহ!)

কূফার প্রত্যেকটি মসজিদের মিনার ভাঙিয়া ফেলিয়াছিল। এই খৃস্টানী-তনয় নিজের মায়ের নামে একটি গির্জাও তৈয়ার করিয়াছিল। তাহার কার্য-কলাপ মুসলিম জনসাধারণের অসহ্য হইয়া উঠিল। প্রসিদ্ধ কবি ফরযদকও আর সহ্য করিতে পারিলেন না। তৎকালীন ইসলাম ও মুসলমানদের দুরবস্থার কথা উল্লেখ করিয়া তিনি একটি বিরাট কবিতায় লিখিয়াছিলেন—"খালিদ মায়ের জন্য তো কূফায় গির্জা তৈয়ার করাইল। আর নিজের কুফরীর জন্য মসজিদের মিনার ভাঙিয়া ফেলিতেছে।"

কথিত আছে, মুসলমানদের অভিযোগ শুনিয়া খালিদ বলিয়াছিল—"তোমাদের ধর্মের চেয়ে যদি খৃস্ট ধর্ম উৎকৃষ্ট না হয় তবে যেন খৃস্ট ধর্মের উপর আল্লাহ্‌র অভিসম্পাত বর্ষিত হয়।" (কামিল ইবনে কাসীর, ১০৩ পৃষ্ঠা, ১ম খন্ড)

বর্ণিত আছে, স্বীয় প্রভু বনী উমাইয়াদিগকে সন্তুষ্ট করার জন্য খালিদ হযরত আলী (রাঃ)-এর প্রতি কটু-ভাষা প্রয়োগ করিত। কামিল ইবনে কাসীরে লিখিত আছে—"বনী উমাইয়া বংশীয় কোন একজন লোক খালিদের নিকট কিছু সাহায্য চাহিয়া প্রত্যাখ্যাত হইয়াছিল। দান-দক্ষিণার ব্যাপারে খালিদ মুক্ত হস্ত ছিল এবং হাশিমের সাথে সে ভাল ব্যবহার করিত। ইহাতে আশ্চর্য হওয়ারও কোন কারণ নাই। কারণ এই স্বভাবের লোকেরা নিজেদের দোষত্রুটি ঢাকিয়া রাখার জন্য একটু মুক্তহস্তই থাকে। যাহা হউক, হয়ত বনী হাশিমের কোন কোন লোককে সে দান-দক্ষিণা করিত। এই ঘটনাকে লক্ষ্য করিয়াই বনী উমাইয়া বংশীয় লোকটি বলিয়াছিল—"খালিদের দান-দক্ষিণার হাত বনী হাশিমদের জন্য খোলা; আমাদের জন্য রাখিয়াছে 'আলীর প্রতি তাহার মুখের কটুক্তি।"

লোকের এই অভিযোগ যখন তাহার কানে পেঁাছিল তখন সে বলিয়াছিল—'তাহাদের ইচ্ছা হইলে উসমান সম্বন্ধেও কিছু শুনাইতে পারি।' এই জন্যই লোকে বলিত হযরত আলী বা হযরত 'উসমান কাহারও সহিত তাহার কোন সম্পর্ক ছিল না। তাহার উদ্দেশ্য ছিল পার্থিব স্বার্থোদ্ধার। ইবনে কাসীর বলেন—হযরত 'আলীর প্রতি কটুক্তি প্রয়োগে সে অত্যন্ত বাড়াবাড়ি করিত। রসূলুল্লাহ্‌ (সঃ)-এর পরিবারের সাথে অসদ্ব্যবহার করিয়া যে প্রকার বদনাম হইত হযরত 'আলীকে গালাগালি করিয়া উহা দূর করার চেষ্টা করিত।

প্রকৃতপক্ষে ইহাই ছিল তাহার নীতি। হিশামের প্রতি তাহার 'আকীদা (ধর্ম বিশ্বাস) কখনও কখনও কাফেরী পর্যায়ে গিয়া পেঁাছিত। যেমন—নিজের পরিবারবর্গের জন্য কেহ যদি কাহাকেও খলীফা বা প্রতিনিধি নিযুক্ত করে তবে কি এই খলীফার মর্যাদাসম্পন্ন হইতে পারে—যাহাকে

ঐ ব্যক্তি কাসেদ (রসূল)-রূপে কাহারও নিকট প্রেরণ করে। ইবনে কাসীর বলেন, "খালিদ খলীফা হিশামকে রসূলুল্লাহ্ (সঃ)-এর চেয়েও বেশী মর্যাদাসম্পন্ন মনে করিত।" (নাউযুবিল্লাহ্)

ইবনে কাসীর বলেন—কিন্তু খলীফা হিশাম অতি গোপনে খালিদকে লিখিয়াছিলেন, "যতদিন পর্যন্ত আমীরুল মু'মিনীনের জন্য খাদ্য-শস্য পর্যাপ্ত পরিমাণে ক্রয় করা না হয় ততদিন যেন অন্য কোন লোক খাদ্যশস্য ক্রয় করিতে না পারে।"

খালিদ হিশামের আদেশমত নির্দেশ প্রচার করিয়া দিল। ফলে দেশে খাদ্য-শস্যের দাম অস্বাভাবিকরূপে বাড়িয়া গেল। এক এক কীলজাহ (অল্প পরিমাণ) খাদ্য-শস্য এক এক দিরহামে বিক্রয় হইত।

খাদ্য-শস্যের অস্বাভাবিক মূল্য বৃদ্ধিতে লোকে হাহাকার করিয়া উঠিল। লোকে খালিদকে দোষারোপ করিতে লাগিল যে, তাহার জন্যই খাদ্য-শস্যের মূল্য বৃদ্ধি হইয়াছে।

খালিদ মহা সমস্যায় পড়িয়া গেল। কারণ, খলীফার আসল আদেশও লোকের নিকট প্রচার করিতে পারে না। এদিকে সকাল-সন্ধ্যায় লোকের গালাগালি শুনিতে শুনিতে তাহার মাথা খারাপ হওয়ার উপক্রম হইল। অতঃপর তাহার ধৈর্যের সীমা ভাঙিয়া গেল। একদিন সে বলিল—

"তোমাদের ধারণা আমার জন্যই খাদ্য-শস্যের দাম বাড়িয়া গিয়াছে। তবে শোন! যাহার জন্য বৃদ্ধি হইয়াছে, তাহার উপর আল্লাহ্র লা'নত।"

এই কথার মধ্যে হিশামের ইঙ্গিত ছিল। "আমার দোষ কি? স্বয়ং তোমাদের খলীফা আমাকে আদেশ দিয়াছেন, সরকারী খাদ্যশস্য ক্রয় না হওয়া পর্যন্ত যেন একটি শস্য-কণাও অন্য কেহ ক্রয় করিতে না পারে।" —ইহা দ্বারা অনুমান করা যাইতে পারে যে, যে হিশামকে সে রসূলদের চেয়ে অধিক মর্যাদাসম্পন্ন মনে করিত আজ তাহাকেই সে সকলের সম্মুখে অভিসম্পাত করিতেছে।

লোকে একথাও বলিয়াছে যে, খালিদ তাহার ঘরোয়া বৈঠকে হিশামকে 'আহমকের সন্তান'[১] বলিয়া অভিহিত করিত। সে বলিত আহমকের সন্তান

১. হিশামের মা আবদুল মালিকের স্ত্রী আয়েশা সম্পূর্ণ বুদ্ধিহীনা ছিলেন। আবদুল মালিক শেষ পর্যন্ত বিরক্ত হইয়া আয়েশাকে তালাক দিয়াছিলেন। বুদ্ধিহীনা মায়ের জন্যই হিশামকে লোকে 'আহমকের সন্তান' বলিত। কেহ কেহ বলেন—হিশামের এই বাধ্যগত কর্মচারীরাই তাহাকে প্রথমে এই উপাধি দিয়াছিল।

এই নির্দেশ দিয়াছে। খালিদ যদিও পনর বৎসর শাসনকার্য চালাইয়াছিল তথাপি সে যাহা লুটপাট করিয়াছিল এবং করাইয়াছিল উহার পরিমাণ ইহা দ্বারাই বুঝা যায় যে—যখন তাহার পদচ্যুতির সময় আসিল তখন সে নিজে স্বীকার করিয়াছিল, "হুকুমতের নিকট আমি পঞ্চাশ কোটি টাকা ঋণী।" অথচ বার্ষিক বেতন বাবদ বিশ হাযার আয়ের একটি জায়গীর সে পাইয়াছিল। কিন্তু বায়তুল মালের টাকা দিয়া তাহার জায়গীরে অসংখ্য খাল খনন করিয়াছিল। এইগুলির ভিতর নহরে খালিদ, নহরে বাজেয়া, নহরে তারমানা, নহরে মুবারক, নহরে জামে কোরা আজও ইতিহাসের পৃষ্ঠায় প্রসিদ্ধ হইয়া রহিয়াছে। এই সমস্ত খালের বদৌলতে বিশ হাযার টাকা আয়ের জায়গীর পনর বৎসরের বার্ষিক এক কোটি ত্রিশ লক্ষে গিয়া দাঁড়াইল। আর এই কারণেই তাহার মাথা ঠিক ছিল না। কখনও কখনও সে উচ্ছাস ভরে তাহার ছেলেকে বলিত—"হিশামের ছেলে মাসলামার চেয়ে তুমি কোন অংশে কম!"

আবার কখনও বা বলিত, "বেটা! কি আনন্দের দিনই না হইবে যখন হিশাম তোমার সাহায্য-প্রার্থী হইয়া আসিবে।"

পরবর্তীকালে সে সমস্ত ইরাক এলাকাটাকেই তাহার পৈত্রিক সম্পত্তি হিসাবে গণ্য করিতেছিল। হযরত উমর (রাঃ)-কে দোষারোপ করিয়া সে বলিত—"আমার বজীলা সম্প্রদায় হইতে তিনি জোরপূর্বক এই এলাকা ছিনাইয়া লইয়া মুসলিম করতলগত করিয়াছিলেন।"[১] খালিদ বলিত—"আমি উৎপীড়িত। আমার পায়ের নীচে এমন কোন অংশ নাই যাহাতে আমার অধিকার নাই।"

কূফায় খালিদ ও তাহার সাঙ্গপাঙ্গগণ প্রত্যহ যে ঈদের খুশীতে মাতওয়ারা হইয়া থাকিত উহার পরিমাপ ইহাতেই বুঝা যায় যে, খালিদের চাকর তারিক তাহার পুত্রের খাতনায় যে খরচ করিয়াছিল উহার তো কোন হিসাবই নাই। শুধু তাহার প্রভু খৃস্টান তনয় খালিদকে উপহারস্বরূপ

---

১. ইরাককে সাওয়াদও বলা হয়। সাওয়াদ মুসলিম করতলগত হওয়ার পর উহাকে বিজয়ী মুজাহিদদের মধ্যে বন্টন করিয়া দেওয়া হইবে-না বায়তুল মালের অন্তর্ভুক্ত করা হইবে, সে সিদ্ধান্ত গ্রহণ না করা পর্যন্ত উহার এক চতুর্থাংশ বজীলা সম্প্রদায়ের অধীনে ছিল। কিন্তু সাহাবীদের পরামর্শ মুতাবিক তথাকার যমীন মুসলমানদের মধ্যে বন্টন করিয়া দেওয়া হইলে বজীলা সম্প্রদায়ের অধীনস্ত যমীনও সকলের মধ্যে বন্টন করা হয়। খালিদ এই ঘটনার দিকেই ইঙ্গিত করিয়াছিল।

মূল্যবান কাপড়ের থান ছাড়াও এক হাযার দাস ও এক হাযার দাসী উপঢৌকন দিয়াছিল। আল-ইয়াফী লিখিয়াছেনঃ খালিদের ভাই আসাদ খালিদের পক্ষ হইতে খুরাসানের প্রতিনিধি ছিল। আসাদ যখন বলখে ছিল তখন মাজূসীদের ঈদ 'মহরজান' পর্ব ছিল। হিরাতের মাজূসী সর্দার ঈদ উপলক্ষে আসাদকে যে উপঢৌকন পাঠাইয়াছিল সেই সম্বন্ধে ইবনে আসাকির 'দামেশকের ইতিহাসে' লিখিয়াছেনঃ স্বর্ণ ও চাঁদির এক একটি কাসকেটের সাথে বড় বড় রৌপ্য পাত্র এবং পেয়ালা ছিল। তৎসহ বহু মূল্যবান কাপড়ের অনেকগুলি থানও ছিল। এই সমস্ত উপঢৌকনের সাথে কতকগুলি স্বর্ণ ও রৌপ্যের তালও ছিল।

মোটকথা, ইহাই ছিল বনী উমাইয়াদের খিলাফত কালের তামাশা দেখার মত কান্ড। বিশেষভাবে ইমাম সাহেবের বাসস্থান কূফায়ই ছিল ইহার আধিক্য। কূফার শাসনকর্তা মুসলমানদের উপর কাফিরদিগকে চাপাইয়া রাখিয়াছিল। মুসলমানদের মসজিদ ভাঙিয়া ফেলা হইতেছিল আর মুসলমানদের পয়সাতেই খৃষ্টানদের গীর্জা মাথা উঁচু করিয়া দাঁড়াইতেছিল। মুসলমানদের রসূলদের উপর খলীফার সম্মান প্রতিষ্ঠিত হইতেছিল, হযরত আলী (রাঃ)-কে দোষারোপ করা হইতেছিল, হযরত উসমান (রাঃ)-কেও রেহাই দিতেছিল না। মুসলমানদের ধর্মের সাথে হাসি-তামাসা করা হইতেছিল।

ইহা তো ছিল শাসনকর্তাদের কাজ। স্বয়ং খলীফার চিন্তা ছিল, প্রজাদের অবস্থা যাহাই হোক না কেন টাকা-পয়সায় রাজকোষ পরিপূর্ণ হইলেই হইল। মুসলমানগণ উপবাসি অবস্থায় দিন কাটাইত আর মুসলমানদের শাসনকর্তার চাকর তাহার পুত্রের খতনায় এত পয়সা খরচ করিত যে, কোন রাজা-বাদশাহ্‌র সন্তানের খাতনায়ও সেই পরিমাণ অর্থ খরচ করা সম্ভবপর হইত না। কিন্তু সমস্ত দুনিয়া চুপ ছিল। বনী উমাইয়াদের উন্মুক্ত তরবারি রক্তের যে নদী প্রবাহিত করিয়াছিল এবং অত্যাচারের যে অগ্নিকুন্ড প্রজ্জলিত করিয়া রাখিয়াছিল উহা দেখিয়া চুপ করিয়া থাকা ব্যতীত আর কোন উপায় ছিল না। তাহারা দেখিতেছিল, মুখ হইতে কথা বাহির হওয়ার পূর্বেই দেহ হইতে মাথা বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে।

কিন্তু আয় বাড়াইতে-বাড়াইতে খালিদ তাহার নিজের কবরই রচনা করিতেছিল। যেই প্রেমে হিশামের মাথা আবদ্ধ ছিল খালিদের মাথাতেও উহা ঢুকিল। হিশামের জায়গীর খালিদের জায়গীরের পাশেই ছিল। শাহী

জায়গীরের তত্ত্বাবধায়ক খলীফাকে জানাইল—"খালিদ শাহী জায়গীরের সীমানা লঙ্ঘন করিতেছে।" কথিত আছে, এখান হইতে খালিদের বিপত্তি শুরু হইয়াছিল এবং খালিদের পদচ্যুতিতে উহার পরিসমাপ্তি ঘটিয়াছিল।

এই সময় ইউসুফ ইবনে উমর ছিলেন য়ামনের শাসনকর্তা। গোপনে হিশাম ইউসুফকে লিখিলেন—তুমি এই মুহূর্তে কূফায় পেঁাছিয়া খালিদকে গ্রেফতার কর এবং তাহার নিকট হইতে সরকারী পাওনা আদায় কর।

ইউসুফ কূফায় পেঁাছিয়া খালিদকে গ্রেফতার করিয়া সরকারী পাওনা আদায়ের জন্য তাকীদ করিতে লাগিলেন। হিশামের নির্দেশ ছিল খালিদের নিকট হইতে সরকারী পাওনা আদায় না হওয়া পর্যন্ত নিহত করা ব্যতীত যে কোন প্রকার শাস্তি দিতে পার। ইউসুফ শাস্তি দিতে কোন প্রকার দ্বিধা করিতেন না। নিত্য নতুন শাস্তি দিয়া খালিদকে অতিষ্ঠ করিয়া তুলিলেন। খালিদকে জিজ্ঞাসা করা হইত—"পঞ্চাশ কোটি সরকারী পাওনা তুমি কোথায় লুকাইয়া রাখিয়াছ,"—ঘটনা প্রবাহ এইভাবে চলিতে লাগিল। কূফায় মুসলমানগণ সন্তুষ্ট হইল যে—তাহারা খৃস্টানের পুত্রের হাত হইতে রক্ষা পাইয়াছে।

কথিত আছে, ইউসুফ নামায রোযায় খুবই নিয়মিত ছিলেন। কামেল ইবনে কাসীর বলেন ঃ

ইউসুফ নামাযে অনেক সময় অতিবাহিত করিতেন, মসজিদে বহু সময় কাটাইতেন, তাহার প্রতিবেশী বা জনসাধারণের প্রতি কোন প্রকার অত্যাচার করিতেন না। বিনম্র ব্যবহার করিতেন; বিপদাপদে আল্লাহ্‌র নিকট দোঁআ করিতেন। তাহার নিয়ম ছিল ফজরের সালাত আদায়ের পর চাশত্‌ নামায আদায় না করা পর্যন্ত কাহারও সহিত কোন প্রকার কথা-বার্তা বলিতেন না। অধিকাংশ সময় কুরআন তিলাওত করিতেন এবং আল্লাহ্‌র দরবারে কান্নাকাটি করিতেন।

(কামেল ইবনে কাসীর ৫ম খন্ড ৮৩ পৃঃ)

এই জন্যই কুফার কবি ইয়াহইয়া ইবনে নওফেল কবিতা রচনা করিয়াছিলেন, যাহার অর্থ নিম্নরূপ ঃ যখন মঙ্গলকামী ইউসুফ আসিলেন তখন পৃথিবী উজ্জল হইল এবং প্রত্যেকটি উপত্যকা আলোয় ঝলমল করিয়া উঠিল।

কিন্তু বনী উমাইয়াদের শাসনকর্তা বনী উমাইয়া ছিল। কয়েক দিন পরই জানা গেল ইউসুফের মাথা খারাপ। নামায-রোযার প্রতি এত ভক্তি

পাগলামীর এক ধরনের লক্ষণ। তাহার পাগলামীর কাহিনী অনেক। নমুনাস্বরূপ এখানে দুই একটি উল্লেখ করিতেছি।

ইউসুফ জোলাদের দ্বারা চার আনার কাপড় তৈয়ার করাইতেন। একবার কোন এক জোলা কাপড় তৈয়ার করিয়া আনিলে এক কর্মচারীকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"দেখ তো কেমন হইয়াছে ?"

কর্মচারী বলিল, হুযুর ! খোপওলি একটু ছোট হইয়া গিয়াছে।" ইউসুফ জোলাকে বলিল, "কিরে উল্লুর বাচ্চা ! এ তো ঠিক কথাই বলিতেছে।"

জোলা বলিল "হুযুর ! এই বিষয়ে আমি ভাল জানি"—

ইউসুফ কর্মচারীকে বলিল, "কিরে উল্লুর বাচ্চা ! জোলা তো ঠিক কথাই বলিতেছে।"

কর্মচারী বলিল, "হুযুর ! সারা বৎসরে জোলা দুই এক থান কাপড় তৈয়ার করে।" আর বৎসরে হাযার হাযার থান কাপড় আমার হাত দিয়া যায়।" ইউসুফ বলিল, "কিরে উল্লুর বাচ্চা—এ কথাও তো সত্য।"

মোট কথা, একজনকে একবার সত্যবাদী বলা আবার পরক্ষণেই তাহাকে মিথ্যাবাদী বলিতে তিনি দ্বিধা-বোধ করিতেন না। তাহার স্বভাব অত্যন্ত রুক্ষ চিল। তাহার আদেশের এদিক সেদিক হইলে আর রক্ষা ছিল না। একবার সফরে যাওয়ার সময় তিনি দাসীদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—'আমার সাথে কে কে যাইবে।"

একজন দাসী বলিল, 'হুযুর ! আমি যাইব।'

আর যায় কোথায় ? ক্রোধান্বিত হইয়া তিনি অকথ্য ভাষায় গালাগালি তো করিলেনই তদুপরি আদেশ করিলেন—'একে চাবুক মার।' অন্য দাসী ইহা দেখিয়া বলিল, 'হুযুর ! আমি বাড়ীতে থাকিব।' ইউসুফ চক্ষু লাল করিয়া বলিল, 'আমার কাজে অসন্তুষ্ট, একেও চাবুক লাগাও।'

তৃতীয় দাসীকে জিজ্ঞাসা করিল,—'তোর মত কি ?'

সে উভয়ের পরিণতি স্বচক্ষে দেখিয়াই বলিল, "হুযুর, কি বলিব। যাহা কিছু বলি না কেন, উহার পরিণতি যে কি হইবে তাহা তো প্রত্যক্ষভাবেই দেখিতেছি।'

ইউসুফ,—'তাই নাকি ? আমার কাজের চুল-চেরা বিচার করিতে শিখিয়াছ নাকি ? দাস ! একেও চাবুক মার।"

তাই পাগলামী ব্যতিত তাহার কাজকে আর কি বলা যাইতে পারে ? কথিত আছে, ইউসুফ খুবই খবকৃতির ছিল। কিন্তু দাড়ি ছিল খুব

লম্বা। তাহার জামা তৈরী করার জন্য দরজী ডাকিয়া আনা হইত। দরজী যদি বলিত হুযুর, এই কাপড় দ্বারা জামা তৈরী করিয়াও অনেক থাকিয়া যাইবে, তবে আর দরজীর রক্ষা ছিল না। চাবুক না খাইয়া সে ফিরিয়া যাইতে পারিত না। কিন্তু জানা দরজী বলিত, 'হুযুর! এই সামান্য কাপড়ে আপনার মত বিরাট দেহধারী ব্যক্তির জামা কখনও তৈরী হইতে পারে না।' একথা শুনিলে ইউসুফ আহলাদে আটখান হইয়া যাইত। দরজীও এই সুযোগে মোটা রকমের কাপড় আদায় করিয়া লইয়া যাইত। (ইবনে কাসির ইত্যাদি)

তাহার এই অবস্থা দেখিয়া জনসাধারণ নিরাশ হইল। ইয়াহইয়া ইবনে নওফেলকে পুনরায় বলিতে হইয়াছিল, 'খলীফা অনুগ্রহ করিয়া নতুন লোক আমাদের জন্য পাঠাইয়াছিলেন। কিন্তু প্রকৃত ঘটনা এইরূপ যে, দোযখবাসি যখন দোযখে কিছু প্রার্থনা করিবে তখন গরম পানি ও পুঁজ ব্যতীত আর কিছুই দেওয়া হইবে না। আমাদের অবস্থাও তদ্রূপ। কারণ, খালিদকে বদলাইয়া যেন আমাদের প্রার্থিত বস্তু হিসাবে গরম পানি ও পুঁজ দেওয়া হইয়াছে।"

যাহা হউক, এই সব ঘটনা উল্লেখ করার কারণ এই যে, এই সমস্ত ঘটনায় যখন জনসাধারণের প্রতিক্রিয়া এইরূপ হইয়াছিল তখন ঐ ব্যক্তির মনের অবস্থা কিরূপ হইয়াছিল যাহার সম্বন্ধে সালাম ইবনে সালিম বলিয়াছেন—'আমি বড় বড় লোকের সাহচর্য লাভ করিয়াছি কিন্তু ইমাম আবু হানীফা (রঃ)-এর অন্তর উম্মতে মুহাম্মদীর জন্য যতটা দরদ করা ছিল এমন আর কাহারও দেখি নাই।'

ফরযদকের ন্যায় একজন বেপরওয়া কবির অন্তরও যখন এই অবস্থা দৃষ্টে কাঁদিয়া উঠিয়াছিল। তখন ইসলামের মহান ব্যক্তিদের অন্তরের অবস্থা সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে। সুতরাং একথাই বুঝিতে হইবে—ভিতরে ভিতরে আগুন জলিতেছিল। আমি যতটা বুঝি তাহাতে এই অভ্যন্তরীণ আগুনের কথা খালিদ ব্যতিত অন্য কেহ বেশী বুঝিতে পারে নাই। আমার ধারণা তাহার মাথায় একটি ফন্দি বাসা বাঁধিয়াছিল।

খালিদের বিস্ময়কর ফন্দি

কথিত আছে, সরকারী পাওনা আদায়ার্থে ইউসুফ খালিদকে নিত্য নতুন শাস্তি দিতেন। একদিন জেল হইতে বাহির করিয়া বিভিন্ন প্রকার শাস্তি দেওয়ার পর জিজ্ঞাসা করিলেন, "বল! কাহার নিকট তুমি এই সম্পদ লুকাইয়া রাখিয়াছ?"

পূর্ব সিদ্ধান্ত মতেই হউক কিংবা উপস্থিত মতেই হউক খালিদ বলিল, "আমার শাসনামলে যে সম্পদ অর্জন করিয়াছি উহার বড় একটি অংশ মদীনার তিন ব্যক্তির নিকট জমা রাখিয়াছি।'

ইউসুফ চমকিয়া উঠিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'মদীনায়!'

খালিদ অতঃপর তিন ব্যক্তির নাম করিল। যাহাদের মধ্যে হযরত ইমাম জয়নুল 'আবেদীনের পুত্র হযরত যায়দের নামও ছিল।

পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, চতুর খালিদ বনী হাশিমের সাথে যে সদ্ব্যবহার করিত তজ্জন্য বনী উমাইয়াদের অভিযোগের আর শেষ ছিল না। ইউসুফ হিশামকে সংবাদ দিলেন। হিশাম তাহাদিগকে তৎক্ষণাৎ কূফায় পাঠানোর ব্যবস্থা করিলেন। হযরত যায়দ কূফায় পেঁাছিলে তাহার সম্মুখেই খালিদের জবানবন্দী লওয়া হইল। খালিদকে দেখিয়াই হযরত যায়দ বলিলেন, "এ ব্যক্তি কেন আমার নিকট তাঁহার টাকা পয়সা জমা রাখিবে? এতো সকাল সন্ধ্যা আমার বুযুর্গ দাদা হযরত 'আলী (রাঃ)-কে গালি বর্ষণ করে।'

খালিদকে জিজ্ঞাসা করা হইলে সে বলিল, "শাস্তির কঠোরতা আমার উপর দিন দিনই বাড়িয়াই চলিতেছিল। তাই আপনার নিকট টাকা-পয়সা জমা রাখার কথা বলিয়াছি। উদ্দেশ্য আপনার আগমনে ও সুপারিশে অবশ্য আমার শাস্তির মাত্রা কমিয়া যাইবে।"

একজন বুযুর্গ ব্যক্তির আগমনে শাস্তির পরিমাণ লাঘব হইবে খালিদের মত একজন লোক এইরূপ আশা পোষণ করিতে পারে বলিয়া বিশ্বাস হয় না। খালিদ আরও দূর পাল্লার কিছু চিন্তা করিয়া রাখিয়াছিল। তাই তাহার এই কথার পিছনে কিছু রহস্য ছিল উহা বলার পূর্বে হযরত যায়দ সম্পর্কে সামান্য কিছু পরিচয় দিলেই বিষয়টা পরিষ্কার হইয়া যাইবে।

দশম অধ্যায়

হযরত যায়দের সংক্ষিপ্ত পরিচয়

কারবালার মর্মান্তিক ঘটনার পর একাদিক্রমে বনী উমাইয়াদের লৌহ কঠোর ব্যবস্থাপনায় সাধারণত অন্যায়ের বিরুদ্ধে মাথা তুলিয়া দাঁড়ানোর শক্তি কোন মুসলমানের মধ্যে অবশিষ্ট ছিল না বলিলে অত্যুক্তি হইবে না। বিশেষভাবে হযরত আলী (রাঃ) ও হযরত ফাতিমা (রাঃ)-এর সন্তান-সন্ততিগণই ছিলেন বনী উমাইয়াদের প্রধান লক্ষ্য। হযরত যয়নুল আবেদীন (রাঃ) নিজে বলিয়াছেন, "অসুস্থ থাকায় লোকে আমাকে নিহত করিল না। তাহাদের মধ্যে হইতেই এক ব্যক্তি আমাকে তাহার গৃহে লইয়া আসিল। সে ব্যক্তি বাড়ীতে প্রবেশ করিয়া অথবা বাড়ী হইতে কোথাও যাওয়ার সময় আমার বিপদাবস্থা দেখিয়া অঝোর নয়নে কাঁদিত। আমি মনে করিতাম, এই ব্যক্তির চেয়ে আমার জন্য আপন ও হিতাকাঙ্ক্ষী এই দুনিয়ার আর কেহ নাই।"

—(তবকাতঃ ১৫৭ পৃঃ ৫ম খণ্ড)

তারপর বলেন, "কয়েকদিন যাইতে না যাইতেই ইবনে যিয়াদ প্রচার করিল, "যে ব্যক্তি যয়নুল আবেদীনের সংবাদ দিতে পারিবে এবং আমার নিকট আনিয়া দিবে তাহাকে তিন শত দিরহাম পুরস্কার দেওয়া হইবে।" ইহার পর দেখিলাম, আমার আশ্রয়দাতা রশিদ্বারা আমার হাত মযবুত করিয়া বাঁধিতেছে আর কাঁদিয়া কাঁদিয়া বলিতেছে, "আমার ভয় হইতেছে।" অর্থাৎ তাহার নিকট হইতে আমাকে ছিনাইয়া লইয়া অন্য কেহ ইবনে যিয়াদের ঘোষিত পুরস্কার লইয়া যায় কিনা? অতঃপর আমাকে বাঁধিয়া-ছাঁদিয়া ইবনে যিয়াদের নিকট হাযির করিল এবং ঘোষিত অর্থ লইয়া গেল। ইবনে যিয়াদের দৃষ্টি আমার উপর পতিত হইতেই কয়েকটি কথা বলিয়া জল্লাদকে আদেশ করিল, "ইহাকে নিহত কর।"

এই আদেশ শুনিয়া আমার ফুফু যয়নব চিৎকার করিয়া বলিলেন, "হে ইবনে যিয়াদ! আমার পরিবারের যতজনকে নিহত করিয়াছ উহাই যথেষ্ট। আমি আল্লাহ্‌র শপথ দিয়া বলি, যদি ইহাকে নিহতই করিতে হয়—তবে প্রথমে তোমার তরবারি আমার উপরই পড়ুক।"

ফুফুর চিৎকারে ইবনে যিয়াদ অভিভূত হইয়া পড়িল। আমি জীবনে বাঁচিয়া গেলাম।" (তবকাত, ইবনে সা'আদ)

মনে হয় কারবালার ঘটনার পর নবী পরিবার রাজনৈতিক হাঙ্গামা হইতে নিজদিগকে সম্পূর্ণরূপে পৃথক করিয়া রাখিয়াছিলেন। ইমাম যয়নুল আবেদীন (রাঃ) সারাটা জীবন ইবাদত-বন্দেগী ও যিক্‌র-আযকারে কাটাইয়া গিয়াছেন। মদীনার পার্শ্ববর্তী একটি নদীর তীরে স্বীয় পরিবার-পরিজন ও আত্মীয়-স্বজন লইয়া ধৈর্য সহকারে জীবনের দিনগুলি কাটাইতে থাকেন। নবী পরিবারের মধ্যে শুধু মাত্র হযরত যয়নুল আবেদীন জীবিত থাকিলেও আল্লাহ্ তা'আলা তাহাকে অনেক সন্তান-সন্ততির পিতা করিয়াছিলেন। তাহাদের মধ্যে হযরত ইমাম বাকের (রাঃ) ছিলেন সুপ্রসিদ্ধ। তাঁহার মা ছিলেন হযরত হাসান (রাঃ)-এর কন্যা। তাই তিনি ছিলেন—ইমাম ভ্রাতৃদ্বয়ের বংশের প্রতিনিধি। আবদুল্লাহ্ ইবনে আলী নামক তাঁহার এক ভাই থাকিলেও তিনি বুযুর্গ ও মহত্ত্বে শ্রেষ্ঠ ছিলেন। হযরত যয়নুল আবেদীনের অন্যান্য পুত্র তাঁর অন্য স্ত্রীদের গর্ভে জন্মিয়াছিলেন। তাহাদের মধ্যে একজন ছিলেন হযরত যায়দ।

উপমহাদেশও নবী পরিবার

কোন কোন ঐতিহাসিক বলেন—হযরত ইমাম যয়নুল আবেদীনের মা গামালাহ্[১] মতান্তরে সালামাহ্ বর্তমান পাকিস্তানের সিন্ধু প্রদেশের মেয়ে ছিলেন। কিন্তু প্রসিদ্ধ রিওয়ায়েত মতে তাঁহার মা ইরানের শেষ সম্রাট ইয়াজ্‌দাজিরদের মেয়ে ছিলেন। তাঁহার ফারসী নাম শাহরে বানু এবং আরবী নাম সালামা ছিল। ঐতিহাসিক আলইয়াফীও শেষোক্ত মতের পক্ষে রায় দিয়া গিয়াছেন। হযরত যয়নুল আবেদীনের মাতা উপমহাদেশে অথবা অন্য যেখানকার মেয়েই হউন না কেন কিন্তু তাঁহার পুত্র যায়দ যে তদানীন্তন ভারতীয় মেয়ের গর্ভজাত ইহাতে কোন ঐতিহাসিকের

---

১. যামাখশারী বলেন—ইরানের কয়েদীগণকে মদীনায় আনা হইলে দেখা গেল, তাহাদের মধ্যে তিনজন সম্রাট-তনয়াও আছেন। হযরত আলী (রাঃ) হযরত উমর (রাঃ)-কে পরামর্শ দিলেন—শাহজাদীদের সাধারণ লোকদের দেওয়া যাইতে পারে না। পরিশেষে বায়তুল মালে টাকা জমা দিয়া তিনি শাহজাদীদের নিজে লইয়া যান। পরে তিনি এক রাজকুমারীকে 'আবদুল্লাহ ইবনে উমর, আর একজনকে মুহাম্মদ ইবনে আবু বকর এবং অন্য জনকে তাঁহার পুত্র হুসায়নকে দান করেন। এই শাহজাদীর গর্ভেই ইমাম যয়নুল 'আবেদীন জন্মগ্রহণ করেন।

মতবিরোধ নাই। হযরত যায়দ এবং তাহার চাচাতো ভাই আবদুল্লাহ্ একবার কথাবার্তা বলার সময় তাহাকে হে হিন্দুস্থানী রমনীর পুত্র বলিয়াছিলেন—একথা ঐতিহাসিক তাবারী লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন।

আমি মনে করি ইহা যদি সত্য হয় অর্থাৎ হযরত যায়দের মা হিন্দুস্থানী এবং দাদী পারস্য দেশীয়, তবে তাহার অর্থ তো ইহাই হয় যে—তিনি আরবী কুরায়শী, হাশেমী,ফাতেমী, 'উলুবী বিশেষত্বের সাথে সাথে ইরানী এবং ভারতীয় গুণাবলীও ওয়ারিশ সূত্রে পাইয়াছিলেন। এই যুগে এতগুলি ওয়ারিশী সমাবেশ কোন এক ব্যক্তির মধ্যে দেখা যায় না।

এই জন্যই বর্ণিত আছে—হযরত যায়দ অসামান্য রূপের অধিকারী ছিলেন। শায়খ আবু মুহাম্মদ ইয়াহিয়া আশ-শায়েফী হইতে আর-রাওযুল কাবীর নামক গ্রন্থে লিখিত আছে—"হযরত যায়দের গায়ের রং উজ্জ্বল লাল বর্ণ, বড় বড় চোখ, জোড়া মযবুত ও দীর্ঘ দেহ, প্রশস্ত বক্ষ, দাড়ি ও মাথার চুল কালো ছিল। ওয়ারিশ সূত্রে যাহা কিছু পাওয়ার দরকার হযরত যায়দের মধ্যে উহার সবকিছুরই সমাবেশ হইয়াছিল। তাছাড়া ওয়ারেশী সূত্রে ধীশক্তি, ইলম, বুযর্গী বীরত্ব ও নির্ভীকতা ইত্যাদি গুণেরও অধিকারী ছিলেন।

হযরত যায়দ সম্পর্কে ইমাম সাহেবের সাক্ষ্য

হযরত ইমাম আবু হানীফা (রঃ) বলিতেন—"নবী পরিবারের কিছু সংখ্যক বুযুর্গকে দেখার সৌভাগ্য যেমন আমার হইয়াছিল, তেমনি হযরত যায়দকে দেখার সৌভাগ্য অর্জন করিয়াছিলাম। আমি সেই যুগে তাঁহার মত ফিকাহ্‌বিদ আর কাহাকেও দেখি নাই। তাঁহার ন্যায় সরল ভাষী এবং উপস্থিত জবাব দানকারী কোন লোকও আমার দৃষ্টিগোচর হয় নাই। প্রকৃপক্ষে সেই যুগে তাঁহার সমতুল্য কোন লোক ছিলেন না।"

শুধু ইমাম সাহেবই নন বরং সেই যুগের নামকরা ব্যক্তিগণও একথা বলিয়াছেন। শারবী বলিয়াছেন—"সম্ভবত সে যুগে কোন রমণীই যায়দের ন্যায় পুত্রের জন্ম দেন নাই। তাঁহার ন্যায় ফিকাহ্‌বিদ, বীরত্বের অধিকারী, ধৈর্যশীল আবেদ ও যাহেদ আমার দৃষ্টিগোচর হয় নাই। আমার দৃষ্টিতে ধর্মীয় জ্ঞান ছাড়াও পার্থিব বিষয়েও তিনি ছিলেন অদ্বিতীয়।"

ইমাম জা'ফর সাদিক হযরত যায়দের শাহাদতের সংবাদ শুনিয়া বলিয়াছেন—"আল্লাহর কসম! আমাদের চাচা আমাদের সকলের চেয়ে অধিক কুরআন তিলাওতকারী, ধর্মীয় জ্ঞানে অধিক জ্ঞানী এবং আত্মীয়-স্বজনের প্রতি অধিক মেহেরবান ছিলেন। আল্লাহ্‌র কসম! আমাদের ইহকাল ও পরকালের সমস্যার সমাধানের জন্য আমাদের বংশে তাঁহার ন্যায় কোন লোক রাখিয়া গেলেন না।"

যাহা হউক আল্লাহ্‌ প্রদত্ত গুণাবলী ছাড়াও তিনি নিজের মধ্যে যে সমস্ত গুণের সমাবেশ ঘটিয়েছিলেন ছাত্রাবস্থার ঘটনাবলী দ্বারা উহার অনুমান করা যাইতে পারে। তাঁহার জীবনের বিস্তৃত ঘটনাবলী আমার সম্মুখে না থাকিলেও মোটামুটি কিছুটা বর্ণনা করিতেছি। কারবালার মর্মান্তিক ঘটনার পর নবী পরিবার বিশেষ করিয়া হযরত যয়নুল আবেদীন এতটা ভগ্ন-হৃদয় হইয়া গিয়াছিলেন যে—নীরবতা অবলম্বন করা ব্যতীত আর কোন কাজে উৎসাহ ছিল না। বিশেষতঃ তাহারা ইহাই স্থির করিয়া লইয়াছিলেন যে, রাজনৈতিক কোন ব্যাপারেই হস্তক্ষেপ করিবেন না। তবকাত ইবনে সা'আদ বলেন—'হযরত যয়নুল আবেদীন লোকদিগকে ঝগড়া-বিবাদ করা হইতে নিরস্ত্র থাকিতে উপদেশ দিতেন। খুরাসান হইতে কিছু সংখ্যক লোক তাঁহার খেদমতে আসিয়া বনী উমাইয়াদের অন্যায় অত্যাচার সম্পর্কে শেকায়েত করিলে তিনি তাহাদিগকে ধৈর্য ধারণের এবং ঝগড়া-বিবাদ হইতে দূরে থাকার উপদেশ দিলেন। হযরত ঈসা (আঃ) যেমন অত্যাচারীদের সম্পর্কে কুরআনের ভাষায় বলিয়াছিলেন, হে আল্লাহ্‌! তুমি যদি তাহাদিগকে শাস্তি দাও তবে তাহারা তোমারই বান্দা আর যদি ক্ষমা কর তবে তুমি সকলের উপর জয়ী এবং হিকমত বিশিষ্ট। আমিও বনী উমাইয়াদের সম্পর্কে আল্লাহ্‌র নিকট তদ্রূপ দোআ করিব।"

উম্মতে মুহাম্মদীর জন্য এরূপ দোআ করার—যেরূপ ঈসা (আঃ) খৃস্টানদের জন্য করিয়াছিলেন—অর্থ হইতে ইহাই বুঝায় যে, তাহার নানার উম্মতদের এই দুরাবস্থা দেখিয়া তাঁহারা কত বড় আঘাত পাইয়াছিলেন। ইসলাম ও ঈমানের দাবী করার পর বনী উমাইয়াদের পরিচালনায় মুসলমানদের উপর যে অত্যাচার চলিতেছিল উহার নিরসন করার আশা পরিত্যাগ করিয়া কঠিনতা অবলম্বন করার পরিবর্তে তাহাদের নীতি কিছুটা উদারতার দিকে ঝুঁকিয়া পড়িয়াছিল। অধিকন্তু (ইরজা—আকাঙ্ক্ষা) যাহা মরজিয়া সম্প্রদায়ের মূলনীতি (অর্থাৎ ঈমান গ্রহণ করার পর মুক্তির জন্য সৎকাজ করার প্রয়োজন থাকে না যাহা ইচ্ছা তাহা করিলেও সে

জান্নাতী,—দোযখের আগুন তাহার জন্য হারাম ছিল। যদিও ইহা নিকৃষ্টতম নীতি তথাপি আমার মতে প্রথমত আহলে বায়তের বুযুর্গদের মধ্যে এই নীতির কিছুটা অনুকরণ পাওয়া যাইত। ঐতিহাসিকগণ ইহাও লিখিয়াছেন যে—হযরত আলী (রাঃ)-এর পুত্র মুহাম্মদ ইবনে হানফীয়ার পুত্র হাসান ইবনে মুহাম্মদ সর্বপ্রথম এই বিষয়ে আলোকপাত করেন।

হযরত হাসান ইবনে মুহাম্মদের রচিত গ্রন্থ

কথিত আছে, হাসান ইবনে মুহাম্মদ তাঁহার নীতি বলিষ্ঠ করার জন্য একখানা কিতাবও রচনা করিয়াছিলেন এবং সর্বসাধারণের নিকট প্রচারের ব্যবস্থাও করিয়াছিলেন। সেই কিতাব রচনা ও প্রকাশের উদ্দেশ্য কি তবে উহাই ধরিয়া লইতে হইবে যে, ঈমান গ্রহণ করার পর নবীজীর উম্মত পুনরায় মুরতাদ হইয়া যাউক! পরিতাপের বিষয় তাঁহার রচিত গ্রন্থখানা পৃথিবী হইতে অদৃশ্য হইয়া গিয়াছে। আজ থাকিলে উহা ঐতিহাসিক দলীল হইত। কেননা হিজরী প্রথম শতাব্দীতে কুরআন ও হাদীস সংকলন ব্যতীত কুরআন ও হাদীসের আলোকে অন্য কোন গ্রন্থ রচনার কাজে কেহ হাত দেন নাই। এই প্রকার রচনায় সম্ভবত হাসান ইবনে মুহাম্মদই অগ্রণী ছিলেন। আরও দেখা যাইত তিনি যে [illegible]-এর কথা বলিয়াছিলেন—উহা কোন্ প্রকারের [illegible] ছিল। যাহা হউক লাভের পরিবর্তে লোকের ক্ষতির পরিমাণ দেখিয়া হাসান ইবনে মুহাম্মদ পরবর্তীকালে বলিয়াছিলেন—"আফসোস! আমি যদি এই গ্রন্থ রচনা না করিতাম, বা তৎপূর্বেই মারা যাইতাম তবে কতই না ভাল হইত!"

যাহাই হউক না কেন বনী উমাইয়াদের বিরুদ্ধে দাঁড়ানোর ইচ্ছা নবী পরিবারের কাহারও মধ্যে ছিল না। রাজনৈতিক কার্যাবলী হইতে পৃথক হইয়া যাওয়ার পর অন্য কোন কাজে লিপ্ত থাকা তাহাদের পক্ষে অপরিহার্য হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। উহার মধ্যে ছিল ইবাদত-বন্দেগী ও যিকর-আযকার। চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে হাযার রাক'আত সালাত আদায় তো ছিলই। তদুপরি আমরা দেখিতে পাই তাহাদের মধ্যে জ্ঞানার্জনের স্পৃহা অত্যন্ত প্রবল ছিল। আমরা ইহা দেখিয়া হতবাক হইয়া যাই যে, হযরত যয়নুল আবেদীন (রাঃ) গোলাম ও মাওয়ালীদের ইলমের মজ-

লিসেও অংশগ্রহণ করিতেন। সেই যুগের প্রসিদ্ধ আলিম হযরত উমর (রাঃ)-এর মুক্তিপ্রাপ্ত গোলাম সালেমের মজলিসে হযরত যয়নুল আবেদীনকে ছাত্রের ন্যায় বসিয়া জ্ঞানার্জন করিতে দেখিয়া লোকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল—'কুরায়শ 'আলিমদের মজলিসে না গিয়া বনী 'আদীর দাসের দরবারে আসিয়াছেন?' হযরত যয়নুল আবেদীন বলিয়াছিলেন—'যেখানে লাভবান হওয়া যায় লোক সেখানেই বসে।' (তবকাত)

হযরত যায়দের জ্ঞান-গরীমা

হযরত যয়নুল আবেদীনের সন্তানদের মধ্যে বিশেষ করিয়া হযরত যায়দের মধ্যেও পিতার ন্যায় জ্ঞানার্জন স্পৃহা অত্যন্ত প্রবল ছিল। সেই যুগে যে যে বিষয়কে ইল্‌ম হিসাবে গণ্য করা হইত এবং উক্ত বিষয়ের প্রধান জ্ঞানীগণ যেখানে থাকিতেন তিনি তাহাদের নিকট গমন করিয়া উক্ত বিষয়ে জ্ঞানার্জন করিতে সর্বদা সচেষ্ট থাকিতেন। ইহাও বর্ণিত আছে যে, সেই যুগের শ্রেষ্ঠ মুতাযিলাহ যিনি কোন কোন বিষয়ে লোকের নিকট বদনাম কুড়াইয়া ছিলেন—হযরত যায়দ তাহার নিকটও ইল্‌ম হাসিল করিয়াছিলেন। কুরআন, হাদীস, ফিকাহ্‌র এবং ইল্‌মে কালামে তিনি সেই যুগে এতটা দক্ষ ছিলেন যে, লোকে তাঁহাকে মুজতাহিদ বলিত। আজও যায়দিয়া সম্প্রদায়ের লোকের ধারণা তাহারা হযরত যায়দের অনুসারী। এই সম্প্রদায়ের কতকগুলি কিতাব হযরত যায়দের রচিত বলিয়া তাহাদের বিশ্বাস।

কুরআনের সাথে সম্পর্ক

হযরত যায়দ জ্ঞানার্জনের জন্য যে শ্রম স্বীকার করিয়াছিলেন—নবী পরিবারের মধ্যে আর কেহই ততটা করেন নাই। বিশেষ করিয়া কুরআনের সাথে তাহার যে সম্পর্ক ছিল উহার পরিমাপ ইহা দ্বারাই করা যাইতে পারে যে, তিনি নিজে বলিয়াছেন—'কুরআন পাঠের জন্য আমি তের বৎসর পর্যন্ত নির্জন বাস করিয়াছি।'

পৃথিবীর যাবতীয় সম্পর্ক পরিত্যাগ করিয়া তিনি কেন তের বৎসর পর্যন্ত কুরআন শরীফ অধ্যয়ন করিয়াছিলেন? সমসাময়িক ঘটনা পর্যালোচনা করিলে দেখা যায় বিভিন্ন মতবাদী লোক তাহাদের পৈতৃক ধর্ম-বিশ্বাসের কিছু না কিছু বীজ সাথে লইয়া দলে দলে ইসলাম গ্রহণ করিতেছিল। ইসলাম গ্রহণ করার পর কিছু লোক জ্ঞাতসারে এবং

অধিক লোক অজ্ঞাতসারে তাহাদের পৈত্রিক ধর্ম-বিশ্বাসের কিছু মতবাদ ইসলামের মতবাদের সাথে মিলানোর চেষ্টা করিতেছিল। সত্য বলিতে কি হিজরী প্রথম শতাব্দীতে ইসলামের মধ্যে যে বিভিন্ন মতবাদ দেখা দিয়াছিল উহা ইহারই ফল।

দ্বিতীয়ত, হুকুমতের সাথে মুসলমানের কি সম্পর্ক রাখিতে হইবে এই বিষয়ও তাহারা গভীরভাবে চিন্তা করিতেছিল। পূর্বে বর্ণিত হইয়াছে, "চল্লিশ চোরের দরবেশী দল" ফতওয়া দিয়াছিল—বাদশাহ যাহা ইচ্ছা তাহা করিতে পারেন। তজ্জন্য ইহকাল ও পরকালে তাহাকে জবাবদিহি করিতে হইবে না। তাছাড়া খারেজী সম্প্রদায় এবং তাহাদের আরও কিছু লোক প্রত্যেকটি কাজে ও কথায় মুসলমানদের হত্যা করা, তাহাদের ধন সম্পদ লুট করা, মুসলিম মহিলা ও বালক-বালিকাদিগকে দাস-দাসীতে পরিণত করা নিজেদের পেশায় পরিণত করিয়া লইয়াছিল। তাহারা এতটা শক্তিসম্পন্ন হইয়াছিল যে, হযরত 'আলী (রাঃ)-কেও তওবা করার নির্দেশ দিয়াছিল।

তাছাড়া আমরা দেখিয়াছি নবী পরিবার যাবতীয় রাজনৈতিক ঘটনা হইতে দূরে সরিয়া ছিলেন। তাই আমার মনে হয় এই সমস্ত সমস্যার সমাধান কোথায় উহা অনুসন্ধান করার জন্যই হযরত যায়দ (রাঃ) কুর-আন শরীফ অধ্যয়নে ডুবিয়াছিলেন। অতঃপর তিনি কি সমাধান খুঁজিয়া পাইয়াছিলেন—উহাই আমাদের বর্তমান পর্যালোচনার বিষয়।

হযরত যায়দের একটি ভাষণ

বিভিন্ন মতবাদীদের সম্বন্ধে ভাষণ দানকালে হযরত যায়দ বলিয়াছিলেন, "যাহারা আল্লাহ্‌কে আল্লাহ্‌র সৃষ্টি মানুষের মত মনে করে অর্থাৎ মানুষের ন্যায় আল্লাহ্‌র অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ আছে বলিয়া মনে করে আমি তাহাদের নিকট হইতে অনেক দূরে। আর জবরিয়াদের হইতেও দূরে যাহারা তাহাদের যাবতীয় অসৎ কর্মের বোঝা আল্লাহ্‌র উপর চাপাইয়া বলে, আল্লাহ্‌ যাহা আমাদের দ্বারা করান আমরা তাই করি। আমাদের কোন কিছু করা না করার শক্তি নাই। যাহারা বলে ঈমান আনয়ন করার পর যাহা ইচ্ছা তাহা করা যায়, পরকালের নাজাতের জন্য সৎকাজ করার দরকার হয় না, আমি তাহাদের (মরযিয়া সম্প্রদায়) হইতেও দূরে। যাহারা (খারেজী) হযরত আলী (রাঃ)-কে কাফির বলে—নাউযুবিল্লাহ, আর যাহারা হযরত আবু বকর ও উমর (রাঃ)-কে

কাফির [নাউযুবিল্লাহ]—(রাফেযী) বলে তাহাদের সংশ্রব হইতেও দূরে।

ইহাতো ছিল ধর্মীয় 'আকাইদ সম্পর্কীয় কথা। কিন্তু অনৈসলামিক হুকুমত এবং মুসলিম উৎপীড়নকারী শাসকদের বিরুদ্ধে কোন্ পন্থা অবলম্বন করা যায়,—তের বৎসর নির্জনে বসিয়া তিনি যে কুরআন অধ্যয়নে লিপ্ত ছিলেন নিশ্চয়ই এই সমস্যা তখন তাঁহার সম্মুখে ছিল। আমি মনে করি তাঁহার শহীদ হওয়ার পর এই প্রশ্নের জওয়াব তাঁহার দেহ নিসৃত পবিত্র রক্তধারা দিয়া কূফার প্রতিটি প্রস্তর খণ্ডে লেখা হইয়াছিল। কথিত আছে, তিনি যখন পরাজয় নিশ্চিত মনে করিলেন তখন বলিয়াছিলেন—"আল্লাহ্র শোকর! যিনি এই সময় আমাকে তাঁহার ধর্মকে পরম সীমায় পেঁছানোর সুযোগ দিয়াছেন।"

অতঃপর তিনি যাহা বলিয়াছিলেন উহাই বিশেষভাবে প্রণিধান-যোগ্য। তিনি বলিয়াছিলেন—'আমি আল্লাহ্র রসূলের নিকট বিশেষ-ভাবে লজ্জিত ছিলাম যে, কেন আমি তাঁহার উম্মতকে সৎ কাজে আদেশ এবং অসৎ কাজ হইতে বিরত থাকার নির্দেশ দিই নাই?'

অন্য বর্ণনা মতে তিনি বলিয়াছিলেন—'আল্লাহ্র কসম! রসূলুল্লাহ্র উম্মতকে সৎকাজে আদেশ ও অসৎকাজ হইতে বিরত থাকার নির্দেশ দান না করিয়া তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হওয়াকে আমি অত্যন্ত গর্হিত কাজ মনে করিতেছিলাম।

উক্ত বর্ণনাতেই আছে—'আল্লাহ্র কসম করিয়া বলিতেছি, আল্লাহ্র কিতাব ও রসূলুল্লাহ্র সুন্নাহকে যখন আমি দুরস্ত করিয়া লইয়াছি তখন কেহ অগ্নিকুণ্ড প্রজ্বলিত করিয়া উহাতে আমাকে নিক্ষেপ করুক তাহাতে আমার কোন পরওয়া নাই।'

আমার মতে তো ইহাই ছিল তাহার প্রাণের উচ্ছ্বাস যাহার শিখা তাহার মধ্যে রহিয়া রহিয়া জ্বলিতেছিল। প্রখ্যাত মুহাদ্দিস আবূ আওয়ানাহ্ হযরত যায়দ সম্বন্ধে বলেন—'হযরত যায়দ (রাঃ)-এর পক্ষে জীবিত থাকা দুর্বিসহ হইয়া উঠিয়াছিল।'

পরকালে নানার সম্মুখে কোন্ মুখে দাঁড়াইবেন, এই চিন্তায়ই হযরত যায়দ (রাঃ) অহরহ জ্বলিয়া-পুড়িয়া মরিতেন। মনের কথা ভাবে প্রকাশ ও কার্যে পরিণত করিবেন—জীবনের বড় একটা অংশ এই চিন্তায়ই অতি-বাহিত হইয়া গিয়াছিল। হঠাৎ কূফার প্রাক্তন শাসনকর্তা খালিদ দাবী করিল,—সরকারী আত্মসাৎকৃত অর্থ সে হযরত যায়দের নিকট গচ্ছিত রাখিয়াছে। হিশামের নিকট অর্থের চেয়ে আর কোন বস্তু ছিল না।

আল-মাস'ঊদী বলেন—'সম্পদ-সঞ্চয় করা হিশামের একটি বাতিক ছিল।' আরও বলেন, 'হিশামের শাসনকালে লোক তাহারই অনুসরণ করিতে লাগিল।' যাহার নিকট যে সম্পদ ছিল উহা আঁকড়াইয়া রাখার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করিত। ফলে দেশ হইতে সদ্ব্যবহার ও মেহমানদারী উঠিয়া গেল।'

যে বাদশাহ্‌র নীতি এই যে, প্রজা সাধারণের যাহাই হউক না কেন নিজের খাদ্য-শস্য বিক্রয় না হওয়া পর্যন্ত অন্যকে খাদ্য-শস্য বিক্রয় করিতে দিবে না, সে কি বাদশাহ না আর কিছু।

যাহা হউক, হিশাম সংবাদ শুনিয়াই মদীনার শাসনকর্তাকে নির্দেশ দিলেন হযরত যায়দ এবং খালিদ যাহাদের নাম করিয়াছিল তাহাদিগকে এখনই দামেশকে পাঠাইয়া দাও। শাসনকর্তা হযরত যায়দকে ডাকিয়া খলীফার নির্দেশ শুনাইলে যায়দ (রাঃ) বিস্ময়াভিভূত হইয়া বলিলেন, 'কোথায় আমি আর কোথায় খালিদের গচ্ছিত অর্থ।'

শাসনকর্তা বলিল—আপনি ঠিকই বলিয়াছেন। কিন্তু আপনাকে দামেশকে যাইতে হইবে।

হযরত যায়দ দামেশকে পেঁছিলে হিশাম নিজে তাহাকে এ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসাবাদ করিলেন এবং আন্তরিকতার সাথে বলিলেন—'খৃস্টানির ছেলের (খালিদ) চেয়ে আপনারা আমার নিকট অধিক সত্যবাদী।'

হযরত যায়দ কূফায়

হিশামের উচিত ছিল এখান হইতে তাহাদিগকে মদীনা ফিরিয়া যাওয়ার আদেশ দেওয়া। কিন্তু মনে হয় দৌলতের মোহ তাহাকে এমনভাবে পাইয়া বসিয়াছিল যে, তাহাদিগকে খালিদের সম্মুখীন করিলে এমন কিছু কথা বাহির হইয়া পড়িবে যাহা দ্বারা লুক্কায়িত অর্থের কোন হদিস পাওয়া যাইবে। তাই হিশাম আদেশ করিলেন—"আপনারা কূফায় শাসনকর্তা ইউসুফের নিকট যান। আপনাদের সম্মুখে খালিদকে জিজ্ঞাসাবাদ করিয়া যেন তাহাকে মিথ্যাবাদী প্রতিপন্ন করিতে পারে।"

এইভাবে হিশাম হযরত যায়দকে কূফায় যাওয়ার পথ প্রশস্ত করিয়া দিলেন। অথচ বনী উমাইয়া শাসকগণ সর্বদা সচেষ্ট থাকিতেন যে, নবী পরিবারের কেহ যেন কোন মতে কূফায় পেঁছিতে না পারে। যদিও পেঁছেন তবে যেন তাহাদের প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখা হয়। ইহার

নামই ভাগ্য। কিন্তু অর্থের লোভে হিশাম অন্ধ হইয়া গিয়াছিলেন যাহার ফলে হযরত যায়দ এবং হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাসের পৌত্র দাউদ ইবনে আলী কূফায় পৌঁছিয়া গেলেন। হযরত যায়দের সম্মুখে খালিদকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হইলে বলিল—'আমি তাহাদের নিকট কোন কিছুই গচ্ছিত রাখি নাই। আমার একথা বলার উদ্দেশ্য ছিল, তাহাদের আগমনে হয়ত আমার মুক্তির কোন একটা উপায় হইয়া যাইবে।'

পরবর্তী সময়ে কূফায় যাহা হওয়ার হইয়াছিল। কিন্তু মুসলমানের মসজিদের মিনার ধ্বংস করিয়া দিয়া তৎপরিবর্তে গীর্জা নির্মাণ করা, ঈমানদারদের উপর কুফরী শিরকীর বোঝা চাপাইয়া দেওয়া, বাদশাহ্‌র আমদানী কম হওয়ার ভয়ে প্রজাদিগকে অনাহারে থাকিতে বাধ্য করা হইতেছিল। খালিদের পর যিনি শাসনকর্তা হইয়া আসিলেন, তিনিও চোরের মাসতুত ভাই। তাহার মুখের বাণী ছিল "উল্লুর বাচ্চা"। তাহার নিকট সত্যও মিথ্যা, মিথ্যাও মিথ্যা। দিনকে রাত বলা এবং দিন বলাও ছিল তাহার নিকট অন্যায়। এই প্রকার বহু আঘাতের ব্যথায় কূফাবাসী জর্জরিত ছিল।

এই অত্যাচার ও নিপীড়নের অন্ধকারে হঠাৎ নবী পরিবারের একজন উজ্জ্বল ভাস্কর যাবতীয় গুণের অধিকারী তাহাদের সামনে আসিয়া দাঁড়াইলেন। এই রত্নের সন্ধানী ছিল সকল মু'মিনের অন্তর। তাহাদের সম্মুখে রহমতের ফিরিশতা আসিয়া দেখা দিলেন। কূফার জনসাধারণই নয় বরং বিশিষ্ট ব্যক্তিদের মধ্যে চাঞ্চল্য দেখা দিল। দৈব বিপাক দেখুন, এই ভয়ানক দিনে কূফার শাসনকর্তা হীরা গিয়া বসবাস করিতেছিলেন। হযরত যায়দ যেহেতু হিশামের প্রেরিত তাই নবী পরিবারস্থ লোকের প্রতি যে কড়া দৃষ্টি রাখা হইত স্বভাবতই উহার কড়াকড়ি শিথিল হইয়া গিয়াছিল।

কূফায় হযরত যায়দের ভক্তবৃন্দ

ইহার পরিণতি যাহা হওয়ার তাহাই হইল। জনসাধারণ ছাড়াও বিশিষ্ট বিশিষ্ট লোকগণ হযরত যায়দের হঠাৎ কূফা আগমনকে একটি সুবর্ণ সুযোগ মনে করিলেন। (এখানে বিশিষ্ট লোক অর্থে কূফার আলিম সম্প্রদায়।) তাহাদের মধ্যে কিছু উদ্যমশীল লোক তো প্রকাশ্যেই হযরত যায়দের পক্ষে বায়'আত গ্রহণ করা আরম্ভ করিয়া দিলেন। এই দলের নেতা ছিলেন মনসুর ইবনে মুতামার। তাহার সম্পর্কে

কিছু পূর্বে বলা হইয়াছে যে, তিনি এবং ইমাম সাহেব নির্জনে কথাবার্তা বলিতেছিলেন এবং রোদন করিতেছিলেন। মনসুর ইবনে মুতামার ঘুরিয়া ফিরিয়া লোকের নিকট হইতে হযরত যায়দের পক্ষে বায়'আত গ্রহণ করিতে লাগিলেন।

এই সমস্ত বুযুর্গদের প্রচেষ্টায় চল্লিশ হাযার লোক হযরত যায়দের হাতে বায়'আত গ্রহণ করিল এবং বনী উমাইয়াদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করার শপথ গ্রহণ করিল।

কিন্তু বিশিষ্ট ব্যক্তিদের মধ্যেই একটি দল ছিল যাহাদের সামনে কূফার পূর্ববর্তী ইতিহাসের পৃষ্ঠা খোলা ছিল। কূফাবাসী হযরত যায়দের দাদা ইমাম হাসান এবং স্বয়ং হযরত আলী (রাঃ)-এর সাথে যে ব্যবহার করিয়াছিল উহা তাহারা দিব্য দৃষ্টিতে দেখিতে পাইতেছিলেন। আর এই দলের নেতা ছিলেন প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস সালমাহ ইবনে কুহায়ল। তিনি সাহাবাদিগকে দেখিয়াছিলেন এবং নবী পরিবারের সাথে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রাখিতেন। তিনি হযরত যায়দকে অনেক বুঝাইলেন, বিগত ঘটনাবলী শুনাইলেন। কিন্তু কৃতকার্য হইতে পারিলেন না। হযরত যায়দের মুখে শুধু একটি বাক্য ছিল—"আমি একজন মানুষ; নিহত না হইলেও অবশ্য মরিতে হইবে।"

সালমাহ ইবনে কুহায়ল যখন দেখিলেন হযরত যায়দ তাহার কথায় অটল তখন বলিলেন—"আমাকে কূফা ছাড়িয়া যাওয়ার অনুমতি দিন। কারণ আমার মনে হয় কূফায় এমন কিছু সংঘটিত হইবে তাহা আমি দেখিতে পারিব না।" সত্যই তিনি কূফা ছাড়িয়া 'য়ামামাহ্' চলিয়া গেলেন। তাবাকাতের মতে তিনি ১২২ হিজরীতে মৃত্যুবরণ করেন, সে সময় হযরত যায়দ কূফায় শহীদ হন।

হযরত যায়দের কথা সত্য হইল অর্থাৎ আমি একজন মানুষ নিহত না হইলেও অবশ্যই মরিব। তাই কেহ সত্যই বলিয়াছেন—'মৃত্যু সমস্যার সমাধানই শাহাদত।'

এই দুইটি দলই ছিল বিশ্বস্ত।[১] অর্থাৎ তাহাদের কার্য ও পরামর্শের মধ্যে সততা বিদ্যমান ছিল। তাহাদের মধ্যে আরও একটি দল ছিল যাহারা কূফাবাসীদের ঐতিহাসিক বিশ্বাসঘাতকতা

১. বিশ্বস্ত এইজন্য বলা হইল যে, কূফায় আরও একটি দল ছিল। তাহারা হযরত যায়দকে জিজ্ঞাসা করিল—'আপনি কোন্ বস্তুর প্রতি আমাদিগকে আহ্বান করিতেছেন?' তিনি বলিলেন—'আল্লাহ্র কিতাব ও রসূলের সুন্নাহ্র প্রতি।' আবার জিজ্ঞাসা করিল—'আবূ বকর

দেখিয়া প্রকাশ্যভাবে মুকাবিলা করার পরামর্শ দিতেছিল। কেননা বনী উমাইয়াদের অত্যাচার উৎপীড়ন সীমালংঘন করিয়া গিয়াছিল। তাই এই সুযোগ ছাড়িয়া দিতে তাহারা রাযী ছিলেন না। এই দলের উদ্যোক্তা ছিলেন কূফার বুযুর্গ মুহাদ্দিস নুবাইল আ'মাশ।[১] তিনি বলিয়াছিলেন—'আল্লাহ্‌র কসম! ইহারা যায়দকে পরিত্যাগ করিবে। তাহার দাদা ও চাচার সাথেও ইহারা এইরূপ করিয়াছিল।'

বেচারা আ'মাশ ইহাও বলিলেন—আল্লাহ্‌র কসম! আমার চোখ ত্রুটিপূর্ণ না থাকিলে আমিও তাহাদের সঙ্গী হইতাম।'

প্রখ্যাত মুহাদ্দিস শু'বা বলেন—'কূফার অন্য একজন ইমাম সুফইয়ান সওরীকেও হযরত যায়দের সাথে যুদ্ধক্ষেত্রে দেখা যায় নাই। কিন্তু আবূ 'আওয়ানাহ্‌ বলেন- 'সুফইয়ান সওরী হযরত যায়দের কথা উল্লেখ করিলেই বলিতেন—'তিনি আল্লাহ্‌র পথে নিজের জীবন উৎসর্গ করিয়া

ও উমর (রাঃ)-এর প্রতি আপনার কি ধারণা?' তিনি উত্তর করিলেন—আল্লাহ্‌র রসূলের প্রিয় সাহাবা। তাঁহারা ন্যায়ের প্রতিষ্ঠা এবং অন্যায়ের বিরুদ্ধে জিহাদ করিয়াছেন। তাঁহাদের সম্বন্ধে আমার সুধারণা ব্যতীত আর কিছুই নাই।' তাহারা বলিল—'তাহারা উভয়ে আপনাদের হক হুকুমতের উপর জোর-জবরদস্তী করিয়া অধিকার কায়েম করিয়াছিল। উহার প্রতিকার কি আপনি করিবেন না?' তিনি বলিলেন, 'কিসের প্রতিকার? তাঁহারা আল্লাহ্‌ ও আল্লাহ্‌র রসূলের আদেশের বিরোধিতা কখনও করেন নাই।' ইহার উত্তরে তাহারা বলিল—'তবে বনী উমাইয়াদের বিরুদ্ধে কেন আমাদিগকে জিহাদ করার আমন্ত্রণ দিতেছেন? তাহারা আপনাদের হুকুমত কাড়িয়া নেওয়ায় কি অন্যায় করিল? তাহারাও তো আবূ বকর ও উমর (রাঃ) পদাঙ্কানুসারী।' হযরত যায়দ বলিলেন—'কখনও না! বনী উমাইয়াগণ কখনও তাহাদের মত নহে। বনী উমাইয়াগণ তোমাদের আমাদের এমনকি নিজেদের উপরও অত্যাচার করিতেছে।' এই সময় তাহারা বলিয়াছিল—'আপনি আবূ বকর ও উমরের প্রতি অসন্তুষ্টি প্রকাশ না করিলে আমরা আপনাকে পরিত্যাগ করিব।' একথায় হযরত যায়েদ বলিয়াছিলেন—একটি সম্প্রদায় নবী পরিবারকে ভালবাসিবে। কিন্তু একটি উপাধিতে তাহারা সকলের নিকট পরিচিত হইবে।' যাও, তোমরাই সেই দল! তোমরা 'রাফেযী'। এই সর্বপ্রথম রাফেযী শব্দ ব্যবহার হইল। অতঃপর তাহারা কিছুক্ষণ তর্ক-বিতর্ক করিয়া চলিয়া গেল।

১. প্রকৃত নাম নুবাইল। অন্ধ ছিলেন বলিয়া আ'মাশ (অন্ধ) বলা হইত।

দিয়াছেন; আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভের জন্য সত্যের ঝান্ডা উঁচু করিয়া দাঁড়াইয়াছেন এবং তাহাদের পূর্বপুরুষদের সহিত মিলিত হইয়াছেন যাহাদিগকে আল্লাহ্ তা'আলা শাহাদাতের জীবিকা দান করিয়াছেন।'

হযরত যায়দের প্রতি ইমাম সাহেবের অনুরক্তি

হযরত যায়দের সমর্থনকারীদের মধ্যে ইমাম সাহেবও একজন সমর্থক ছিলেন। ইমাম সাহেবের ব্যাপারে একটি প্রধান বৈশিষ্ট্যের প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয় যে, হযরত যায়দ স্বয়ং ইমাম সাহেবকে আহ্বান করিয়াছিলেন। তিনি ব্যতীত আর কাহাকেও আহ্বান করিয়াছেন বলিয়া কোথাও কোনপ্রকার দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় না। হযরত যায়দ ফুযায়ল ইবনে যুবায়র নামক একজন বিশিষ্ট লোককে ইমাম সাহেবের নিকট প্রেরণ করেন। ফুযায়ল নিজে বলেন—'আমি হযরত যায়দের কাসেদ (সংবাদদাতারূপে) ইমাম সাহেবের নিকট গিয়াছি।'

ফুযায়ল বলেন—'ইমাম সাহেব সর্বপ্রথম আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—ফুকাহাদের (সেই যুগের শ্রেষ্ঠ আলিম) মধ্যে কোন্ কোন্ ব্যক্তি হযরত যায়দের নিকট গমনাগমন করেন।'

ফুযায়ল কয়েকজন প্রসিদ্ধ আলিমের নাম বলিলেন। ইমাম সাহেব কেন এই প্রশ্ন করিয়াছিলেন তাহা বলা যায় না। তবে মনে হয়, আন্দোলনের পরিণতি কি হইতে পারে সে সম্বন্ধে নিজের মতামত স্থির করার জন্যই এই প্রশ্ন করিয়াছিলেন।

একাদশ অধ্যায়

হযরত যায়দের সমর্থনে ইমাম সাহেবের ঐতিহাসিক বর্ণনা

ফুযায়লের এই উত্তর প্রদানের পর ইমাম সাহেব যে ঐতিহাসিক বর্ণনা দিয়াছিলেন উহার সাধারণ কয়েকটি শব্দ রদবদল হইয়া তাঁহার জীবন-চরিতসমূহে দীর্ঘকাল হইতে বর্ণিত হইয়া আসিতেছে। বিভিন্ন স্থানে সেই বর্ণনা কোন কোন অংশ অন্যান্য ঘটনার সাথে আমি বর্ণনা করিয়াছি। কিন্তু এখন উহা বিস্তারিতভাবে বলার সময় হইয়াছে। তিনি ফতওয়া দিয়াছিলেন—'হযরত যায়দের এই সময় বিদ্রোহ ঘোষণা করা হুযুর (সঃ)-এর বদর যুদ্ধের সাথে তুলনা করা যাইতে পারে।'

দৃশ্যত মনে হয় ফুযায়ল ইবনে যুবায়রকে দূতস্বরূপ ইমাম সাহেবের নিকট পাঠানোর উদ্দেশ্য সম্বন্ধে শুধু এতটাই লিখিয়াছেন যে—ইমাম আবু হানীফার নিকট যুবায়রকে এইজন্য প্রেরণ করিয়াছিলেন যে, তিনি যেন হযরত যায়দের হাতে বায়'আত গ্রহণ করেন।

কিন্তু আমার যতদূর মনে হয় হযরত যায়দ ইমাম সাহেবের সাথে এই সম্পর্কে শরীয়ত মুতাবিক আলোচনা করিতে চাহিয়াছিলেন যে, বর্তমান অবস্থাদৃষ্টে বনী উমাইয়াদের বিরোধিতা করা আপনার মতে শরীয়ত কি বলে? এইরূপ মনে করা অন্যায় হইবে না। হইতে পারে উহার উত্তরই ইমাম সাহেব এইভাবে দিয়াছিলেন যে,—কুরায়শদের বিরুদ্ধে হুযুর (সঃ)-এর যুদ্ধ এক সন্দেহাতীত মীমাংসা ছিল। তদ্রূপ যদিও এই সময় কাফিরদের পরিবর্তে এমন সব লোক রহিয়াছে—যাহারা নিজদিগকে মুসলমান বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকে,—কিন্তু কার্যক্ষেত্রে বনী উমাইয়াদের হুকুমত যে হীনতার অতল সীমায় পৌঁছিয়াছিল উহা দেখিয়া তাহাদের হুকুমত ওলট-পালট করিয়া দেওয়াতে ইসলাম এবং ঈমান কখনও অসম্মতি জ্ঞাপন করিতে পারে না। সম্ভবত এই কথা দ্বারা ইমাম সাহেব হযরত যায়দের বিদ্রোহের শরয়ী ব্যাখ্যা করিতে চাহিয়াছিলেন। যেমন সম্মুখে জানিতে পারা যাইবে যে, এই সময়ে ইমাম সাহেবের যে নীতি ছিল সেই নীতির প্রকাশই এক প্রকার

বিশেষ ব্যাখ্যা দ্বারা বর্ণনা করিয়াছেন। আর যদি উহাকে সুধারণা বলা না যায় তবে এক প্রকারে ঐ বাক্য দ্বারা ইমাম সাহেব উহার পরিণতি বলিয়া দিয়াছিলেন হযরত যায়দ যাহার সম্মুখীন হইয়াছিলেন।

হযরত যায়দের জিহাদের জন্য দাওয়াত

একমাত্র রাফেযী সম্প্রদায় ব্যতীত কূফায় অধিকাংশ লোকই উমাইয়াদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার মানসে হযরত যায়দের পাশে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল। কাহারও কাহারও মতে চল্লিশ হাযার লোক হযরত যায়দের নিকট এই শর্তে বায়'আত গ্রহণ করিয়াছিল যে, তাহারা বনী উমাইয়াদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিবে। হযরত যায়দ আগন্তুককে বলিতেন—'আমি তোমাদিগকে আল্লাহ্‌র কিতাব ও রসূলের সুন্নাহর দিকে আহবান করিতেছি। তোমাদিগকে আহবান করিতেছি-তোমরা অত্যাচারীর বিরুদ্ধে জিহাদ কর, দুর্বলকে উৎপীড়ন হইতে রক্ষা কর; নিজের হক হইতে যে বঞ্চিত তাহাকে তাহার হক আদায় করিয়া দাও, মুসলমানদের যে সম্পদ বায়তুলমালে জমা রহিয়াছে সমভাবে উহা মুসলমানদের মধ্যে বণ্টন করিয়া দাও।'

লোক যখন উহার উত্তরে 'হ্যাঁ' বলিত তখন প্রত্যেক বায়'আত গ্রহণকারীর হাতের উপর হাত রাখিয়া বলিতেন—'ইহা আল্লাহ্‌ এবং আল্লাহ্‌র রসূলের সাথে প্রতিশ্রুতি যে, তোমরা আমার পাশেই থাকিবে, আমার শত্রুদের সাথে লড়াই করিবে, প্রকাশ্যে বা গোপনে আমার প্রদর্শিত পথ অনুসরণ করিবে।

এই কথার উত্তর 'হ্যাঁ' হইলে তিনি হাতের উপর হাত রাখিয়া বলিতেন, 'আল্লাহ সাক্ষী রহিলেন।'

কেহ কেহ উল্লেখ করিয়াছেন যে, এইভাবে পনের হাযার লোক বায়'আত গ্রহণ করিয়াছিল। কিন্তু প্রসিদ্ধ বর্ণনামতে চল্লিশ হাযারের উল্লেখ রহিয়াছে। সালমাহ ইবনে কুহাইন জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—'কত লোক আপনার আনুগত্য স্বীকার করিয়াছে?' উত্তরে হযরত যায়দ বলিয়াছিলেন—'চল্লিশ হাযার।'[১] কিন্তু কার্যক্ষেত্রে দেখা গেল হযরত যায়দ যখন জিহাদে গমন করিলেন তখন তাহার সাথে প্রায় এমন সংখ্যক লোকই ছিল যেমন ছিল বদর প্রান্তে হুযূর (সাঃ)-এর সাথে। অর্থাৎ কাহারও মতে দুইশত আঠারো।[২] আবার কাহারও মতে তিনশত।

১, সালমা ইবনে কুহাইন হযরত যায়দকে জিহাদ করা হইতে বিরত

রাখার জন্য জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, 'কতজন লোক আজ পর্যন্ত আপনার নিকট বায়'আত গ্রহণ করিয়াছে ? উত্তর—চল্লিশ হাযার। প্রশ্ন—'আপনার দাদা হুসায়নের হাতে বায়'আত গ্রহণকারীর সংখ্যা কত সুতরাং বদরের সাথে তুলনা করিয়া ইমাম সাহেব যে ইহারই প্রতি ইঙ্গিত করেন নাই, একথা জোর গলায় কে বলিতে পারে ?

অন্য এক মতে ইমাম সাহেব হযরত যায়দের দূতকে বলিয়াছেন, 'যদি আমি নিঃসন্দেহ হইতে পারিতাম যে সময়কালে লোক হযরত যায়দকে পরিত্যাগ করিবে না, সত্যতার সাথে তাঁহার সঙ্গে থাকিবে, তবে নিশ্চয়ই আমি তাহার অনুসরণ করিতাম এবং জিহাদে যোগ দিতাম।'

এই কথায় ইহাই প্রমাণিত হয় যে, ইমাম সাহেব নিঃসন্দেহ ছিলেন যে, হযরত যায়দের এই আন্দোলন শরীয়ত-সিদ্ধ। তেমনি ইহাতেও নিঃসন্দেহ ছিলেন যে, কূফাবাসী বিশেষ করিয়া হযরত যায়দের বর্তমান সাথীদের যাহাদের অতীত কার্যকলাপ দেখিয়া অনুমান করিয়াছিলেন যে, সময়ে সকলেই তাঁহাকে পরিত্যাগ করিবে। এতটা পর্যন্ত ইমাম

ছিল ?' উত্তর—'আশি হাযার। প্রশ্ন—'কিন্তু সময়ে কতজন লোক তাহার সাথী ছিল ?' উত্তর—'তিনশত।' প্রশ্ন—'আপনি ভাল না আপনার দাদা ভাল ছিলেন।' উত্তর 'দাদা ভাল ছিলেন।' প্রশ্ন—'সেই যুগের লোক ভাল ছিল, না আপনার যুগের ?' উত্তর—'সেই যুগের।' অতঃপর সালমাহ বলিলেন—'তবে আপনি কোন্ ভরসায় রহিয়াছেন যে, ইহারা আপনাকে পরিত্যাগ করিবে না।' হযরত যায়দ বলিলেন—'লোকের প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করিয়া আমিও তাহাদের নিকট প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়া গিয়াছি। এখন আর উপায় নাই।'

২. কূফার শাসনকর্তা ইউসুফ হীরা হইতে শহর কোতয়ালকে নির্দেশ দিয়াছিলেন, ফজরের নামায পড়িতে মুসল্লিগণ মসজিদে প্রবেশ করিলে মসজিদের দরজা বন্ধ করিয়া দিবে, যেন কেহ বাহির হইতে না পারে। তদ্রূপ প্রত্যেকটি মহল্লার দরজাও বন্ধ করিয়া দিবে।..... ফজরের পর হযরত যায়দ তাহার সাথীসহ বাহির হইয়া যখন অল্পসংখ্যক লোক দেখিলেন—তখন জিজ্ঞাসা করিলেন, 'আর লোক কোথায় ?' উত্তর পাইলেন—'মসজিদে বন্ধ করিয়া রাখা হইয়াছে।' কিন্তু হযরত [illegible] ইহাতে না দমিয়া যুদ্ধ করিতে অগ্রসর হইলেন।

(কামিল ইবনে কাসীর)

সাহেব সালমাহ্ ইবনে কুহাইনের মতবাদে ছিলেন। সালমাহ ইবনে কুহাইন এই পরিণতির কথা চিন্তা করিয়াই হযরত যায়দকে জিহাদ করা হইতে বিরত রাখিতে চাহিয়াছিলেন।

আমরা দেখিতে পাইতেছি যে, ইমাম সাহেব সেই পন্থা অবলম্বন করেন নাই অর্থাৎ সালমাহ্ যে পরামর্শ দিয়াছিলেন ইমাম সাহেব সেই পরামর্শই দিয়াছিলেন—উহা আমরা কোন বর্ণনায় দেখিতে পাই না। হইতে পারে ইমাম সাহেবের বদর যুদ্ধের প্রতি প্রতি ইঙ্গিত করা উহার বিরোধী ছিল। বদর যুদ্ধে হযরত (সঃ)-এর মুজাহিদ সংখ্যা ছিল তিনশত তের আর শত্রু সংখ্যা ছিল এক হাযার। এখানেও যে হযরত যায়দকে সেই অবস্থায় পতিত হইতে হইবে—উহা চিন্তা করা দোষণীয় ছিল না। পয়গম্বরের সুন্নত সম্মুখে ছিল। এই সম্বন্ধে কুরআনে ইরশাদ হয়েছে ঃ

كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة باذن الله والله مع الصابرين -

'কত ছোট দল বড় দলের উপর আল্লাহর নির্দেশে জয়লাভ করিল। আল্লাহ ধৈর্যশীলদের সাথী।'

কিন্তু কত বড় বিস্ময়কর ব্যাপারে যে, এই কার্য হইতে তিনি হযরত যায়দকে বিরতও রাখিতেছেন না। এই সন্দেহে যে, লোকে হযরত যায়দকে একেবারেই পরিত্যাগ করিবে। সত্য বলিতে কি ইহাই ছিল ইমাম সাহেবের রাজনৈতিক নীতি। এখন আমরা সে বিষয়েই আলোক-পাত করিব।

ইমাম সাহেবের রাজনৈতিক পদ্ধতি ব্যাখ্যা

আইনগত এবং ফিকাহ্র দৃষ্টিভঙ্গি দ্বারা এই সমস্যার ব্যাখ্যা 'সত্যের প্রতিষ্ঠা এবং অন্যায়কে তিরোহিত' এই শব্দগুলি দ্বারা করা যায় অর্থাৎ অন্যান্য কর্তব্যের সাথে মুসলমানদের ইহাও একটি কর্তব্য যে, সৎকাজের আদেশ করিবে এবং অন্যায় কার্য হইতে লোককে বিরত রাখিবে। ইসলামের আদর্শে লোকদিগকে গড়িয়া তোলা এবং উহার দিকে আহ্বান করা মুসলমানদের এমন ফরযের মধ্যে গণ্য যাহা বার বার বিভিন্ন উপলক্ষে কুরআন শরীফে বর্ণিত হইয়াছে। তৎসহ কুরআনে ইহাও বর্ণিত আছে যে—

يا ايها الذين امنوا عليكم انفسكم لا يضركم من ضل اذا اهتديتم -

'হে বিশ্বাসিগণ! স্বীয় রক্ষণাবেক্ষণ তোমাদের প্রতি ওয়াজিব। যে পথভ্রষ্ট হইয়াছে সে তোমাকে ক্ষতি করিতেছে না যখন তুমি পথে চল।'

অর্থাৎ নিজ নিজ জিম্মাদারীর প্রতি অবশ্য খেয়াল রাখিতে হইবে। অন্যে যদি পথভ্রষ্ট হইতে থাকে তবে উহাদের প্রতিক্রিয়া তাহাদের উপর পড়িবে না যাহারা নিজেদের জিম্মদারীর রক্ষা করার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করিবে।

যখন অত্যাচারী শাসন ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত হইল তখন যাহারা এই চিন্তা করিয়াছিলেন যে, এই অত্যাচারী শাসকদের সম্বন্ধে চুপ করিয়া থাকাই শ্রেয়, এই আয়াত ছিল তখন তাহাদের সম্মুখে। কিন্তু প্রশ্ন উঠিয়াছিল যে, সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজ হইতে বিরত রাখার জন্য কুরআনে যে আয়াত অবতীর্ণ হইয়াছিল উহা কি মানসূখ (রহিত) হইয়া গেল? অথচ এই কথাও কেহ বলেন না।

ইহার উত্তরে এক সম্প্রদায়ের আলিম বলেন—"তুমি যখন সৎপথে থাক তখন অন্যের ভ্রষ্টতায় তোমার কোন ক্ষতি হইবে না। কিন্তু অন্যকে সৎকাজের আদেশ করিতে না পারিলে, অন্যায় হইতে বিরত রাখিতে না পারিলে সেই বা কি করিয়া হিদায়ত প্রাপ্ত হইল। কারণ ইহা তো ফরয কাজ। ফরয পরিত্যাগকারী কিভাবে হিদায়ত প্রাপ্ত হইতে পারে।" এই সমস্ত বুযুর্গদের উদ্দেশ্য যে, এই ফরয আদায় হইতে পরিত্রাণ পাওয়ার পরও যদি কেহ গোমরাহী হইতে বিরত না থাকে তখন তাহার গোমরাহী অন্যের জন্য ক্ষতিকারক নহে। এই জন্যই কোন অবস্থাতেই তাহারা সৎকাজে আদেশ এবং অন্যায় হইতে বিরত রাখার কাজ হইতে নিবৃত্ত থাকা জায়েয মনে করেন নাই।

অবশ্য এই প্রকার ফরয আদায় করা সম্পর্কে হাদীস শরীফে কয়েকটি নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে অর্থাৎ হযরত মুহাম্মদ (সঃ)-এর প্রসিদ্ধ বাণী—"অন্যায় এবং অনৈসলামিক কাজ দেখিলে মানুষের কর্তব্য হাত দ্বারা বাধা দেওয়া,—উহার শক্তি না থাকিলে মুখ দ্বারা বাধা দিবে। সেই শক্তি যদি না, থাকে তবে অন্তরে উহাকে খারাপ জানিবে আর শেষোক্ত পন্থা দুর্বলতম ঈমানের লক্ষণ।"

কুরআনের আয়াতের ব্যাখায় এই হাদীস প্রমাণস্বরূপ রাখিয়া তাহারা বলেন, ইহার কোন একটি স্তরের আদেশ পালনই ফরয আদায় করার জন্য যথেষ্ট। যদিও হাত দ্বারা বাধা দেওয়া উৎকৃষ্টতম তবুও অবস্থানুযায়ী যে-কোন একটি পন্থা অবলম্বন করিলেই ফরয আদায় হইয়া যাইবে।

সৎকাজে আদেশ ও অন্যায় হইতে বিরত রাখা সম্পর্কে ইমাম সাহেবের দৃষ্টিভঙ্গি

কিন্তু ইমাম সাহেবের কথা ও কার্যধারা পর্যবেক্ষণ করিয়া পরবর্তী সময়ে যে ফলাফল নির্ণয় করা হইয়াছে উহার সংক্ষিপ্তসার এই যে, —ইমাম সাহেব ঐ সমস্ত লোকের দলে নন, যাহারা উক্ত আয়াতের মর্মানুযায়ী একেবারে চুপ করিয়া রহিয়াছেন। যাহার ফলাফল সম্ভবত ইহাই দাঁড়ায় যে, সৎকাজের আদেশ ও অন্যায়ের বিরোধিতা সম্পর্কীয় কুরআনী আয়াত মনসুখের সমতুল্য। বিশেষত তাহারা অত্যাচারী হুকুমতের বিরুদ্ধে এই পথই অবলম্বন করিয়াছিলেন। যাহারা অত্যাচারী শাসকদিগকে এই প্রকার আদেশ-নিষেধ করিতেন—তাহাদেরও বিরোধিতা করিতেন। মুহাদ্দিসদের বড় একটি দল এই ধারণা পোষণ করিতেন। এমনকি সেই দলের সাহাবীও এই বিষয় লিখতে গিয়ে বলিয়াছেন—"যায়েদ হিশামের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করিয়াছেন। আহা! যদি এই কাজ না করিতেন।"

তৎসহ ইমাম সাহেব ইহাও মনে করিতেন যে, পরিস্থিতি না বুঝিয়া যখন তখন সৎকাজের আদেশ এবং অসৎকাজ হইতে বিরত রাখাকে ফরয করা হয় নাই। বরং কুরআনের অন্যান্য আয়াত, হুযুর (সঃ)-এর হাদীস এবং সাহাবীদের কার্য-পদ্ধতিকে প্রমাণস্বরূপ রাখিয়াই এই বিষয়ের কার্যক্রম নির্ধারণ করিতে হইবে। কুরআন শরীফই তো বলেঃ

فذكر ان نفعت الذكرى —

(হে নবী)"লোকদিগকে উপদেশ দান করুন যদি উপদেশে উপকার হয়।"

অতঃপর কুরআন দ্বারা ইহাও অবগত হইতে পারা যায় যে, যে-কোন অবস্থাতেই শক্তি প্রয়োগ করিয়া অন্যায় হইতে নিরত রাখা ফরয নয়। যদি তাহাই হয় তবে এই আয়াতের মর্ম কি ?—

فذكر انما انت مذكر لست عليهم بمسيطر —

'আপনি লোকদিগকে উপদেশ দিন। আপনি শুধু উপদেশদাতা যিম্মাদার নহেন।'

দ্বিতীয়ত আবু সা'লাবা খাশানী এই আয়াত يا أيها الذين امنوا ..... اذا مررتم — সম্পর্কে স্বয়ং হুযুর (সঃ)-এর নিকট ব্যাখ্যা জিজ্ঞাসা করায় নবীজী ইরশাদ করিয়াছিলেন—"ভাল কাজ কর··· অন্যায় করা হইতে বিরত থাক। অতঃপর যখন দেখিবে লোক লোভ-লালসার দাসে পরিণত হইয়াছে, নিজের লালসা চরিতার্থে লাগিয়া

গিয়াছে, পৃথিবীর প্রতি আসক্ত হইয়া পড়িয়াছে এবং প্রত্যেক ব্যক্তিই নিজের ইচ্ছাকে প্রাধান্য দিতেছে তখনই তোমার কর্তব্য আত্মরক্ষা করা।"

শুধু ইহাই নয় বরং এরূপ আরও অনেক সহীহ্ রওয়ায়েত রহিয়াছে যে, এমন এক সময় আসিবে যখন হুযুর (সঃ) মুসলমানদিগকে ঘরের দরজা বন্ধ করিয়া বসিয়া থাকার আদেশ দিয়াছেন। নবীজী আরও ইরশাদ করিয়াছেন—"ঐ সময় উপবেশনকারী দণ্ডায়মানকারীর চেয়ে, দণ্ডায়মানকারী পায়ে চলা ব্যক্তির চেয়ে এবং পায়ে চলা ব্যক্তি দৌড়ান-ব্যক্তির চেয়ে ভাল হইবে। মোটকথা কুরআন ও হাদীসকে উপেক্ষা করা কোন মতেই জায়েয হইতে পারে না। দ্বিতীয়ত বনী উমাইয়াদের আমলে, সাহাবীদের একটি দল জীবিত ছিলেন। তাঁহাদের কার্যধারাও সৎকাজের আদেশ এবং অসৎ কাজের বারণ করা সম্পর্কে পথ-প্রদর্শক ছিল।

প্রসিদ্ধ হানাফী ইমাম আবু জাফর তাহাবী এই সম্পর্কীয় সমস্ত রওয়ায়েত সমবেত করিয়া হানাফী দৃষ্টভঙ্গিকে এইভাবে প্রকাশ করিয়াছেন—"সৎকাজে আদেশ এবং অসৎকাজ হইতে বিরত রাখা সম্পর্কে আমি যে সমস্ত কথা বলিয়াছি; উহাতে বুঝা যায় এমন এক সময় আসিবে যখন উহা কার্যে পরিণত করা বন্ধ হইয়া যাইবে। আবু সা'লাবা খাশানী হুযুর (সঃ) হইতে যে হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন এবং উহাতে যে সময়ের কথা উল্লেখ আছে উহাই হইবে সেই সময়। সৎকাজে আদেশ এবং অসৎকাজ হইতে বিরত রাখার উপদেশ ফলপ্রসূ হইবে না এবং যাহাদিগকে উপদেশ দেওয়া হইবে তাহাদের চেয়ে উপদেশদাতা হীনশক্তিসম্পন্ন হইবে। এই সময়ই ফরয আদায় করা হইতে পরিত্রাণ পাওয়ার সময়। কুরআন এই সময় সম্বন্ধেই বলিয়াছেন—"অন্যায়কারীদের অন্যায় তোমাকে ক্ষতি করিতে পারিবে না—যদি তুমি ন্যায়ের অনুসারী থাক।" সাহাবীর উদ্দেশ্য এই যে, অন্যান্য ফরয যেমন সালাত, সিয়াম, হজ্জ ইত্যাদি ফরয হওয়ার কোন সন্দেহ নাই, কুরআনই উহাকে ফরয করিয়াছে কিন্তু অসুস্থ এবং বিদেশ ভ্রমণ অবস্থায় আর ফরয থাকে না। পথ নিরাপদ না থাকিলে হজ্জ করা ফরয হয় না তেমনি অবস্থা বিশেষে সৎকাজের আদেশ এবং অসৎকাজ হইতে বিরত রাখার ফরয আদায় করা হইতেও পরিত্রাণ পাওয়া যায়। কুরআন এই দুইটি আয়াত অর্থাৎ যাহাতে এই ফরয আদায়ের তাকীদ দেওয়া হইয়াছে এবং যে আয়াতে প্রত্যেক ব্যক্তিকে নিজস্ব যিম্মাদারীর প্রতি হুঁশিয়ার করা হইয়াছে যে অন্যের পথভ্রষ্টতায় তোমার কোন ক্ষতি হইবে—উহাদের মধ্যে সামঞ্জস্য করার উপায় এই যে, প্রত্যেকটি আদেশকে এই নির্দিষ্ট যুগের সাথে সীমিত রাখিতে হইবে।

এখন প্রশ্ন হইল সেই যুগদ্বয়ের পরিচয় কি? তাহাবী ঐদিকেই ইঙ্গিত করিয়াছেন যে, আবু সালাবার বর্ণিত হাদীস হুযুর (সঃ) নিজেই সেই যুগ নির্দিষ্ট করিয়াছেন অর্থাৎ যে উদ্দেশ্যের জন্য সৎ-কাজের আদেশ এবং অসৎ কাজ হইতে বিরত রাখিতে মুসলমানদের উপর ফরয করিয়া দেওয়া হইয়াছে যখন দেখা যাইবে সেই উদ্দেশ্য কার্য-কর হইতেছে না, লোকে তাহা গ্রহণ করিতে প্রস্তুত নহে আর প্রচারকারীর মধ্যে এমন শক্তি নাই যে, তাহাদের বিরোধিতা করে তখনই মনে করিবে সেই যুগ আসিয়াছে এবং যাহা ফরয করা হইয়াছে—উহা আর ফরযের পর্যায়ভুক্ত নহে। ইব্রাহীম সায়েগ সম্পর্কীয় ঘটনা যাহা পূর্বে কিছু বর্ণিত হইয়াছে এবং পরে বিস্তারিতভাবে বলা হইবে উহা বর্ণনা করিতে গিয়া 'আবদুল্লাহ্ ইবনে মুবারক ইমাম আবু হানীফা (রঃ) হইতে বলেন, "যাহাদের সম্বন্ধে আমরা জানি যে, তাহারা আমাদের কথা শুনিবে না এবং সৎকাজে আদেশকারীর মধ্যে তাহাদের সাথে বুঝাপড়া করার ক্ষমতা নাই, এই অবস্থাতেই ইবরাহীম তাহাদের হাতে নিহত হইয়াছিল। জন-সাধারণের জন্য কোন প্রকার স শোধনের কাজই তাহার দ্বারা হইল না।"

অর্থাৎ এই অবস্থায় জীবনও যায় এবং তাহার উৎসর্গে মুসলমানদের কোন প্রকার উপকারও হয় না, অধিকাংশ ক্ষেত্রে এই অবস্থায় উপকারের পরিবর্তে অপকারই বেশী হইয়া থাকে; যেমন ইমাম সাহেব বলেন—"সৎ-কাজে আদেশকারী যখন নিহত হয় তখন সম্মুখে অগ্রসর হওয়ার জন্য যে প্রেরণার দরকার তখন উহা অন্যের মধ্যেও অবশিষ্ট থাকে না। ফলে সে এই কাজ করা হইতে বিরত থাকে।" ইমাম সাহেব বলেন—"নিঃসন্দেহে এই অবস্থায় যদি এমন ব্যক্তি সৎসঙ্গী পায় এবং তাহাদের মধ্যে একজনকে নেতা মনোনীত করে, যিনি ধর্মে অটল এবং নিজে কখন নীতিভ্রষ্ট না হন—তবে অবশ্য কৃতকার্য হওয়া যায়।" এই সম্পর্কে ইমাম সাহেব আরও আলোকপাত করেন—"সৎকাজের আদেশ এবং অসৎ কাজ হইতে বিরত রাখা এমন ফরয নয় যাহা আদায় করা ব্যক্তি বিশে-ষই যথেষ্ট হইতে পারে অর্থাৎ ইহা এমন ফরয যাহা সকলকে সমবেতভাবে আদায় করিতে হইবে এবং এমন কিছু শর্ত আছে যাহা গভীরভাবে পর্যা-লোচনা না করিলে ফরয হইতে পারে না।"

কিন্তু এই সমস্ত আলোচনা শুধু ফরয হওয়া পর্যন্তই ছিল অর্থাৎ কুরআনের আয়াত এবং রসূলুল্লাহর হাদীস দ্বারা প্রমাণ করা হইল যে, লোক বিশেষ অবস্থায় এই প্রকার ফরয আদায় না করিলেও চলে।

কিন্তু ফরয আদায় করা হইতে মুক্তি পাওয়ার পরও এই একই প্রশ্ন উঠে যে ইহা সত্ত্বেও যদি কেহ সেই ফরয আদায় করিতে প্রস্তুত হইয়া যায় তবে সেই ক্ষেত্রে ইমাম সাহেবের অভিমত কি ছিল? আল্লামা বদরুদ্দীন তাহার শরহে হিদায়ার হানাফী দৃষ্টিভঙ্গিতে ইহার উত্তর দিতে গিয়া বলিয়াছেন—"যদি মনে করে যে বিরোধীদের মারধর সহ্য করার ক্ষমতা আছে এবং এই সম্বন্ধে কাহারও নিকট কোন অভিযোগ করিবে না তবে সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজ হইতে বিরত রাখার কাজে আত্মনিয়োগ করিলে কোন দোষ নাই। বরং এই ক্ষেত্রে তাহাকে মুজাহিদ বলা হইবে।"

হানাফী ফকীহ্‌গণ ইহার সমর্থনে আবূ দাউদ ও তিরমিযীর এই হাদীস বলেন—

ان من اعظم الجهاد وكلمة عدل عند سلطان جائر -

"অত্যাচারী শাসকের সম্মুখে ইনসাফের প্রকাশ করাই শ্রেষ্ঠ জিহাদ।"

তাহারা ইমাম আবূ হানীফা হইতে বর্ণিত এই হাদীসও প্রমাণ-স্বরূপ গ্রহণ করেন—"আমি (ইমাম সাহেব) ইব্‌রাহীম সায়েগ হইতে আকরামার মধ্যস্থতায় এই রিওয়ায়ত বর্ণনা করিয়াছি যে, হুযুর (সঃ) ইরশাদ করিয়াছেন—শহীদদের নেতা হামযা ইবনে আবদুল মুত্তালিব এবং ঐ ব্যক্তি যে অত্যাচারী শাসকের সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়া সৎ কাজের আদেশ এবং অসৎ কাজের নিষেধ করিতে গিয়া শাসকের হাতে নিহত হয়।"

তাই দেখা যায় সৎকাজের আদেশ ও অসৎ কাজ হইতে বিরত রাখার বুনিয়াদ শুধু মঙ্গলের উপরই নয় বরং বিপদে পড়াও একটা বড় উদ্দেশ্য অর্থাৎ শুধু যে মানুষের মঙ্গল সাধনই হইবে এইজন্য আল্লাহ্ তা'আলা ইহাকে মুসলমানের উপর ফরয করেন নাই বরং যাহার উপর ফরয করা হইয়াছে তাহার ধৈর্য ও শৌর্য পরীক্ষা করাও আল্লাহ্-তা'আলার একটি প্রধান উদ্দেশ্য।

ফরয আদায় করা যখন রহিত হইয়া গিয়াছিল তখন যতদূর আমার মনে হয় ইমাম সাহেবের মতে লক্ষ্যস্থলে পেঁছার জন্য কঠিন বিপদের ঝুঁকি মাথায় লওয়ার প্রয়োজন ছিল না। যদি তাহাই হইত তবে ফরয রহিত হওয়ার অর্থ কি? বরং লোকে শুনা ও জানা হইতে নিরাশ হওয়ার পরও লোককে সৎকাজের উপর প্রতিষ্ঠিত রাখার জন্য এবং

অন্যায় এবং অসৎ কাজ হইতে বিরত রাখার কোন সম্ভাব্য পথ যদি বাকী থাকে তবে ইমাম সাহেবের মতে সেই চরম বিপদের ঝুঁকি মাথায় লওয়ার পরিবর্তে অথবা নিজকে হত্যা করাইয়া বা এই প্রকার কোনরূপ ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার চেয়ে সেই সম্ভাব্য উপায়ে যতটা পারা যায় এবং জ্ঞান যে দিকে পথ প্রদর্শন করে সেই পথে লাভবান হওয়ার চেষ্টা করিবে। তাঁহার কথার অর্থ ইহাই—

"সত্যের প্রতিষ্ঠা এবং অন্যায় হইতে বিরত রাখার পথ-নির্দেশকারী যদি নিহত হইয়া যায় তবে উহা মুসলিম জনসাধারণের জন্য কোন প্রকারেই লাভজনক কাজ হইবে না।"

বরং নিহত ব্যক্তির নিজস্ব উপকার হইবে। তাছাড়া এমন নিহত ব্যক্তি শহীদদের নেতা হইবে ইহার চেয়ে বড় লাভের বিষয় আর কি হইতে পারে? কিন্তু ইহা তো নিজস্ব লাভ ব্যতীত আর কিছুই নহে। মুসলিম জনসাধারণের জন্য উহাতে কোন প্রকার লাভ নাই। ইমাম সাহেব এই ধারণাও পোষণ করিতেন যে, কোন কোন স্থানে এই চরম পরিণামই মানুষের উৎসাহ এবং উদ্দীপনাকে নষ্ট করিয়া দেয়। তাই ফরয আদায় করা রহিত হইয়া যাওয়ার পর এইরূপ চরম বিপদের ঝুঁকি কাঁধে লইয়া ইমাম সাহেবের দৃষ্টিভঙ্গিতে কাজের শেষ পন্থা অবলম্বন বলিয়া বিবেচিত হইত।

উহাকেই আমি ইমাম সাহেবের রাজনৈতিক পদ্ধতি বলিয়া মনে করি।

হযরত যায়দের সঙ্গে ইমাম সাহেবের জিহাদে অংশগ্রহণ না করার কারণ

এখন প্রশ্ন উঠে হযরত যায়দ (রাঃ) সম্পর্কে। ইমাম সাহেব এই কাজের জন্য শর্ত আরোপ করিয়াছিলেন যে, একনিষ্ঠ সত্যবাদী লোক যদি অগ্রসর হয় এবং তাহাদের নেতা এমন ব্যক্তি হয় যাহার উপর ভরসা করা যায় যে, ধর্মের সীমালঙ্ঘন করিবে না—এই অবস্থায় ইমাম সাহেবও অগ্রসর হওয়ার ফতওয়া দিয়াছেন। এই ফতওয়া দেওয়ার পরও কেন ইমাম সাহেব নিজে অত্যাচারের বিরুদ্ধে জিহাদে অংশগ্রহণ করিলেন না? এই উত্তর ইমাম সাহেব পূর্বেই দিয়াছেন। যেমন—"যদি আমি জানিতাম যে লোকে হযরত যায়দকে পরিত্যাগ করিবে না বরং একনিষ্ঠভাবে ছায়ার ন্যায় তাহাকে অনুসরণ করিবে তবে অবশ্যই আমি তাহার সঙ্গী হইতাম; বিপক্ষের সাথে জিহাদ করিতাম, কেননা তিনি প্রকৃত ইমাম।"

জীবনের চল্লিশটি বৎসর ইমাম সাহেব কূফায় অতিবাহিত করিয়াছেন। কূফাবাসীদের সম্বন্ধে তিনি ব্যতীত অধিক আর কে অবগত থাকিতে পারে! পূর্বে বলিয়াছি যে, হযরত যায়দের বিশেষ দূত ফুযায়ল ইবনে যুবায়রকে ইমাম সাহেব জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—"শ্রেষ্ঠ আলিমদের মধ্যে কোন্ কোন আলিম হযরত যায়দের নিকট গমনাগমন করেন?" জিজ্ঞাসা করার উদ্দেশ্য ছিল আজ যাহারা উৎসাহ দিতেছে প্রয়োজনের সময়ে তাহারাই ভাগিয়া যাইবে। এই সন্দেহ শুধু ইমাম সাহেবেরই ছিল না বরং কূফার সর্বজনপ্রিয় ইমাম আমাশ তো শপথ করিয়াই বলিয়াছিলেন; "আল্লাহ্‌র কসম! প্রয়োজনের সময়ে অবশ্যই লোকে হযরত যায়দকে পরিত্যাগ করিবে, দুশমনের হাতে ছাড়িয়া দিবে।" সালমা ইবনে কুহাইল যিনি একনিষ্ঠ ভক্ত এবং উৎসাহী ছিলেন তিনিও বারবার এই কথাই বলিয়াছিলেন।

হযরত যায়দের এই সময়কার সাথী হযরত 'আবদুল্লাহ্ ইবনে 'আব্বাসের পৌত্র দাউদ ইবনে আলীও অনেক অনুনয়-বিনয় সহকারে বলিয়াছিলেন—"হে আমার (চাচাতো) ভাই! কূফাবাসী আপনাকে ধোঁকা দিতেছে। ইহা কি সত্য নয় যে—আপনার চেয়ে বুযুর্গ আপনার পর দাদা হযরত আলী (কঃ)-কেও ইহারা পরিত্যাগ করিয়াছিল এবং তিনি শহীদ হইয়াছিলেন। হযরত ইমাম হাসান (রাঃ)-এর সহিতও এই ব্যবহার করিয়াছিল। প্রথমে তাঁহার হাতে বায়'আত গ্রহণ করিয়াছিল, পরে বিগড়াইয়া গিয়া তাঁহার গায়ের চাদর ছিনাইয়া লইয়াছিল এবং তাঁহাকে আঘাত করিয়াছিল। আপনার দাদা হযরত হুসাইন (রাঃ)-কেও ইহারা ইয়াযীদের বিরুদ্ধে দাঁড় করাইয়াছিল, তাহার নিকট শপথ করিয়াছিল পরে পরিত্যাগ করিয়াছিল। এইখানেও তাহারা ইতি না টানিয়া আপনার পিছনেও লাগিয়াছে। পরিশেষে তাহারা আপনাকেও নিহত করিবে।"

সর্বোপরি নবী পরিবারের হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে হাসান যখন মদীনা হইতে এই সংবাদ জানিতে পারিলেন তখন তিনি হযরত যায়দকে লিখিলেন, "কূফাবাসীকে দেখিতে খুবই ভক্ত এবং সরল বিশ্বাসী মনে হয়। কিন্তু ইহারা অন্তঃসারশূন্য। যখন শান্তিতে থাকে তখন একটা কিছু করার জন্য উদগ্রীব হইয়া উঠে। কিন্তু যখন কিছু করার মত সামনে আসে তখন ঘাবড়াইয়া যায়; অথবা বাক-বিতণ্ডা করে, আগে আগে কথা বলে। কিন্তু তাহাদের মনের ও অন্তরের ভাষা সম্পূর্ণ আলাদা।"

"আমাকে কূফায় আসার জন্য ইহারা অহরহ পত্র লিখে সংবাদ পাঠায়, কিন্তু তাহাদের সেই আহ্বান আমার কর্ণকুহরে প্রবেশ করে না। তাহাদের সম্পর্কে আমার অন্তরে পর্দা পড়িয়া গিয়াছে। তাহাদের সম্বন্ধে হযরত আলী ইবনে আবূ তালিব বলিয়াছেন—ইহাদিগকে ছাড়িয়া দিলে ভিতরে প্রবেশ করে; যুদ্ধ করিতে বলিলে অলসতা করে। লোকে কোন ইমামের আনুগত্য স্বীকার করিতে চাহিলে ইহারা বিরোধিতা করে, কোন শ্রমের কাজ করিতে বলিলে পিঠ দেখাইয়া চলিয়া যায়।"

কূফাবাসীদের সম্পর্কে ইমাম সাহেবও এই অভিমত পোষণ করিতেন। দীর্ঘ দিন তাহাদের সাহচর্যে থাকিয়া তাঁহার দূরদৃষ্টি তাঁহাকে যাহা দেখাইতেছিল উহাতে এইরূপ ধারণা করা তাঁহার পক্ষে মোটেই অন্যায় হয় নাই। আবার কাহারও মতে ইমাম সাহেব জিহাদে অংশগ্রহণ না করার জন্য কিছু ওযর-আপত্তিও উত্থাপন করিয়াছিলেন। মুফিক এই সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন—"ইমাম সাহেব অসুস্থতার কথা বলিয়াছিলেন যাহা সময়-অসময় দেখা দিত।'

আল্লাহ্ জানেন ইমাম সাহেব কি প্রকার অসুস্থ ছিলেন। হইতে পারে তিনি অসুস্থ ছিলেন কিংবা সম্ভবত জিহাদে অংশগ্রহণ করার জন্য পিতা-মাতার অনুমতি গ্রহণ করাও তো একটি শর্ত। এক ব্যক্তি জিহাদে অংশগ্রহণ করার ইচ্ছা প্রকাশ করিলে নবীজী জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, 'তোমার পিতা-মাতা জীবিত আছে কি?' হ্যাঁ বোধক উত্তর পাওয়ার পর ইরশাদ করিয়াছিলেন—'যাও, তাহাদের জন্য জিহাদ কর।' অর্থাৎ পিতা-মাতার খিদমত কর।

ইমাম সাহেব হয়ত মায়ের ওযর উত্থাপন করিয়াছিলেন। কেননা তিনি মায়ের এতটা খেয়াল করিতেন যে, ইবনে হুবায়রা যখন তাঁহাকে চাবুক দ্বারা প্রহার করিয়াছিলেন তখন নিজের কষ্টের প্রতি খেয়াল না করিয়া বলিয়াছিলেন—"প্রহারের ব্যথার চেয়ে মা যে কষ্ট পাইবেন উহাই আমার জন্য অধিক বেদনাদায়ক।"

মাথায় ও মুখমণ্ডলে যখন চাবুকের আঘাত পড়িল তখন তিনি কাঁদিয়া ফেলিয়াছিলেন। জিজ্ঞাসা করা হইলে তিনি বলিয়াছিলেন, 'আমার মায়ের কথা স্মরণ হইয়াছে। তিনি আমার মুখমণ্ডল চাবুকের আঘাত দেখিলে না জানি কত ব্যথা পাইবেন। এই সমস্ত বিপদাপদের

চেয়ে আমার মায়ের দুঃখই আমার নিকট অধিক বেদনাদায়ক।[১] যাহা হউক তিনি এইরূপ কিছুই হয়ত বলিয়াছিলেন। কিন্তু আসল কথা ছিল কুফাবাসীদের বিশ্বাসঘাতকতা। এই দৃঢ় বিশ্বাসের পর ফরয আদায় করা অবশ্য রহিত হইয়া গিয়াছিল। ইচ্ছা করিলে তিনি এই পর্যায়ের অন্যান্য বুযুর্গ যেমন আমাশ, সুফইয়ান সওরী যাহা করিয়াছিলেন তিনিও তেমনি কিছু করিতে পারিতেন অর্থাৎ না নিষেধ করিতেন, আর না অংশগ্রহণ করিতেন এবং হযরত যায়দ সম্পর্কে এই ধারণাই পোষণ করিতেন যে বিপদের চরম সীমায়ই পেঁাছিয়া তাঁহার পূর্ব-পুরুষদের ন্যায় শহীদদের নেতার মর্যাদা অর্জন করিতেন—যেমন সুফইয়ান সাওরী বলিতেন।

কিন্তু ইহাকে আপনি সাময়িক দৃষ্টিভঙ্গিই বলুন বা অন্য কিছুই বলুন পরিণতি এবং রহস্যের দিক হইতে কূফার এই সমবেত জনতা যাহাই হউক না কেন তাহারা এমন এক মহান ব্যক্তির অনুসরণ করিয়াছিল যাহার সম্বন্ধে আমাদের ভাষায় বলা যায়, যদি তাহারা হযরত যায়দের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা না করিত তবে তিনি তাহাদিগকে সঠিক পথে আনিতে পারিতেন।

জিহাদের জন্য ইমাম সাহেবের আর্থিক সাহায্য

এই প্রকার আলাপ-আলোচনার পর হযরত ইমাম সাহেব দশ বিশ টাকা নয় বরং তাঁহার ব্যবসায়ের প্রারম্ভিক যুগে (কারণ তখনও তিনি হাম্মাদ ইবনে আবু সুলায়মানের নিকট শিক্ষা গ্রহণার্থে গমনাগমন করিতেন)—হাযার টাকার দশটি থলে আনিয়া ফুযায়ল ইবনে যুবায়রের হাতে দিয়া বলিলেন—'আমি অর্থ দ্বারা হযরতের খিদমত করিতেছি।

---

১. ইমাম সাহেবের মাতৃভক্তি সম্বন্ধে অনেক ঘটনা আছে। তন্মধ্যে একটি এই যে কূফা শহরে যারআ নামক একজন ওয়ায়েজ ছিলেন। ইমাম সাহেবের মা প্রায়ই তাঁহার ওয়াজ শুনিতে যাইতেন এবং তাহার খুব ভক্ত ছিলেন। একবার তিনি ইমাম সাহেবের নিকট একটি মাস-আলা জিজ্ঞাসা করিলেন। ইমাম সাহেব যথাযথ উত্তর দিলেন। মা বলিলেন—'যারআর মতামত না জানা পর্যন্ত আমার তৃপ্তি হইবে না।' ইমাম সাহেব মাকে সাথে লইয়া যারআর বাড়ী গেলেন। ঘটনা শুনিয়া তো যার'আর চক্ষু স্থির, বেচারা মাসআলা সম্বন্ধে কি জানিবেন? অতঃপর বলিলেন—'বেগম সাহেবা! আপনার ছেলে যে উত্তর দিয়াছেন উহাই ঠিক।' ইমাম সাহেব মাকে সাথে লইয়া বাড়ী ফিরিয়া আসিলেন।

হযরতের নিকট আমার অনুরোধ এই যে, এই অর্থ দ্বারা যেন তিনি তাঁহার শত্রুদের বিরুদ্ধে শক্তি সঞ্চয় করেন।'

যাহারা প্রশ্ন করেন যে, ইমাম সাহেব কেন এইরূপ ব্যাপক আকারে ব্যবসা-বাণিজ্য করিতেন, এই প্রশ্নের উত্তর উপরিউক্ত ঘটনার মধ্যেই নিহিত রহিয়াছে। তাহাছাড়া ভবিষ্যতে যাহা কিছু হইতে পারে উহার সম্বন্ধে ইমাম সাহেবের ধারণা বদ্ধমূল থাকা সত্ত্বেও তিনি হয়ত মনে করিয়াছিলেন যে, পরিণাম এখনও দূরে, উহার সম্বন্ধে অবস্থাদৃষ্টে বদ্ধমূল ধারণা পোষণ করা স্বভাববিরুদ্ধ। তাই তিনি দৈহিকভাবে অংশগ্রহণ করেন নাই বলিয়া যে-কোন মতেই অংশগ্রহণ করিবেন না, ইহা তিনি ভাল মনে করেন নাই। তাই সেই সময়কার আর্থিক সঙ্গতি অনুযায়ী তিনি বেশ বড় রকমের অর্থ সাহায্য করিয়াছিলেন। এই সম্পর্কে হযরত যায়েদের পুত্র মুহাম্মদ বলেন, ইমাম সাহেব আর্থিক সাহায্য করার সময় বলিয়াছিলেন—'আপনার পরিবারের লোকের জন্য এবং আপনার হীনবল সঙ্গীদের জন্য এই অর্থ ব্যয় করুন।'

'আপনার হীনবল সঙ্গীদের' কথা দ্বারা আর্থিক অভাবের প্রতি ইঙ্গিত করা হইয়াছে। অর্থাৎ যাহারা টাকা-পয়সার অভাবে যুদ্ধের সরঞ্জাম সংগ্রহে অসমর্থ তাহাদিগকে এই টাকা দিয়া উহা ক্রয় করিয়া দিন।

ইহাতে একটি সূক্ষ্ম বিষয় পরিলক্ষিত হয় যে, অস্ত্রের অভাবে যাহারা জিহাদে শরীক হইতে অপারগ ছিল, ইমাম সাহেব তাহাদিগকে আর্থিক সাহায্য করিয়া যেন জিহাদে অংশগ্রহণ করিলেন। হজ্জ ফরয হওয়া সত্ত্বেও যেমন কেহ ওযরবশত হজ্জ করিতে না পারিয়া বদল হজ্জ করায় অর্থাৎ টাকা-পয়সা দিয়া অন্যকে দিয়া নিজের নামে হজ্জ করাইয়া থাকে তেমনি ইমাম সাহেবও যেন যে-কোন কারণবশতই জিহাদে অংশগ্রহণ করিতে না পারিয়া বদল জিহাদের পন্থা অবলম্বন করিয়াছিলেন। হয়ত ইমাম সাহেব মনে করিয়াছিলেন, পরিণতি সম্পর্কে আমার ধারণা ভ্রান্তমূলক হইলেও আর্থিক সাহায্য করায় জিহাদের পুণ্য হইতে বঞ্চিত থাকিব না। আবু জাফর বলেন, আমি ইমাম সাহেবকে বলিতে শুনিয়াছি, 'সৎকাজের আদেশ ও অসৎ কাজ হইতে বিরত রাখার ব্যাপারে যে অলসতা করিয়াছি তজ্জন্য আমি আল্লাহ্‌র নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি।'

দৈহিক অংশগ্রহণ না করায় অলসতা সম্বন্ধেই হয়ত ইমাম সাহেব ঐ কথা বলিয়াছিলেন। কারণ উহা ছিল ইজতিহাদী অর্থাৎ গবেষণামূলক মাসআলা। কারণ সৎকাজে আদেশ এবং অসৎ কাজ হইতে বিরত থাকার

ফরয রহিত হওয়ার সময় যে আসিয়া পড়িয়াছে, একথা বলা সহজসাধ্য ছিল না। বিশেষ করিয়া এমন অবস্থা হযরত যায়দের সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছিল যে, লোকে তাঁহার সাহায্যার্থে আগাইয়া আসিয়াছিল এবং অবস্থার মুকাবিলা করার জন্য তৎকালীন শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিগণ তাঁহার হাতে হাত মিলাইয়াছিলেন। এতদসত্ত্বেও নিজস্ব ইজতিহাদ ও অনুভূতির উপর ভিত্তিস্থাপন করিয়া জিহাদে কায়িক অংশগ্রহণ না করার সিদ্ধান্তে পেঁাছান সহজ কথা ছিল না।

বাস্তবিকপক্ষে এই সময়টা ইমাম সাহেবের পক্ষে খুবই সন্ধিক্ষণ ও ঈমানের শক্তি যাচাই করার সময় ছিল। একদিকে প্রকাশ্য অবস্থা যাহা তিনি স্বচক্ষে দেখিতেছিলেন—উহাতে জিহাদে অংশগ্রহণ না করার কোন কারণ থাকিতে পারে না। অন্যদিকে তিনি তাঁহার চল্লিশ বৎসর বয়সের অভিজ্ঞতা, জ্ঞান এবং ঐতিহাসিক ঘটনাবলী হইতে কূফা এবং কূফাবাসী-দের সম্বন্ধে যাহা অবগত হইয়াছিলেন উহাতে তিনি বদ্ধমূল ধারণা পোষণ করিতেন এবং জানিতেন পরিণতি কি হইবে। যদি তিনি প্রকাশ্যে ব্যক্তিগতভাবে জিহাদে অংশগ্রহণ করেন তবে পরিণতি যাহা হইবে তাহার ফরয রহিত হওয়ার পর মুসলমানদের ধর্মীয় উন্নতির জন্য তিনি যে পরিকল্পনা করিয়াছিলেন, বনী উমাইয়াদের হাতে যে উহার কি অবস্থা হইবে উহাও তিনি জানিতে পারিয়াছিলেন। কোন কোন ঐতিহাসিক বলিয়াছেন, 'হযরত যায়দকে সাহায্য করা ফরয'—এই সম্বন্ধে ইমাম সাহেব অতিসংগোপনে ফতওয়া দান করিতেন। তিনি নিজেও গোপনে আর্থিক সাহায্য করিতেন।'

তাই দেখা যায় ইমাম সাহেব গোপনে সাধ্যানুযায়ী সাহায্য করিতেন। আমি তো ইহার উদ্দেশ্য এই মনে করি যে, এই জিহাদের পরিণতি কি হইবে এবং পরিণতির পরও যে ভয়াবহ অবস্থার সৃষ্টি হইবে উহা বন্ধ করার জন্যই ইমাম সাহেব এই গোপন পন্থা অবলম্বন করিয়াছিলেন।

কিন্তু ইমাম সাহেবের এই রাজনৈতিক কার্যকলাপ সরকার পক্ষের নিকট অজ্ঞাত রহিল না। যদিও হযরত যায়দের শাহাদত বনী উমাইয়া-দের জন্য ধ্বংস ডাকিয়া আনিয়াছিল এবং সাত বৎসরের মধ্যেই তাহারা শাসন ক্ষমতা হইতে বহিষ্কৃত হইয়াছিল, তথাপি এই সময়ের মধ্যে ইমাম সাহেবকে সরকার পক্ষীয় করার জন্য যতটা সম্ভাব্য পন্থা ছিল

উহা প্রয়োগ করা হইয়াছিল।[১] দামেশ্‌কে যখন এই সংবাদ পৌঁছিল তখন শুধু সরকার বা সরকার পক্ষীয় লোকেই নয় বরং আলিমগণও ইমাম সাহেবের এই কার্য সম্বন্ধে সমালোচনা করিয়াছিলেন। সিরিয়ার প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস ফকীহ্‌ এবং মুজতাহিদ ইমাম আওযায়ী বলিয়াছেন, 'তরবারি গ্রহণ না করা পর্যন্ত আমরা ইমাম আবু হানীফা (রঃ)-এর সকল কথাই নির্বিবাদে মানিয়া লইয়াছি। কিন্তু তিনি বিদ্রোহীদের দলে যোগদান করার পর আর আমরা ধৈর্য ধারণ করিতে পারিলাম না।'

ইহাতে মনে হয় সেই সময় যাহারা আহলে সুন্নত ওয়াল-জামা'আত-ভুক্ত আলিম ছিলেন তাঁহাদের মধ্যে নির্ভরযোগ্য একটি দলও ইমাম সাহেবের বনী উমাইয়াদের বিরুদ্ধে যাওয়া সমর্থন করেন নাই। অবস্থা যাহাই হউক না কেন হযরত যায়দ (রঃ)-এর জিহাদে আর্থিক সাহায্য করার পর হইতে ইমাম সাহেব পিছ-পা হওয়ার পরিবর্তে সামনের

---

১. পরবর্তী সাত বৎসরে পাঁচজন বাদশাহ রাজত্ব করিয়াছিলেন। গড়পড়তা এক বৎসর কয়েক মাসের বেশী শাসন ক্ষমতায় থাকা কাহারও ভাগ্যে হইয়া উঠে নাই। এই ধ্বংসের মূলে ছিলেন আহমদ তনয় হিশাম। তিনি বহুদিন পর্যন্ত নবী পরিবারকে মদীনায় অন্তরীণ করিয়া রাখিয়াছিলেন। অর্থের লোভে খালিদের ভিত্তিহীন কথায় হিশাম হযরত যায়দকে কূফায় যাওয়ার আদেশ দিলেন। হযরত যায়দ সেখানে বিদ্রোহ করার পর শহীদ হইলেন। তাঁহাকে অতি গোপনে দাফন করা হইল। কিন্তু কূফার শাসনকর্তা ইউসুফ প্রভুর মনস্তুষ্টি করার মানসে হযরত যায়দের লাশ অনুসন্ধান করিয়া বাহির করার পর দেহ হইতে মস্তক ছিন্ন করিয়া হিশামের নিকট পাঠাইয়া দিলেন। হিশাম সেই পবিত্র মস্তক দামেশ্‌কে প্রকাশ্য রাজপথে লটকাইয়া রাখার নির্দেশ দেন। ইউসুফকে লিখিলেন মস্তকবিহীন দেহ যেন কূফার রাজপথে লটকাইয়া রাখা হয়। এক বৎসর দুই মাস পর্যন্ত এই পবিত্র দেহ বস্ত্রবিহীন অবস্থায় লটকানো ছিল। এই সময়ের মধ্যে হিশাম মৃত্যুবরণ করিলে ওয়ালিদ ক্ষমতাসীন হন। ওয়ালিদের শাসনকালে হযরত যায়দের পুত্র ইয়াহ্‌ইয়া বলখের জুযেজান জেলায় শহীদ হন। পিতার ন্যায় তাহার মৃতদেহও রাজপথে লটকাইয়া রাখা হয়। খুরাসান, ইরাক এবং সিরিয়া পর্যন্ত যেন একটি তামাশার বস্তু (নাউযুবিল্লাহ) লোকের দেখার জন্য লটকাইয়া রাখা হইয়াছিল।

কিন্তু হযরত (সঃ)-এর উম্মতের উপর ইহার পরিণতি কতটা প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করিতে পারে, ক্ষমতার মোহে বনী উমাইয়াগণ উহা ভুলিয়া

দিকেই অগ্রসর হইতে থাকেন। চল্লিশ বৎসর বয়স হইতে সত্তর বৎসর বয়স পর্যন্ত মধ্যস্থতায় এবং পরিশেষে বিনা মধ্যস্থতায় এই ঘটনাবলীর মধ্যেই অতিবাহিত করেন। এমন কি পরিশেষে ঐ পথেই তাহাকে চলিতে হইয়াছিল—বৎসরের পর বৎসর তিনি যে পথ তৈরী করিতেছিলেন। যতদূর সম্ভব এই উদ্দেশ্যেই তিনি এই পথ অবলম্বন করিয়াছিলেন।

গিয়াছিল। বনী আব্বাসীয়দের পক্ষীয় আবূ মুসলিম খুরাসানে যে কৃতকার্য হইয়াছিলেন, আমার মনে হয় উহার মূলে ছিল বনী উমাইয়াদের হৃদয়হীনতা। কারণ খুরাসানে বনী আব্বাসীয়দের শাসনক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর তাহাদের প্রথম কার্য ছিল হযরত ইয়াহ্ইয়ার লাশ নামাইয়া নামাযে জানাযা দিয়া যথারীতি দাফন করা। সাত দিন পর্যন্ত খুরাসানের প্রত্যেকটি ঘরে শোক প্রকাশ করা হইয়াছিল। শুধু ইহাই নহে; কোন কোন ঐতিহাসিকের মতে এক বৎসর পর্যন্ত খুরাসানে যত পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করিয়াছিল তাহাদের নাম ইয়াহইয়া অথবা যায়দ রাখা হইয়াছিল।

ঐতিহাসিক মাসউদী বলেন, চৌদ্দ মাস পর ওয়ালিদ হযরত যায়দের দেহ জ্বালাইয়া ভস্মে পরিণত করিয়া নদীবক্ষে ফেলিয়া দেয়। ইহার প্রতিশোধ গ্রহণার্থে বনী আব্বাসীয়গণ শাসন ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর একমাত্র হযরত উমর ইবনে আবদুল আযীয ব্যতীত বনী উমাইয়াদের সকল শাসকের মৃতদেহ কবর খুঁড়িয়া বাহির করিয়াছিল। ছয় সাত বৎসর পরও হিশামের দেহ অবিকল অবস্থায় পাওয়া গিয়াছিল। তাহার সেই মৃতদেহে অসংখ্য চাবুক মারার পর তাহারা তাহা জ্বালাইয়া নদীতে নিক্ষেপ করিয়াছিল। মুয়াবিয়ার পুত্র ইয়াযীদের একখানা অস্থি ব্যতীত আর কিছুই পাওয়া যায় নাই। বনী উমাইয়াদের আশি জন শাহজাদাকে বাঁধিয়া চিৎভাবে শোয়াইয়া তাহাদের উপর বিছানা পাতিয়া খাবার টেবিলে পরিণত করা হইয়াছিল।

বনী উমাইয়াদের শেষ খলীফা মারওয়ান মিসরে নিহত হইলে তাহার পরিবারবর্গ যে গগণভেদী বিলাপ ও চিৎকার করিয়াছিল, ইতিহাসের এই মর্মান্তিক অধ্যায় পাঠ করা যায় না। তাহাদের ভাগ্যে যাহা ছিল তাহাই হইল। কিন্তু হিশামের মৃত্যুর সময় তাহার ভাইবন্ধু যে ব্যবহার করিয়াছিল তাহাও হৃদয়বিদারক। মৃত্যুর কিছুক্ষণ পূর্বে পানি চাহিলে ওয়ালিদ পানি দেন নাই। তখন হিশাম—'আমি ওয়ালিদের জন্য শুধু ধন সঞ্চয় করিয়াই গেলাম' বলিতে বলিতে মৃত্যুবরণ করেন। মৃত্যুর পর

কিন্তু যতদিন পর্যন্ত তিনি ভিন্ন উপায়ে লাভবান হওয়ার সুযোগ পাইয়াছিলেন, উহা গ্রহণ করিয়াছিলেন। অতঃপর মানব জীবনের সর্বশেষ কঠিন সমস্যা দেখা দেয় উহার সমাধান করিতেও তিনি কৃতকার্য হইয়াছিলেন। অন্য কথায় অত্যাচারী শাসকদের সম্মুখে সত্য প্রকাশ করিয়া শাহাদতের শরবত পান করিয়া মৃত্যুর ন্যায় কঠিন সমস্যাকেও নিজের জন্য সহজ করিয়া লইয়াছিলেন। এখন আমরা এই সম্বন্ধেই বিস্তারিত আলোচনা করিব।

পানি গরম করার জন্য একটি পাত্রও পাওয়া যায় নাই। হিশামের দাস গালিব নিজস্ব অর্থে কাফনের কাপড় খরিদ করিয়া দিয়াছিল। তাই দেখা যায় হিশাম উনিশ বৎসর যাবৎ যে অর্থ সঞ্চয় করিয়া পরবর্তীদের জন্য রাখিয়া গিয়াছিল সেই অর্থ নিজের কোন কাজে আসে নাই।

দ্বাদশ অধ্যায়

কূফার অত্যাচারী শাসকের সামনে প্রথম সত্য প্রকাশ

হযরত যায়দ (রঃ)-এর শাহাদতের পূর্বে ইমাম সাহেবের রাজনৈতিক মনোভাব সম্বন্ধে কোন ঘটনা আমরা পাই না। ইতিহাসে শুধু একটি ঘটনা উহা এই যে, খৃস্টানীর পুত্র খালিদ যখন কূফার শাসক ছিল তখন সে সময়কার নিয়মমত শাসনকর্তাই নামাযে ইমামতি করিতেন। খালিদ একদিন জুম'আর নামায আদায় করার মানসে খুতবা পাঠ করার জন্য মিম্বরে দাঁড়াইল। কিন্তু একখানা সরকারী চিঠি পাঠে এমনই মগ্ন হইয়া গেল যে, সময় অতিবাহিত হইয়া আসরের নামাযের সময় প্রায় হইয়া গেল। এই ঘটনার বর্ণনাকারী আবূ সালিহ্ বলেন, 'আমি সেই জুম'আয় ঐ মসজিদে ছিলাম। কিন্তু কোন লোকই আমার পরিচিত ছিল না। এমন সময় দেখিলাম মুসল্লীদের মধ্য হইতে এক ব্যক্তি দাঁড়াইয়া বলিলেন, জুম'আর নামাযের সময় চলিয়া গিয়াছে, আসর নামাযের সময় আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে।'

আবূ সালিহ বলেন, তৎক্ষণাৎ সেই ব্যক্তিকে গ্রেফতার করার আদেশ দেওয়া হইল। আমি আমার পার্শ্ববর্তী লোকের নিকট উক্ত ব্যক্তির পরিচয় জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে পারিলাম, তিনি নুমান, আবূ হানীফা। অতঃপর খালিদ নামায শেষ করিয়া ইমাম সাহেবকে তাহার সম্মুখে হাযির করাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "সত্য বল! কেন তুমি একথা বলিলে?"

ইমাম সাহেব উত্তর করিল, 'নামাযের সময় কাহার জন্য অপেক্ষা করে না!' আল্লাহ্ তা'আলা কুরআনে ইরশাদ করিয়াছেন। আর তোমারই অধিক দায়িত্ব কুরআনের আদেশ পালন করা। অতঃপর তিনি এই আয়াত পাঠ করিলেন—

اضاعوا الصلوة واتبعوا الشهوات -

"তাহারা সালাত ধ্বংস করিল এবং বাসনার পিছনে লাগিয়া রহিল।"

অতঃপর পুনরায় খালিদ জিজ্ঞাসা করিল, "আল্লাহ্‌র কসম করিয়া বলিতে পার কি, সালাত ব্যতীত অন্য কিছু তোমার উদ্দেশ্য ছিল না।" ইমাম সাহেব বলিলেন, "হ্যাঁ, সালাত ব্যতীত আমার আর কোন উদ্দেশ্য

ছিল না।' অতঃপর খালিদ তাঁহাকে ছাড়িয়া দিল। (মানাকিবে মু'ফিক, ১৭২ পৃঃ ১ম জিলদ)

হযরত যায়দের শহীদ হওয়ার পূর্বে এই একটি ঘটনাই পাওয়া যায় যে, তিনি একজন পদস্থ রাজ-কর্মচারীর কাজে বাধা প্রদান করিয়াছিলেন। খালিদের মামুলী জিজ্ঞাসাবাদ, গ্রেফতার ও মুক্তি দেওয়ায় এই কথাই প্রমাণিত হয় যে, ইমাম সাহেবের অভ্যন্তরীণ মতবাদ তখনও লোকের নিকট প্রকাশ হয় নাই। লোকে তখনও তাহাকে একজন বিজ্ঞ আলিম এবং বিত্তবান ব্যবসায়ী হিসাবেই জানিত। কিন্তু হযরত যায়দকে গোপনে সাহায্য করিয়া থাকিলেও সরকারের চোখে তিনি ধরা পড়িলেন। ইহার পর বনী উমাইয়া হুকুমত এবং ইমাম সাহেবের মধ্যে কি সম্পর্ক বিদ্যমান ছিল সে সম্বন্ধে বিশেষ কিছু তথ্য পাওয়া যায় না।

কিন্তু হাজ্জাজের বংশ বনী সাকীফ গোত্রীয় হাকাম ইবনে হিশাম সাকাফী রাষ্ট্রের এবং ইমাম সাহেবের সম্পর্ক সম্বন্ধে বলেন, "হুকুমত কোষাগারের চাবি তাহার হাতে দিতে ইচ্ছা করিয়াছিল (অর্থাৎ ইমাম সাহেব খাজাঞ্চীর পদ গ্রহণ করুন অথবা চাবুকের আঘাত দ্বারা পিঠ জর্জরিত করুন)। কিন্তু সেই ব্যক্তি (ইমাম সাহেব) আল্লাহ্‌র শাস্তি ভোগ করার পরিবর্তে শাসক গোষ্ঠীর শাস্তিই গ্রহণ করিলেন।"

এই কথা শ্রবণকারী হাকামকে বলিলেন—"আপনি তো এমন কথা বলিলেন, 'যাহা আমরা আর কাহারও নিকট শুনি নাই।'

হাকাম বলিয়াছিলেন—'আমি যাহা বলিয়াছি তাহাই ঠিক।'

দেখিতে তো হাকামের এই বর্ণনা কয়েকটি শব্দের সমষ্টি মাত্র। কিন্তু যতদূর আমার মনে হয় হাকামের এই উক্তি যদি সত্য হয় (আর সত্য না হওয়ারও কোন কারণ নাই), হাকাম যেমন তাহার উক্তিতে গুরুত্ব দিয়াছেন এতটা গুরুত্ব যদি দেওয়া যায় এবং শ্রবণকারী শুনিয়া যাহা কিছু বলিয়াছিল, যদি ঐসব কিছুকে সম্মুখে রাখা যায় আর ধরিয়া লওয়া যায় যে, ইমাম সাহেবের জীবন-চরিত রচয়িতাগণ যে সমস্ত ঘটনা বনী উমাইয়া শাসক ইবনে হুবায়রার দিকে ইঙ্গিত করিয়াছেন। তবে প্রকৃতপক্ষে উহা ইবনে হুবায়রার নয় বরং স্বয়ং হাকামের বাণী অর্থাৎ ইহাই ছিল বনী উমাইয়াদের সরাসরি পন্থা।

অবশ্য এই পন্থা ইবনে হুবায়রার মুখে প্রকাশ হইয়া হাকাম কর্তৃক বর্ণিত হইয়াছিল। উহার অর্থ এই দাঁড়ায় যে, প্রথমে হুকুমতের নীতি

ছিল ইমাম সাহেবের সম্মুখে টাকা পয়সার সাথে পদমর্যাদা ঘুষ দেওয়া। উহা কি প্রকার ঘুষ ছিল ? হুকুমতের কোষাগারের চাবি পর্যন্ত তাহার হাতে দেওয়ার প্রস্তাব করা হইয়াছিল। একথা বলা যাইতে পারে না যে, খাজাঞ্চীর পদ কূফার কোষাগার পর্যন্তই সীমিত ছিল। বরং সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হইয়াছিল যে, ইমাম সাহেব রাযী থাকিলে কেন্দ্রীয় কোষাগার দামেশ্কের খাজাঞ্চীর পদে তাহাকে নিয়োগ করা হইবে। এই পদ ছিল বর্তমান যুগের সচিবের পদের ন্যায়।

সম্মুখে পরিলক্ষিত হইবে যে, এই খাজাঞ্চীর পদ কূফা পর্যন্তই সীমিত ছিল। কিন্তু হাকামের বর্ণনায় কোন নির্দিষ্ট স্থানের উল্লেখ না থাকায় কেন্দ্রীয় অর্থ সচিবের পদ ধরিয়া লইলে ভুল হইবে না। কিন্তু ইমাম সাহেব রাযী না হওয়ায় তাহাকে চাপ প্রয়োগ করা হইয়াছিল। তবে বল প্রয়োগ বা যাহা কিছু হইয়াছিল উহা কেন্দ্রীয় হুকুমতের ইঙ্গিতে হইয়াছিল।

হুকুমতে বনী উমাইয়ার সাথে ইমাম সাহেবের সম্পর্ক

হযরত যায়দ (রঃ)-এর শাহাদতের পর বনী উমাইয়াদের হুকুমতের উপর ক্রমাগত বিপদ-আপদ চাপিয়া আসিতেছিল। খলীফার পর খলীফা পরিবর্তন হইতেছিল। দেশের আনাচে-কানাচে একটির পর একটি বিদ্রোহ মাথাচাড়া দিয়া উঠিতেছিল। এই সময় যাহারা খিলাফতের আসনে সমাসীন হইতেন তাহারা একে অন্যের চেয়ে অধিক নির্দয়, অত্যাচারী ও অসংযমী ছিলেন। বিশেষ করিয়া বনী উমাইয়া খলীফাগণ কোন অনারবকে সম্মানের চোখে দেখিতেন না।

হযরত ইমাম হানীফা (রঃ)-এর একজন ছাত্র হাসান ইবনে যিয়াদ বলেন, "আমি ইমাম সাহেবকে বলিতে শুনিয়াছি, তিনি বলিয়াছেন, 'মাওয়ালী (অনারব) মুসলমান আলিমদিগকে ফতওয়া দেওয়ার জন্য বনী উমাইয়াদের দরবারে আহ্বান করা হইত না।" অতঃপর ইমাম সাহেব বলিয়াছিলেন, "সর্বপ্রথম যে মাওয়ালীকে ফতওয়া দেওয়ার জন্য আহ্বান করা হইয়াছিল তিনি ছিলেন অমুক ব্যক্তি।" ইমাম সাহেব তাহার নামও বলিয়াছিলেন।

ফতওয়ার জন্য ইমাম সাহেবের প্রথম আহ্বান

হাসান ইবনে যিয়াদ কেন নাম বলেন নাই তাহা আমরা জ্ঞাত নহে। কিন্তু আমাদের বিশ্বাস হযরত যায়দের শাহাদতের পর হিশামের ইঙ্গিতেই কূফার শাসনকর্তা ইউসুফ ফতওয়া জিজ্ঞাসার জন্য ইমাম সাহেবকে

আহবান করিয়াছিলেন। আর একথাও মনে হয় যে, ইমাম সাহেবের গোপন সাহায্য দানের কথা অবগত হইয়া প্রথমেই তাহারা চেষ্টা করিতে ছিল ইমাম সাহেবকে কিভাবে টোপ গিলানো যায়। এই জন্যই মাওয়ালী-দের সম্পর্কীয় প্রাচীন রীতি যাহা বনী উমাইয়াগণ একাগ্রতার সাথে পালন করিয়া আসিতেছিলেন উহা পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন।

সে যাহা হউক অতঃপর কূফার শাসনকর্তা আরব বংশোদ্ভব আলিমদের সমাবেশেই.....ইমাম সাহেবের নিকট ফতওয়া জিজ্ঞাসা করিল। শুধু ফিকাহ্ সম্পর্কীয় ইজতিহাদই নয় বরং ইমাম সাহেবের গভীর জ্ঞানের পরিচয়ও হুকুমত এই প্রথম পাইয়াছিল। দ্বিতীয়ত আরব বংশোদ্ভব আলিম-গণ যাহারা অনারবদিগকে দেখিতে পারিতেন না তাহারাও ইমাম সাহেবের জ্ঞানের পরিচয় লইয়া হতবাক হইয়া রহিলেন।

আমার মতে ইহাই ছিল প্রথম টোপ যাহা উমাইয়াগণ ইমাম সাহেবের সম্মুখে রাখিয়াছিলেন। ইহাতে আর কিছু উপকার হউক কিংবা না হউক একটি অনৈসলামিক নীতি মুসলিম সমাজ হইতে বিদায় গ্রহণ করিল। বনী উমাইয়াদের হুকুমত তখন চারিদিক হইতে বিপন্ন ছিল। দামেশ্কে খলী-ফার পর খলীফা নির্বাচিত হইতেছিলেন। আর উহার প্রতিক্রিয়া প্রদেশিক শাসনকর্তাদের উপরও পড়িতেছিল। হিশাম এবং ওয়ালিদের সময় ইউ-সুফই কূফার শাসনকর্তা ছিল। ওলালিদ নিহত হওয়ার পর য়াযীদ সিংহা-সনে বসিলেন। তখন ইউসুফের উপর বিপদের পাহাড় ভাঙ্গিয়া পড়িল এবং নিজের কর্মফল ভোগ করিয়া পৃথিবী হইতে বিদায় গ্রহণ করিলেন।

ইউসুফের পর মনসুর ইবনে জমহুর...কূফার শাসনকর্তা হইয়া আসি-লেন। কিন্তু কূফায় বিদ্রোহের মুকাবিলা করিতে না পারায় তাহাকে পদচ্যুত হইতে হয়। ইহার পর ইয়াযীদ উমর ইবন 'আবদুল আযীযের পুত্র —'আবদুল্লাকে ডাকিয়া বলিলেন, 'ইরাকবাসী তোমার পিতার ভক্ত ছিল, সুতরাং কূফার শাসনকর্তার পদে তোমাকে নিয়োগ করা হইল।' (কামিল ইবনে কাসীর)

কিন্তু কূফায় বিদ্রোহিগণ দুর্বার হইয়া উঠিয়াছিল। আবদুল্লাহ্ সেখানে গিয়াও নানা বিবাদের সম্মুখীন হইলেন। উহার মধ্যে 'আবদুল্লাহ্ ইবনে মু'আবিয়া ইবনে 'আবদুল্লাহ্ ইবনে জাফর ইবনে আবু তালিবের ঘটনাই ছিল প্রধান। ভীষণ যুদ্ধ ও অসংখ্য হতাহতের পর এই বিদ্রোহের দমন হইয়াছিল।

কূফায় যেহাক খারিজীর আধিপত্য

পাঁচ মাস কয়েকদিন খলীফা থাকার পর য়াযীদ ইবনে ওয়ালীদ মারা যান। সিংহাসনের অধিকারী কয়েকজনের মধ্যে অধিকার লইয়া হতাহতের বাজার গরম হইয়া উঠিল। কয়েকজনের হাতে বয়'আত গ্রহণ করা হইল, আবার বিদ্রোহ করিল। পরিশেষে মারওয়ান ইবন মুহাম্মদ ইবনে মারওয়ান জয়ী হইলেন। আর মারওয়ানই ছিলেন বনী উমাইয়াদের শেষ খলীফা। পারিবারিক ঝগড়া-বিবাদ হইতে নিষ্কৃতি পাইলেও তিনি খারিজীদের সাথে বুঝাপড়া করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন।

ইমাম সাহেবের গ্রেফতারী

যেহাক নামক একজন খারিজী সম্প্রদায়ভুক্ত লোক কূফার শাসনকর্তা আবদুল্লাহ ইবনে উমরকে পরাজিত করিয়া কূফা অধিকার করিলেন এবং সাথে সাথে ইমাম সাহেবকে বন্দী করার আদেশ দিলেন। ইমাম সাহেবের রাজনৈতিক কার্যধারা তখন গোপন ছিল না বলিয়াই খারিজিগণ ইমাম সাহেবকে বন্দী করার উপর এতটা গুরুত্ব দিয়াছিল।

বর্ণিত আছে, ইমাম সাহেবকে যেহাকের সম্মুখে উপস্থিত করা হইলে কেহ বলিয়াছিল, 'ইনিই কূফার মুসলমানদের মযহাবী নেতা।' খারিজিগণ অন্যান্য মুসলমানকে যেমন তওবা করাইত তদ্রূপ ইমাম সাহেবকেও বলিল, 'কুফরী হইতে তওবা কর।'

ইমাম সাহেব সদম্ভে উত্তর দিলেন, 'আমি প্রত্যেকটি কুফরী হইতে আল্লাহ্‌র নিকট তওবা করিতেছি।'

এই কথা শুনিয়া ইমাম সাহেবকে মুক্তি দেওয়া হইল। কিন্তু কোন দুষ্ট লোক খারিজীদিগকে বলিল, "তাহার কুফরীর অর্থ তোমাদের আকাইদ বা ধর্ম বিশ্বাস। তিনি তোমাদের আকাইদ হইতেই তওবা করার কথা বলিয়াছেন।" একথা শুনিয়া আবার ইমাম সাহেবকে ডাকিয়া আনিয়া জিজ্ঞাসা করা হইল, 'হে শায়খ! তুমি যে কুফরী হইতে তওবা করিয়াছ উহা নাকি আমাদের আকাইদ ও রীতিনীতি।"

খারিজীদের নীতি ছিল, 'হাদীস ফিকাহ্‌ বাদ দিয়া শুধু কুরআনের আদেশই বলবত থাকিবে।' ইমাম সাহেব দেখিলেন কুরআন ব্যতীত আর

কিছু দিয়া তাহাদিগকে ঠাণ্ডা করা যাইবে না। তাই তিনি বলিলেন, 'তোমরা যাহা বলিতেছ ইহার মূলে তোমাদের ধারণা করা ব্যতীত আর কোন প্রমাণ আছে কি? তোমরা কি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস কর যে আমার সম্বন্ধে এইরূপ বিশ্বাস করা তোমাদের ধারণা ব্যতীত আর কিছু আছে?' নেতা বলিলেন, 'না, তা শুধু ধারণা ব্যতীত আর কি থাকিবে?'

তখন ইমাম সাহেব এই আয়াত পাঠ করিলেন ঃ

(কোন কোন ধারণা পাপ), সুতরাং কুধারণা পোষণ করিয়া তোমরা পাপ করিয়াছ। তোমাদেরই কথা, 'পাপ করা কুফরী এবং পাপ প্রত্যেক লোককে ইসলাম বহির্ভূত করিয়া দেয়।'

এই কথা শুনিয়া খারিজীদের নেতা বলিলেন, 'হাঁ সত্য কথাই বলিয়াছ। আমি কুফরী হইতে তওবাহ করিতেছি। তুমিও তওবাহ কর।' ইমাম সাহেব পূর্ববতই বলিলেন, 'আমি যাবতীয় কুফরী হইতে আল্লাহ্‌র নিকট তওবাহ করিতেছি।' ইহার পর ইমাম সাহেবকে মুক্তি দেওয়া হইল।

কুফার হত্যাকাণ্ড

অতঃপর খারিজীগণ কুফার জনসাধারণের প্রতি মনযোগ দিল। তাহারা জানিত কুফার অধিকাংশ লোকই শিয়া। শিয়া না হইলেও অন্ততঃ তাহারা খারিজী আকাইদে বিশ্বাসী নয়। তাই কাফির হত্যা করা এবং তাহাদের ছেলে-মেয়ে রমণীদিগকে দাস-দাসীতে পরিণত করা হালাল। এই চিন্তা মাথায় ঢুকিতেই শয়তান যেহাক কুফার জামে মসজিদে উলঙ্গ তরবারী হাতে লইয়া আদেশ করিল, 'কুফাবাসীদের নিহত কর এবং তাহাদের সন্তান-সন্ততি এবং রমণীদের দাসদাসীতে পরিণতি কর।

যেহাকের সাথে ইমামের আলাপ-আলোচনা

ইমাম সাহেবের জীবনে কুফার এই সময়কার ইতিহাস একটি বিরাট সন্ধিক্ষণ ছিল। কাহারও এমন শক্তি ছিল না যে খারিজীদের এই বর্বরতা সম্বন্ধে তাহাদের নিকট কিছু বলে। একবার ইমাম সাহেব তাহাদের সাথে আলাপ-আলোচনা করিয়াছিলেন। তাই তিনি জীবনের আশা পরিত্যাগ করিয়া যেহাকের সামনে গিয়া বলিলেন, 'আমি তোমার সাথে কিছু কথা

বলিতে চাই।' যেহাক অনুমতি দিলে ইমাম সাহেব বলিলেন, 'কোন্ নীতি অনুসারে পুরুষদের হত্যা এবং ছেলে-মেয়ে ও রমণীদের দাস-দাসীতে পরিণত করা হইতেছে।'

যেহাক বলিলেন, 'ইহারা মুরতাদ অর্থাৎ ধর্মভ্রষ্ট।'

ইমাম সাহেব বলিলেন, 'মুরতাদ হওয়া অর্থ কি? ইহারা কি পূর্বে অন্য ধর্মাবলম্বী ছিল? তাহারা সেই ধর্ম পরিত্যাগ করিয়া কি অন্য ধর্ম গ্রহণ করিয়াছে? না তাহারা পূর্ব-ধর্মমতের উপরই রহিয়াছে?'

যেহাক এই কথা শুনিয়া কিছুটা নরম হইয়া বলিলেন, "আবার বল।' ইমাম সাহেব পুনরায় তাহার কথা বলিলেন। আল্লাহ্ জানেন ইমাম সাহেবের কথায় সে কি বুঝিল। কিন্তু উচ্চৈস্বরে বলিল, 'আমি অন্যায় করিয়াছি।' সাথে সাথে তরবারি কোষবদ্ধ করিয়া হত্যাকাণ্ড বন্ধ করিবার আদেশ দিল।

আল্লাহ্র অসীম অনুগ্রহে কূফাবাসী সেদিন ইমাম সাহেবের দ্বারা রক্ষা পাইল। আবু মাআয বলখী বলিতেন, 'সমস্ত কূফাবাসীই ইমাম আবু হানীফা (রঃ)-এর আযাদকৃত দাস, কারণ তাহার জন্যই কূফাবাসী সেদিন মুক্তি পাইয়াছিল।'

খারিজীদের পত্তন ও ইবন হুবায়রার শাসনামল

অতি অল্প দিনের মধ্যেই খারিজীদের অধিকার হইতে কূফার অধিপত্য ছুটিয়া গেল। যেহাক মুছন্না ইবন 'ইমরানকে কূফার শাসনকর্তা করিয়া মারওয়ানের মুকাবিলা করিতে গিয়া মারা যায়। মারওয়ান য়াযীদ ইবন 'আমর ইবন হুবায়রাকে মুছন্নার বিরুদ্ধে পাঠাইয়া দেন। ইবন হুবায়রা ইরাক পেঁাছিয়া সেখান হইতে খারিজীদের বিতাড়িত করেন। ইহাতে কোন সন্দেহ নাই যে ইবনে হুবায়রা জীবনে আর যাহাই কিছু করিয়া থাকুক না কেন ইরাক হইতে খারিজীদের বিতাড়িত করিবার পর পূর্ণ চারি বৎসর সেখানে শান্তি ও শৃঙ্খলা বহাল রাখিতে পারিয়াছিলেন (১২৯-১৩২ হিজরী)। ইমাম আবু হানীফা (রঃ) সম্বন্ধে বনী উমাইয়াগণ যে নীতি নির্ধারণ করিয়া রাখিয়াছিলেন ইবনে হুবায়রা উহা প্রয়োগ করিবার পূর্ণ সুযোগ পাইয়াছিলেন। তাই এই বিষয়ের সমস্ত ঘটনাতেই ইবন হুবায়রার নাম উল্লেখ রহিয়াছে।

বনী উমাইয়াদের নীতি ছিল যতটা সম্ভব ইমাম সাহেব হইতে নম্রতার সাথে কার্যোদ্ধার করিতে হইবে এবং নম্রতার সাথে যতটা কঠিন করা যায় উহাও প্রয়োগ করিতে হইবে যখন নম্রতায় কার্যোদ্ধার না হয় তখন কঠোরতা অবলম্বন করিবে।

ইবন হুবায়রার সাথে ইমাম সাহেবের সাক্ষাৎ

এক ব্যক্তি ইবন হুবায়রাকে নিহত করিবার হুমকি দিলে তাহাকে জল্লাদের হাতে শোপর্দ করিবার পূর্বক্ষণে ইমাম সাহেব ইবন হুবায়রার দরবারে উপস্থিত হন। কিন্তু ঐতিহাসিকগণ এই কথা উল্লেখ করেন নাই যে ইমাম সাহেব স্বেচ্ছায় গিয়াছিলেন, না, তাঁহাকে কর্তৃপক্ষ আহ্বান জানাইয়াছিলেন। ইমাম সাহেব দরবারে উপস্থিত হইলে মৃত্যু-দণ্ডপ্রাপ্ত ব্যক্তি জানিয়া বুঝিয়াই হউক অথবা ব্যাকুল অবস্থায়ই হউক ইবন হুবায়রাকে বলিল, 'এখন যে ব্যক্তি আপনার সম্মুখে উপস্থিত হইলেন তাহার নিকট আমার সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিলেই আপনার সন্দেহ নিরসন হইবে।' অথচ ইমাম সাহেব ইহার পূর্বে তাহাকে আর কখনও না দেখিয়া থাকিলেও বুঝিতে পারিলেন, এই বেচারা আমার সাহায্য-প্রার্থী; তাহাকে রক্ষা করিবার কোন উপায় করা দরকার। আল্লাহতা'আলা তাঁহাকে অসীম উপস্থিত বুদ্ধি দিয়াছিলেন। তাঁহার মাথায় একটি উপায় খেলিয়া গেল।

ইবন হুবায়রা ইমাম সাহেবকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'আপনি ইহাকে চিনেন ?'

ইমাম সাহেব তো আর মিথ্যা কথা বলিতে পারেন না। তাই তিনি উক্ত ব্যক্তিকে উদ্দেশ্য করিয়া বলিলেন, 'তুমিই কি আযান দেওয়ার সময় বিশেষভাবে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্' শব্দকে দীর্ঘ স্বর কর ?' সেই ব্যক্তি উত্তর করিল, 'জিহাঁ।' ইমাম সাহেব বলিলেন, 'এই ব্যক্তির মধ্যে কোন দোষ আছে বলিয়া মনে হয় না।'

ইমাম সাহেব এই কথা বলিতেই ইবন হুবায়রা তাহাকে ছাড়িয়া দেওয়ার নির্দেশ দিলেন।

এই ঘটনা বর্ণনাকারী এই প্রসঙ্গে আরও বলিয়াছেন 'কথার মধ্যে ইমাম সাহেব আযানের কথা এই জন্য উঠাইলেন যে দোষী ব্যক্তির যেন প্রশংসা করা যায়। অর্থাৎ কালেমা শাহাদাত পাঠ করিয়া তাহার মুক্তির উপায় বাহির করা। তাই তাহাকে তিনি আযান দিতে বলিয়াছিলেন।'

অর্থাৎ ইমাম সাহেবের উদ্দেশ্য ছিল যে ব্যক্তি কালেমা শাহাদত পাঠ করে এবং নবুওতকে স্বীকার করে তাহাকে ভাল বলা যায়। এইরূপ ভাল বলা মিথ্যা হইবে না।

কিন্তু আমার মনে হয় এই কথা দ্বারা ইহাও প্রমাণ করিতে চাহিয়াছিলেন যে, ইবনে হুবায়রা ইমাম সাহেব সম্বন্ধে কিরূপ ধারণা পোষণ করেন। এই ব্যক্তি দোষী হউক বা না হউক ইবন হুবায়রা তাহাকে হত্যা করিবার আদেশ দিয়াও ইমাম সাহেবের সাধারণ কথায় তাহাকে মুক্তি দিয়াছিলেন। আবার যদি ইহাও ধরিয়া লওয়া হয় যে এইরূপ ব্যবহার করিয়া তিনি ইমাম সাহেবকে দলে টানিবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, তবে অন্যায় হইবে না। অথবা মুখে কোন কিছু না বলিয়া কার্য দ্বারা তাহা প্রকাশ করিয়াছিলেন।

এইরূপ আর একটি ঘটনা ইমাম ফারুরীও বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম সাহেবের নামে একখানা জাল সুপারিশ-পত্র ইবন হুবায়রার নিকট এক ব্যক্তি পেশ করিল। কিছুক্ষণ পর ইমাম সাহেবও ইবন হুবায়রার দরবারে উপস্থিত হইলেন। ইবন হুবায়রা জিজ্ঞাসা করিলেন, 'এই পত্র কি আপনি পাঠাইয়াছেন?' ইমাম সাহেব পত্রের দস্তখত দেখিয়া ইবন হুবায়রার দিকে চাহিয়া বলিলেন, 'হাযাকাল্লাহ্, আল্লাহ্ আপনাকে প্রতিফল দান করুন!' ইবন হুবায়রা সন্তুষ্ট হইয়া মনে করিলেন, পত্রখানা সম্বন্ধে ইমাম সাহেব স্বীকার করিয়াছেন। যাহা হউক ইমাম সাহেবকে আয়ত্তে রাখিবার জন্যই এইরূপ করা হইয়াছিল।

নগিনার ঘটনা

ইহার কিছুদিন পর যে ঘটনা হইয়াছিল উহাতে ইবনে হুবায়রা প্রকাশ্যভাবেই মনোবাঞ্ছা খুলিয়া বলিয়াছিলেন। ঘটনা প্রসঙ্গে মুফিক বলেন,—"কোন বিষয়ে মতামত লওয়ার জন্য ইবন হুবায়রা ইমাম সাহেবকে আহবান করিয়াছিলেন।"

ইমাম সাহেব দরবারে পেঁাছিয়া দেখিলেন—ইবন হুবায়রা একটি নগিনা সম্মুখে রাখিয়া চিন্তিত মুখে বসিয়া রহিয়াছেন। ইমাম সাহেব জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কি চিন্তা করিতেছেন।' ইবন হুবায়রা বলিলেন, 'এই নগিনাটি আমার খুবই পছন্দ হইয়াছে, নিজে ব্যবহার করিতে চাহিয়াছিলাম। কিন্তু উহাতে অন্যের নাম খুদিত রহিয়াছে।' ইমাম সাহেব নগিনাটি চাহিয়া হাতে লইয়া দেখিলেন উহাতে عطا بن عبد الله লেখা

রহিয়াছে। ইমাম সাহেব ইবন হুবায়রার অনুমতি লইয়া এক ব্যক্তিকে ডাকিয়া বলিলেন, 'ইহা এখনই কোন খোদায়কারীর নিকট লইয়া গিয়া বল ن শব্দকে من এবং الله عبد শব্দের ب এর নোকতা ইঠাইয়া উপরে নোকতা দিয়া যেন ن বানাইয়া দেয়।' কিছুক্ষণের মধ্যেই সেই ব্যক্তি ফিরিয়া আসিল। ইমাম সাহেব নগিনাটি ইবন হুবায়রার হাতে দিয়া বলিলেন, 'এখন আপনি নিঃসন্দেহে পরিধান করিতে পারেন।' ইবন হুবায়রা দেখিলেন عطاء الله عبد এর স্থলে عطاء من عند الله অর্থাৎ 'আবদুল্লাহ পুত্র আতা'র স্থলে আল্লাহ্‌র দান' লিখিত রহিয়াছে।

ইবন হুবায়রা ইমাম সাহেবের এই বুদ্ধিমত্তা দেখিয়া একেবারে বিস্ময়াভিভূত হইয়া পড়লেন এবং নগিনা বসাইয়া আংটি বানাইয়া আনার আদেশ দিলেন।

ইবন হুবায়রার আবেদন

হুকূমতের নীতি ইমাম সাহেবের সম্মুখে পেশ করার ইহাকেই উৎকৃষ্ট সময় মনে করিলেন। ইমাম সাহেব চলিয়া যাওয়ার উদ্যোগ করিতেই ইবন হুবায়রা বলিলেন, 'হে শায়খ! আপনার গমনাগমন আমাদের এখানে একটু বাড়াইয়া দিলে আমরা আপনার দ্বারা উপকৃত হইতে পারি।'

আজ বুঝা যায় যে, এই প্রাণহীন শব্দগুলির গুরুত্ব কতটা ছিল। অতীতের দিকে লক্ষ্য করিলে দেখা যায় যে সেই যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ অত্যাচারী হুকুমতের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ শাসনকর্তা একজন সাধারণ শহরবাসীর নিকট নিজের আকাঙ্ক্ষা কিভাবে নিবেদন করিয়াছিলেন। যাহার কথা চিন্তা করিলে আজ ও সমস্ত শরীর শিহরিয়া উঠে।

ইমাম সাহেবের উত্তর

ইমাম সাহেব অত্যন্ত গাম্ভীর্যের সাথে তখন যে উত্তর দিয়াছিলেন যাহারা বড়লোকদের সান্নিধ্যে থাকে আজও উহা তাহাদের জন্য শিক্ষা লাভের বিষয়। ইমাম সাহেব উত্তর করিলেন, 'আপনাদের নিকট আসিয়া আমি কি করিব? আপনারা আমাকে আপনাদের সান্নিধ্য দান করিয়া

বিপদে নিপতিত করিবেন। আর যদি আমাকে দূরে সরাইয়া রাখেন কিংবা দূর করিয়া দেন তবে উহা অযথা আমার জন্য চিন্তার কারণ হইবে।'

যদিও ইহা সংক্ষিপ্ত কথা তথাপি রাজনীতিবিদদের দরবারে উঠা-বসা কারীদের ইহাই যথার্থ দৃষ্টি। ইমাম সাহেবের প্রথম কথার "আপনাদের সান্নিধ্যদান করিয়া আমাকে বিপদে নিপতিত করিবেন—" অর্থ এই যে প্রথম দরবারে অন্যান্য অমাত্যগণ এই অবস্থায় নবাগতকে কিভাবে বিপদে ফেলিবে সর্বদা উহারই পরিতারা করিতে থাকে। ইহা তো গেল অন্যের কথা। কিন্তু সান্নিধ্যলাভকারী সর্বদা এই চিন্তায় থাকে যে না জানি কখন আমার মনিব আমার উপর অসন্তুষ্ট হন। কর্তৃপক্ষের সামান্য অনাদর এবং ভ্রূকুটি অনাত্যদের অন্তরে যে কত বড় আঘাত হানে— ইহা শুধু ভূক্তভোগীরাই অনুভব করিতে পারে।

ইমাম সাহেবের প্রকৃতিগত জ্ঞান এই ভবিষ্যত তাহার সম্মুখে খুলিয়ে ধরিয়াছিল। দেশের একজন শাসনকর্তার সম্মুখে এমন সত্য প্রকাশ করিবার ক্ষমতা কয়জন লোকের থাকে ? ইহার পরও ইমাম সাহেব যে কথা বলিয়াছিলেন—উহাতে তাহার স্বাধীন মনোভাবের প্রকৃষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। ইমাম সাহেব বলিয়াছিলেন—'আপনাদের নিকট এমন কোন বস্তু নাই যে জন্য আমি আপনাদের ভয় করিব।' ইহার অর্থ ছিল আপনাদের ধন-সম্পদ এবং মর্যাদা আছে। অর্থের জন্য ঐ সমস্ত আমীর-উমরাদের নিকট হাত বাড়াইবার পূর্বে আল্লাহ্ তাহাকে যথেষ্ট দান করিয়াছিলেন। বাকী রহিল মর্যাদা। জনসাধারণের নিকট যাহা মর্যাদা লাভের বিষয় উহাকে যদি ইমাম সাহেব ঘৃণার চোখে না দেখেন তবে আর কে দেখিবে ? ইমাম সাহেবের দ্বিতীয় কথা—'আমার নিকট এমন কোন বস্তু নাই যাহার জন্য আপনাদের ভয় করিব।' আমার মতে এই কথা ঐ সব সন্দেহের দিকে ইঙ্গিত ছিল যাহা হযরত যায়দকে গোপনে সাহায্য করিবার পর হুকুমত ইমাম সাহেবকে দোষারোপ করিতেছিল।

অতঃপর ঐতিহাসিকগণ এই কথা উল্লেখ করেন নাই যে ইমাম সাহেবের কথায় ইবনে হুবায়রার উপর কি প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হইয়াছিল এবং ইবন হুবায়রা কি বলিয়াছিলেন। মনে হয় এইখানেই তাহাদের আলোচনা শেষ হইয়া গিয়াছিল এবং ভবিষ্যতে কোন পন্থা অবলম্বন করা যায় ইবন হুবায়রা সেই সুযোগের অপেক্ষায় ছিলেন।

কোমলতার পর কঠোরতা

ইমাম সাহেবের এই কথায় যদিও ইবন হুবায়রা তখনকার মত চুপ হইয়া গিয়াছিলেন তবুও ইহার ফলাফল যে কি হইতে পারে উহা কাহারও নিকট অজ্ঞাত নহে। "আমার নিকট এমন কোন কিছু নাই যে জন্য আপনাদের ভয় করিব"—একথা বলিয়া ইমাম ইবন হুবায়রাকে নিঃসন্দেহ করিতে চাহিলেও ইবন হুবায়রার কিন্তু ঐ কথায় সন্দেহ আরও প্রবল হইয়া উঠিল। ইমাম সাহেবের অন্তরে যে বস্তু লুক্কায়িত ছিল—তিনি উহার সন্ধান পাইলেন। হযরত যায়দের বিদ্রোহের সময় তিনি যতটা গোপনতাই অবলম্বন করিয়া থাকেন না কেন উহাও প্রকাশ হইয়া গেল।

উমাইয়া ও আব্বাসীয়দের মধ্যে ক্ষমতার দ্বন্দ্ব

১২৯ হিজরীতে যখন ইবন হুবায়রা কূফার শাসনকর্তা হইয়া আসেন ঠিক সেই আব্বাসীয়দের সমর্থক আবু মুসলিম খোরাসানে আব্বাসীদের অনুকূলে জনমত সংগ্রহ করায় এবং তাহাদের আনুগত্যের শপথ গ্রহণ করায় অসম্ভবভাবে কৃতকার্য হইতেছিলেন। খোরাসানের শাসনকর্তা নসর ইবন সাইয়ার সর্বদা ইবন হুবায়রাকে খোরাসানের অবস্থা অবগত করাইতেছিলেন এবং ফৌজী সাহায্য চাহিতেছিলেন। কিন্তু অবস্থা এমনই নাজুক ছিল যে কেন্দ্র হইতে কোন সাহায্য পাওয়া যাইতেছিল না। স্থানীয় ব্যাপারে ইবন হুবায়রাও এমন বিপদে ছিলেন যে তিনিও কোনও সাহায্য করিতে পারিতেছিলেন না। আবদুল্লাহ ইবন মুসআবিয়া ইবন আবদুল্লাহ ইবন জাফর ইবন আবু তালিব বিদ্রোহ দমনের জন্য ইরান এলাকায় ব্যস্ত ছিলেন। পরিশেষে ইবন হুবায়রা তাহার পুত্র দাউদকে পাঠান। এই বিদ্রোহ কোনমতে দমন করা হয়।

অতঃপর খোরাসানে নসর ইবন সাইয়ারের সাহায্যার্থে এক বিরাট বাহিনীর অধিনায়ক করিয়া নাবাতাহ ইবন হানযালাকে পাঠান। কিন্তু পথিমধ্যে 'আব্বাসীয়দের প্রসিদ্ধ সেনাপতি হাসান ইবন কাহতাবা নাবাতাকে ভীষণভাবে পরাজিত করেন। নাবাতার পনের হাযার সৈন্যের দশ হাযারই নিহত হয়। এই পরাজয়ের সংবাদ ইবন হুবায়রার পক্ষে খুবই মর্মান্তিক এবং অপমানজনক ছিল।

তাই ইবন হুবায়রা 'আব্বাসীয়দের সাথে শেষবারের মত বোঝাপড়া

করিবার জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিলেন। তিনি নসরকে লিখিলেন—'শীঘ্রই তোমার সাহায্যার্থে এক লক্ষ সৈন্যের একটি বাহিনী প্রেরণ করিতেছি—একটু ধৈর্য ধারণ কর।' কথিত আছে, ইবন হুবায়রা তখন কূফার নেতৃস্থানীয় সমস্ত লোককে সমবেত করিয়াছিলেন। কিন্তু অবস্থাদৃষ্টে মনে হইতেছিল গোপনে গোপনে আব্বাসীয়দের প্রচার হইতেছিল। তাই লোক সৈন্য দলে ভর্তি হইতে গড়িমসি করিতেছিল। মুজমের গ্রন্থকার বলেন—"ইবন হুবায়রা ইরাকে বনী উমাইয়াদের শাসক ছিলেন। ইরাকে বিদ্রোহ দেখা দিলে তিনি ইরাকের সমস্ত ফিকাবিদদিগকে একত্রিত করেন। তাহার হুকুমতের বিভিন্ন বিভাগ এক একজন ফিকাবিদকে সোপর্দ করেন।

ইমাম সাহেবকে প্রধানমন্ত্রীত্ব দানের প্রস্তাব

যখন ইবন হুবায়রা আব্বাসীয়দের সাথে শেষ বুঝাপড়া করিবার জন্য তৈয়ার হইতেছিলেন তখন দেখিলেন জনসাধারণের নেতৃত্ব যাহাদের মুঠির মধ্যে তাহাদিগকে হাত করিতে পারিলে জনসাধারণের সাহায্য পাইতে কোনপ্রকার অসুবিধা হইবে না। ইবন হুবায়রার একজন নির্ভরশীল লোক হাশিম ইবন রবী বলেন, 'ইমাম সাহেবকে হাত করিবার জন্য আমাকে নিযুক্ত করা হইল।' ইবন রবীর মারফত সংবাদ পাঠানো হইল, শাসনকর্তার শীলমোহর তাহাকে দান করা হইবে। কারণ, যে কোন আদেশ বলবত করা হইবে বা যে অর্থ সরকারী কোষাগার হইতে দেওয়া হইবে উহা যেন ইমাম সাহেবের তদারকে এবং তাহার কর্তৃত্বেই সম্পন্ন হয়।'

যদি এই ঘটনা সত্য হয় তবে উহার অর্থ এই হয় যে, শুধু অর্থ মন্ত্রী নয় বরং তাঁহাকে প্রধানমন্ত্রীত্বের পদে বহাল করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করা হইয়াছিল। ইহার কি অর্থ হইতে পারে যে শুধু কোষাগারের তত্ত্বাবধানই নহে, অধিকন্তু ইমাম সাহেবের দস্তখত ব্যতীত কোন রাজকীয় আদেশ বলবৎ হইতে পারিবে না। আমার মতে সেই যুগের নীতি অনুযায়ী শাসনকর্তাদের পরেই ছিল এই পদমর্যাদা। বিশেষ করিয়া খোরাসান, ইরাক এবং ইরানের মত বিরাট বিরাট প্রদেশের শাসকদের অধীনে এমন একটা পদ সামান্য কথা নয়। খিলাফতে বনী উমাইয়ার প্রতিষ্ঠাতা আমীর মুআবিয়ার যুগে এই প্রদেশসমূহের প্রথম শাসনকর্তা

ছিল যিয়াদ ইবন আবীহ[১] এবং শেষ ছিলেন ইবনে হুবায়রা। আল-ইয়াফী বলেন, 'ইবন হুবায়রা ঐ সমস্ত লোকের মধ্যে পরিগণিত যাহারা একই সাথে ইরাকে আরব এবং ইরাকে আজমের শাসনভার পাইয়াছিলেন। এই পদে সম্মানিত প্রথম ব্যক্তি আমীর মুআবিয়া কর্তৃক নিযুক্ত যিয়াদ ইবন আবীহ এবং দ্বিতীয় ব্যক্তি যায়ীদ ইবন হুবায়রা। এই দুইটি বিরাট এলাকায় শাসনকর্তা উক্ত দুই ব্যক্তি ব্যতীত আর কেহ হইতে পারেন নাই।'

সে যাহাই হউক না কেন ইমাম সাহেবকে একটি সরকারী পদ পেশ করা হইয়াছিল। এই প্রস্তাব এমন কোন আরবীয় পক্ষের হুকুম হইয়াছিল যাহারা সাধারণ কোন মাসআলা জিজ্ঞাসা করিবার সময়ও দেখিতেন যাহাকে জিজ্ঞাসা করা হইতেছে তিনি আরব না অনারব। আর আজ তাহারা এমন অবস্থায় আসিয়া পেঁাছিয়াছিলেন যে, খলীফার পর উমাইয়া হুকুমতের সবচেয়ে বড় যিম্মাদার ব্যক্তি ইবন হুবায়রা তাহার সমস্ত দায়িত্ব এবং কোষাগার ইমাম সাহেবের করায়ত্ত করিয়া দিতেছিলেন। ইমাম সাহেবের কার্যধারায় যাহারা গর্ববোধ করিয়া থাকেন তাহাদের নিকট আজও ইহা চিন্তার বিষয় হইয়া রহিয়াছে। আজ যদি এমন কোন বিষয় ইমাম সাহেবের অনুসারীদের সম্মুখে আসে তবে কয়জন পাওয়া যাইবে যে উহা পালন করিতে পারিবে? ইমাম সাহেবের জীবনচরিত রচয়িতাগণ লিখিয়াছেন, ইবন হুবায়রা তাহার দ্বারপ্রান্তে ইরাকের সমস্ত ফিকাহবিদকে সমবেত করিয়াছিলেন। তাহাদের মধ্যে ইবন আবী লায়লা, ইবন শাবরামাহ, দাউদ ইবন আবু হিন্দ ব্যতীত আরও অনেক লোক ছিলেন।

১. একজন ইরানী সরদার তায়েফ আসিয়া অসুস্থ হইয়া পড়ে। চিকিৎসক হায়েসের চিকিৎসায় সুস্থ হইয়া সর্দার তাহাকে একজন ইরানী দাসী দান করেন। দাসীর নাম ছিল সুমায়্যা। হায়েস সুমায়্যা হইতে সন্তান উৎপাদন করিবার পর আবীহ নামক একজন দাসের সাথে বিবাহ দিয়া দেয়। আমীর মুআবিয়ার পিতা কাফির থাকাকালীন তায়েফ আগমন করেন এবং মদ্য পান করিবার পর সুমায়্যার সাথে তাহার দৈহিক মিলন হয়। সেই সহবাসেই যিয়াদের জন্ম। সিফফীন যুদ্ধের সময় যিয়াদ হযরত আলীর পক্ষাবলম্বন করিয়া অসীম পরাক্রম দেখায়। আমীর মুআবিয়া নিজের দলে তাহাকে টানিবার জন্য ভাই বলিয়া পরিচয় দেন। সেই হইতে যিয়াদ আবু সুফইয়ানের পুত্র হিসাবে পরিচিত হয়। এই যিয়াদের পুত্র আবদুল্লাহ্‌র নির্দেশেই হযরত ইমাম হুসায়ন কারবালা প্রান্তে শহীদ হন।

ইমাম সাহেবের অস্বীকার

ইবন আবী লায়লার কথা বাদ দিন। কারণ, মুহাদ্দিসগণ তাহার সম্বন্ধে সন্দেহ পোষণ করেন। কিন্তু ইবন শাবরামাহ এবং দাউদ ইবন আবূ হিনদ বিশুদ্ধ রাবীদের মধ্যে পরিগণিত ছিলেন। কিন্তু ঘটনা কি হইয়াছিল? কূফার একজন রুটি প্রস্তুতকারকের সন্তান এত বড় স্বাতন্ত্র্যের অধিকারী কিভাবে হইলেন? শত্রুমিত্র সকলে একবাক্যে বলিয়াছেন, ইমাম সাহেব বনী উমাইয়া হুকুমতের এত বড় মর্যাদাসম্পন্ন পদ গ্রহণ করিতে দৃঢ়ভাবে অস্বীকার করিয়াছিলেন। অনুমান করা যাইতে পারে যে, ইমাম সাহেবের এই মতিভ্রম দেখিয়া কতভাবে বুঝানো হইয়াছিল যে, এমন সৌভাগ্য সব সময় আসে না! সুতরাং এই সুযোগ হাতছাড়া করিলে আর পাওয়া যাইবে না!

ফিকাহবিদদের পরামর্শ

যে সমস্ত আলিমদের ইবন হুবায়রা খেদমত পেশ করিয়াছিলেন ইচ্ছায় হউক অনিচ্ছায় হউক সকলকেই উহা গ্রহণ করিতে হইয়াছিল। তাহাদের মধ্যে একটি দল ইমাম সাহেবের নিকট আসিয়া বলিলেন, 'আমরা তোমাকে খোদার কসম দিয়া বলিতেছি, নিজের সর্বনাশ ডাকিয়া আনিও না। আমরা তো তোমারই ভাই। হুকুমতের এই কাজ আমরা সকলেই অপসন্দ করি। কিন্তু নিরুপায় হইয়াই আমরা সরকারী চাকুরী গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছি। সুতরাং তুমিও অস্বীকার করিও না।'

মনে হয় সরকারী চাকুরী গ্রহণ করিতে কেহ অস্বীকার করিলে ইবনে হুবায়রা তাহাকে স্বীকার করাইতে সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করিতেন। অন্যথায় নিরুপায় হইয়াই আমরা সরকারী চাকুরী গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছি' বলার কি অর্থ হইতে পারে? এই নিরুপায় অবস্থায় পড়িয়াই দাউদ ইবন আবূ হিনদ এবং ইবন শাবরামাহ সরকারী চাকুরী গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন।[১]

---

১. দাউদ ইবনে আবূ হিনদ সরকারী সাহায্য গ্রহণ না করিবার জন্য দরজীগীরির পেশা গ্রহণ করিয়াছিলেন। ইবনে শাবরামাহ সরকারী চাকুরী গ্রহণ করিয়াই জীবন অতিবাহিত করিয়াছিলেন। বনী উমাইয়াদের খিলাফতের অবসানের পর বনী আব্বাসীয় খিলাফতকালেও তিনি কাযীর পদে বহাল ছিলেন। ইবন আবী লায়লাও সরকারের অধীনে কাযীর পদ গ্রহণ করিয়াছিলেন।

ইমাম সাহেবের দ্বিতীয় পর্যায়ে অস্বীকার

'উলামাদের এই পরামর্শ শুনিয়া ইমাম সাহেব বলিলেন, 'এই চাকুরী তো দূরের কথা, এই ব্যক্তি যদি আমাকে বলে যে ওয়াসিত শহরের মসজিদের দরজাগুলি গণনা কর, তবে আমি উহাও করিব না।' অতঃপর ইমাম সাহেব বলিলেন ঃ

'ইহাও চিন্তার বিষয় যে, হুবায়রার দেওয়া প্রস্তাব আমি কিভাবে গ্রহণ করিতে পারি? সে কাহারও গর্দান উড়াইয়া দেওয়ার আদেশ দিবে আর আমি উহাতে সীল-মোহর অংকিত করিব? আল্লাহ্‌র কসম! আমি কখনও এই কাজে জড়িত হইব না।'

ইমাম সাহেব শপথ বাক্য উচ্চারণ করায় আলিমরা হতবাক হইয়া গেলেন যে এই অস্বীকারের পরিণতি কোথায় গিয়া শেষ হইবে। কিন্তু ইমাম সাহেবের শপথ করা শুনিয়া সকলেই চুপ হইয়া গেলেন। শুধু ইবন আবী লায়লা এতটা বলিলেন, 'তোমাদের বন্ধুকে আর কিছু বলিও না। তিনি সঠিক পথেই আছেন। তিনি ব্যতীত আর সকলেই ভুল পথের পথিক।'

ইমাম সাহেব অস্বীকার করায় কাহারও কাহারও মতে ইবন হুবায়রা ইমাম সাহেবকে চাবুক মারিবার জন্য তৈয়ার হইলেন। কিন্তু অবস্থা দৃষ্টে মনে হয় ইবন হুবায়রা এত শীঘ্র কোন সিদ্ধান্তে পৌঁছেন নাই। কেহ কেহ বলিয়াছেন, "কোতোয়াল শুক্রবার পর্যন্ত তাহাকে কারাগারে রাখিয়াছিল এবং কোন প্রকার মারধর করে নাই।"

জেলখানায় অন্য চাকুরীর প্রস্তাব

ইমাম সাহেব চাকুরী গ্রহণ করিতে অস্বীকারের সাথে সাথেই ইবন হুবায়রা চাবুক মারিবার আদেশ দিয়াছিলেন বলিয়া মনে হয় না। ইহার পর পনের দিন পর্যন্ত জেলখানায় রাখিয়া উক্ত চাকুরী ব্যতীত অন্য কোন চাকুরী গ্রহণ করিবার প্রস্তাব করা হইয়াছিল। কিন্তু কোন্ কোন্ চাকুরী গ্রহণ করিবার প্রস্তাব করা হইয়াছিল তাহা ঐতিহাসিকরা বর্ণনা না করিলেও ইমাম সাহেব রেশমী বস্ত্রের কারবারে নিযুক্ত ছিলেন বলিয়া 'তার্‌রাজের' চাকুরী গ্রহণ করিবার প্রস্তাব করা হইয়াছিল।

মুফিক কেন যে 'তাররাজ' শব্দের অর্থ সরকারী কোষাগার লিখিয়াছেন তাহা আমরা বুঝিতে পারিলাম না। কিন্তু ঐতিহাসিকদের মতে রাজ-রাজড়া, আমীর-উমরাদের পোশাক, বিছানা-পত্র এবং তাবু যেখানে বানানো হয় উহাকেই তার্‌রাজ বলা হয়।

মুসলিম শাসনের শেষ সময় পর্যন্ত নিয়ম ছিল যে—শুধু বাদশাহই নয় বরং আমীরদের অধীনে কিছু কারখানা থাকিত। উহাদের মধ্যে কাপড় তৈরীর কারখানাও ছিল। তাই কুফায় যে সব তার্‌রাজ ছিল তাহার তত্ত্বাবধায়ক হিসাবে ইমাম সাহেবকে নিযুক্ত করিতে ইচ্ছুক ছিলেন। কারণ ইমাম সাহেব তো কাপড়ের ব্যবসায়ী ছিলেন। ইমাম সাহেব অস্বীকার করিলেন।

কাযীর পদ গ্রহণের জেদ

অতঃপর ইমাম সাহেবকে কাযীর (বিচারক) পদ গ্রহণ করিবার প্রস্তাব করা হইল, কিন্তু ইমাম সাহেব স্থির সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন—ধর্মীয় হউক কিংবা পার্থিব সরকারের অধীনে তিনি কোন কাজই গ্রহণ করিয়া অত্যাচারী সরকারের সাথে সহায়তা করিবেন না। এইভাবে পনের দিন পর্যন্ত কারাগারে মতের বিনিময় হইতে থাকে। কাযীর পদ গ্রহণ করায় যখন ইমাম সাহেব অস্বীকার করিলেন তখন ইবন হুবায়রার ক্রোধ চরম সীমায় পেঁাছিল। ইবন হুবায়রা ক্রোধান্ধ হইয়া শপথ করিলেন, 'এই পদ গ্রহণেও যদি অস্বীকার করে তবে তাহাকে চাবুক মারা হইবে।'

এই কথা শুনিয়া দরবারস্থ সকলে কাঁপিয়া উঠিল। শাসনকর্তা যে শপথ করিয়াছেন উহা অবশ্য কার্যকরী হইবে। লোকে এই প্রকার কিছু সন্দেহই পোষণ করিত। ইমাম সাহেবকে পর্যন্ত এই সংবাদ পেঁাছান হইল। আল্লাহ্ জানেন লোকে কি ধারণা করিয়াছিল যে ইমাম সাহেব এই সংবাদ শুনিয়া কি করিবেন ? কিন্তু তিনি ধীর গম্ভীরভাবে বলিলেন —"পরকালের লৌহ দন্ডের প্রহারের চেয়ে আমার নিকট এই পার্থিব প্রহার অতি উত্তম।"

ইবন হুবায়রা যেমন শাসকের পদমর্যাদায় গর্বিত হইয়া শপথ করিয়াছিলেন তেমনি ধর্মের পাগল ইমাম সাহেব (যাহার চোখের সম্মুখে চাবুকের আঘাতের চেয়ে পরকালের লৌহদন্ডের প্রহার দীপ্ত হইয়া ভাসিতেছিল) বলিলেন—"আল্লাহ্‌র কসম! ইবন হুবায়রা আমাকে নিহত করিলেও তাহার কোন প্রস্তাব আমি গ্রহণ করিব না।"

এই সংবাদ ইবন হুবায়রার কানে পৌঁছিলে ক্রোধান্ধ হইয়া বলিল—"এই ব্যক্তির সাহস এত বাড়িয়া গিয়াছে যে আমার শপথের মুকাবিলায় সেও শপথ করিতেছে।"

ইমাম সাহেবের দৃঢ়তা

ইবন হুবায়রা নিজে পদমর্যাদা সম্পর্কে এতটা সজাগ ছিল যে খলীফা মারওয়ানের পরই তার মর্যাদা বলিয়া মনে করিত। ইমাম সাহেবের শপথ করাকে তাহার সম্মানের মূলে কুঠারাঘাত করিবার সমতুল্য মনে করিল। নিজের মর্যাদা বজায় রাখিবার জন্য সে ইমাম সাহেবকে অপমান করিতে অগ্রসর হইল। ইবন হুবায়রার বিবেকের উপর উহা এমন চোট ছিল যে সে ক্রোধে ফুলিয়া উঠিল এবং ইমাম সাহেবকে হাযির করিবার নির্দেশ দিল। ইমাম সাহেবকে হাযির করা হইল। ইবন হুবায়রা বার বার শপথ করিয়া বলিতেছিল—"সে যদি হুকুমতের কোন চাকুরী গ্রহণ না করে তবে শেষ নিশ্বাস পরিত্যাগ না করা পর্যন্ত তাহার মাথায় চাবুক মারা হইবে।"

কিন্তু ইমাম সাহেবের সংকল্পের কোন পরিবর্তন দেখা গেল না। ইবন হুবায়রা দোযখের আগুনের মত ফুলিয়া ফুলিয়া উঠিতেছিল। ইমাম সাহেব সেদিকে ভ্রূক্ষেপ না করিয়া বলিলেন—"শুধু একবার মৃত্যু পর্যন্তই তাহার ক্ষমতার দৌড়।"

হুবায়রা আর সহ্য করিতে পারিল না। চাবুক হাতে প্রস্তুত প্রহারকারীকে লক্ষ্য করিয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিল—"ইহার মাথার উপর একাদিক্রমে বিশটি চাবুক মারা হউক।"

ইমাম সাহেবের মাথা খোলা ছিল। এক দুই তিন বার চাবুক এমনভাবে মাথার উপর পড়িল যে মাথার উপর আল্লাহ্‌র শ্রেষ্ঠত্ব ব্যতীত কোন সৃষ্টির শ্রেষ্ঠত্ব স্থান পাওয়ার জায়গা ছিল না। কয়েকটি চাবুক মারা পর্যন্ত ইমাম সাহেব চুপ করিয়াছিলেন। অতঃপর তিনি ইবন হুবায়রাকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, 'স্মরণ কর যে সময় তোমাকে আল্লাহ্‌র সম্মুখে দণ্ডায়মান করা হইবে। আজ তোমার সম্মুখে আমি যে ভাবে অপমানিত হইতেছি, ইহার চেয়ে আরও অধিক হীনতা ও অপমানের সাথে তোমাকে আল্লাহ্‌র দরবারে দাঁড় করানো হইবে। ইবন হুবায়রা তুমি আমাকে ধমকাইতেছ। অথচ দেখ আমি সাক্ষ্য দিতেছি যে, আল্লাহ ব্যতীত কোন উপাস্য নাই। আমি সাক্ষ্য দিতেছি, 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ।' দেখ। আমার

সম্বন্ধে তোমাকেও জিজ্ঞাসা করা হইবে। তখন সত্য ব্যতীত আর কিছু তোমার মুখ হইতে বাহির হইবে না।'

মাথায় চাবুকের আঘাত পড়িতেছিল আর ইমাম সাহেব বার বার ঐ কথা বলিতেছিলেন। কথিত আছে, শেষের কথাগুলি শুনিয়া ইবন হুবায়রার মুখ ফ্যাকাশে হইয়া গেল এবং জল্লাদকে ইশারায় বলিলেন, 'থাম।'

অতঃপর তাহাকে পুনরায় কয়েদখানায় লইয়া যাওয়া হইল। সারারাত সেখানেই তিনি অতিবাহিত করেন। সকালে দেখা গেল তাহার মুখ চোখ ফুলিয়া গিয়াছে এবং মাথায় প্রহারের আঘাত প্রকট হইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে। ইমাম সাহেবকে চাবুক মারিবার পর কয়েদখানায় লইয়া যাওয়ার সময় কিংবা পেঁাছার পর তিনি কাঁদিতেছিলেন। লোকে জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলিয়াছিলেন, 'প্রহারের দরুণ নয় বরং আমার এই অবস্থা দেখিয়া আমার মা যে কত বড় দুঃখ পাইবেন সেই কথা স্মরণ করিয়াই আমি মায়ের দুঃখে কাঁদিতেছি।'

মুক্তিলাভ

কথিত আছে, ইত্যবসরে ইবন হুবায়রার ক্রোধ অনেকটা প্রশমিত হইয়া গিয়াছিল। কিন্তু রাজনৈতিক চাল তখন ভুতের মত তাহার মাথায় সওয়ার ছিল। অতঃপর ঘাবড়াইয়া গিয়া বলিতেছিল, তাহাকে বুঝাইবার এমন কোন লোক কি নাই যে তিনি যেন তাহার ব্যাপারে চিন্তা ভাবনা করিবার জন্য আমার নিকট সময় প্রার্থনা করেন।' (মুফিক ২৪ পৃষ্ঠা ১ম জিলদ)

ইমাম সাহেবকে এই সংবাদ পেঁাছানো হইলে তিনি বলিলেন, 'আচ্ছা আমাকে মুক্তি দেওয়া হউক। তাহার কথিত মতে আমি আমার বন্ধু-বান্ধবদের সাথে পরামর্শ করিয়া দেখিব।'

কিন্তু ইমাম সাহেবকে মুক্তি দেওয়ার ব্যাপারে কোন প্রকার যামিন লওয়া হইয়াছিল কিনা ইহা কোথাও পাওয়া যায় না। ইমাম সাহেবের মত লোকের মুখের এতটা কথা শুনাই ইবন হুবায়রার জন্য যথেষ্ট ছিল। খবর শোনা মাত্রই মুক্তির আদেশ পাঠাইয়া দিল।

আল-ফারুরীর বর্ণনা মতে জানা যায় ইমাম সাহেব তাহার প্রতিশ্রুতি মত বন্ধু-বান্ধবদের সাথে পরামর্শ করিলেন। কাযী আবু ইউসুফ বর্ণনা

করেন—লোকে তাহাকে পরামর্শ দিল যে, ইবনে হুবায়রা যখন শপথ করিয়াছে তখন তাহার শপথ পূর্ণ করিবার জন্য আপনি যে কোন একটি কাজ গ্রহণ করুন। অন্যথায় তাহার এই শপথের বাহানা করিয়া আবার গ্রেফতার করিবে এবং তাহার শপথ মোতাবেক আবার শাস্তি দিতে থাকিবে। এই কথা স্মরণ করিয়া সকলেই বলিলেন—"আত্মহত্যা করিতে তাহাকে সাহায্য করিবেন না।"

কিন্তু প্রশ্ন হইল কি প্রকারের চাকুরী গ্রহণ করা যায়? এই সম্বন্ধে অনেক কথাবার্তা হওয়ার পর ইমাম সাহেব বলিলেন,—শহরের বাহির হইতে যে সমস্ত ফল বিক্রয়ের জন্য শহরে আমদানী করা হয় উহা গণনার কাজ আমি গ্রহণ করিতে পারি। ইমাম সাহেবের রাযী হওয়ার কথা ইবন হুবায়রার কানে পৌঁছিল। ইবন হুবায়রা নিজেও বিরক্ত হইয়া গিয়াছিল। শুধু নিজের ঠাট বজায় রাখিবার পথেই ইমাম সাহেবকে মুক্তি দেওয়ার বাধা ছিল। তাই এতটুকু বাহানাই তাহার জন্য যথেষ্ট ছিল। আর ইমাম সাহেবও তাহার অত্যাচার ও উৎপীড়ন হইতে রেহাই পাইলেন।

সাময়িকভাবে ইমাম সাহেবের মক্কায় হিযরত

ইমাম সাহেব কতদিন ফল গণনার কাজ করিয়াছিলেন তাহা জানা যায় নাই। কিন্তু সকলের মতে ইমাম সাহেব পালাইয়া মক্কা শরীফ চলিয়া গেলেন।

আমার মনে হয় সাময়িকভাবে হিযরত করিয়া মক্কা শরীফে আশ্রয় গ্রহণ করিবার ইচ্ছা ইমাম সাহেব প্রথম হইতেই পোষণ করিয়া আসিতেছিলেন। এই উদ্দেশ্যে তিনি একটি চাকুরী গ্রহণ করিলেন যাহাতে শহরের বাহিরে আসা-যাওয়া করিলে যেন লোকে কোন প্রকার সন্দেহ না করিতে পারে। এই বিভাগের কর্মচারীদের সাধারণত শহরের রাস্তা-ঘাটের সাথেই বেশী সম্পর্ক থাকে। ইমাম সাহেব প্রয়োজনীয় সওয়ারী গাধা ও খচ্চর সংগ্রহ করিয়া দরকারী আসবাবপত্র উহার পিঠে উঠাইয়া দিয়া একদিন হেজায অভিমুখে রওয়ানা হইয়া গেলেন।

ইবন হুবায়রাও হয়ত ইহাই চাহিতেছিল যে, এই প্রকার জেদী লোক হইতে শহর যতটা মুক্ত খালি থাকে ততই ভাল। কারণ ইহাদের দেখা-দেখি অন্যান্য লোকেও বিগড়াইয়া যাওয়ার সন্দেহ ইবন হুবায়রার ছিল।

এইরূপ সন্দেহ অমূলকও ছিল না। আমি দেখিতেছি আজকাল কোন খ্যাতনামা কাজের উদাহরণ দিতে হইলে মুসলমানদের সম্মুখে ভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের কার্যাবলী উপস্থাপন করা হয়। অথচ ইসলামী ইতিহাসের প্রত্যেকটি পাতা এমন সব জীবন্ত উদাহরণে পরিপূর্ণ। স্বয়ং ইমাম সাহেবের জীবনে এমন কোন উদাহরণ বিদ্যমান নাই যাহা আমাদের চলার পথে সহায়তা করিতে না পারে। ইমাম সাহেবের জীবনের প্রত্যেকটি দিক আমাদের পথের দিশারী এবং কর্মপ্রেরণার উৎস স্বরূপ হইতে পারে।

ত্রয়োদশ অধ্যায়

আব্বাসী হুকুমত

বনী উমাইয়া হুকুমতের সাথে ইমাম সাহেবের আকর্ষণ-বিকর্ষণের যে সমস্ত ঘটনা ইতিহাসে লিপিবদ্ধ আছে ইবনে হুবায়রা পর্যন্তই উহার পরিসমাপ্তি ঘটিয়াছে। ইমাম সাহেবের হিযরত সম্পর্কে ঐতিহাসিকগণ বলেন, "বনী আব্বাসী ক্ষমতাসীন না হওয়া পর্যন্ত ইমাম সাহেব মক্কা শরীফেই অবস্থান করেন।"

দেশের শাসন ক্ষমতা হস্তান্তর হওয়ার এই ঘটনা ইসলামের ইতিহাসের একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। লোক এই সম্বন্ধে অজ্ঞাত নহে যে, এই ইনকিলাবের প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন খোরাসানের আবু মুসলিম। তিনিই আরববাসীদের মধ্যে মতানৈক্যের সৃষ্টি করিয়া বনী উমাইয়াদের ক্ষমতাচ্যুত করেন। বড়ই আশ্চর্যের বিষয় যে, ইমাম সাহেব হিযরত করিয়া যে বৎসর মক্কা শরীফ চলিয়া যান ঠিক সেই বৎসরই আবু মুসলিম মারভে প্রবেশ করেন এবং সলা-পরামর্শের পর তিনি তাঁহার দলকে, যাহাকে তিনি নবী পরিবারের দল বলিতেন; বলিয়াছিলেন—

"এখন তোমরা নির্ভাবনায় বাড়ী-ঘর তৈয়ার করিয়া বসবাস করিতে থাক। আরববাসীরা হুকুমতের প্রশ্নে আর মতৈক্যে পৌঁছিতে পারিবে না।"

বনী উমাইয়াদের বিরুদ্ধে আবু মুসলিম ইসলাম জগতের ভিতরে ভিতরে যে বিদ্রোহের বীজ ছড়াইতেছিলেন—পরোক্ষ বা প্রত্যক্ষভাবে ইমাম সাহেব উহার মধ্যে জড়িত ছিলেন কিনা উহার কোন প্রমাণ আজও পাওয়া যায় নাই। কিন্তু ইব্‌রাহীম ইবনে মায়মুন—যাহার সম্বন্ধে পূর্বে যৎসামান্য বলা হইয়াছে—এবং পরিশেষে আবু মুসলিমের ইঙ্গিতেই শহীদ হইয়াছিলেন তাহার সম্বন্ধে ইবনে সা'আদ তবকাতে লিখিয়াছেন। ইব্‌রাহীম ইবনে মায়মুন সায়েগ এবং মুহাম্মদ ইবনে সাবিত আবদী উভয়েই আবু মুসলিমের বন্ধু ছিলেন। উভয়েই আবু মুসলিমের নিকট গমনাগমন করিতেন এবং তাঁহার কথামত চলিতেন।

যেহেতু ইব্‌রাহীম ইবনে মায়মুন এবং ইমাম সাহেবের মধ্যে গভীর সম্পর্ক বিদ্যমান ছিল, সেহেতু ইমাম সাহেব হইতে ইবনে মুবারক বর্ণনা করেন—ইব্‌রাহীম ইবনে মায়মুন আমার নিকট যাওয়া আসা

করিতেন। উভয়ের মধ্যে নির্জনে কথাবার্তা হইত। ইমাম সাহেবের উপর তাহার বিশেষ হাত ছিল। পরিশেষে ইব্রাহীম আবু মুসলিমের অত্যাচার ও অন্যায় আচরণ দেখিয়া তাহার বিরুদ্ধতা করিতে মনস্থ করেন। এই সম্পর্কে তিনি শুধু ইমাম সাহেবের পরামর্শই গ্রহণ করেন নাই অধিকন্তু আবু মুসলিমের বিরোধিতা করার জন্য তাহার নিকট বায়'আত গ্রহণ করিতেও ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন।

কিন্তু ইব্রাহীমের মতের বিরোধিতা করিয়া ইমাম সাহেব বায়'আত গ্রহণ করিতে অস্বীকার করেন। তথাপি উভয়ের মধ্যে রাজনীতির সম্পর্ক ছিল বলিয়া প্রমাণিত হয়। সুতরাং আবু মুসলিমের সাথে ইব্রাহীমের বিরোধ দেখা দিলে যেমন ইমাম সাহেবের পরামর্শ চাহিয়াছিলেন, তেমনি যখন বন্ধুত্ব ছিল তখন যে আবু মুসলিম সম্বন্ধে কোন কথাবার্তা হয় নাই একথা কে বলিতে পারে ? কিন্তু ইতিহাস যখন এ সম্বন্ধে নীরব তাই একথা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে না যে, আব্বাসীয়দের সাথে ইমাম সাহেব কার্যত কোনরূপ অংশগ্রহণ করিয়াছিলেন। শুধু এতটা অবগত হওয়া যায় যে, আব্বাসীয়দের গোপন আন্দোলন যখন প্রকাশ লাভ করিল এবং বিভিন্ন অংশে বনী উমাইয়াদের বিরুদ্ধে আব্বাসীয়দের ইঙ্গিতে আবু মুসলিম বিদ্রোহ করিতেছিলেন ইমাম সাহেব তখন মক্কা শরীফে বসবাস করিতেছিলেন। বনী উমাইয়াদের পরাজিত করিয়া বনী আব্বাস ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত না হওয়া পর্যন্ত সেখানেই ছিলেন। বিশেষ অনুসন্ধানের পরও একথা জানা যায় যে, আব্বাসীয়দের আন্দোলনের সাথে ইমাম সাহেবের কোন প্রকার আন্তরিক সমর্থন ছিল কি না।

ইমাম সাহেবের কূফা প্রত্যাবর্তন

সত্য বলিতে কি এই আন্দোলনের আরম্ভ যে অনৈসলামিক ভিত্তির উপর আরম্ভ হইয়াছিল উহার পরিণতি সম্বন্ধে কেহ চিন্তা না করিলেও ইমাম সাহেবের সতর্ক দৃষ্টি হইতে উহা গোপন থাকিতে পারে নাই। যেদিন জ্বরাক্রান্ত অবস্থায় বনী আব্বাসের প্রথম খলীফা আবুল আব্বাস সাফ্ফাহ কূফায় পৌঁছিয়া জুম'আর নামাযের খুতবার সময় নিজের খিলাফত ও হুকুমতের এলান করিলেন উহার পূর্বদিন পর্যন্ত ইমাম সাহেবকে আমরা মক্কা শরীফেই বসবাস করিতে দেখিতে পাই। এই সময়ের মধ্যে কূফায় কমপক্ষে বিশবার বিদ্রোহ ও আন্দোলন হইয়াছিল

এবং ইবনে হুবায়রা ওয়াসিতে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল। আব্বাসীয়রাও কূফায় পূর্ণভাবে শাসন ক্ষমতা প্রতিষ্ঠা করিয়া বসিয়াছিল।

কূফার আলিমদের সমাবেশ সাফ্ফাহ্‌র ভাষণ

১৩২ হিজরীতে আবুল আব্বাস কূফায় প্রবেশ করিয়া কূফাবাসীদের সম্মুখে ভাষণ দান করেন। সাধারণত ইতিহাসে আবুল আব্বাস এবং তাহার চাচা দাউদ ইবনে আলীর ভাষণ সম্বন্ধেই উল্লেখ রহিয়াছে। কিন্তু আবুল আব্বাস কূফায় আলিম সম্প্রদায়কে ভিন্নভাবে একত্রিত করিয়া ভাষণ দান করিয়াছিলেন কিনা তাহার উল্লেখ পাওয়া যায় না। অথচ ইমাম সাহেবের জীবন রচয়িতা সাধারণ সূত্র হইতে নয় বরং কাযী আবূ ইউসুফ হইতে দাউদ তাঈর বর্ণনা করেন যে, আবুল আব্বাস কূফায় আলিম সম্প্রদায়কে একত্রিত করিয়া নিম্নরূপ ভাষণ দিয়াছিলেন ঃ

"পরিশেষে খিলাফত আপনাদের নবী পরিবারের হাতে আসিয়া পৌঁছিয়াছে। আল্লাহ্ তা'আলা মীমাংসা করিয়া দিয়াছেন এবং সত্যকে সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। আর আপনারা যাহারা আলিম সম্প্রদায়ের সাথে সম্বন্ধ রাখেন তাহাদের কর্তব্য এই সত্যকে সাহায্য করা। আমি এলান করিতেছি উহার পরিবর্তে আপনাদের সাথে সহৃদয় ব্যবহার করা হইবে, আপনাদের সম্মান বর্ধিত করা হইবে এবং আল্লাহ্‌র দেওয়া ধন-সম্পদ হইতে আপনাদের মেহমানদারী করা হইবে। তাই খিলাফতের দায়িত্ব পালন করার জন্য যাহাকে মনোনীত করা হইয়াছে, আপনাদের উচিত তাহার আনুগত্য স্বীকার করা। আর উহা এমন আনুগত্য হইবে যাহা আপনাদের খলীফার সম্মুখে প্রমাণের কাজ দিবে। উহাতেই আপনাদের পরিণতি ও নিরাপত্তার জামানত নিহিত থাকিবে। পরকালে উহা দ্বারাই আপনারা মুক্তি পাইবেন। আপনাদের যে কেহ আল্লাহ্‌র দরবারে যাইবেন তিনি যেন খলীফাকে ছাড়া না যান। কেননা, যদি এইরূপ হয় তবে আপনারা ঐ সমস্ত লোকের মধ্যে পরিগণিত হইবেন যাহারা নিজেদের নিকট নিজেদের জন্য কোন সম্বল রাখেন না।

"আর শুনুন। কেহ যেন ভয়ে আমাকে আমীরুল মুমিনীন না বলেন এবং ভয়ে যেন কেহ সত্য কথা বলা হইতে বিরত না থাকেন।"

কাযী আবু ইউসুফ দাউদ তাঈরকে বলেন, 'আবুল আব্বাস যে সমস্ত আলিমকে সমবেত করিয়াছিলেন তাহাদের মধ্যে ইমাম সাহেবও ছিলেন। সকল ঐতিহাসিকের মতে আবুল আব্বাস ১৩৮ হিজরীতে কুফায় আগমন করিয়াছিলেন। সে মতে দেখা যায়, ইমাম সাহেবও মক্কা শরীফ হইতে ঐ সময়ই কুফায় প্রত্যাবর্তন করিয়াছিলেন।

আলিমদের পক্ষ হইতে ইমাম সাহেবের উত্তর

কাযী আবু ইউসুফ বলেন—"আবুল আব্বাসের ভাষণ শেষ হইলে উপস্থিত আলিমগণ ইমাম সাহেবের দিকে তাকাইলেন। ইমাম সাহেব তাহাদের অবস্থা বুঝিতে পারিয়া বলিলেন, 'আপনাদের আদেশ পাইলে আমি আমার ও আপনাদের পক্ষ হইতে ইহার উত্তর দিব।' আলিমগণ কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকার পর সকলেই একবাক্যে সম্মতি জানাইলেন। ইমাম সাহেব সকলের সম্মতি পাইয়া বলিলেন, 'আলহামদু লিল্লাহ্! আল্লাহ্র শুকরিয়া যে তিনি অত্যাচারীদের গলা বন্ধ করিয়া দিয়াছেন এবং আমাদের সত্য বলার অধিকার দিয়াছেন।"

অতঃপর বায়'আত সম্বন্ধে সংক্ষেপে এই কথা কয়টি বলিলেন—

نبا يعنك على امر الله والوفاء لك ببيعتك اى الى قيام الساعة

"আল্লাহ্র আদেশের উপর আমরা আপনার হাতে বায়'আত গ্রহণ করিতেছি। এবং এই বায়'আতের সাথে আমরা কিয়ামত পর্যন্ত বহাল থাকিব।"

অতঃপর দোয়া স্বরূপ বলিলেন—

"আল্লাহ্র নিকট প্রার্থনা, তিনি যেন এই খিলাফতকে ঐ সমস্ত লোক হইতে দূরে না রাখেন যাহারা হুযুর (সঃ)-এর নিকটতম আত্মীয়।"

এই সংক্ষিপ্ত ভাষণ দান করার পর ইমাম সাহেব উপবেশন করিলেন। আবুল আব্বাস তাহার ভাষণ শুনিয়া বলিলেন—"আলিমদের পক্ষ হইতে আপনার মত লোকের বলাই ঠিক হইয়াছে। আলিমগণ আপনাকে প্রতিনিধিত্ব দান করিতে দিয়া নিজেদের বুদ্ধির পরিচয়ই দিয়াছেন। আপনি অতি সৌন্দর্যের সাথেই আপনার উদ্দেশ্য বর্ণনা করিয়াছেন।"

(মুওফিক, পৃষ্ঠা ১৫১, ১ম জিলদ)

সভা শেষ হইয়া গেল। আবুল আব্বাসের নিকট হইতে সরিয়া আসিয়া সকলে ইমাম সাহেবকে ঘিরিয়া ধরিলেন এবং জিজ্ঞাসা করিলেন,

"কিয়ামত পর্যন্ত বহাল থাকিব—আপনার এ কথার অর্থ কি?"

ইমাম সাহেব বলিলেন—"তোমরা আমাকে বলার অধিকার দিয়াছ। সুতরাং আমার জন্য আমি রাস্তা তৈয়ারী করিয়া লইয়াছি এবং তোমাদিগকেও বিপদ হইতে রক্ষা করিয়াছি।"

এই কথা শুনিয়া সকলেই চুপ করিয়া রহিলেন। পরে পরস্পর বলাবলি করিতে লাগিলেন—"তিনি যাহা কিছু করিয়াছেন ঠিকই করিয়াছেন।" এই ঘটনা বর্ণনার পর মুফিক যদিও কোনরূপ ব্যাখ্যা করেন নাই, কিন্তু আল-ফারুকী ব্যাখ্যাস্বরূপ বলিয়াছেন—"ইমাম সাহেব তাহার ভাষণে السلام عليكم যে শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন উহার অর্থ ছিল এই,—মজলিসের সময় পর্যন্ত আমরা তোমার অনুগত থাকিব।"

অর্থাৎ ইমাম সাহেব আবুল আব্বাসকে যে কথা বলিয়াছিলেন উহার উদ্দেশ্য কি ছিল? প্রকাশ্যভাবে দেখা যায় ইমাম সাহেব এবং যে সমস্ত আলিম তাহাকে তাহাদের প্রতিনিধিত্ব করার অনুমতি দিয়াছিলেন তাহাদের পক্ষে আবুল আব্বাসের বায়'আত গ্রহণ করিয়াছিলেন। পরবর্তীকালে ইমাম সাহেব এবং কূফার অন্যান্য আলিমের কার্য পদ্ধতিতে দেখা যায়, বনী আব্বাস ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর মুসলমানদের উপর যে অত্যাচার শুরু করিয়াছিলেন এবং বায়তুলমাল সম্বন্ধে বনী উমাইয়াদেরই নীতি অবলম্বন করিয়াছিলেন তখন তাহারা আব্বাসীয়দের বিরুদ্ধেও রুখিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন। এই বিষয় লইয়াই ইমাম সাহেব ও বনী আব্বাসের মধ্যে শেষ পর্যন্ত বিরোধ চলিয়াছিল। এখন প্রশ্ন হইল তবে কেন ইমাম সাহেব এমন কঠিনভাবে বায়'আত গ্রহণ করিয়াছিলেন?

ইহার উত্তরে ফারুকী বলেন, "ইমাম সাহেব তখন এক বিশেষ কার্যপদ্ধতি গ্রহণ করিয়াছিলেন—যে সম্বন্ধে এই অবস্থায় ইসলাম অনুমতি দিয়াছে অর্থাৎ কোন সৎ উদ্দেশ্য লাভ করার মানসে যদি এমন কোন শব্দ ব্যবহার করা যায় ভবিষ্যতে যাহার কয়েক প্রকার অর্থ হইতে পারে তবে এমন শব্দ ব্যবহার করা দূষণীয় নহে।" আবুল আব্বাস এমন রক্ত-পিপাসু লোক ছিলেন যিনি লোকের বিরোধিতা করা মোটেই সহ্য করিতে পারিতেন না। বিনা কারণেই আলিমদের মস্তক বিচ্ছিন্ন করার আদেশ দিতেন—যদি না ইমাম সাহেব ঐ প্রকার শব্দ ব্যবহার করিতেন। আস্‌সাফ্‌ফাহ বুঝিয়াছিলেন—তাহারা কিয়ামত পর্যন্ত আমার আনুগত্যের শপথ গ্রহণ করিলেন। কিন্তু ইমাম সাহেবের কথার অর্থ ছিল—'এই মজলিস হইতে উঠা পর্যন্তই আমরা তোমার আনুগত্যের শপথ

করিলাম।' তাঁহার ব্যবহৃত শব্দে উভয় প্রকার অর্থে ব্যবহার ছিল। আবুল আব্বাস তাঁহার ইচ্ছামত বুঝিলেন আর ইমাম সাহেবও তাঁহার উদ্দেশ্য সাধন করিলেন।

ইমাম সাহেবের এই ভাষণের প্রধান উদ্দেশ্য হইল, এই ঘটনা যদি সত্য হয় তবে দেখা যায়, আবুল আব্বাস সাফ্ফাহ্‌র শাসনকালেই ইমাম সাহেব মক্কা হইতে কূফায় ফিরিয়া আসিয়াছিলেন। কিন্তু যাহারা উক্ত ঘটনা বর্ণনা করিয়াছেন, তাহারা ইহাও বলিয়াছেন যে, ইমাম সাহেব আব্বাসীয়দের দ্বিতীয় খলীফা আবু জাফর মনসুরের শাসনকালে মক্কা হইতে কূফা প্রত্যাবর্তন করেন।

সুতরাং দেখা যায় ইমাম সাহেব আবুল আব্বাসের পূর্ণ শাসন-কাল অর্থাৎ চারি বৎসর ছয় মাস হিজাযেই ছিলেন। এই অবস্থায় সাফ্‌-ফাহ্‌র মজলিসে তাঁহাকে ভাষণদান অবস্থায় কিরূপে দেখা যাইতে পারে ? তবে এতটা বলা যাইতে পারে যে, আবু জাফর মনসুরের সময় ইমাম সাহেব স্থায়ীভাবে কূফায় বসবাস করিবার জন্য ফিরিয়া আসেন এবং ইহার পূর্বে তিনি সময় সময় হিজায হইতে কূফায় আসা-যাওয়া করিতেন। কূফা আব্বাসীয়দের অধীনস্থ হওয়ার সময় ঘটনাক্রমে ইমাম সাহেব তখন সেখানে ছিলেন। অবশ্য ইমাম মুফিক আবু হাফ্‌স্‌ কাবিরী আল-বুখারীর বর্ণনা মতে "ইমাম সাহেব ইবনে হুবায়রার অত্যাচারে অতিষ্ঠ হইয়া মক্কা শরীফ চলিয়া যান। কূফায় আব্বাসীয়-দের শাসনক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর তিনি মক্কা হইতে ফিরিয়া আসেন। অতঃপর আবু জাফর মনসুর তাঁহাকে বাগদাদে আহ্বান করিয়া লইয়া যান।"

এই বর্ণনাকে মানিয়া লইলে হইতে পারে যে, প্রথম বর্ণনা লেখকে ভুলবশত বাগদাদের স্থলে কূফা শব্দটি ব্যবহার করিয়াছেন। অর্থাৎ সেখানে একথাই বুঝিতে হইবে যে, আবু জাফর তাঁহার শাসনকালে ইমাম সাহেবকে কূফা হইতে বাগদাদ আহ্বান করিয়া লইয়া গিয়া-ছিলেন। অন্যথায় আব্বাসীয়দের হুকুমত প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সাথেই ইমাম সাহেব হিজায হইতে কূফায় প্রত্যাবর্তন করিয়াছিলেন।

সে যাহাই হউক না কেন আবু জাফর মনসুরের আগেই আব্বাসীয় হুকুমতের সাথে ইমাম সাহেবের সম্পর্ক গড়িয়া উঠিয়াছিল। আবুল আব্বাসের সময়কার আর কোন বিষয়ের সাথে ইমাম সাহেবের কোন সম্পর্ক ছিল বলিয়া ঐতিহাসিকরা কোথাও কোন কিছু উল্লেখ করেন নাই।

আমার নিজস্ব মতামত এই যে আস্‌সাফ্‌ফাহ্‌র সময় ইমাম সাহেব স্থায়ীভাবে কুফায় বসবাস আরম্ভ করেন নাই। সুতরাং উপরোক্ত বর্ণনা দুইটির মধ্যে এইভাবে সামঞ্জস্য সৃষ্টি করা যাইতে পারে যে,—আস্‌-সাফ্‌ফাহ্‌র সময় কোন কার্যবশত ইমাম সাহেব কুফায় আগমন করিয়াছিলেন এবং মজলিসে যোগদান করার পর পুনরায় হিজায চলিয়া গিয়াছিলেন। আর তখনকার অবস্থাদৃষ্টে ইহাই সঠিক বলিয়া মনে হয়। সত্য বলিতে কি সাফ্‌ফাহ্‌র যুগ পর্যন্ত আব্বাসী হুকুমত ততটা মযবুত হইতে পারে নাই। আস্‌সাফ্‌ফাহ সাময়িকভাবে 'আম্বার' কে তাহার বাসস্থানে পরিণত করিয়াছিলেন এবং অধিকাংশ সময়ই তিনি পীড়িত থাকিতেন। পূর্বেই বলিয়াছি, তিনি তাঁহার প্রথম ভাষণ জ্বরাক্রান্ত অবস্থায় অসম্পূর্ণভাবে দিয়াছিলেন। তাঁহার চাচা দাউদ ইবনে আলী তাহা সম্পূর্ণ করিয়াছিলেন।

তিনি বেশী দীর্ঘজীবন যাপন করিতে পারেন নাই। আল মাসউদীর মতে ঊনত্রিশ বৎসর এবং অন্যান্য ঐতিহাসিকের মতে তেত্রিশ বৎসরকাল জীবিত ছিলেন।

তাই দেখা যায়, প্রকৃতপক্ষে আব্বাসীয়দের প্রথম খলীফা ছিলেন আবু জাফর মনসুর। তিনি একে একে তাঁহার পথের সকল কাঁটা অপসারিত করিয়াছিলেন। তিনিই বাগদাদ এবং মদীনাতুস্‌ সালামের প্রতিষ্ঠাতা। হুকুমত করার সময়ও তিনি অনেক পাইয়াছিলেন। সমস্ত মুসলিম জগতকে তিনি সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার উপর সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। সমস্ত ঐতিহাসিকের মতেও তিনিই ছিলেন বনী আব্বাসীয় হুকুমতের প্রথম স্থাপয়িতা এবং তাঁহার সাথে ইমাম সাহেবের মতবিরোধই প্রকৃতপক্ষে ইমামের রাজনৈতিক জীবনের শ্রেষ্ঠ কীর্তি।

আমার যতদূর মনে হয় কূফা পরিত্যাগ করার পর দেশে যথার্থ শান্তি ও শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠিত না হওয়া পর্যন্ত পুনরায় হিজায হইতে কুফা আগমন করা তিনি যুক্তিসঙ্গত মনে করেন নাই। হয়ত প্রয়োজনবশতই দুই একবার কুফায় আসিয়াছিলেন এবং আবু জাফর মনসুরের সময়ই স্থায়ীভাবে বসবাস করিবার জন্য কূফায় প্রত্যাবর্তন করিয়াছিলেন। তাই দেখা যায়, ইমাম সাহেব প্রায় ছয় বৎসর হিজাযে ছিলেন।

কিন্তু এই দীর্ঘ ছয় বৎসর ইমাম সাহেব কুফায় কি করিয়াছিলেন? পূর্বেই বলিয়াছি যে, তাঁহার উস্তাদ হাম্মাদ ইবনে সুলায়মান

১২০ হিজরীতে ইন্তিকাল করেন। অতঃপর হাম্মাদের পরিবর্তে ফতওয়া দিবার জন্য লোকে ইমাম সাহেবকে ধরিলেন। ইমাম সাহেব প্রথমে রাযী না হইলেও পরে তিনি লোকের অনুরোধ রক্ষা করিতে বাধ্য হইলেন। আরও অবগত হওয়া যায় যে, প্রথমে হাম্মাদের পুত্র ইসমাঈলকে লোকে তাঁহার পিতার স্থলাভিষিক্ত করিতে চাহিলেন। কিন্তু ফতওয়া দেওয়ার পরিবর্তে ইতিহাস, কবিতা ও সাহিত্যের প্রতি তাঁহার ঝোঁক দেখিয়া হাম্মাদের অন্যান্য কয়েকজন ছাত্রের নাম করা হইল। কিন্তু কিছুসংখ্যক বয়ঃবৃদ্ধ অভিজ্ঞতাসম্পন্ন লোক বলিলেন, "বয়সে নবীন হইলেও এই রেশম ব্যবসায়ী অনেক জ্ঞান রাখেন।"

লোকের এই সুধারণা যথার্থ প্রমাণিত হইল। তিনি উস্তাদের প্রতিনিধিত্ব ঠিকভাবেই করিতে লাগিলেন। ইহা ছিল ইমাম সাহেবের জীবনের প্রথম ধাপ; কিন্তু হিজায হইতে ফিরিয়া আসার পর তিনি যে কার্যপদ্ধতি গ্রহণ করেন, প্রথম ধাপের সঙ্গে উহার বেশ পার্থক্য সম্বন্ধে প্রসিদ্ধ ইমাম ইয়াহ্ইয়া ইবনে সাঈদ আল-কাত্তান বলিয়াছেন—"ইমাম আবু হানীফার যে অবস্থা তোমরা আজ দেখিতেছ উহা প্রথমে ছিল না। পরে তিনি প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন।"

ইহা ইমাম সাহেবের জীবনের দুইটি বিভিন্নমুখী কার্যধারার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। প্রথম জীবনে তাঁহার উস্তাদ হাম্মাদ ইবনে সুলায়মান ইন্তিকাল করার পর লোকে যে অভাব অনুভব করিতেছিল সেই অভাব তাঁহার দ্বারা পূর্ণ হইয়াছিল। সেই অভাব পূর্ণ করিতে গিয়াই তিনি সকলের নিকট সুপরিচিত হইয়াছিলেন এবং ইবনে হুবায়রাও তাঁহার দিকে ঝুঁকিয়া পড়িয়াছিল। কিন্তু ইবনে হুবায়রার অত্যাচার হইতে আত্মরক্ষা করিয়া তিনি হিজায যান এবং সেখানে যাওয়ার একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল আশ্রয় গ্রহণ করা। ইবনে আবী কাদীক বলেন, "আমি দেখিলাম ইমাম সাদিক আবু হানীফার হাত ধরিয়া মসজিদে প্রবেশ করিতেছেন। মসজিদে নববীর দরজায় পেঁাছিতেই ইমাম আবু হানীফা 'ইহা নিরাপদ স্থান' বলিয়া মসজিদে প্রবেশ করিলেন।"

ইহাতে মনে হয় ইমাম সাহেব নিরাপদে থাকার মানসেই সেখানে গিয়াছিলেন। ইহা লৌকিক ও পারলৌকিক বিপদাপদ হইতে নিরাপদে থাকার স্থান। মক্কায় কাবা শরীফের পরই মদীনায় মসজিদে নববীর স্থান। একথা একান্ত সত্য যে, আল্লাহ্ এবং আল্লাহ্র রসূলই মুমিনদের আশ্রয় স্থান। সে যাহা হউক প্রশ্ন এই যে, আশ্রয় গ্রহণ ছাড়াও ইমাম দীর্ঘ ছয় বৎসর হিজাযে কোন্ কাজে লিপ্ত ছিলেন?

হিজাযে ইমাম সাহেবের কর্মব্যস্ততা

সেই যুগের নিয়ম মুতাবিক হিজাযে উলামা ও মুহাদ্দিসীনদের নিকট শিক্ষা গ্রহণের যে সুবর্ণ সুযোগ ছিল ইমাম সাহেব তাহা কখনো হেলায় হারান নাই। একবার কোন প্রয়োজনবশত ইমাম সাহেবের উস্তাদ-সংখ্যা গণিতে গিয়া ইমাম আবু হাফ্স কাবিরী আল-বুখারী বলিয়াছেন, 'ইমাম সাহেবের উস্তাদ সংখ্যা চারি হাযার ছিল।' (মুজিম, পৃষ্ঠা ২৭, ১ম জিলদ)

হাফিজ ইবনে হাযার-এর গ্রন্থ 'খায়তুল হিসানে'র উক্তি উল্লেখ করিয়া মুজিম বলিয়াছেন, "এই চারি হাযার উস্তাদ তো ছিলেন তাবিঈন।" অর্থাৎ যাহারা সাহাবা-ই কিরামদের দেখিয়াছিলেন এবং তাহাদের নিকট শিক্ষাগ্রহণ করিয়াছিলেন। ইহা হইতেই অনুমান করা যাইতে পারে যে, এই চারি হাযার ছাড়াও তাঁহার আরও কত উস্তাদ ছিলেন।

হিজাযে হিজরত করিয়া যাওয়ার সময় তিনি শুধু আলিমই ছিলেন না, বরং উচ্চ পর্যায়ের একজন মুআল্লিমও (উস্তাদ) ছিলেন। তাই জন-সাধারণের মধ্যেই নয় বরং মক্কা ও মদীনা শরীফের মর্যাদাসম্পন্ন আলিম-দের মধ্যেও তাঁহার গভীর জ্ঞান ও বিদ্যা-বুদ্ধির প্রশংসা ছড়াইয়া পড়িয়া-ছিল। হিজাযের এমন একজন উস্তাদ যাঁহাকে উস্তাদস্বরূপ পাইয়া ইমাম সাহেব গর্ববোধ করিতেন, তাঁহার সম্বন্ধে ইমাম সাহেব বলিয়াছেন, "আতা ইবনে রাবাহ্-এর চেয়ে ভাল লোক আমি আর কখনও দেখি নাই।" কখন ইহাও বলিতেন, "সেই যুগের সর্ব-বিদ্যায় তিনি পারদর্শী ও অভিজ্ঞ ছিলেন।

আতা ইবনে রাবাহ্র শাগরিদ আবদুর রহমান বলেন, "আমরা আতা ইবনে রাবাহ্র মজলিসে বসিয়া শিক্ষা গ্রহণ করিতাম। অতঃপর আবু হানীফা আসিলে আতা সকলকে সরিয়া বসিতে নির্দেশ দিতেন এবং তাঁহাকে নিজের কাছে বসাইতেন।"

ইহার পরিণতিস্বরূপ লোকে ইমাম আবু হানীফাকেও শিক্ষা দানের মজলিস গঠন করিতে বাধ্য করিয়াছিলেন। ওয়াযীর ইবনে আবদুল্লাহ্ বলেন ঃ—

"আমি মক্কা মুআজ্জামায় দেখিয়াছি ইয়াসীন যিয়াত বড় একটি জনতাকে উদ্দেশ্য করিয়া বলিতেছেন, "হে লোক সকল। আবু হানীফার শিক্ষা দানের মজলিসে যাতায়াত কর। তাহার নিকট বসাকে সৌভাগ্যের বিষয়বস্তু মনে কর। তাঁহার ইল্ম দ্বারা উপকৃত হও। কেননা, এমন

লোক আর পাইবে না। হালাল-হারামে তারতম্যকারী এবং সুবিজ্ঞ আলিম আর পাইবে না। এই ব্যক্তিকে যদি তোমরা হারাইয়া ফেল, তবে মনে রাখিও ইল্‌মের বড় একটি অংশকে হারাইয়া ফেলিলে।"

ইসলামের সর্বশ্রেষ্ঠ কেন্দ্র যেখানে পৃথিবীর সকল মুসলমান সমবেত হয়—সেখানকার একজন প্রসিদ্ধ আলিম ও মুহাদ্দিসের এমন প্রচারে যে কতদূর প্রতিক্রিয়া হয় তাহা সহজেই অনুমেয়। মনে হয় সকল দেশের মুসলমান ইমাম সাহেবের শিক্ষার মজলিসে ভাঙিয়া পড়িয়াছিল। আম্মার ইবনে মুহাম্মদের মধ্যস্থতায় মুফিক বলেন, "ইমাম আবু হানীফা কা'বার মসজিদে বসা থাকিতেন। মনে হইত পৃথিবীর সকল মুসলমান তাহার নিকট আগমন করিয়া ফতওয়া জিজ্ঞাসা করিতেছেন এবং তিনি উহার উত্তর দিতেছেন।"

ইমাম সাহেবের জ্ঞানের কথা যতই ছড়াইয়া পড়িতে লাগিল লোক সংখ্যা ততই বাড়িতে লাগিল। ইবনে মুবারক স্বচক্ষে এই দৃশ্য দেখিয়া বলিয়াছেন—"আমি ইমাম আবু হানীফাকে কা'বা শরীফে বসিয়া পূর্ব ও পশ্চিম দেশীয় লোকদের ফতওয়া দিতে দেখিয়াছি।"

ইমাম সাহেবের মজলিসে কেমন প্রকৃতির লোক আসিতেন সেই সম্বন্ধেও তিনি বলিয়াছেন যে—"তখন মানুষ 'মানুষ' ছিল।" মুফিক ইবনে মুবারকের এই বাক্যের ব্যাখ্যা স্বরূপ বলিয়াছেন—"বড় বড় ফিকাহ্‌বিদ প্রসিদ্ধ আলিম ইমাম আবু হানীফার শিক্ষা-মজলিসে যোগদান করিতেন।"

ইহাকে আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ ব্যতীত আর কি বলা যাইতে পারে যে, ইমাম সাহেবের শিক্ষা গ্রহণ ও দানের যে পরিসীমা কূফা ও কূফার নিকটবর্তী বসরা পর্যন্ত সীমাবদ্ধ ছিল, উহা ইবনে হুবায়রার সৃষ্টি করা এক অমঙ্গল হইতে মঙ্গলে পরিবর্তিত হইয়া সুদূর হিজায পর্যন্ত বিস্তার লাভ করিয়াছিল।

অবশ্য ইমাম সাহেব হজ্জ করার জন্য কয়েকবার মক্কা শরীফ গিয়াছেন। কিন্তু ইবনে হুবায়রার অত্যাচারের দরুণই তিনি সেখানে কয়েক বৎসর অতিবাহিত করিয়াছেন। ইসলামী জগতের বিভিন্ন স্থানের প্রয়োজনীয়তা এবং তাহাদের এলাকার বিশেষত্ব সম্পর্কীয় জ্ঞান অর্জন করায় তাহার যে উপকার হইয়াছিল উহার অনুমান তিনিই করিতে পারেন যিনি উহাকে রাখিয়া হানাফী মতবাদের গ্রন্থাবলী পাঠ করিয়া থাকেন।

হিজাযের বিভিন্ন আলিমের সাথে আলাপ-আলোচনা

মক্কা ও মদীনা শরীফে থাকাকালীন বিভিন্ন দেশের আলিমদের মত-বাদ, ইজতিহাদ ও দৃষ্টিভঙ্গি পর্যবেক্ষণ করার সুযোগ তিনি পাইয়াছিলেন। হিজাযের আলিমগণ তো হিজাযেই ছিলেন। কিন্তু বিভিন্ন দেশের আলিমগণ হজ্জ উপলক্ষে সেখানে আগমন করিতেন। তাহারা বেশ কিছুদিন এখানে থাকিতেন। তাই ইমাম সাহেব তাঁহাদের সাথে মেলা-মেশা করার বেশ সুযোগ পাইতেন। আলিমদের দেখাশুনা কখনও চোখের দেখায় হয় না। তেমনি ইমাম সাহেবের দেখাশুনাও উদ্দেশ্যবিহীন চোখের দেখাশুনা ছিল না। মক্কার প্রসিদ্ধ ইমাম ইবনে যরীহ সম্বন্ধে মুফিক বলেন—"ইবনে যরীহ এবং ইমাম সাহেবের মধ্যে তর্ক-বিতর্ক হইত।"

তাহাবী হইতে মুফিক বর্ণনা করেন—"ইবনে ওয়াকিদী বলেন: আমি ইমাম মালিক ও ইমাম আবু হানীফাকে দেখিলাম, তাহারা ইশার নামাযের পর মসজিদে নববীতে ইলমী তর্ক-বিতর্কে লিপ্ত হইলেন।"

কতক্ষণ পর্যন্ত এই তর্ক-বিতর্ক চলিত তৎসম্বন্ধে পুনরায় বলিয়াছেন, "ইশার নামাযের পর উভয়ের মধ্যে তর্ক-বিতর্ক আরম্ভ হইত, উহা ফজরের নামাযের পূর্বক্ষণ পর্যন্ত চলিত।"

ইমাম মালিক (রঃ) একদিন ইমাম আবু হানীফা (রঃ) সম্বন্ধে ওয়াকিদীর নিকট বলিয়াছিলেন—"আমি একদিন আবু হানীফাকে এক জন হিজাযী ফকীহ্‌র সাথে তর্ক করিতে দেখিলাম যে, তিনি তিনবার হিজাযী ফকীহ্‌কে তাঁহার রায় মানিতে বাধ্য করিলেন। পরিশেষে তৃতীয় রায় যাহা তিনি মানিতে বাধ্য করিয়াছিলেন আবু হানীফা প্রমাণ করিয়া দিলেন যে ইহাও ঠিক নহে।"

হিজাযের আলিমগণ ছাড়াও তিনি অন্যান্য দেশের আলিমদের সাথে তর্কবিতর্ক করিতেন। সিরিয়ার প্রসিদ্ধ ফিকাহ্‌বিদ ও মুহাদ্দিস আওযা'ঈ সম্বন্ধে ইবনে মুবারক বলেন—"মক্কাশরীফে আওযা'ঈর সাথে ইমাম সাহেবের সাক্ষাত হয়। একদিন দেখিলাম উভয়েই তর্ক-বিতর্ক করিতেছেন।"

ইবনে মুবারক বলেন—"প্রথম ইমাম সাহেব সম্বন্ধে আওযাঈ'র সুধারণা ছিল না। কিন্তু এই সাক্ষাতের পর আওযাঈ বলিয়াছিলেন, "এই ব্যক্তির ইল্‌মের গভীরতা দেখিয়া তো আমার হিংসা হয়। আমার ভুলের জন্য আমি আল্লাহ্‌র নিকট ক্ষমা চাহিতেছি। আমি অযথা এই

ব্যক্তিকে দোষারোপ করিতাম। আসলে এই ব্যক্তি সম্বন্ধে আমি লোক মুখে যাহা শুনিতাম এখন তো দেখি উহার সম্পূর্ণ বিপরীত।"

মিসরের ইমামুল আম্মা (ইমামদের) লায়স ইবনে সাইদ শুধু ইমাম সাহেবের সাথে দেখা করার মানসেই একবার হজ্জ করিতে আসিয়াছিলেন। তিনি বলিলেন, "আমি দেখিলাম লোকে তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে। লোক প্রশ্ন করিতেছিল, তিনি উত্তর দিতেছিলেন। একটি কঠিন প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলে তিনি এমন সহজভাবে উত্তর দিলেন যে, আমি অবাক হইয়া গেলাম।" তিনি আরও বলেন, "তাঁহার সঠিক উত্তর দেওয়ায় আমি যতটা অবাক না হইলাম তাহার চাইতে বেশী হইলাম, তাড়াতাড়ি উত্তর দেওয়ায়।"

ইমাম লায়স বলেন, "আমি আরও অনেক বিষয় সম্বন্ধে তাঁহার নিকট প্রশ্ন করিলাম। এই সম্বন্ধে লোকে অনেক ঘটনা সংগ্রহ করিয়াছে। এইসব উদাহরণ পেশ করার অর্থ এই যে, অন্যান্য অভিজ্ঞতার সাথে মক্কা ও মদীনা থাকাকালীন তিনি বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, হিজায কিংবা হিজাযের বাহিরে ইসলামের শরীয়ত সম্বন্ধে যে কর্মধারা আলিম সম্প্রদায় গ্রহণ করিয়াছেন উহা শুধু অসম্পূর্ণই নয় বরং ইসলামের পক্ষে ক্ষতিকর। দ্বিতীয়ত যে সমস্ত মুহাদ্দিস হাদীসের যথার্থতা পরীক্ষা-নিরীক্ষা না করিয়াই যাহা শুনিতেন তাহাই অনর্গল বলিয়া যাইতেন, তাঁহাদের সম্পর্কে ইমাম সাহেবের দারুণ একটা অভিযোগ ছিল। তাঁহাদের সম্পর্কে তিনি বলিয়াছেন—"তাঁহাদের পরিণতি খুবই পরিতাপের। তাঁহারা এমনই দায়িত্বহীন যে, জনসাধারণের সম্মুখে চিন্তা-ভাবনা না করিয়াই একটির পর একটি হাদীস বর্ণনা করিয়া যান।"

ইমাম সাহেবেরই ছাত্র হেরাতের আলিম আবু রিযা ইমাম সাহেবের মৃতদেহের গোসল দেওয়ার সময় বলিয়াছিলেন,—"ইমাম সাহেব বলিতেন,—যে ব্যক্তি বিশুদ্ধ সনদ ব্যতীত হাদীস সংগ্রহ করে তাহার অবস্থা এমন ব্যক্তির ন্যায় যে শুধু ঔষধ সংগ্রহ করে অথচ জানে না সেই ঔষধ কোন্ রোগের প্রতিষেধক।"

মুহাম্মদ নামক একজন লোক হাদীস সংগ্রহে খুবই আগ্রহী ছিলেন। ইমাম সাহেব একদিন কোন একখানি হাদীসের ব্যাখ্যা জিজ্ঞাসা করায় মুহাম্মদ সঠিক উত্তর দিতে পারিলেন না। ইমাম সাহেব উহার যথার্থ ব্যাখ্যা করার পর বলিলেন, "মুহাম্মদ! যে ব্যক্তি শুধু

হাদীস সংগ্রহে আগ্রহী, অথচ উহার ব্যাখ্যা এবং অন্তর্নিহিত অর্থ সংগ্রহে উদাসীন, মনে রাখিও সে তাহার পরিশ্রমই নষ্ট করিল।"

পরিশেষে তিনি এতটাও বলিয়াছিলেন, "এইরূপ ইল্‌ম, তাহার জীবনের জন্য বিপজ্জনক হইয়া দাঁড়ায়।"

তাই দেখা যায় শুধু হাদীস সংগ্রহ করাকে তিনি বিশেষ কোন গুরুত্ব দিতেন না। আর প্রকৃত ঘটনা এই যে, হাদীস ও আছারের এমন সম্বন্ধ যাহা মুসলমানদের দৈনন্দিন জীবনের কার্যাবলী, ইবাদত-বন্দেগীর সাথে সম্পর্কযুক্ত। বিশেষত ইমাম সাহেবের যুগের লোকেরা উক্ত হাদীসের সাথে সম্পর্কযুক্ত ঘটনাবলী প্রায়ই অজ্ঞাত ছিলেন। তাই তিনি হাদীসের ইতিহাস জানায় অতি উৎসাহী ছিলেন অর্থাৎ কোন্ সময় কি অবস্থায় এবং কেন হুযুর (সঃ) এই ইরশাদ বা কাজ করিয়াছিলেন? ইমাম সাহেবের এই বিশেষ ধরনের স্বভাব সম্বন্ধে বর্ণনাকারী বলিয়াছেন, "হাদীসের মধ্যে নাসিখ-মানসুখের[১] সন্ধানে তিনি ব্যাপৃত থাকিতেন।"

অর্থাৎ ইমাম সাহেবের মতে যাঁহারা ঐতিহাসিক ভিত্তিতে হাদীস ও আছার অধ্যয়ন না করে তাহারা ইসলামী শরীয়তের বিধি-নিষেধ সম্পর্কে সুষ্ঠু ব্যবস্থা গ্রহণ করায় সমর্থ নহেন।"

প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস ও ফকীহ্ ইয়াহ্ইয়া ইবনে আদম বলেন, "ইমাম সাহেবের প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল হাদীসের ঐতিহাসিক পর্যায়ক্রম সন্ধান করা। তিনি আরও বলেন, "সর্বশেষ কথা এই যে, হুযুর (সঃ) যে অবস্থায় ইন্তিকাল করিয়াছিলেন, ইমাম আবু হানীফার দৃষ্টি উহাতে নিবদ্ধ ছিল এবং উহাকেই তিনি জীবনের লক্ষ্য হিসাবে গ্রহণ করিয়াছিলেন।"

বাস্তবায়নের পূর্বে শরীয়তের নির্দেশ

হিজায অবস্থানকালে ইমাম সাহেব আরও একটি অভিজ্ঞতা অর্জন করিয়াছিলেন। উহা ছিল এই যে, সেই যুগের নিয়ম ছিল কোন ঘটনা সংঘটিত হওয়ার পর এবং কোন প্রশ্নকারীর প্রশ্ন করার পর চিন্তা হইত—শরীয়ত মুতাবিক ইহার সমাধান কি হইতে পারে? ফতওয়া

---

১. যাহা কোন কিছুকে কার্যকরী হওয়া হইতে বিরত রাখে, উহা নাসিখ আর যাহা পূর্বে কার্যকরী ছিল কিন্তু এখন নহে উহা মানসুখ।

দানকারী এবং হুকুমতের বহালকৃত কাজীগণও এই পন্থা অবলম্বন করিয়া চলিতেন। উহার পরিণতি এই হইত যে, ঠিক সময়ে এইরূপ সমাধান সম্বন্ধে ধীর-স্থিরভাবে চিন্তা ভাবনা করার সময় ও সুযোগ পাওয়া যাইত না। ফলে অভিজ্ঞ লোকদেরও ভুল-ভ্রান্তি হওয়ার সম্ভাবনা থাকিয়া যাইত।

কথিত আছে, ইমাম সাহেবের প্রাথমিক যুগে বসরায় ইমাম কাতাদাহ্ কূফা আগমন করেন। ইমাম সাহেবের নাম শুনিয়া তিনি তাঁহার সহিত সাক্ষাত করিতে আসেন। কথা প্রসঙ্গে একটি মাস'আলা উত্থাপিত হইলে ইমাম সাহেব মাস'আলার বিবিধ সমস্যা সম্পর্কেও জিজ্ঞাসা করিলেন। উত্তরে কাতাদাহ্ বলিলেন, "ভাই! সত্যই কি এমন কোন অবস্থা হইয়াছে না এমনি জিজ্ঞাসা করিতেছ?" ইমাম সাহেব বলিলেন, "এখনও এমন কোন অবস্থা হয় নাই।" উত্তরে কাতাদাহ বলিলেন, "তবে যাহা এখনও সংঘটিত হয় নাই এমন বিষয়ে প্রশ্ন করিও না।"

ইহার উত্তরে ইমাম সাহেব কাতাদাহ্কে বলিয়াছিলেন—"মানুষ যে বিপদে পড়িতে পারে আলিমদের কর্তব্য উহার সমাধান পূর্বেই করিয়া রাখা। আল্লাহ্ না করুন যদি এমন কোন অবস্থা আসিয়া পড়ে তখন যেন এমন কোন কিছু না হয় যাহা লোকে জানে না। বরং যদি কেহ এমন বিপদে পড়ে তখন কি করিতে হইবে এবং বিপদ হইতে মুক্ত হওয়ার জন্য শরীয়ত কি ব্যবস্থা করিয়া রাখিয়াছে উহা যেন জানা থাকে।"

ইমাম কাতাদাহ্ ১১৭ বা ১১৮ হিজরীতে ইন্তিকাল করেন। তাই দেখা যায় হাম্মাদ ইবনে সুলায়মানের ছাত্র থাকাকালীনই ইমাম সাহেব নিজের এই মত কাতাদাহ্কে বলিয়াছিলেন। এই ঘটনায়ই তাহার অনাগত ভবিষ্যতের মনোভাব প্রকাশ পায়।

সত্য বলিতে কি এই দুইটি বিষয় অর্থাৎ হাদীস আছারের ঐতিহাসিক কারণ অনুসন্ধান এবং যে সমস্যা এখনও দেখা দেয় নাই বরং দেওয়ার সম্ভাবনা রহিয়াছে উহার সমাধান করিয়া রাখার চেষ্টা করা—এই দুইটি বিষয়ে তাঁহাকে শুধু তাঁহার যুগেরই নয় বরং অনাগত প্রত্যেকটি যুগের জন্যই তাঁহাকে ইমাম করিয়া রাখিয়াছে। কায়েস ইবনে রবী ইমাম সাহেব সম্বন্ধে বলিতেন, "যাহা এখনও হয় নাই উহার সমস্যা সমাধানে আবু হানীফা বড়ই অভিজ্ঞ।"

প্রথম হইতেই এই দুইটি বিষয়ের গুরুত্ব সম্পর্কে ইমাম সাহেব সচেতন ছিলেন। অতঃপর হিজায ও বিভিন্ন দেশীয় আলিমদের সহিত মিলিত হওয়ার পর উপলব্ধি আরও প্রখর হইতে প্রখরতর হইয়াছিল।

কুফায় প্রত্যাবর্তন ও আইন প্রণয়ন

এই গভীর উপলব্ধির ফলাফলস্বরূপ বনী উমাইয়া শাসনকাল অবসান হওয়ার পর ইমাম সাহেব যখন কূফায় স্থায়ীভাবে বসবাস আরম্ভ করেন তখন আমরা তাঁহাকে নূতন একটি কাজে লিপ্ত দেখিতে পাই। এমন এক কাজে লিপ্ত ছিলেন যাহা শুধু ইসলামী ইতিহাসেই নয় অন্যান্য জাতির ইতিহাসেও বিরল। আর এই কাজের জন্যই তিনি তাঁহার বিগত জীবনের চেয়ে আরও প্রসিদ্ধি লাভ করিলেন। প্রথম যুগে তিনি এমন সব কাজই করিতেন যাহা অন্যান্য আলিমও করিতেন। হিজায হইতে ফিরিয়া আসার পর তিনি কূফায় যে নীতির প্রবর্তন করিলেন, জানি না উহা তাঁহার মাথায় কোথা হইতে আসিয়াছিল? উহাকে আল্লাহ্-প্রদত্ত ইলহাম ব্যতীত আর কি বলা যাইতে পারে?

আমার ইঙ্গিত ঐ মজলিসে শূরার দিকে যাহা ইমাম সাহেব আব্বাসীয়দের শাসনকালে কিতাব ও সুন্নতের আলোকে আইন-কানুন রচনার জন্য কূফায় প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। আমার পূর্বেও ইমাম সাহেবের জীবন-চরিত রচয়িতা উর্দু গ্রন্থকারগণ এই মজলিসে শূরার উল্লেখ করিয়াছেন। এই গ্রন্থ হইতে প্রয়োজনবোধে আমি উহার কিছুটা বর্ণনা দিব। কিন্তু তৎপূর্বে এই মজলিসের বিশেষত্ব সম্বন্ধে যদি কিছু বলা যায় তবে ভাল হইবে বিধায় আমি এখানে তাহা লিপিবদ্ধ করিতেছি।

এই মজলিস প্রতিষ্ঠা করার উদ্দেশ্য ছিল হুযুর (সঃ) বর্ণিত যে সব হাদীস মুহাদ্দিসগণ মুসলমানদের নিকট রওয়ায়েত করেন, উহাতে ঐতিহাসিক পর্যায়ক্রম স্থির করিয়া মুসলমানদের আসক্ত করার জন্য শেষ বারের মত মাস্'আলা নির্দিষ্ট করিয়া দেওয়া। ইহা ছিল প্রথম উদ্দেশ্য। দ্বিতীয় উদ্দেশ্য ছিল, সমস্ত সমস্যা এখনও দেখা দেয় নাই এবং যাহা দেখা দেওয়ার সম্ভাবনা আছে সময়ে যেন উক্ত সমস্যার সমাধানের জন্য তাড়াহুড়া করা না হয়, তজ্জন্য কুরআন ও হাদীসের আলোকে যথাসম্ভব সমাধান পূর্ব হইতেই করিয়া রাখা।

ইমাম সাহেব যেভাবে এ কাজ আরম্ভ করিয়াছিলেন অন্যরা ঠিক সেভাবে না করিলেও অন্তত এই পর্যায়ের কাজ তখনও কিছুটা প্রচলিত ছিল। তবে তাহাদের কাজ সমবেতভাবে না হইয়া একক চেষ্টায় হইতেছিল। ইমাম সাহেবের সমসাময়িক সুফইয়ান সাওরী, ইমাম আওযা'ঈ, রবীয়াতুর রা'ঈ এমন কি ইমাম মালিক (রঃ)-ও একক চেষ্টায় এই পর্যায়ের কিছু কিছু কাজ করিতেন।

ইমাম সাহেবই সর্বপ্রথম উপলব্ধি করিয়াছিলেন যে, একক চেষ্টায় এই বিরাট কাজ সুষ্ঠুভাবে কার্যকরী করা সম্ভব নয়। তিনি যে সমবেত চেষ্টার প্রয়োজনীয়তাই উপলব্ধি করিয়াছিলেন শুধু তাহাই নয় বরং আমি তো ইহা পাঠ করিয়া বিস্মিত হইয়া যাই যে, একবার কোন এক ব্যক্তি ইমাম সাহেবের নিকট আসিয়া বলিলেন, "অমুক মসজিদে দলবদ্ধ-ভাবে লোকে ফিকাহ্‌র মাস'আলা-মাসায়েল সম্পর্কে তর্ক-বিতর্ক করিতেছেন।" ইমাম সাহেব জিজ্ঞাসা করিলেন—"তাহাদের মধ্যে কেহ সভাপতি আছেন কি?" সে ব্যক্তি বলিলেন—"না তাহাদের দলের কোন সভাপতি নাই। উত্তরে ইমাম সাহেব বলিলেন,—"তবে ইহারা কখনও ফকীহ্ হইতে পারিবে না।"

"কখনও" শব্দের প্রতি একটু লক্ষ্য করুন। একাকীর চেয়ে সমবেত-ভাবে চেষ্টার প্রতি তাহার যেমন খেয়াল ছিল তেমনি কোন মজলিসের সভাপতি না থাকিলে উহার সিদ্ধান্ত যেমন কার্যকরী হইতে পারে না, উহার প্রতিও তাহার খেয়াল ছিল।

শৃংখলার সাথে প্রশ্ন করার স্বাধীনতা

সমবেত প্রচেষ্টা তখনই কার্যকরী হইতে পারে যখন উহা ধৈর্য ও শৃংখলার সাথে আনজাম দেওয়া হয়। একথা অবগত থাকার পরও ইমাম সাহেব জানিতেন সভার সমস্ত লোকের স্ব স্ব মতামত প্রকাশ করার স্বাধীনতা না থাকিলে আসল উদ্দেশ্য লাভ করা যায় না। এ সম্বন্ধে ইমাম সাহেব যে কতটা স্বাধীনতা দিয়া রাখিয়াছিলেন উহা নিম্ন ঘটনায় প্রকাশ পায়। জুরজনী বলেন, "আমি ইমাম সাহেবের মজলিসে উপস্থিত ছিলাম। সভাস্থ একজন যুবক একটি প্রশ্ন করিলে ইমাম সাহেব ইহার উত্তর দিলেন। কিন্তু উত্তর শুনার সাথে সাথেই যুবক হঠাৎ বলিয়া ফেলিল—"আপনি ভুল করিয়াছেন।"

জুরজানী বলেন, "যুবকের কথার ভঙ্গি দেখিয়া আমি হতবাক

হইয়া গেলাম। উপস্থিত সকলকে লক্ষ্য করিয়া বলিলাম,—বড়ই বিস্ময়ের কথা যে উস্তাদের সাথে কথা বলার সময় তাহাদের সম্মানের প্রতি তোমরা মোটেই খেয়াল কর না।"

উত্তরে ইমাম সাহেব বলিলেন,—"তাহাদের কথায় কিছু মনে করিও না, বরং তাহাদের এইভাবে কথা বলার অভ্যাস আমিই করাইয়া দিয়াছি।"

ইমাম সাহেব ইচ্ছা করিয়াই তাহার মজলিসের সদস্যবৃন্দকে এমন বাক স্বাধীনতা দিয়া রাখিয়াছিলেন—যাহাতে প্রকৃত উদ্দেশ্য লাভ করার ক্ষেত্রে কোন প্রকার বাধা-বিঘ্নের সৃষ্টি না হয়।

এই মজলিসের সভাপতি ছিলেন স্বয়ং ইমাম সাহেব। এই মজলিস সম্বন্ধীয় বিস্তারিত বিবরণ অনেক উর্দু গ্রন্থকারই করিয়াছেন। তাই মোটামুটি এই সম্বন্ধে আমি কয়েকটি ইঙ্গিত করা ব্যতীত বিশেষ কিছু লিখিব না। প্রয়োজন বোধে শিবলী নুমানির "সীরাতুন নুমান' এবং ডক্টর হামীদুল্লাহ খানের বিশেষ আলোচনা পাঠ করিতে পারেন।

যাহা হউক আমার মতে 'আব্বাসীয়দের যুগে ইমাম সাহেব হেজায হইতে প্রত্যাবর্তন করার পর এই মজলিস প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন।

যে কোন সমস্যার সমাধান নীতি সম্বন্ধে লিখিত আছে,—কোন মাসআলা সম্বন্ধে আলোচনাকালে এক একজন নিজের মতামত প্রকাশ করিতেন এবং অন্যান্য সকলে শুনিতেন। ইমাম সাহেবেও নিজের মতামত প্রকাশ করিতেন। সভার সদস্যবৃন্দ এই সম্বন্ধে আলাপ-আলোচনা করিতেন। সময়ে কোন কোন মাসআলার আলোচনায় মাসাবধি এমন কি মাসের উপর সময় লাগিয়া যাইত। কোন সিদ্ধান্তে না পৌঁছা পর্যন্ত এরূপ আলাপ-আলোচনা চলিতে থাকিত।

এই মজলিসের সদস্যবৃন্দ সম্বন্ধে ওয়াকী' ইবন জারাহ লোকের নিকট বলিতেন,—"ইমাম সাহেবের সিদ্ধান্ত কিভাবে ভুল হইতে পারে? কারণ, আবু ইউসুফ, যুফার, মুহাম্মদের ন্যায় লোক তাহাকে কয়াস ও ইজতিহাদে সাহায্য করিতেন। ইয়াহইয়া ইবন যাকারিয়া; ইবন আবু যায়দ, হাফস ইবন গিয়াছ, হাব্বান এবন মানদস ইবন আলীর ন্যায় প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিছ আরবী অভিধানে অভিজ্ঞ কাসম ইবন মা'আন, 'আবদুর রহমান ইবন 'আব্দুল্লাহ ইবন মাসউদ (রাঃ), দাউদ ইবন নাযীর তাঈ, ফুযায়ল ইবন ইয়াদের ন্যায় দীনদার লোক তাহার এই মজলিসের সদস্য ছিলেন।"

ইহার পর ওয়াকী বলেন,—"যাহার বন্ধু এবং কাজের সঙ্গী এমন সব মহান ব্যক্তি তাহার ভুল হইতে পারে না। কারণ ভুল হওয়ার সম্ভাবনা দেখিলে তাঁহারা তাঁহাকে সঠিক পথে আনিয়া দাঁড় করাইয়া নিতেন।

ইহার পরও যাহারা ইমাম সাহেবের কার্য-সম্বন্ধে কুধারণা পোষণ করে তাহাদের সম্বন্ধে ওয়াকী বলেন,—

و الذى يقول مثل هذا اولئك لا الانعام بل هم اضل -

"তাঁহার উদ্দেশ্য এমন সব উক্তিকারকগণ (অর্থাৎ হানাফী ফিকাহ্ ভিত্তিহীন) পশু অথবা উহার চেয়েও নিম্নস্তরের জীব।"

আইন প্রণয়নের এই মজলিস আমার ধারণায় হেজায হইতে প্রত্যাবর্তন করার পর করিয়াছিলেন। কারণ, এই মজলিসের অধিকাংশ সভ্যদের উহাতে অংশগ্রহণ করার সম্ভাবনা ঐ সময়ই ছিল—যখন ইমাম সাহেব হেজায হইতে ফিরিয়া আসিয়া কুফায় পুনরায় নূতন ভাবে আইন প্রণয়নের কাজে লিপ্ত হইয়াছিলেন। 'আবদুল্লাহ ইবন নাওয়ামীরের মধ্যস্থতায় এই মজলিস সম্বন্ধে মু'ফিক বলেন,—"ইমাম সাহেব যখন বসিতেন তখন তাঁহার বন্ধুগণ আশে-পাশে বসিতেন। তাহাদের মধ্যে কাসিম ইবন মা'আদ, 'আফিয়া ইবন ইয়াযীদ; দাউদ তাঈ, যাফর ইবন হুযয়েল এবং এই প্রকারের আরও লোক উপস্থিত থাকিতেন। অতঃপর কোন একটি মাসআলা লইয়া আলোচনা আরম্ভ হইলে ইমাম সাহেবের ছাত্ররা নিজেদের সাধ্যমত ঐ সম্বন্ধে আলোকপাত করিতেন। তাহাদের কথাবার্তার ও তর্ক-বিতর্কের শব্দ উচ্চ হইতে উচ্চতর হইতে থাকিত। অনেক কথাবার্তার পর ইমাম সাহেব বলা আরম্ভ করিতেন এবং সকলে তাহার বলা শেষ না হওয়া পর্যন্ত চুপ করিয়া থাকিতেন।"

এই বিষয়ে আবু সুলায়মানও বলিয়াছেন,—"আবু হানীফা যখন বলা আরম্ভ করিতেন তখন সকলে চুপ করিয়া থাকিতেন। মনে হইত যেন এই মজলিসে কোন লোক নাই। অথচ সেখানে বড় বড় আলিম উপস্থিত থাকিতেন।"

ইমাম মুহাম্মাদ ইবন হাসান আশ্‌শায়বানী বলিয়াছেন,—"আবু হানীফার নিয়ম ছিল তিনি তাঁহার ছাত্রদের দ্বারা তর্ক-বিতর্ক করাইতেন। ছাত্ররা কখনও তাহার কথা মানিয়া লইতেন, আবার কখনও তাঁহার কথার বিরুদ্ধে নিজেদের দলীল পেশ করিতেন।"

এই মসলিসের একজন বিশেষ সদস্য 'আলী ইবন মাসহার বলেন "ইমাম সাহেবের মজলিসে কয়েকটি হাদীস সম্পর্কে আলাপ-আলোচনা হইতেছিল যে উহার সনদ কি? ঘটনাক্রমে আমার উহা জানা থাকায় বলিলাম। উহাতে ইমাম সাহেব সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন—"সাবাশ বাজলার নওজওয়ান। (বাজ্‌লা 'আলীর গোত্রের নাম)।"

মোট কথা সকলেই স্বাধীনভাবে নিজের মতামত প্রকাশ করিতে পারিতেন। এবং সে জন্য প্রত্যেককেই উৎসাহ দেওয়া হইত। ইহাকে উৎসাহ দানই বলা হউক কিংবা ইমাম সাহেবের সতর্কতা ও ন্যায়-পরায়ণতাই বলা হউক এই মজলিসের একজন সদস্য 'আফিয়া ইবনে ইয়াযীদ সম্বন্ধে বর্ণিত আছে যে, কোনদিন ঘটনাক্রমে 'আফিয়া অনুপস্থিত থাকায় কোন মাসআলা সম্বন্ধে স্থির সিদ্ধান্তে পেঁছার পরও ইমাম সাহেব বলিলেন, "আফিয়া না দেখা পর্যন্ত উহাকে চূড়ান্তভাবে লিখিও না।" পরে 'আফিয়া উহা দেখার পর ইমাম সাহেব চূড়ান্তভাবে লিখিয়া রাখার নির্দেশ দিলেন।

উপরোক্ত বিশেষত্বসমূহ হইতে বুঝা যায় যে,—এই অবস্থায় যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হইত উহার গুরুত্ব কতটা হইতে পারে। ইবন মুবারক বলেন,—"কোন একটি মাসআলা সম্বন্ধে তিনদিন পর্যন্ত সদস্যগণ আলাপ-আলোচনায় লিপ্ত থাকেন।"

তর্ক-বিতর্ক ও আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে আইন-প্রণয়ন করা যদিও সেই যুগের সাধারণ নীতি ছিল, তথাপি সেই যুগের হিসাব মত চিন্তা করিয়া দেখা উচিত যখন ইমাম সাহেব আইন প্রণয়নের এই নূতন পথ আবিষ্কার করিয়াছিলেন। মুহাম্মিদছ আমাশ এই মজলিসের গুরুত্ব ও বিশেষত্ব সম্বন্ধে বলিয়াছেন,—"এই মজলিসে কোন মাসআলা উঠিলে উহা সম্বন্ধে তর্ক-বিতর্ক হইত এবং কোন সিদ্ধান্তে পেঁছা পর্যন্ত এরূপ তর্ক-বিতর্ক চলিত।" সম্ভবত তাঁহার জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত এই আইন-প্রণয়ন কাজ অব্যাহত ছিল। যদিও তিনি নানা প্রকার অসুবিধা ও বিপদাপদের সম্মুখীন হইয়াছিলেন, তথাপি এমন কোন বর্ণনাই পাওয়া যায় না যে সে কাজ তিনি বন্ধ রাখিয়াছিলেন, 'আবদুল্লাহ ইবন মুবারক বলেন,—'আমি আবু হানিফার কিতাবসমূহ একাধিকবার নকল করিয়াছি। ঐ সমস্ত কিতাবে পরবর্তীকালে যাহা পরিবর্তন ও পরিবর্ধন হইত উহাও লিখিয়া লইতাম।"

ইহাতে বুঝা যায় এই মজলিসের প্রণীত আইন লিপিবদ্ধ করিয়াই কাজ বন্ধ রাখা হইত না বরং উহার উপরেও বর্ধিত করা হইত। এই রূপ বর্ধিত করা সব সময়ই হইত। ইমাম সাহেবের মৃত্যুর পর উক্ত মজলিসের একজন বিশেষ সদশ্য যুফারের নিকট হইতে ইবনে মুবারক কিতাব চাহিয়া নিয়া নকল করিতেন। তাহার প্রণীত আইনের সংখ্যা খাওয়ারিযমীর মতে তিরাশী হাযার ছিল।

এই আইন প্রণয়নের জন্য ঐ সময় পনের হইতে বিশ বৎসর কালই যথেষ্ট হইতে পারে। যাঁহারা এই মাসআলা বলিতে শুধু নামায রোযা হজ্জ যাকাতই বুঝেন তাঁহারা উহার যথার্থ গুরুত্ব কখনও বুঝিতে সক্ষম হইবেন না। তাঁহারা এই কথা কিভাবে বুঝিতে পারিবেন যে, আজকাল যাহাকে সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক বিষয় বলে উহার সমস্ত কিছুই ফিকাহ শাস্ত্রে স্থান পাইয়াছিল। এই সমস্ত আইন-কানুন প্রণয়ন করিতে কুরআন, হাদীস, ইজমা এবং কিয়াসের উপরই নির্ভর করা হয় নাই বরং অভিধান, ব্যাকরণ এবং অঙ্ক শাস্ত্র হইতেও যথেষ্ট সাহায্য গ্রহণ করা হইয়াছিল। ইহা ছাড়াও ফিকাহ্ শাস্ত্র প্রণয়নে নানা বিষয়ে অভিজ্ঞতাসম্পন্ন হইতে হইত।

মজলিসে প্রণীত আইনের সংখ্যা

খাওয়ারিযমী ইমাম সাহেবের মজলিসের রচিত আইনের যে সংখ্যা বলিয়াছেন তাঁহারই বর্ণনা যে, "এই তিরাশী হাযার মাসআলার মধ্যে ৩৮ হাযার শুধু ধর্ম-সম্বন্ধীয়। অবশিষ্ট ৪৫ হাযার পার্থিব কাজ-কারবারের সাথে সম্পর্কযুক্ত।

পার্থিব কাজ-কারবার এই শব্দের অধীনে মানব জীবনের ব্যক্তিগত, সমষ্টিগত, সমাজগত মোট কথা সব কিছুই আসিয়া যায়! প্রকৃতপক্ষে এই ব্যাপারে ফিকাহ্র প্রত্যেকটি অধ্যায় শুধু স্বয়ংসম্পূর্ণ গ্রন্থই নয় বরং এক একটি স্বতন্ত্র বিষয় হওয়ার সামর্থ্যও রাখে। পৃথিবী যখন মুসলমানদের এই শত শত বৎসরের প্রচেষ্টাকে গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করিবে তখন মানব জীবনের অসংখ্য অসুবিধা দেখিতে পাইবে যাহার সমাধান পূর্বেই করিয়া রাখা হইয়াছে।

ইমাম সাহেবের আইন-প্রণয়ন এবং তাঁহার মজলিসের কথা এখানেই শেষ করা হইল। এখন কথা হইল, এই কাজ করার পিছনে ইমাম সাহেবের লক্ষ্য কি ছিল? কোন্ বিষয় তাঁহাকে একাজ করিতে উৎসাহী

করিয়াছিল ? এখন এই বিষয়েই আমি আলোচনা করিব। প্রথমে এই সম্বন্ধে ছিটে-ফোঁটা ইঙ্গিত করিয়াছি, এখন বিস্তারিতভাবে আলোচনা করার সময় আসিয়াছে।

একথা বলা নিষ্প্রয়োজন যে, সেই যুগের যে নিয়ম ছিল ইমাম সাহেবও সেই নিয়মের বাহিরে ছিলেন না। অর্থাৎ একাজ করার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল আল্লাহ্‌কে সন্তুষ্ট করা। তাঁহার ছাত্ররা বলিয়াছেন, ইমাম সাহেবের নিয়ম ছিল তর্ক-বিতর্ক চলাকালীন তিনি কুরআন শরীফের এই আয়াত পাঠ করিতেন—

فبشر عبادى الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه -

প্রকৃতপক্ষে ঐ সমস্ত বান্দাদের সুসংবাদ দাও যাঁহারা কথা শুনে এবং সবচেয়ে ভাল কথা অনুযায়ী কাজ করে।

প্রকৃতপক্ষে যাবতীয় কাজের মধ্যে সর্বোৎকৃষ্ট কাজ কুরআন ও হাদীছের ইবাদতের যে অন্তর্নিহিত অর্থ হইতে পারে উহার সন্ধান করাই ছিল তাঁহার প্রধান লক্ষ্য। ইমাম সাহেব নিজেও বলিয়াছেন, 'আমার সাধ্যানুযায়ী কাজের মধ্যে ইহাই আমার নিকট সর্বোৎকৃষ্ট।'

ইমাম সাহেবের মজলিস যখন শেষ হইয়া যাইত তখন তিনি তাঁহার ছাত্রদের লক্ষ্য করিয়া বলিতেন, 'ঈমানের সম্পর্ক দ্বারা আল্লাহ তোমাদের ভ্রাতৃত্ব-বোধকে মজবুত করুন। তোমাদের সমষ্টিগত স্নেহ-ভালবাসার রহমত দান করুন। তোমাদের অন্তঃকরণকে কুরআন ও জ্ঞান দ্বারা সুস্থ্য করুন।' (মুফিক, ২৫৪ পৃঃ, ১ম জিলদ)

উপরোক্ত কথা দ্বারাই তাঁহার দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় পাওয়া যায়। ইবন মুবারক বলিয়াছেন, 'যখন কোন কঠিন মাসআলা তর্ক-বিতর্কের পর শেষ মীমাংসায় আসিয়া পৌঁছিত তখন সকলেই উচ্চৈঃস্বরে আল্লাহু আকবার বলিয়া তকবীর ধ্বনি করিতেন।'

ইমাম সাহেব ছাত্রদের লক্ষ্য করিয়া বলিতেন—"ইলম দ্বারা যদি তোমরা পরকালের মঙ্গল সাধনা না করিতে পার তবে তোমাদের কোন কাজের জন্যই শক্তি সামর্থ দেওয়া হইবে না।"

কোন লোক তাহার কাজের আসল উদ্দেশ্য অনুধাবন করিতে না পারিয়া যদি কখনও তর্ক-বিতর্ক করিত তখন তিনি বলিতেন,—"ভাই! হালাল-হারামের ফয়সলা করার চেয়ে আর নেকীর কাজ কি হইতে

পারে ? আল্লাহ্‌র দিকে যেন কেহ কোন ভুল বিষয়বস্তু সম্বন্ধযুক্ত না করে এবং অজ্ঞতাবশতঃ মানুষ যেন আল্লাহর নাফরমানী না করে—সেই সম্বন্ধে কাজ করার চেয়ে আর ভাল কাজ কি হইতে পারে ?"

ইমাম সাহেবের সাগরিদ খালিদ বলেন,—ইমাম সাহেব প্রায়ই একটি কবিতা পাঠ করিতেন উহার অর্থ ছিল—"চিন্তা ভাবনা ও বিপদাপদের জন্য দুইটি বিষয়ই যথেষ্ট। প্রথম—মানুষের জীবন অশান্তিতে অতিবাহিত হওয়া। দ্বিতীয়—মানুষের এমন সব কাজে লিপ্ত হওয়া যাহাতে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি নাই।"

এখন প্রশ্ন হইল ইহার পিছনেও কি অন্য কোন উদ্দেশ্য নিহিত ছিল ? আমি বিভিন্ন ঘটনা পেশ করিতেছি—ফলাফল পাঠক স্বচক্ষেই দেখিতে পাইবেন। কিন্তু ঘটনাবলী পেশ করার পূর্বে একথা বলিয়া রাখিলে ভাল হইবে যে, আব্বাসীয় শাসন ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর ইমাম সাহেব হেজায হইতে প্রত্যাবর্তন করতঃ আইন প্রণয়নের কাজে লিপ্ত হইলে তখন তিনি যে এক বিরাট রাজনৈতিক পরীক্ষায় পড়িয়া গিয়াছিলেন উহাই বর্ণনা করিব।

ইবরাহীম ইবন আয়মুল এবং ইমাম সাহেব

ইবরাহীম ইবন মায়মুন সায়েগ সম্বন্ধে পূর্ববর্তী অধ্যায় গুলিতে সংক্ষিপ্তভাবে বলা হইয়াছে এবং বিস্তারিতভাবে বলার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হইয়াছিল।

মারওয়ান বংশীয়রা হযরত যায়দ এবং তাঁহার পুত্র ইয়াহইয়ার সাথে নির্মম ব্যবহার করিয়া নিজেদের কবর নিজেরাই রচনা করিয়া রাখিয়াছিল। এখন শুধু এমন একজন হৃদয়হীন লোকের প্রয়োজন ছিল যে একটু সাহস করিয়া তাহাদের ধাক্কা দিয়া সেই কবরে ফেলিয়া দিত। আর ইহা কার্যে পরিণত করিয়াছিলেন আব্বাসীয়দের সমর্থক আবু মুসলিম খোরাসানী। অব্বাসীয়দের সৌভাগ্য যে, এমন একজন বিস্ময়কর যাদুকর ব্যক্তিকে নিজেদের সমর্থকরূপে পাইয়াছিলেন। আবু মুসলিম বনী উমাইয়া হুকুমতকে কাফন পরাইয়া দাফন করিয়াছিলেন।

আবু মুসলিম খোরাসানী

আবু মুসলিম হিজরী ১২৯ সনে তাহার জন্মস্থান খোরাসানের প্রসিদ্ধ শহর মার্ভ হইতে তাঁহার কাজ আরম্ভ করেন। ইসলামের এই

দেড় শতাব্দীর মধ্যে দূর-দূরান্তের দেশসমূহের খ্যাতনামা ব্যক্তিগণ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। মার্ভ আরব হইতে হাযার মাইল দূরে অবস্থিত হওয়া সত্ত্বেও বহু ঈমানদার আলিম ও বুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তিদের দ্বারা পরিপূর্ণ ছিল। এই মহান ব্যক্তিত্বের মধ্যে ইবরাহীম ইবনে মায়মুন ছিলেন অন্যতম।

ইমাম বুখারী তারিখুল কবীরে লিখিয়াছেন,—"ইবরাহীমের পিতা ছিলেন হুযুর (সাঃ)-এর আযাদকৃত গোলামদের মধ্যে একজন।" হাফিয ইবন হাজার বলেন,—"এই মায়মুনকেই—মেহ্রান বলা হইত। কয়েক খানা বিশেষ হাদীস মায়মুন রাওয়ায়েত করিয়াছেন। ইবরাহীম মার্ভেই বসবাস করিতেন। স্বর্ণকার ছিলেন বলিয়া তাহার নামের শেষে তিনি সায়েগ শব্দ ব্যবহার করিতেন।" ইবন হাজার তাহার সম্বন্ধে বলেন,—"কাজ করিবার জন্য হাতুড়ী উঠাইয়াছেন এমন সময় আযানের শব্দ কানে আসিল। অমনি হাতুড়ী রাখিয়া দিয়া সালাত আদায় করিবার জন্য চলিয়া যাইতেন।"

এই কাজ করার সাথে বড় বড় মুহাদ্দিস যেমন—'আতা ইবন রাবাহ, নাফে আবু ইসহাক আবু যুবায়র হইতে হাদীস রওয়ায়েত করিতেন। সিহাহ্ সাত্তাহ্ হাদীসে তাহার বর্ণিত হাদীস রহিয়াছে। ফিকাহ শাস্ত্রেও এই অবস্থা ছিল। হানাফী ফিকাহ্র কিতাব সমূহে ইমামদের নামের তালিকার শেষে তাহার নামও লিপিবদ্ধ আছে। আবু হামযা 'আসকারী হইতে মুফিক বর্ণনা করেন,—"ইবরাহীম সায়েগ আমাকে রাস্তা খরচ দিয়া এত হাযার ফিকাহর প্রশ্নসহ ইমাম আবু হানীফার নিকট প্রেরণ করেন যেন আমি সেই প্রশ্নের উত্তরগুলি আবার ইবরাহীমের নিকট পৌঁছাইয়া দেই।"

ফিকাহ্ সম্বন্ধে ইবরাহীম যে কত বড় আগ্রহী ছিলেন উহাতেই বুঝা যায়। ইমাম সাহেব হইতে 'আবদুল্লাহ ইবন মুবারক এই কথাগুলি রওয়ায়েত করিয়াছেন,—"ইবরাহীম খুবই খোদাভক্ত লোক ছিলেন। আল্লাহ্র কাজে জীবন উৎসর্গকারীদের মধ্যে তিনি পরিগণিত ছিলেন।"

সুতরাং তাহার পরহেযগারী এবং খোদা-প্রদত্ত শক্তিতে সন্দেহ করার স্থান কোথায়? 'আবদুল্লাহ ইবনে মুবারকের রওয়ায়েতে ইমাম সাহেবের এই কথাও সংযোজিত রহিয়াছে,—"তিনি আমার নিকট আসিতেন এবং প্রশ্নাদি জিজ্ঞাসা করিতেন।"

ইহাতে বুঝা যায় আবু হামযা আসকারীর সাথে হাযার প্রশ্ন প্রের করা ব্যতীতও ইবরাহীম সায়েগ ইমাম সাহেবের নিকট নানাবিধ প্রশ্ন

জিজ্ঞাসা করিয়া উপকৃত হইতেন। ইমাম সাহেব আরও বলিতেন,—"ইবরাহীমের পরহেযগারী এমন ছিল যে, তিনি আমার সাথে সাক্ষাৎ করিতে আসিলে আমি তাহার সম্মুখে খাদ্য-দ্রব্য উপস্থিত করিতাম। তিনি আমার নিকট খাদ্য সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিতেন। (অর্থাৎ ইহা পরহেযগারীর চরম অবস্থা যে, ইমাম সাহেবের ন্যায় লোকের নিকটও জিজ্ঞাসা করিতেন—এই খাদ্য কিভাবে অর্জন করা হইয়াছে) জিজ্ঞাসা করার পর ইচ্ছা হইলে খাইতেন, আর ইচ্ছা না করিলে স্পর্শও করিতেন না॥" (মু'ফিক ৪৯ পৃঃ ১ম জিলদ)

মনে হয় পরহেযগারীর চরম সীমানায় পেঁাছার মানসেই তিনি জীবিকা-নির্বাহের জন্য স্বর্ণকারের কাজ করিতেন। অন্যথায় তিনি যে জ্ঞান ও বুদ্ধিমত্তার অধিকারী ছিলেন উহাতে হুকুমতের যে কোন একটি পদ অলংকৃত করিতে পারিতেন। আবু মুসলিম যখন তাহার দাবী লইয়া মার্ভ পেঁাছেন সেই সম্বন্ধে ইবন আছীর বলেন,—"লোক তাহার দিকে ঝুঁকিয়া পড়িল। মার্ভবাসী তাহার নিকট যাওয়া-আসা করিতে লাগিল।"

তখন মারওয়ান ছিলেন বনী উমাইয়াদের শেষ খলীফা। আবু মুসলিম তাহাকে গদিচ্যুত করার জন্য লোকদিগকে আমন্ত্রণ জানাইতেছিলেন। বনী উমাইয়াদের অত্যাচারের সীমা এমনই চরমে পেঁাছিয়াছিল যে, লোকে প্রকাশ্যভাবে বিদ্রোহ আরম্ভ করিয়া দিয়াছিল।

কামিল ইবন কাছীর লিখিয়াছেন,—"আবু মুসলিম রক্ষীবিহীন তাঁবুতে বসে করিতেন।" কারণ তিনি লোকের মধ্যে প্রচার করাইয়া দিয়াছিলেন যে, তিনি বনী হাশিম গোত্রের লোক। আর প্রচার করাইয়া দিয়াছিলেন যে, তিনি সর্বশাস্ত্রে একজন পারদর্শী 'আলিম।"

তাই মার্ভের যুবকগণ ধর্মীয় ও ফিকাহ সম্বন্ধে জ্ঞানার্জন করার জন্য তাঁহার নিকট ভিড় করিতে লাগিল। কিন্তু কোন প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা হইলে বলিতেন,—"ভাইসব! এখন মাসআলা জিজ্ঞাসা করার সময় নয়। এখন তো শরীয়তের নির্দেশ বলবত করা এবং অধর্মীয় কাজ থেকে বিরত রাখার সময়। এখন আপনাদের কর্তব্য আমার মত দুর্বল যে সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়াছে তাহার সাহায্য করা।',

লোকে তাঁহার বংশ-পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলে বলিতেন,—"আমার বংশ পরিচয়ের চেয়ে আমার জীবনধারাই হয়ত আপনাদের সম্মুখে

আমার পরিচয়কে অধিক সমুজ্জল করিয়া তুলিতে সক্ষম হইবে।'

আবু মুসলিম ও ইবরাহীমের বন্ধুত্ব

আবু মুসলিম মার্ভে নিজের পরিচয় এমনভাবে দিয়াছিলেন যে, বড় বড় লোকও তাঁহার ধোঁকায় পড়িয়া গিয়াছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে ইবরাহীম সায়েগও একজন ছিলেন। তাই ইবরহীম ও আবু মুসলিমের মধ্যে বন্ধুত্বের সম্পর্ক গড়িয়া উঠিয়াছিল। ইবনে সা'আদ বলেন,—"ইবরাহীম ও মুহাম্মদ ইবনে ছাবিত নামক অন্য একজন মুহাদ্দিস আবু মুসলিমের সাথে উঠা-বসা করিতেন এবং আলাপ আলোচনা করিতেন।"

কিন্তু শয়তানী কতদিন গোপন থাকে? তিনি যতই ক্ষমতাবান হইতে লাগিলেন ততই তাঁহার ভিতরের গোপন রহস্য বাহির হইয়া আসিতে লাগিল।

বিরোধ

আবু মুসলিমের শঠতা যতই প্রকাশ পাইতে লাগিল ইবরাহীমও তাহার নিকট হইতে ততদূরে সরিয়া যাইতে লাগিলেন। ইবরাহীম যে কোন্ প্রকৃতির লোক ছিলেন সে সম্বন্ধে পূর্বে কিছু বর্ণনা করা হইয়াছে। উহা হইতেই অনুমান করা যায় যে, তিনি তাঁহার ভুলের জন্য কতটা অনুতপ্ত হইয়াছিলেন। সত্য ও ন্যায়ের প্রতিষ্ঠার জন্য তিনি যে সাহায্য করিয়াছিলেন উহা পাপের কাজে সাহায্য হইতে দেখিয়া খুবই মর্মাহত হইলেন। অতঃপর কিভাবে উহার প্রতিবিধান করা যায় অগ্নির ন্যায় সেই প্রশ্ন তাহার অন্তরে দাউ দাউ করিয়া জ্বলিতেছিল।

১। আবু মুসলিম বিশ্ব-ইতিহাসে এক বিরাট ব্যক্তিত্বসম্পন্ন লোক। কেহ কেহ তাহাকে আরব বলিলেও প্রকৃতপক্ষে তিনি অনারব ছিলেন। তাঁহার পিতা মার্ভের একজন সাধারণ চাষী ছিলেন। কিন্তু রাজস্ব আদায় করিতে না পারিয়া স্ত্রীসহ আযারবাইজান পালাইয়া যান। সেখানে পিতার মৃত্যুর পর আবু মুসলিম জন্মগ্রহণ করেন। কোন এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে লালিত-পালিত হন এবং শিক্ষা গ্রহণ করেন। আরবী ও ফারসী ভাষায় তাঁহার অসাধারণ দক্ষতা ছিল। ছোট সময় হইতেই তাঁহার উচ্চাকাঙ্খা ছিল। বনী উমাইয়াদের পতনের সময় আব্বাসীয়গণ তাহাকে নিজেদের অস্ত্রস্বরূপ ব্যবহার করেন। আবু মুসলিম তাঁহার পিতৃদেশ মার্ভে ফিরিয়া আসিয়া উমাইয়াদের বিরুদ্ধে খোরাসানে বিদ্রোহের আগুন লাগাইয়া দেন। তিনি বলিতেন—

আবু মুসলিম সম্পর্কে ইমাম সাহেবের সাথে পরামর্শ

আবু মুসলিমের রহস্য প্রকাশ হইয়া যাওয়ার পর আমরা ইবরাহীমকে মার্ভের পরিবর্তে কুফায় দেখিতে পাই। ইবরাহীম ইমাম সাহেবের সঙ্গে আবু মুসলিম সম্বন্ধে পরামর্শ করিতেছিল। উভয়ের মধ্যে যে আলাপ-আলোচনা হইয়াছিল উহা বর্ণনা করার পূর্বে চিন্তা করিয়া দেখা উচিত যে, মার্ভ হইতে কুফার মধ্যবর্তী স্থানে মুসলমানদের বড় বড় আবাদী ছিল। তা ছাড়া যদি বাহিরের কোন লোকের সাথেই তাঁহার পরামর্শ করার প্রয়োজন হইত তবে মুসলিম জগতের অন্যান্য নেতৃস্থানীয় 'আলিমগণের নিকট না গিয়া ইমাম সাহেবের রাজনৈতিক প্রবণতাই তাঁহাকে এই দূর-দারাজ পথ অতিক্রম করিতে বাধ্য করিয়াছিল।

সেই যুগে যখন মুসলমানদের খিলাফতের অধিকার কোন এক বংশজাত অধিকার বলিয়া মনে করা হইত তখন অন্য ধারণার লোক অর্থাৎ বংশজাত অধিকার মনে না করিয়া যাঁহারা ইহাকে গণতান্ত্রিক অধিকার বলিয়া মনে করিত তাঁহাদের সংখ্যা নিতান্তই কম ছিল। ইবনে সা'আদ স্পষ্টভাবে লিখিয়াছেন,—"আবু মুসলিম যখন বনী আব্বাসকে খিলাফতের অধিকারী হিসাবে প্রচার আরম্ভ করিলেন—তখন হইতেই ইবরাহীমের সাথে তাহার বিরোধের সৃষ্টি হয়।"

ইবরাহীম মার্ভে হইতে রওয়ানা হইয়া কুফায় আগমন করতঃ ইমাম সাহেবের নিকট উপনীত হইলেন। স্মরণ রাখিতে হইবে যে, ইহা ছিল আব্বাসীয় খিলাফতের আরম্ভ কাল। তখন বাগদাদের নকশা যমীনে পড়া তো দূরের কথা কাহার মাথায়ও ছিল না। কেননা বাগদাদের স্থাপয়িতা মানসুর। আমরা যে সময়ের কথা বলিতেছি তখন আব্বাসীয় খলীফা ছিলেন আবুল আব্বাস আস্‌সাফ্‌ফাহ। আবুল আব্বাস পরবর্তীকালে কুফার অনতিদূরে আম্বারে রাজধানী স্থাপন করিয়াছিলেন। আম্বারে যাওয়ার পূর্বে ইবন হুবায়রার প্রাসাদে ছিলেন।

"বনী উমাইয়াদের অত্যাচারী হাত হইতে লোকদের মুক্তি দেওয়ার উদ্দেশ্যে-আল্লাহ্‌র রাসূলের বংশধর শাসন-ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত হউন ইহাই আমার ইচ্ছা, "কিন্তু পরবর্তীকালে এই মুসলিমই নরঘাতকরূপে পরিণত হইয়াছিলেন। ঐতিহাসিকদের মতে যুদ্ধ ছাড়াই ব্যক্তিগত ভাবে তিনি পাঁচ হাজার লোক হত্যা করিয়াছিলেন। পরিশেষে—আরব হুকুমত ধ্বংস করিয়া দিয়া অনারব-হুকুমত প্রতিষ্ঠা করার অপরাধে আবুজাফর মানসুর তাঁহাকে নিহত করেন।

অন্য এক বর্ণনা মতে দেখা যায় যে, আস্‌সাফ্‌ফাহ ইবন হুবায়রার প্রাসাদের নিকটে 'হাশিমিয়া' নামক একটি প্রাসাদ নির্মাণ করাইয়া যখন সেখানে বসবাস করিতেছিলেন—ইবরাহীম তখন কুফায় আগমন করিয়াছিলেন।[১]

মতৈক্য

ইবরাহীম আবু মুসলিমের ঘটনা ইমাম সাহেবের নিকট আদ্যোপান্ত বর্ণনা করেন। আবু মুসলিম ইসলামের সম্মুখে যে বিপদ ডাকিয়া আনিতেছিল ঐ সম্বন্ধে সতর্কবাণী উচ্চারণ করেন। ইমাম সাহেব বলেন—"অতঃপর ইবরাহীম আমার সাথে তর্ক-বিতর্ক আরম্ভ করেন।" আরও বলেন—"এই অবস্থায় আবু মুসলিমকে বাধা দেওয়া কি মুসলমানদের পক্ষে ফরয নয়?" বহুক্ষণ আলাপ-আলোচনার পর ইমাম সাহেব বলিয়াছিলেন,—"আমরা উভয়েই সিদ্ধান্ত করিলাম যে—আবু মুসলিমের বিরোধিতা করা আল্লাহ্‌র পক্ষ হইতে ফরয।"

জিহাদের জন্য ইমাম সাহেবের বায়'আত গ্রহণার্থে হস্ত সম্প্রসারণ

ইমাম সাহেব বলেন, "এই সিদ্ধান্ত স্থির করার পর ইবরাহীম আমার দিকে হাত অগ্রসর করিয়া বলিলেন—হাত দিন আমি বায়'আত করিব।"

ইহা পীর মুরীদীর শপথ গ্রহণ ছিল না। ইবরাহীমের এই শপথ গ্রহণ করা ছিল সেই যুগের নির্মম ও নির্দয় ক্ষমতাসীন শাসক-গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে। এই হাত বাড়ানোর অর্থ ছিল—যখন আল্লাহ্‌র তরফ হইতে

১। বনী উমাইয়াদের পতনের পর আবুল আব্বাস দামেশকের রাজধানী রাখা ঠিক মনে করিলেন না। সুতরাং তিনি কুফায় ইবন হুবায়রার প্রাসাদে থাকাই মনস্থ করিলেন এবং উহার নাম 'কছরে হাশিমিয়া' অর্থাৎ হাশিমিয়া প্রাসাদ রাখিলেন, কিন্তু অনেক দিন যাবত লোকের 'কসরে ইবন হুবায়রা' বলার অভ্যাস হইয়া যাওয়ায় কসরে হাশিমিয়া আর মুখে আসিত না। তাই বাধ্য হইয়া সেই প্রাসাদের অনতিদূরে 'কসরে হাশিমিয়া' নামক প্রাসাদ তৈয়ার করাইয়া উহাতে বসবাস করিতে থাকেন। পরে সেখানে অনেক লোক আসিয়া বসবাস আরম্ভ করিলে উহা 'হাশিমিয়া' মহল্লা নামেও খ্যাত হইয়াছিল।

ফরয নির্ধারিত হইয়া গিয়াছে তখন আপনি তৈয়ার হউন এবং এই ফরয আদায় করুন।"

স্মরণ রাখিতে হইবে যে, এই সব কিছু কুফায় বসিয়াই হইতেছিল। আর কুফায়ই ছিল হাশিমিয়া মহল্লা। যেখানে দিনের পর দিন জনসংখ্যা বর্ধিত হইতেছিল এবং সেখান হইতে গুপ্তচর বিভাগ দেখিতেছিল কে কোথায় কি করিতেছে। হযরত যায়দের আন্দোলনের সময় রাজনৈতিক উৎসাহ এবং প্রবণতার জন্য তিনি বেশ বদনাম কুড়াইয়া ছিলেন। বর্তমান শাসকগোষ্ঠী সম্বন্ধে ইমাম সাহেবের মনোভাব তখনও লোকের জানা ছিল না। তবুও আস্‌সাফাহর ভাষণের উত্তর দান প্রসঙ্গে 'উলামাদের পক্ষ হইতে ইমাম সাহেব যে বক্তৃতা করিয়াছিলেন উহা হইতে সুধারণা পোষণ করা যাইতে পারিত যে ইমাম সাহেব ঠিকই আছেন।

তাছাড়া ইমাম সাহেব পরবর্তীকালে হুকুমতে আব্বাসীয়ার বিরুদ্ধে যে কার্যধারাই গ্রহণ করুন না কেন, যে সময় ইবরাহীম বর্তমান সরকারের বিরুদ্ধে ইমাম সাহেবকে অংশগ্রহণ করার প্রস্তাব করিয়াছিলেন —উহা ছিল আব্বাসীয় হুকুমতের প্রারম্ভিক কাল। সেই সময় ছিল তাঁহার অবসর কাল এবং সেই অবসরকে কাজে লাগানোর জন্য তিনি অন্য কর্মপন্থা গ্রহণ করিয়াছিলেন, অর্থাৎ তাঁহার নিয়ত ছিল প্রথমে আইন-প্রণয়ন কাজ শেষ হইয়া যাউক। অন্তরে তিনি কি ইচ্ছা পোষণ করিতেন উহা পরে জানা গিয়াছে। কিন্তু সে সময় যাবতীয় ঝঞ্ঝাট হইতে দূরে থাকিয়া শান্তিতে নাগরিক জীবন যাপন করিতেছিলেন। একদিকে ব্যবসায়-বাণিজ্য অন্য দিকে ছাত্রদের ফিকাহ্‌ শিক্ষা দেওয়ার কাজে লিপ্ত ছিলেন। ইবরাহীম সায়েগের সুচিন্তিত ধারণা এবং স্বীয় আলোক-উজ্জ্বল প্রকৃতিতে হঠাৎ তাঁহাকে এক অচিন্তনী অনুভূতির রাজ্যে পেঁছাইয়া দিল। ইবরাহীমের হাত অগ্রসর করার পর তাঁহার যে কি অবস্থা হইয়াছিল তৎসম্বন্ধে নিজেরাই বলিয়াছেন, 'আমার এবং ইবরাহীমের সম্মুখে যেন পৃথিবী অন্ধকার হইয়া গেল।'

প্রাণের মায়ায় কি তাঁহার এই অবস্থা হইয়াছিল? যিনি সত্যের প্রতিষ্ঠার জন্য জীবন দান করিয়াছেন—তাঁহার সম্পর্কে আমি এই কথার কি উত্তর দিতে পারি? যত দূর মনে করি এবং ভবিষ্যতে ইমাম সাহেবের কথায় যতটা জানা যাইবে—হঠাৎ তিনি টানাটানির অবস্থায় পড়িয়া যাওয়ায় এইরূপ হইয়াছিল। একদিকে ইবরাহীমের সততা, একাগ্রতা তাঁহার অকাট্য যুক্তি এবং অবস্থার প্রয়োজনীয়তা ইহাই

চাহিতেছিল কোন কথা না বলিয়া এবং সেই অবস্থায়ই ইবরাহীমের কথা মানিয়া লওয়া এবং জিহাদের জন্য তৈয়ার হওয়া।

'কিন্তু এই ক্ষিপ্রতার পরিণতিও সম্মুখে ছিল। সেই পরিণতির প্রতি দৃষ্টি রাখিয়াই হয়ত ইমাম সাহেব ধারণা করিয়াছিলেন, 'আমি যে কর্মপন্থা গ্রহণ করিয়াছি উহা ধূলিসাৎ হইয়া যাইবে। এই পথে কখনও কৃতকার্য হইতে পারিব না। অধিকন্তু আমি যাহা ঠিক করিয়া রাখিয়াছি সে পথও চিরতরে বন্ধ হইয়া যাইবে। অন্তরের কথা আল্লাহ জানেন তবে প্রকাশ্যভাবে ইহাই আমার বুদ্ধিতে আসিতেছে।'

ইমাম সাহেবের উত্তর

ইহা এমন একটি আকস্মিক ঘটনা ছিল যাহার জন্য ইমাম সাহেব মোটেই তৈরী ছিলেন না। তবুও নিজকে অনেকটা সামলাইয়া ইবরাহীমকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কি জন্য তোমার বায়আত গ্রহণ করিব?'

ইহার পর হয়ত ইবরাহীম আর এক দীর্ঘ ভাষণ দিয়াছিলেন। ইমাম সাহেব নিজের ভাষায় উহার সংক্ষিপ্ত সার বলিয়াছেন, 'আল্লাহর হক-সমূহের মধ্যে ইবরাহীম পুনরায় আমাকে একটি হক আদায় করিতে আহ্বান জানাইলেন।'

ইহার পর ইমাম সাহেব বায়আত গ্রহণ করিতে অস্বীকার করিয়া তাহাকে বুঝাইয়া বলিলেন, 'ইহা দুই একজন লোকের কাজ নয়। দুই একজন লোক ইহার বিরোধিতা করিতে গিয়া নিহত হইবে। ফলে অন্যান্য লোকের পক্ষে যাহা করা সম্ভব হইত উহা আর হইবে না।'

এই কাজের জন্য সুশৃংখলভাবে সমষ্টিগত চেষ্টার প্রয়োজন সম্বন্ধে ইমাম সাহেব বলিলেন, 'অবশ্য এই কাজ সমাধা করার জন্য কিছু সৎলোকের এবং এমন একজন নেতার প্রয়োজন যাহার ধর্মের উপর আস্থা স্থাপন করা যায়।'

অর্থাৎ তিনটি বস্তুর প্রয়োজন সম্বন্ধে ইমাম সাহেব ইঙ্গিত করিয়া ছিলেন ঃ

প্রথম—এই কাজ একা একা সমাধা করা দুঃসাধ্য। তাই কিছু সৎ-সংগী ও সাহায্যকারীর প্রয়োজন।

২য়—বিশৃংখল জনতা দ্বারা একাজ সমাধা হইতে পারে না। কোন

এক ব্যক্তির সাথে বহু লোকের মিলন হওয়া প্রয়োজন। সকলেই যদি স্ব স্ব মতের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকেন সংখ্যায় অধিক হইলেও কোন কাজে আসিবে না। এক ব্যক্তির নেতৃত্বে এবং পরামর্শ মত সকলকে চলিতে হইবে।

৩য়—নেতার ঈমান ও ধর্ম সযবূত রাখিতে হইবে। মুনাফিক বা দুর্বলচেতা ঈমানদার ব্যক্তিকে এমন কাজে নেতা নির্বাচন করিলে চলিবে না। মোট কথা, অন্যায়কে ধ্বংস করা এবং সত্যের প্রতিষ্ঠা করা যদিও মুসলমানদের প্রতি কুরআনী ফরয তথাপি সমস্ত কুরআনী ফরয এক পর্যায়ের নহে। যেমন নামায ও হজ্জ কুরআনী ফরয, কিন্তু রাস্তার সম্বল থাকা হজ্জ আদায়ের শর্ত, যাহা নামাযের জন্য শর্ত নহে। অতঃপর ইমাম সাহেব বলিলেন, 'নিঃসন্দেহে ইহাও ফরয, কিন্তু এমন ফরয নয় যাহা কোন ব্যক্তি বিশেষকে একা একা আদায় করিতে হইবে।'

এখানে একটি বিশেষ প্রশ্ন উদয় হইতে পারিত তাহা হইল আম্বিয়াগণ (আঃ) তো একা একা এমন অন্যায়ের বিরুদ্ধে দাড়াইয়াছেন। উহার উত্তর প্রসঙ্গে ইমাম সাহেব বলিলেন, 'ইহা একা সমাধা করার কাজ নয়। এইরূপ অবস্থায় পয়গম্বরগণও সহ্য করিয়া রহিয়াছেন। অবশ্য তখন তাহাদের জন্য আসমানী সাহায্যের ব্যবস্থা করা হইত।'

ইমাম সাহেবের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে অবগত হওয়া যায় যে, উচ্চাকাংখী পয়গম্বরগণও অন্যায়ের মুকাবিলায় নিজকে একা পাইয়া এইরূপ সন্দেহ পোষণ করিতেন। যেমন মুসা (আঃ)কে যখন আল্লাহ তাআলা ফেরাউনের নিকট পাঠাইতে চাহিলেন তখন মুসা (আঃ) মানবসুলভ স্বভাববশতঃ আল্লাহর দরবারে আরয করিয়াছিলেন—

ربنا انا نخاف ان يفرط علينا او يطغى

'হে প্রভো! আমাদের ভয় হইতেছে যে ফেরাআউন আমাদের সাথে অন্যায় ও অসঙ্গত ব্যবহার করিবে।'

উত্তরে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করিয়াছিলেন—

لا تخافا انني معكما اسمع وارى

'তোমরা ভয় করিও না। আমি তোমাদের সাথে শুনিতেছি এবং দেখিতেছি।'

ইমাম সাহেবের এই উদাহরণ দেওয়ার উদ্দেশ্য ছিল যে, পয়গম্বরগণ

তো আসমানী সাহায্য পাওয়ার প্রতিশ্রুতি পাইতেন, কিন্তু একজন সাধারণ লোক যাহার পক্ষে আসমানী সাহায্য পাওয়া না পাওয়ার কোন নিশ্চয়তা নাই তিনি কিভাবে এমন গুরুত্বপূর্ণ কাজের ভার গ্রহণ করিতে পারেন।

ইমাম সাহেব আরও বলিলেন, 'এমন গুরুত্বপূর্ণ কাজে কোন সুশৃংখল শক্তির সাহায্য না লইয়া ঝাঁপাইয়া পড়ার অর্থই নিজের অমূল্য জীবন বিনা মূল্যে ধ্বংস করিয়া দেওয়া। এক কথায় উহা আত্মহত্যার সমতুল্য।" এই অবস্থায় নিহত হওয়াকে যদিও আত্মহত্যা বলা যায় না বরং হানাফী মতে ফতওয়া পাওয়া যায় যে অন্যায়ের বিরুদ্ধে একা এবং দুর্বলাবস্থায় যদি অত্যাচারীদের অত্যাচার সহ্য করার ক্ষমতা থাকে এবং এই বিশ্বাস থাকে যে এই অত্যাচার সম্পর্কে কাহারও নিকট কোন প্রকার অভিযোগ করিব না তখন অত্যাচারীদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে রুখিয়া দাঁড়ানো শুধু জায়েযই নহে তাহাকে মুজাহিদ বলা হইবে যিনি জিহাদের ফরয আদায় করিয়াছেন। অত্যাচারী শাসকের সামনে সত্য প্রকাশ করা সবচেয়ে বড় জিহাদ—হানাফী ফিকাহ্‌বিদগণ আবু দাউদ ও তিরমিযী হইতে এই দলীল গ্রহণ করিয়াছেন।

মজার কথা এই যে এই বিষয়ে ইবরাহীম সায়েগ হইতে ইমাম আবু হানীফার প্রতি সম্বন্ধযুক্ত একটি বর্ণনা ফিকাহ্‌ এবং হাদীসের কিতাবে বর্ণিত হইয়াছে অর্থাৎ ইবনে আব্বাস (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে হুযুর (সাঃ) ইরশাদ করিয়াছেন—"সত্যের প্রতিষ্ঠা এবং অন্যায়কে বিতাড়িত করার জন্য যে ব্যক্তি অত্যাচারী বাদশাহ্‌র সম্মুখে দণ্ডায়মান হয়—সে এবং হামযা ইবনে 'আবদুল মুত্তালিব শহীদ সম্প্রদায়ের নেতা।"

হাদীসের ভাষায় বুঝা যায় এই প্রকার কাজে যে ব্যক্তি নিহত হয় সে হযরত হামযা (রাঃ)-এর ন্যায় পদমর্যাদাসম্পন্ন হইবে।

মনে হয় ইবরাহীম সায়েগ ইবন আব্বাস (রাঃ)-এর মুক্তিপ্রাপ্ত দাস আকরামা হইতে যে হাদীস শুনিয়াছিলেন উহাই ইমাম সাহেবের নিকট বলিয়াছিলেন। তারপর পরকালের পুরস্কার ও মর্যাদা তো অন্য কথা। সূরা ইয়াসীনে হাবীব নাজ্জার নামক যে ব্যক্তি শহরতলী হইতে রাসূলুল্লাহ্‌র নিকট আগমন করিয়াছিলেন—তাহার ঘটনাও উহাকে প্রমাণিত করিতেছে। কুরআন শরীফে আছে;

"يا ليت قومي يعلمون - بما غفرلي ربي و جعلني من المكرمين"

আফসোস! আমার সম্প্রদায় যদি জানিত আল্লাহ আমাকে ক্ষমা করিয়াছেন এবং সম্মানিত ব্যক্তিদের মধ্যে আমাকে পরিণত করিয়াছেন।"

এই হাবীব নাজ্জার কোন পয়গম্বর ছিলেন না। বরং সত্য ঈমান গ্রহণকারীদের একজন ছিলেন। হযরত মূসা (আঃ)-এর বিরুদ্ধে ফেরআউন যে যাদুকরদেরকে পাঠাইয়াছিলেন তাহারা হযরত মূসা (আঃ) -এর মু'জিযা দেখিয়া ঈমান আনিয়াছিল এবং নিহত হওয়ার জন্য তৈয়ার হইয়া রহিয়াছিল। কুরআন তাহাদের এই প্রকৃতিকে প্রশংসার সাথে বর্ণনা করিয়াছে। ইমাম সাহেবের দৃষ্টিভঙ্গি ছিল যখন জীবন উৎসর্গ করাই স্থির হইল তখন উহার পরিবর্তে এমন এক মূল্যবান বস্তু লাভ করিতে হইবে, যাহা দ্বারা ইসলাম ও মুসলমান উপকৃত হইতে পারে। এমন মূল্যবান বস্তু অযথা নষ্ট না করাই উচিত। ইবনে মুবারক হইতে রওয়ায়েত বর্ণনাকারীদের মধ্যে কেহ কেহ ইহাও ইমাম সাহেবের দিকে সম্বন্ধ যুক্ত করিয়াছেন যে—"আদম (আঃ)-এর খিলাফত সম্বন্ধীয় কুরআনের ঘটনায় ফেরেশতাগণ আল্লাহ তা'আলাকে বলিয়াছিলেন—"হে প্রভু! ঝগড়া-বিবাদ এবং খুন-খারাবী করার জন্যই কি আপনি পৃথিবীতে মানুষ সৃষ্টি করিতে ইচ্ছুক হইয়াছেন?"

ইমাম সাহেব ইবরাহীমকে উক্ত আয়াত স্মরণ করাইয়া দিয়াছিলেন যে যদি সত্যই তিনি শেষে এই আয়াত পাঠ করিয়া থাকেন তবে তাহার উদ্দেশ্য ইহাই মনে হয় যে, নিহত হওয়া না হওয়া সম্পর্কে যখন শরীয়ত স্বাধীনতা দিয়াছে তখন উপরোক্ত আয়াতের মর্মানুযায়ী নিহত হওয়াকে বাছিয়া লওয়া যুক্তিযুক্ত নহে। আবু বকর জাসসাস ইমাম সাহেবের উক্তি নিম্নরূপ বর্ণনা করিয়াছেন—

"অত্যাচারীদের সাথে টক্কর দিয়া নিজকে নিহত করানো আর একটি উদ্দেশ্য লাভের পরিপন্থী, উহা এই যে এইভাবে নিহত হইলে ভয় থাকে যে অন্য কেহ এইরূপ অন্যায়ের বিরুদ্ধে মাথা তোলার সাহস হারাইয়া ফেলিবে।"

মোট কথা, আবূ মুসলিমের বিরুদ্ধে ইবরাহীম তাহার ঈমানী জোশে যে জান কুরবানের মনস্থ করিয়াছিলেন ইমাম সাহেব তাহাকে উহা হইতে বিরত রাখার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু ইবরাহীম তাহার সংকল্পচ্যুত হইলেন না। ইমাম সাহেব বলেন—ইব-রাহীম তাহার কাজে অংশ গ্রহণ করার জন্য আমাকে এমনভাবে তাকীদ করিতেন যেমন কোন পাওনাদার তাহার পাওনা আদায় করার জন্য ঋণ গ্রাহককে তাকীদ করিয়া থাকে। যখনই তিনি আমার নিকট আসিতেন তখনই এ সম্বন্ধে আমাকে তাকীদ করিতেন।"

ইমাম সাহেবের বর্ণনা মতে মনে হয় তাহাদের মধ্যে এই বিষয়ের আলাপ-আলোচনা একেবারেই শেষ হয় নাই। মনে হয় ইমাম সাহেবের যুক্তি-তর্কে তাহার ইচ্ছার কিছুটা পরিবর্তন হইত। কিন্তু মার্ভ পৌঁছিয়া আবু মুসলিমের কান্ড-কারখানা দেখিয়া আবার তাঁহার মধ্যে বিদ্রোহের অনল জ্বলিয়া উঠিত এবং পুনরায় তিনি পরামর্শ করার জন্য মার্ভ হইতে কুফায় চলিয়া আসিতেন। যেহেতু আবু মুসলিমের কাজ ১২৯ হিজরীর রমযান মাস হইতে খোরসানে আরম্ভ হইয়াছিল। শত্রু-পক্ষের শক্তি খর্ব করার কাজে কিছুদিন অতিবাহিত হইল। বনী উমাইয়াদের খোরাসানের শাসনকর্তা নসর ইবন সাইয়ার পরাজয় বরণ করিয়া এক শহর হইতে অন্য শহরে প্রাণের ভয়ে পালাইয়া ফিরিতেছিলেন। অবশেষে 'রে' পৌঁছিয়া তিনি মারা যান। সমস্ত খোরস্যান আবু মুসলিমের শাসনাধীন হইল। নসর ইবনে সাইয়ার ১৩১ হিজরীতে মারা যান। সেই বৎসর হইতে ১৩৬ হিজরী পর্যন্ত আবু মুসলিম সমস্ত খোরাসানের শাসনকর্তা ছিলেন। ১৩৬ হিজরীতে সাফ্ফাহর আমন্ত্রণে বড় অসুবিধায় পড়িয়া তিনি ইরাক যান। এই সময়ের মধ্যে সমরকন্দ, বুখারা, রে ইত্যাদি শহরে তিনি যাওয়া-আসা করিতেন কিন্তু স্থায়ীভাবে মার্ভেই ব্যবসা করিতেন। এই জন্যই আবু মুসলিমের কীর্তিকলাপ ইবরাহীমের পক্ষে অতি নিকট হইতে দেখার সুযোগ হইয়াছিল। এবং ইহাই পরবর্তী কালে সাফ্ফাহ এবং মানসুরও দেখিয়াছিলেন।[১]

এই বিষয় লইয়া ইবরাহীম কতবার ইমাম সাহেবের নিকট আসিয়াছিলেন—উহা বলা দুষ্কর। কিন্তু যতবারই আসুন না কেন তিনি ইমাম সাহেবের উত্তরে নিরাশ হইতেন না। ইহাতে বুঝা যায়

১। বিরুদ্ধ দল হইতে খোরাসানকে খালি করার পর শহরবাসী মুসলমানদের নির্বিবাদে হত্যা করার সুযোগ আবু মুসলিম পাইলেন। বলিতেন—ইহারা বনী উমাইয়াদের পক্ষের লোক। যাঁহারা হজ্জে গিয়াছিলেন তাঁহাদের বিষয়-সম্পত্তিও বাজেয়াপ্ত করিলেন। বেচারা হাজীগণ হজ্জ হইতে ফিরিয়া কুফায় আসিয়া এই সংবাদ অবগত হইয়া আস্সাফ্ফাহর নিকট অভিযোগ করিলেন। আস্সাফাহ দয়াপরবশ হইয়া তাহাদের সম্পত্তি ফিরাইয়া দিতে বলিলেন। কিন্তু আবু মুসলিম গ্রাহ্য করিলেন না। অতঃপর আস্সাফ্ফাহ কঠোর-আদেশ দেওয়ায় ফেরত দেওয়া হইল। ১৩৬ হিজরীতে তিনি খোরাসানের এক সেনাধ্যক্ষকে গোপনে নির্দেশ দিলেন, "আবু মুসলিমকে হত্যা কর।" কিন্তু কৃতকার্য হইতে পারিলেন না। অতঃপর সাফ্ফাহ আবু

আসল কাজে কাহারও অমত ছিল না। মতবিরোধ ছিল কোন পথে কাজ আরম্ভ করা যায়। অন্যায়ের বিরুদ্ধে দাঁড়ানোর যে অগ্নিশিখা তাহাদের মধ্যে প্রজ্বলিত ছিল উহা সমানভাবেই জ্বলিতেছিল। বর্তমান হুকুমতের প্রতি অসন্তুষ্টি এবং সম্ভাব্য উপায়ে উহার বিরোধিতা করার চেষ্টায় রাজনৈতিক পদ্ধতি উভয়ের একই ছিল। এই একতা থাকার দরুণই ইবরাহীম বার বার নিরাশ হওয়ার পরও আবার আশার আলো দেখিতে পাইতেন আর ভাবিতেন, 'এখন না হউক পরে অবশ্য ইমাম সাহেব আমার কথায় আসিবেন।'

যাহাই হউক না কেন ভিতরে ভিতরে উভয়েই এক ছিলেন। অবশ্য ইবরাহীমের মধ্যে শুধু ঈমানী উৎসাহ ছিল যে উৎসাহকে জ্ঞান ও ব্যবস্থাপনায় ঠিক পথে চালাইতে অক্ষম ছিলেন। কিন্তু ইমাম সাহেব চাহিয়াছিলেন ঈমানের এই উদ্দীপনা দ্বারা যদি কোন কিছু তৈয়ার করা সম্ভব হয় তবে সেই সুযোগ ছাড়িয়া দিয়া লাভ কি? তাই তিনি বুঝানোর পর বলিয়াছিলেন,—"আরও অপেক্ষা করা দরকার।"

অর্থাৎ ইমাম সাহেবের ভবিষ্যত কার্য-পদ্ধতি দ্বারা ইহাই বুঝা যায় যে 'মুসলমানদের কোন সমষ্টিগত কোন সুশৃংখল জনতার সাথে অংশ গ্রহণ করিয়া বিরোধিতা করার সুযোগ পাইলে উহাতে অংশ গ্রহণ করিয়া ফরয আদায় করিতে চেষ্টা করিব। অন্যথায় সেই সুযোগ না আসা পর্যন্ত সত্যের প্রতিষ্ঠা ও অন্যায়কে বিতাড়িত করার যে সম্ভাব্য সুযোগ থাকিবে সেই সুযোগ মত কাজ করিব এবং অনাগত সুযোগের অপেক্ষায় থাকিব। ঘটনাক্রমে এই দুইটি সুযোগই ইমাম সাহেবের সম্মুখে আসিয়াছিল এই সম্বন্ধেই এখন বলিব।

মুসলিমকে দরবারে হাযির হইতে নির্দেশ দিলেন। আবু মুসলিম বলিয়া পাঠাইলেন—"আমাকে হজ্জে যাওয়ার অনুমতি দিলে আমি উপস্থিত হইতে পারি।" তাহার উদ্দেশ্য ছিল লুটপাট করিয়া যাহা কিছু সঞ্চিত হইয়াছিল—উহা আববাসীয়দের মধ্যে লুটাইয়া দিয়া তাহাদের সহানুভূতি অর্জন করা। সাফ্ফাহ উহা টের পাইয়া তাহার ভাই মু'সিলের শাসনকর্তা মানসুরকে বলিলেন——"তুমি প্রচার করিয়া দাও যে তুমি হজ্জে যাইবে—তাহা হইলে সে আমীরুল হজ্জ হইতে পারিবে না।" তাহাই হইল। হজ্জ হইতে ফিরিয়া আসার পথে সাফ্ফাহ মারা যান। মানসুর খলীফা হইয়া আবু মুসলিমকে হত্যা করেন।

আবু মুসলিমের সম্মুখে ইবরাহীমের সত্য প্রকাশ

কিন্তু সেই সুযোগ আসার পূর্বে ইবরাহীমের পরিণতি কি হইয়াছিল বর্ণিত আছে বার বার অনুরোধ করার পরও যখন ইমাম সাহেব তাহার কথায় রাযী হইলেন না তখন তিনি নিরাশ হইলেন এবং শেষ সিদ্ধান্ত করিয়া কুফা হইতে মার্ভে পৌঁছিলেন। এদিকে আবু মুসলিম অতি সামান্য কথার জন্যও লোকের গর্দান উড়াইতেছিলেন। যেমন এক ব্যক্তি আবু মুসলিমকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল—"আপনি সর্বদা কাল পোশাক কেন পরিধান করেন?" উত্তরে বলিয়াছিলেন, মক্কা বিজয়ের সময় তাঁহার পবিত্র মাথায় কাল পাগড়ী ছিল। কিন্তু তুমি এই কথা কেন জিজ্ঞাসা করিলে? জল্লাদ! এর মস্তক বিচ্ছিন্ন কর। এইরূপ কোন যুদ্ধ-বিগ্রহ ছাড়াই তাহার হাতে নিহতদের সংখ্যা ঐতিহাসিকদের মতে পাঁচ লক্ষ। এখন দেখুন! এমন নির্মম জল্লাদ কি না করিতে পারে?

কিন্তু ঈমানী জোশে পরিপূর্ণ, ফরয আদায়ের চিন্তায় বিভোর ইবরাহীম তাঁহার সিদ্ধান্তে অটল অবস্থায়ই আবু মুসলিমের দরবারে গিয়া উপস্থিত হইলেন। আবু মুসলিমের সাথে পূর্ব হইতে তাঁহার জানা-শোনা ছিল এবং তাঁহার পরহেযগারী ও তাকওয়া সম্বন্ধে সকলেই অবগত ছিল। সুতরাং আবু মুসলিমের দরবারে পৌঁছিতে তাঁহার কোন অসুবিধা হইল না। তিনি দরবারে পৌঁছিয়াই আবু মুসলিমকে নসীহত করা আরম্ভ করিলেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় তিনি আবু মুসলিমকে কি বলিয়াছিলেন উহা কোন লিপিকার লিপিবদ্ধ করিয়া রাখেন নাই।

এই উপদেশ প্রদানের পরিণতি যে কি হইবে উহা চিন্তা করিয়াই তিনি গিয়াছিলেন। কিন্তু তাহা হইল না, অর্থাৎ তাঁহাকে নিহত করা হইল না। ইবরাহীম সাধারণ লোক ছিলেন না। তাঁহার তাকওয়া পরহেযগারীর কথা মুসলিম জগতের সকলেই জানিত এবং সকলেই তাঁহাকে সমীহ করিত। আবু মুসলিম উপদেশ বাণী শোনার পর ক্রোধ দমন করিয়া বলিলেন—'আচ্ছা আপনার কথা শুনিলাম। এখন আপনি গৃহে চলিয়া যান।' (ইবনে সা'দ)

মনে হয় প্রথমবার তিনি ফিরিয়া আসিয়াছিলেন। কিন্তু ইমাম সাহেব বলেন, "পুনরায় যান এবং আবু মুসলিমকে কঠিন ভাষায় কিছু বলেন।" এবারও আবু মুসলিম তাঁহাকে হত্যা না করিয়া বন্দী করার আদেশ দেন। ইবরাহীমের বন্দী হওয়ার সংবাদ পাইয়া খোরাসানের সমস্ত 'আলিম ও বুযর্গানে দীন আবু মুসলিমের দরবারে উপস্থিত হন।

আবু মুসলিম তাঁহাদের অনুরোধে ইবরাহীমকে মুক্তি দেন। লোকের কথায় কিছু দিন থামিয়া থাকার পর আবার তিনি এক দিন আবু মুসলিমের দরবারে গিয়া তাঁহাকে কঠিন ভাষায় গালাগালি করেন। খোদা জানেন—কেন যেন এবারও আবু মুসলিম তাঁহাকে শাস্তি না দিয়া শুধু ধমকাইয়া ছাড়িয়া দেন।

ইবরাহীমকে হত্যার মানসে আইনের ভাওতা

মনে হয় আরও একবার তিনি আবু মুসলিমকে তিরস্কার করিয়াছিলেন। ইহার পর ইবরাহীম সম্বন্ধে আবু মুসলিম অন্য পন্থা অবলম্বন করার চিন্তা করিতেছিলেন।

ইবনে সা'আদের মতে দেখা যায় আইনের আওতায় গ্রেফতার করিয়া ইবরাহীমকে হত্যা করার জন্য একটি উপায় উদ্ভাবন করেন। এই বিরোধিতার পূর্বে ইবরাহীমের সাথে মুহাম্মদ ইবন ছাবিত নামক একজন মুহাদ্দিসও আবু মুসলিমের নিকট যাতায়াত করিতেন। আবু মুসলিম তাহাকেও উহার সাথে জড়াইয়া ফেলেন। এক ব্যক্তিকে আবু মুসলিম বলিলেন "তুমি গোপনে ইবরাহীম ও মুহাম্মদের নিকট গিয়া ফতওয়া জিজ্ঞাসা কর যে, হত্যার নিয়তে হঠাৎ আবু মুসলিমকে আক্রমণ করা শরীয়ত মুতাবিক জায়েয কিনা ?"

আবু মুসলিম নিয়োজিত ব্যক্তি উভয়ের নিকট গমন করিয়া ফতওয়া জিজ্ঞাসা করিল। মুহাম্মদ ইবন ছাবিত উত্তর দিলেন,

لا ارى ان يفتك به لان الايمان قيد الفتك -

'আবু মুসলিমের উপর হঠাৎ হত্যার নিয়তে আক্রমণ করাকে ঈমান কখনও সমর্থন করে না, অর্থাৎ যে ব্যক্তি ঈমানের দাবী করে তাহাকে হত্যা করা জায়েয বলিয়া শরীয়ত কিভাবে অনুমোদন করিতে পারে ?'

কিন্তু ইবরাহীম সাহেব ফতওয়া দিলেন, 'আমি মনে করি হঠাৎ আক্রমণ করিয়া আবু মুসলিমকে নিহত করা জায়েয।'

এই ফতওয়া মৌখিক না লিখিত অবস্থায় আবু মুসলিম পাইয়াছিলেন তাহা জানা যায় নাই। ইবনে সা'আদ বলেন,—"এই ফতওয়াকে প্রমাণস্বরূপ করিয়াই আবু মুসলিম ইবরাহীমকে নিহত করার আদেশ দিয়াছিলেন।"

কিন্তু আমাদের বিশ্বাস এই ফতওয়া সম্পূর্ণরূপে জাল ছিল। শুধু ইবরাহীমকে নিহত করা আইন মুতাবিক জায়েয এই সনদ লাভ করার জন্য আবু মুসলিম এই শঠতার আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। এইরূপ সন্দেহ পোষণ করার কারণ এই যে, ইমাম আবু হানীফা (রঃ) ইবরাহীমের নিহত হওয়ার ঘটনা বর্ণনা প্রসঙ্গে বলিয়াছেন,—"ইবরাহীম যে ফতওয়া দিয়াছেন বলিয়া প্রচার করা হইয়াছে, উহা মিথ্যা। কারণ ইবরাহীমের এমন ফতওয়া দেওয়ার নীতি ছিল না।"

শাহাদাতের পূর্বে ইবরাহীমের আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ

ইমাম আবু হানীফা (রঃ) বলেন, "ইবরাহীম যখন শেষ বারের মত আবুসলিমের সম্মুখে উপস্থিত হন তখন বলিয়াছিলেন,—

"আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে আমার নিকট সবচেয়ে বড় জিনিস তোমার সাথে জিহাদ করা। আল্লাহর সন্তুষ্টি বিধানার্থে ইহার চেয়ে বড় আমার নিকট অন্য কিছু আর অবশিষ্ট নাই।"

অতঃপর বলিলেন,—

"আমি অবশ্য তোমার সাথে মৌখিক জিহাদ করিব। দৈহিক শক্তি প্রয়োগ করার সামর্থ আমার নাই। আমি তো ইহাই চাই যে, আমার আল্লাহ আমার এই অসহায় অবস্থাকে দেখিতেছেন এবং আমি তাঁহার উদ্দেশ্যেই তোমার সাথে শত্রুতা পোষণ করিতেছি।"

এই কথায় পরিষ্কার বুঝা যাইতেছে যে, জিহাদ ও আক্রমণ করা জনসাধারণের কাজ নয়। এই নীতি হানাফী মযহাবের এবং ইবরাহীমও এই নীতির অনুসারী ছিলেন। অবশ্য উপকৃত না হওয়া এবং নিহত হওয়ার সন্দেহে মৌখিক সৎকাজে আদেশ দেওয়ার ফরযও স্থগিত হইয়া গিয়াছিল। কিন্তু ইমাম সাহেবের উপদেশ দেওয়া সত্ত্বেও কাজের মহত্ত্বের উপর গুরুত্ব দিয়াছিলেন। প্রকৃতপক্ষে উপকারের চেয়ে ঈমানের জোশ তাহার উপর বেশী কার্যকরী ছিল; আল্লাহ্‌র সমীপে তিনি জীবন উৎসর্গ করিতে চাহিয়াছিলেন। মৃত্যুর মত জটিল সমস্যার সমাধান তিনি এইভাবে করিতে চাহিয়াছিলেন যে, আল্লাহর শত্রুর তরবারি তাঁহাকে আল্লাহর সমীপে পৌঁছাইয়া দিক। তাই তিনি বলিয়াছিলেন, —"আমি তো ইহাই চাই যে, আমার আল্লাহ দেখুন আমি শুধু তাঁহার সন্তুষ্টি বিধানার্থে তোমার সাথে শত্রুতা পোষণ করিতেছি।"

ইবরাহীমের শাহাদাত

উপরোক্ত বাক্য দ্বারাই তাঁহার মনের অবস্থা প্রকাশ পাইতেছে। অতঃপর কি হইল? ইমাম আবু হানীফা (রঃ) শুধু লিখিয়াছেন,—"আবু মুসলিম তাহাকে নিহত করিলেন।" ইবনে সাআদ বিস্তারিত-ভাবে লিখিয়াছেন, "ইবরাহীম শেষ বার যখন যান তখন বুঝিয়াছিলেন যে, এইবার আমি জীবন লইয়া ফিরিতে পারিব না। তাই কাফনের কাপড় পরিধান করিয়া সুগন্ধি লাগাইয়া আবু মুসলিমের ভরা দরবারে গিয়া তাঁহাকে তিরস্কার করিলেন। আবু মুসলিম তাঁহাকে হত্যা করিলেন এবং কোন এক নির্জন জঙ্গলে তাঁহার লাশ ফেলিয়া দিতে আদেশ করিলেন।"

এখানে লক্ষণীয় বিষয় যে—ইবরাহীম ইমাম সাহেবের পরামর্শ মানিলেন না,—যে সিদ্ধান্ত তিনি করিয়াছিলেন—উহা পূর্ণ করিলেন। কিন্তু ইমাম সাহেব যখনই তাঁহার কথা আলোচনা করিতেন তখনই কাঁদিতে কাঁদিতে বেহুঁশপ্রায় হইয়া যাইতেন। কোন পথে কার্য আরম্ভ করিবেন—ইহাই ছিল উভয়ের মধ্যে মতানৈক্য, অথচ লক্ষ্য উভয়ের একই ছিল। ইবরাহীম বিপদের ঝুঁকি মাথায় লইলেন এবং ইমাম সাহেব পরিশেষে তাঁহার লক্ষ্যস্থলে পৌঁছিতে সক্ষম হইয়াছিলেন এবং উপকৃত হইয়াছিলেন।

আবু মুসলিমের হাতে নিহতদের সংখ্যা

আবু মুসলিমের হাতে যে পাঁচ লক্ষ সাধারণ লোক নিহত হইয়াছিল তাহাদের মধ্যে ইবরাহীমও যে একজন ছিলেন—একথা বিশ্বাসযোগ্য নয়। ইবরাহীম এমন কোন লোক ছিলেন না যে হুকুমত তাঁহার পরিচয় জানিত না। তিনি খ্যাতিসম্পন্ন ব্যক্তি হওয়ায় অতি সামান্য প্রমাণ এই যে,—তিনি যখন প্রথমবার বন্দী হন তখন তাঁহাকে মুক্ত করার জন্য খোরাসানের 'আলিম ও বুযুর্গরা মার্ভ-এ উপস্থিত হইয়াছিলেন।

শুধু মার্ভেরই নয় খোরাসানের আলিম সম্প্রদায় তাঁহার মুক্তির জন্য সমবেত হইয়া প্রমাণ করে যে সে যুগে মুসলমানদের সমাজে তিনি কিরূপ মর্যাদার অধিকারী ছিলেন।

তাছাড়া আমরা ইহাও দেখিতে পাই যে ইবরাহীমের শাহাদাতের চল্লিশ-পঞ্চাশ বৎসর পর নসর ইবন বায নামক একজন খোরাসানী

মুহাদ্দিস বাগদাদ আগমন করিলে লোকে তাঁহার নিকট হাদীস শুনিতে উপস্থিত হয়। শ্রোতাদের মধ্যে হযরত আহমাদ ইবন হাম্বলও ছিলেন। অন্যান্য মুহাদ্দিসদের হাদীছ বর্ণনা করার পর ইবরাহীম সায়েগের বর্ণিত দুই একটি হাদীস শুনাইতেই মুষ্টিমেয় বিশিষ্ট কয়েকজন লোক ব্যতীত আর সকলেই উঠিয়া চলিয়া গেল। ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল স্বয়ং বলেন,—"নসরের কোন দোষ ছিল না, বরং ইবরাহীম বর্ণিত হাদীস শুনাইতেই লোক উঠিয়া গেল।" (মীযানুল ই'তিদাল ৫২৮ পৃঃ)

ইবরাহীমের স্থান যে সাধারণ মিহতদের মধ্যে ছিল না উহা তাহারই প্রমাণ। আব্বাসী হুকুমত এবং আবু মুসলিম তাঁহাকে রাষ্ট্রের দুশমন বলিয়া প্রচার করিয়া দিয়াছিল। যাহার অন্য অর্থ এই যে, তাঁহাকেও বনী উমাইয়াদের দলের বিবেচনা করিয়া লওয়া হইয়াছিল। "যার খায় তার গায়" এই প্রবাদ বাক্য অনুসারে বাগদাদীরা নিজদিগকে আব্বাসী বলিয়াই মনে করিত। সুতরাং আব্বাসী হুকুমতের দুশমনের বর্ণিত হাদীস তাহাদের শহরে বসিয়াই কেহ শুনাইবে আর তাহারা শুনিবে—ইমাম আহমদের ন্যায় আল্লাহ এবং আল্লাহর রাসূলের প্রতি শ্রদ্ধাবান মুষ্টিমেয় কয়েকজন লোক ব্যতীত সেই ধৈর্য আর কাহারও ছিল না। (সেই যুগ কেন এই যুগেও নাই) তাই তাহারা হাদীস না শুনিয়া উঠিয়া গিয়াছিল।

আমার মনে হয় ইমাম সাহেব এবং ইবরাহীমের কার্যকলাপ হুকুমতের নিকট অজ্ঞাত ছিল না। সেই অন্যায়ে ইমাম সাহেবের সাথে কোন অন্যায় ব্যবহার করা হইয়াছে বলিয়া কোথাও পাওয়া যায় না। শুধু ইহাই নহে অতঃপর জিজ্ঞাসা যে, এই তো বনী উমাইয়াগণ ক্ষমতাচ্যুত হইলেন এবং বনী আব্বাসীয়রা তো তাহাদেরই স্থলাভিষিক্ত হইল। হযরত যায়দের আন্দোলনে ইমাম সাহেব যে আর্থিক সাহায্য করিয়াছিলেন উহা কি বনী আব্বাসদের অজ্ঞাত ছিল? কিন্তু আমরা দেখিতে পাই এক যুগ পর্যন্ত বনী আব্বাস ইমাম সাহেবের রাজনৈতিক কার্যকলাপের প্রতি কোন প্রকার দৃষ্টিপাত করে নাই। আবুল আব্বাস প্রায় পাঁচ বৎসর কাল রাজত্ব করেন। এই সময়ের মধ্যে এমন কোন ঘটনার সন্ধান পাওয়া যায় না যাহাতে হুকুমতের সাথে তিনি বন্ধুত্ব বা শত্রুতাপূর্ণ মনোভাব পোষণ করিতেন।

অথচ ইমাম সাহেব যে তৎকালীন রাজধানী হইতে দূরে ছিলেন এমন কিছুও না। তিনি তো কূফায়ই ছিলেন এবং কূফা হইতেই

আব্বাসীগণ মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন। বাগদাদ নির্মাণের পূর্বে কূফার আশে পাশেই তাহাদের রাজধানী ছিল। অধিকন্তু বিভিন্ন ইতিহাসে লিখিত আছে—"খলীফা আবু জাফর মনসুরের নিকট একখানি আয়না ছিল উহাতে তিনি শত্রু-মিত্রকে পৃথক পৃথকভাবে দেখিতে পাইতেন।"

বিভিন্ন সময় মনসুর সেই আয়নার সাহায্যেই তিনি তাহার শত্রুকে চিনিতে পারিতেন এবং শত্রু কোথায় থাকে তাহাও জানিতে পারিতেন। কথিত আছে, প্রাচীন রাজ-রাজড়াদের ধনভান্ডারে তিনি উহা পাইয়াছিলেন।

কিন্তু আমি বলিতে পারি না যে, উহা কি বস্তু ছিল। সত্যই যদি এমন কোন জিনিস তাহাদের অধিকারে থাকিত তবে কি ইমাম সাহেব তাহাদের দৃষ্টির অন্তরালে থাকিতে পারিতেন? বিশেষতঃ তিনি তো রাজধানীর পাশেই বসবাস করিতেন।

মেহদী সমীপে হযরত সুফইয়ান ছাওরী

এক যুগ পর্যন্ত হুকুমত কেন ইমাম সাহেবের সঙ্গে কোন সম্পর্ক রাখে নাই এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার জন্য হুকুমতের তৎকালীন দৃষ্টিভঙ্গির ব্যাখ্যার প্রয়োজন। তাই উদাহরণস্বরূপ একটি ঐতিহাসিক ঘটনা বলা হইতেছে। ইবনে খাসম এবং আল মাসউদী বলেন,—

আবু জাফর মনসুরের পর আল-মেহদী সিংহাসনে আরোহণ করেন। মেহদীর সময় হযরত সুফইয়ান সাওরীকে বন্দী করিয়া আনিয়া তাহার সম্মুখে উপস্থিত করা হইল। মেহদী বলিলেন,—

১। হযরত সুফইয়ান ছাওরী একজন উচ্চ পর্যায়ের ওলী ছিলেন। ইবন সালাম বলিতেন,—"তোমাদের মধ্যে কেহ যদি বলে,—আমি সুফইয়ানের চেয়ে বুযুর্গ লোক দেখিয়াছি—তবে তাহার কথা বিশ্বাস করিও না।" সুফইয়ান একবার মেহদীকে বলিয়াছেন,—"আমি জানিতে পারিয়াছি, হযরত ওমর একবার হজ্জ উপলক্ষে মাত্র বারটি দেরহাম ব্যয় করিয়াছিলেন। অথচ তোমরা তাহারই স্থলাভিষিক্ত হইয়া কি পরিমাণ খরচ কর—চিন্তা করিয়া দেখিয়াছ কি?" মেহদী এ কথায় রাগান্বিত হইয়া বলিয়াছিলেন,—"তবে কি তোমার মত দরিদ্রের ন্যায় থাকিব?" সুফইয়ান বলিয়াছিলেন—'আমি তা বলি না! তবে এই অপব্যয়কে নিশ্চয়ই কমাইতে হইবে।'

"সুফইয়ান! তোমরা আমাদের সংশ্রব এড়াইয়া দূরে দূরে থাক এবং মনে কর যে, আমরা তোমাদিগকে কোন বিপদে ফেলিতে চাই তবে তোমরা এইভাবে সেই বিপদ এড়াইয়া যাইতে পারিবে। এখন তুমি আমার আয়ত্তে। এখন যদি আমি তোমার বিরুদ্ধে কোন নির্দেশ দেই তবে কি করিবে?"

সুফইয়ান নির্ভয়ে বলিলেন,—"তুমি যদি এই সময় আমার উপর কোন নির্দেশ জারী কর, তবে যিনি সর্ব শক্তিমান, সত্য মিথ্যা যাহার নখদর্পণে, তিনিও তোমার উপর কোন হুকুম জারী ক্ষমতা রাখেন।"

দরবারী আমীর রবী'খোলা তরবারি হাতে মেহদীর এক পাশে দন্ডায়মান ছিলেন, তিনি সুফইয়ানের নির্ভীক উত্তর শুনিয়া ক্রোধে লাল হইয়া বলিলেন,—"হুযুর! আপনার সম্মুখে এমন বেয়াদবী! আদেশ করুন তাহার শিরশ্ছেদ করি।"

মেহদী বলিলেন,—"বদমায়েশ! চুপ থাক! ইনি এবং ইহার মত লোকেরা তো ইহাই চান যে, আমরা তাঁহাদের হত্যা করিয়া তাহাদের কৃতকার্যকে নিজেদের দুর্ভাগ্য এবং বদনামের হেতু বানাই।"

এই কথায় মনে হয় হুসায়ন হত্যার মধ্যে প্রত্যেক যুগের ইয়াযীদই তাহার নিজের মৃত্যু বিভীষিকা চোখের সম্মুখে দেখিতে পায়। সেই যুগের শ্রেষ্ঠ নবুওতির সাক্ষী হইতে এই ফলাফল নির্ণয় করা যাইতে পারে যে, হুসায়নী নমুনা অনুসরণকারীগণ উল্টাভাবে তাহাদের মৃত্যু-তেই তাহাদের জীবনের যামানতকে লুক্কায়িতভাবে দেখিতে পায়।

যাহা হউক নিঃসন্দেহে কোন কথা বলা যাইতে পারে না। এমনও হইতে পারে যে, প্রথম কয়েক বৎসর ইমাম সাহেব হুকুমতের সাথে সম্পর্ক না রাখায় তাহার রহস্য গোপনই ছিল। অথবা এমনও হইতে পরে যে আল্লাহতা'আলা তাঁহাকে দিয়া ইসলামের এমন একটি কাজ করাইয়া লইতে চাহিয়াছিলেন, যে কাজ সম্বন্ধে ইয়াযীদ ইবন হারুন বলেন,—"ফিকাহ শাস্ত্রে অভিজ্ঞতা ইমাম সাহেবের এক বিশেষ গুণ ছিল। আমি এমন কোন ব্যক্তি দেখি নাই যে, ফিকাহ সম্বন্ধে আলাপ করিয়া তাঁহার নিকট পরাজয় বরণ করে নাই। ফিকাহ শাস্ত্র অভিজ্ঞতা তাঁহার এবং তাঁহার সাগরেদদের বিশেষ গুণ এবং বিষয়বস্তু ছিল। আমার মনে হয় এই কাজের জন্যই তাঁহাদের জন্ম হইয়াছিল।

সত্য বলিতে কি শুধু হানাফী ফিকাহই নয় বরং মুসলমানদের

নিকট ফিকাহর যে ভান্ডার সঞ্চিত রহিয়াছে তাহা শাফিঈ, হাম্বলী এমকি মালিকীই হউক না কেন ইমাম আবু হানীফা (রঃ)-এর বদৌলতেই হইয়াছে এবং আল্লাহ তাঁহাকে এই সুযোগ দান করিয়াছিলেন।

মোট কথা, হেজাষ হইতে প্রত্যাবর্তন করার পর তিনি আইন প্রণয়নে লিপ্ত থাকেন এবং ১৪৫ হিজরী পর্যন্ত ইবরাহীম সায়েগের ঘটনা ব্যতীত যাহার সম্বন্ধে তিনি বলিয়াছিলেন,—"আমার উপর পৃথিবী অন্ধকার হইয়া আসিল" এমন কোন ঘটনা সংঘটিত হয় নাই যাহা তাহার শান্তিময় পরিবেশকে ঘোলাটে করিতে পারিত।

চতুর্দশ অধ্যায়

আব্বাসী হুকুমতের প্রারম্ভে ইমাম সাহেবের নীরব সাধনা

বিরতির এই তের-চৌদ্দ বৎসরের মধ্যে যতদূর মনে হয় ইমাম সাহেবের দুইটি লক্ষ্য ছিল অর্থাৎ মুসলমানদের যদি কোন শৃঙ্খলাবদ্ধ শক্তি পাওয়া যায় তবে উহাতে অংশগ্রহণ করিয়া ন্যায়ের সাহায্য এবং অন্যায় তিরোহিত করার ফরয আদায় করিতেন। আর যতদিন ইহা সম্ভবপর না হয় ততদিন পর্যন্ত কোন প্রকার বিপদের ঝুঁকি কাঁধে না লইয়া ন্যায়ের প্রতিষ্ঠা এবং অন্যায়ের বিরোধিতায় সম্ভাব্যভাবে কাজ করিয়া যাইতে থাকিবেন।

আল্লাহর মেহেরবাণীতে আব্বাসীয় হুকুমতের প্রথম দিকে অর্থাৎ ১৪৫ হিজরী পর্যন্ত ইমাম সাহেব শেষোক্ত মতে কাজ করার সুবর্ণ সুযোগ পাইয়াছিলেন। এই কাজে তিনি এতটা সফলকাম হইয়াছিলেন যে, উহাকে সামনে অগ্রসর করাইতে অন্য লোকও ইমাম সাহেবের প্রতিনিধিত্ব করিতে পারিত।

একটি বিষয়ে ভ্রান্তির নিরসন করা দরকার, অর্থাৎ ১৪৫ হিজরী পর্যন্ত হুকুমতের সাথে সম্পর্কচ্ছেদের অর্থ এই যে, আব্বাসী হুকুমত এবং ইমাম সাহেবের মধ্যে পরবর্তীকালে বিরোধ বাধিয়াছিল সেই বিরোধ সম্পর্ক হইতে ইমাম সাহেব মুক্ত ছিলেন। পরবর্তী আলোচনায় জানা যাইবে যে, আবুল আব্বাসের পর মনসুর খেলাফতের আসনে সমাসীন হন এবং কিছুদিন পরই ইমাম সাহেবের সাথে মনসুরের বন্ধুত্বের সম্পর্ক গড়িয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু সম্পর্ক ১৪৫ হিজরী পর্যন্ত ছিল। ইহার পর যাহা হইয়াছিল উহাই বিস্তারিতভাবে বর্ণিত হইবে।

সাধনার ব্যাখ্যা

এই বিরতির সময় ইমাম সাহেব কি করিতেন? এবং যাহাই কিছু করিতেছিলেন কেন করিতেছিলেন? এই প্রশ্নের উত্তরের একাংশ পূর্বে বলা হইয়াছে অর্থাৎ আইন-প্রণয়ন সমিতি গঠন করিয়া মানব জীবনের ঐ সমগ্র, বিষয় বিশেষত যাহা মানব জীবনের কর্মক্ষেত্রের সাথে সম্বন্ধযুক্ত, তাহার সমাধান করেন। ইমাম সাহেবের খিদমত

সম্বন্ধে যতটা এই গ্রন্থের বিষয়বস্তু তাহা বর্ণনা করিয়াছি। এখন যাহা বলিব উহা প্রশ্নের দ্বিতীয়াংশ।

বিচার বিভাগ সম্পর্কে শিষ্যদিগকে সঠিক শিক্ষা দান

এই সম্বন্ধে সর্বপ্রথম যেদিকে আমাদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয় উহা হইল বিচার বিভাগ সম্পর্কে ছাত্রদিগকে বিশেষ শিক্ষাদান।

অর্থাৎ ইমাম সাহেব যে কাজ তাঁহার ছাত্রদের সাহায্যে করিতেছিলেন উহা এমনই ছিল যে, ঐ সম্পর্কে যথার্থ শিক্ষালাভের পর হুকুমতের সবচেয়ে বড় এবং গুরুত্বপূর্ণ কাজের দায়িত্ব লওয়ার যোগ্যতা অর্জিত হইত। শুধু সেই যুগেই নয় বর্তমান যুগের রাষ্ট্রগুলিতেও উচ্চ পরিষদ হইতে আরম্ভ করিয়া একেবারে শেষস্তরের আদালত সমূহেও উহা ব্যতীত আর কি হয় যাহা ইসলামী হুকুমতের যুগে কাযী এবং মুফতীগণ সম্পাদন করিতেন। আইন প্রণয়ন অবস্থাভেদে উহা প্রয়োগ এবং সেই আইনের আলোকে শান্তি-শৃংখলা বজায় রাখা হুকুমতের সবচেয়ে বড় কাজ এবং প্রধানত দায়িত্ব সেই যুগেও তাহাই ছিল। পরস্পরের মধ্যে যে ঝগড়া-বিবাদ হয় উহার মীমাংসা করাকেই আরবী ভাষায় হুকুমত বলে অর্থাৎ উহাই হুকুমতের প্রধান দায়িত্ব।

ইমাম সাহেব চাহিতেন তাহার মজলিসের সভ্য ও অংশ গ্রহণ-কারিগণ জ্ঞানে যে পরিপূর্ণতা লাভ করিতেন সেই জ্ঞানই তাহাদিগকে হুকুমতের দায়িত্বপূর্ণ পদ গ্রহণ করার উপযুক্ত করিয়া তুলিতেছে। ইহা যেন তাহারা বুঝিতে পারে। যেহেতু ইসলামী আইন ইমাম সাহেব প্রণয়ন করিতেছিলেন উহা শুধু আইনই ছিল না, ছিল মুসলমানদের ধর্ম ও অর্থাৎ পৃথিবীর দ্বারও তাহাদের জন্য ধর্মের পথে খুলিয়া যাইতেছিল। ধর্মের জন্য যে সততা এবং দৃঢ়তার প্রয়োজন, দুনিয়ার কাজে লাগিয়া যাওয়ার পর ধর্মের ঐ সমস্ত দাবীর পূর্ণতা সকল লোক দ্বারা সমানভাবে হইতে পারে না।

একদিকে যেমন দেখা যায়—ইমাম সাহেব ইসলামী আইনের সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর দিকে তাঁহার ছাত্রদিগকে দৃষ্টি দিতে বলিতেন, তেমনি অন্যদিকে যখনই সুযোগ পাইতেন তখন উক্ত 'ইসলামকে হুকুমতের বিচার বিভাগে প্রবেশ করার ওসিলা কি ভাবে সৃষ্টি করা যায় সেই চেষ্টায় বিশেষ ভাবে নিরুৎসাহিত করিতেন।

নূহ ইবন দারাজ, যিনি পরবর্তীকালে আব্বাসী হুকুমতের শ্রেষ্ঠ বিচারকদের মধ্যে পরিগণিত হন, তিনি তাঁহার নিজস্ব কাহিনী

বর্ণনা প্রসঙ্গে বলিয়াছেন,—"ইমাম আবু হানীফার নিকট আমি সময় সময় এমন প্রশ্ন করিতাম যাহা বিচার বিভাগের সাথে সম্পর্কযুক্ত ছিল। ইমাম সাহেব আমার প্রশ্নের উত্তর দিতেন।" অবশেষে তিনি একদিন নূহকে বলিলেন,—"নূহ! আমি দেখিতেছি তুমি প্রায়ই বিচার বিভাগ সম্পর্কীয় প্রশ্ন কর। আমার মনে হয় তুমি কাযী হওয়ার বাসনা পোষণ করিতেছ? নূহ শোন? তোমার বিবেক-বিবেচনা আমি খুবই পসন্দ করি। তাই খোদা-প্রদত্ত এই দান যেন তুমি নষ্ট করিয়া না ফেল।"

কখনও তিনি ছাত্রদের সমাবেশে বলিতেন,—"যাহাকে কাযী বানানো হইল তাহাকে যেন সমুদ্রে ডুবাইয়া দেওয়া হইল। সে যদি সাঁতারও জানে তবুও কতক্ষণ আর সাঁতরাইবে এবং হাত-পা নাড়াচাড়া করিবে।" (মুনফিক, ৯০ পৃষ্ঠা, ২য় জিলদ)

ইমাম সাহেবের প্রিয় ছাত্র মার্ভ নিবাসী খালিদ ইবন সাবীহ এক বিস্ময়কর রওয়ায়েত করেন যে, ইমাম সাহেব একদিন তাঁহার ছাত্রদের সমাবেশে বলিলেন,—"যে ব্যক্তি জ্ঞান রাখা সত্ত্বেও অগ্রণী হইয়া ফতওয়া না দেয় সে সবচেয়ে ভাল। মধ্যবর্তী ঐ ব্যক্তি যে ফতওয়া দেয়। আর যে কাযীর পদ গ্রহণ করে সে সর্বনিকৃষ্ট।" ইমাম সাহেবের নিজস্ব কথা—"সর্ব-নিকৃষ্ট ব্যক্তি কাযী বা বিচারক।"
(মুনফিক, ১৫৯ পৃঃ ২য় জিলদ)

জ্ঞানার্জনে প্রকৃত উদ্দেশ্য সম্পর্কে শিক্ষাদান

ইমাম সাহেবের ছাত্রদের মধ্যে অন্যতম আবু ইউসুফই যে কাযীর পদ গ্রহণ করিয়াছিলেন—এ সম্বন্ধে কোন ভবিষ্যদ্বাণী ছিল না। প্রকৃতপক্ষে তিনি তাঁহার ছাত্রদের এই নীতির অনুশীলন দিতেন তাঁহার কথার অর্থ সম্বন্ধে তিনি নিজে সময় সময় যাহা বলিতেন উহা আবু শিহাব নেহাত এইভাবে বর্ণনা করিয়াছেন,—"যে ব্যক্তি পার্থিব স্বার্থ উদ্ধার মানসে জ্ঞানার্জন করে, সে জ্ঞানের বরকত হইতে বঞ্চিত থাকে। এমন ব্যক্তির অন্তরে জ্ঞান স্থায়ী হয় না এবং তাহার জ্ঞান দ্বারা লোক বেশী উপকৃত হয় না। কিন্তু যে ব্যক্তি ধর্মের নামে জ্ঞানার্জন করে সে বরকত লাভ করে, তাহার অন্তরে জ্ঞানার্জন স্থায়ী হয়, লোক বেশীর ভাগ উপকৃত হয়।" (মুনফিক ৯০ পৃঃ ২য় জিলদ)

এমনতর আরও অনেক কথা বর্ণিত রহিয়াছে। ইমাম সাহেবের দৃষ্টিভঙ্গি বুঝিবার জন্য হয়ত এই কয়টি উদাহরণই যথেষ্ট হইবে। পাঠক। একদিকে ইমাম সাহেবের এই কথাগুলি রাখুন এবং অন্যদিকে এই সম্পর্কীয় অন্য কথাও শুনুন। কাযী আবু ইউসুফ বলেন,—ইমাম সাহেবের মজলিসে যদি কেহ এদিক সেদিকের কথা বলিত এবং সেই কথা যদি দীর্ঘ সূত্রের হইত, তখন ইমাম সাহেব আর সহ্য করিতে পারিতেন না। তিনি তাহাদের কথা থামাইয়া দিয়া মাসআলা-মাসায়েল সম্বন্ধে আলাপ আরম্ভ করিতেন। অতঃপর ছাত্রদের লক্ষ্য করিয়া বলিতেন,—'খবরদার। যে কথা অসহনীয়, উহা লোককে জানাইয়া কোন লাভ নাই।' (লোক ইমাম সাহেবকে বলিত, 'অমুক ব্যক্তি আপনার সম্পর্কে এমন কথা বলে) সেদিক ইঙ্গিত করিয়া পরিশেষে বলিতেন—"যে আমার সম্বন্ধে খারাপ কথা বলে,—আল্লাহ তাহাকে ক্ষমা করিবেন। আর যে সুধারণা পোষণ করে আল্লাহ তাহার প্রতি মেহেরবান হউন।"

অতঃপর বলিতেন,—"তোমরা আল্লাহ্‌র ধর্ম সম্বন্ধে জ্ঞান অর্জন করিয়া যাও এবং লোকে যাহা কিছু বলে উহা আল্লাহ্‌র নিকট সোপর্দ কর। যদি এরূপ কর তবে লোকে তোমাদের জ্ঞানের মুখাপেক্ষী হইয়া থাকিবে।"

আমি ইমাম সাহেবের উপরোক্ত কথার দিকেই খেয়াল করিতে বলি যে, একদিকে তিনি তাঁহার ছাত্রদের বিচারকের পদ গ্রহণ করিতে এবং ফতওয়া দিতে নিরুৎসাহ করিতেন এবং অন্যদিকে উৎসাহ দিতেন, তোমরা জ্ঞানার্জনে এমন পরিপূর্ণতা লাভ কর যেন লোক স্বেচ্ছায় তোমাদের মুখাপেক্ষী হয়।

একথাও সর্বজনবিদিত যে, তাহার ছাত্রগণ যে বিষয়ে জ্ঞানার্জন করিতেন বিচার এবং ফতওয়া ব্যতীত আর কোন বিষয় মীমাংসা করার জন্য লোক তাহাদের মুখাপেক্ষী হইত। তাহারা চিকিৎসাশাস্ত্র অধ্যয়ন করিতেন না যে, লোক তাহাদের নিকট দৈহিক অসুস্থতার প্রতিবিধানের জন্য যাইবে। তাই দেখা যায় তাঁহার শাগরিদদিগকে বিচার এবং ফতওয়া দেওয়া সম্পর্কে নিরুৎসাহ করার অর্থ ছিল দুনিয়ার জন্য এই জ্ঞান এমনভাবে যেন ব্যবহার না করা হয় যাহাতে ধর্মের মর্যাদা ক্ষুণ্ণ হইতে পারে।

ইমাম সাহেবেরই একজন ছাত্র সহল ইবন মাযাহিম, যাঁহাকে হারুনুর রশীদ খোরাসানের শাসনকর্তার পদ গ্রহণ করিতে বার বার

অনুরোধ করেন। কিন্তু সহল কিছুতেই রাযী হইলেন না। ফলে তাঁহাকে কারাগারের শাস্তি ভোগ করিতে হইয়াছিল। তথাপি তিনি স্বীকার করেন নাই। অবশেষে হারুনুর রশীদ তাঁহাকে মুক্তি দিয়াছিলেন। তিনি বলেন,—একদিন ইমাম সাহেব তাঁহার ছাত্রদের প্রসঙ্গে বলেন,—"আমার ছাত্রদের মধ্যে ত্রিশজন বিশেষ মর্যাদাসম্পন্ন, তাহাদের মধ্যে দশজন নেক এবং ফকীহ, দশজন ফতওয়া দেওয়ার উপযুক্ত, বাকী দশজন বিচারক হইতে পারে। ইহারা আমার ছাত্রদের মধ্যে সর্বোৎকৃষ্ট।"

ইমাম সাহেব এক বর্ণনায় বিচারক পদ গ্রহণকারীদের তৃতীয় পর্যায়ের লোক, আবার এই বর্ণনায় বিচারক হওয়ার উপযুক্ত ছাত্রদের সর্বোৎকৃষ্ট লোক বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। দুইটি বর্ণনা বিপরীত মুখী। কিন্তু প্রথম বর্ণনার অর্থ এই ছিল যে,—যে ব্যক্তি বিচারক ফিকাহশাস্ত্রে জ্ঞানার্জন করে, সে সামান্য স্তরের লোক। ইমাম সাহেবের মতে পার্থিব স্বার্থের জন্য জ্ঞানার্জনকারী অতি হীন। আর সহল ইবন মাযাহিম যে বর্ণনা করিয়াছেন—উহা যথার্থ প্রকাশ করিয়াছেন, যাহাদের মধ্যে বিচারক হওয়ার দক্ষতা ছিল তাহাদেরই সেই দক্ষতাকে তিনি কিভাবে অস্বীকার করিতে পারিতেন। তাছাড়া এই রওয়ায়েত সম্পর্কে এই সন্দেহও তো করা যাইতে পারে যে, যাঁহারা বিচারকের পদ গ্রহণ করিয়াছিলেন তাঁহারা নিজেদের কার্য-ধারাকে প্রশংসনীয় করার জন্য এই প্রকার বর্ণনা ইমাম সাহেবের বলিয়া প্রচার করিয়া থাকিতেন। কেননা, এই বর্ণনা তো সহল ইবন মাযাহিমের। হারুনুর রশীদের বার বার অনুরোধ সত্ত্বেও সহল বিচারকের পদ গ্রহণ করিয়া ভোগ করাকে পসন্দ করিয়াছিলেন।

কাযীর পদ সম্পর্কে ইমাম সাহেবের অভিমত

ইমাম সাহেবের বিভিন্ন বর্ণনা দ্বারাই বুঝা যায় যে, তিনি কোন কাজের জন্য তাহার ছাত্রদের তৈয়ার করিতেছিলেন। ইমাম সাহেবের পৌত্র ইসমাঈল ইবন হাম্মাদ, যিনি তাহার যুগের একজন প্রসিদ্ধ কাযী ছিলেন, তিনিও প্রায় এমনিতর বর্ণনা করিয়াছেন। শুধু পার্থক্য এতটুকু যে, ত্রিশের পরিবর্তে তিনি ছত্রিশ জনের কথা বলিয়াছেন। ইমাম সাহেব এই ছত্রিশ জন সম্বন্ধে বলিয়াছেন,—'ইহাদের মধ্যে আটাশ জন তো কাযী হওয়ার দক্ষতা অর্জন করিয়াছে, "ছয় জন ফতওয়া দেওয়ার ক্ষমতা রাখে। অবশিষ্ট দুইজন (আবূ ইউসুফ এবং জাফর)

শুধু কাযী এবং ফতওয়া দেওয়ার দক্ষতাই অর্জন করে নাই বরং অন্যকে কাযী ও মুফতী বানানোর সামর্থও রাখে।"

এখন চিন্তার বিষয় যে, কাযীর পদ গ্রহণে ছাত্রদের নিরুৎসাহিত করা এবং বুযুর্গ ছাত্রদের সম্বন্ধে প্রচার করা যে, অমুক কাযী, মুফতী হওয়ার উপযুক্ত এবং অমুক অমুক কাযী মুফতী তৈয়ার করার দক্ষতা রাখে এই দুইটি কথার অর্থ কি এই হইতে পারে যে, ইমাম সাহেব কাযী মুফতী হওয়াকে অপসন্দ করিতেন না বরং কাযী মুফতী হওয়ার জন্য যে জ্ঞানের প্রয়োজন সেই জ্ঞানার্জনের উৎসাহ দান করিতেন।

প্রকৃতপক্ষে কাযীর পদের যে গুরুত্ব ইমাম সাহেবের দৃষ্টিতে তাহা যদি অতটা থাকিত, যতটা লোকে তাঁহার সম্পর্কে মনে করিয়া থাকে, তবে উহার দিকে দৃষ্টি রাখিয়া তাঁহার কার্য-পদ্ধতি ভিন্নতর কিছু হইত। ইমাম সাহেবের অন্য একজন প্রিয় ছাত্র নূহ আল-জামের বলেন,—"কোন বিশেষ বিশেষ প্রশ্ন ইমাম সাহেবকে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি ধমকাইয়া বলিতেন,—'নূহ! তুমি কাযী হওয়ার স্বপ্ন দেখিতেছ?"

নূহ আল-জামের শিক্ষা গ্রহণ শেষ করিয়া কূফা হইতে স্বদেশ মার্ভে পৌঁছেন। কাযীর পদ গ্রহণ করার জন্য তাঁহাকেও প্রস্তাব দেওয়া হইল। তিনি ভয়ে ভয়ে উস্তাদ ইমাম সাহেবকে এই বিষয়ে অবহিত করিলেন। ইমাম সাহেব উত্তরে যে পত্র লিখিয়াছিলেন উহা আজও ঐতিহাসিক পত্ররূপে পরিগণিত হইয়া আসিতেছে। তিনি লিখিয়াছিলেন,—"তোমার পত্র পাইলাম। যাহা কিছু লিখিয়াছ অবগত হইলাম। তোমাকে বড় আমানত সোপর্দ করা হইয়াছে। এত বড় আমানত যে, বড় বড় লোকও উহার চাপ সহ্য করিতে অক্ষম। তুমি এখন এমন এক ব্যক্তি, যে ডুবিয়া যাইতেছে। নিজের মুক্তির পথ তৈয়ার করা তোমার কর্তব্য।"

এই কথাগুলির মধ্যে যে শক্তি নিহিত রহিয়াছে, লোকে উহার যথার্থ বুঝিতে পারিবে না যতক্ষণ পর্যন্ত কাযীর যিম্মাদারী সম্পর্কে কিছু জানা না যায়, যাহা ইমাম সাহেবের নিকট অতি প্রয়োজনীয় ছিল। এই প্রকার কথা যেমন, কাহারও দাপটে, সে বাদশাহই হউক না কেন, কাযীর নতি স্বীকার করা উচিত নয়। (মুনিফ ১১৫ পৃঃ ২য় জিল্দ)

আদালতের যিম্মাদারদের সম্পর্কে ইমাম সাহেবের দৃষ্টিভঙ্গি

আদালতে ঠিক মত বিচার হউক কি না হউক এই সম্পর্কে শুধু আদালতের যিম্মাদারগণই নহে বরং সমস্ত পৃথিবী উদাসীন। কিন্তু

এক উপদেশনামায় ইমাম সাহেব কাযী আবু ইউসুফকে যাহা লিখিয়াছিলেন উহা দেখিয়া বিস্মিত না হইয়া পারা যায় না। ইমাম সাহেব লিখিয়াছিলেন,—

'যদি মুসলমানদের ইমাম (বাদশাহ বা শাসনকর্তা) দ্বারা এমন কোন অন্যায় সংঘটিত হয় যাহা আল্লাহর সৃষ্টি ও বাদশাহ্‌র সাথে সম্পর্কযুক্ত তবে উহার শাস্তির বিধান বাদশাহ্‌র নিকটবর্তী কাযীকে করিতে হইবে।' (মুনফিক ১০০ পৃঃ)

আদালতের ক্ষমতা

ইমাম সাহেবের নিকট যদি আদালতের মর্যাদা এত উঁচু হয় তবে উহার পরিষ্কার অর্থ এই দাঁড়ায় যে, হুকুমতের ক্ষমতার চেয়েও আদালতের ক্ষমতাকে তিনি বেশী বলিয়া বিশ্বাস করিতেন।

আবু বকর জাসসাস তাঁহার তাফসীরে লিখিয়াছেন,—"যেখানে ইসলামী হুকুমত নাই, সেখানকার মুসলমানগণ যাহাকে কাযী মনোনীত করিবে সেই কাযীর ফয়সালা এমনভাবে মানিতে হইবে যেমন রাষ্ট্রের পক্ষ হইতে মনোনীত কাযীর আদেশ মানা ওয়াজিব। তাই হানাফী মযহাব মতে কাযীর পদের জন্য হুকুমতের প্রয়োজন নাই। হুকুমত ছাড়াও কাযীকে ক্ষমতার মালিক করা যাইতে পারে।"

ছাত্রদের উদ্দেশ্যে উপদেশ

ইমাম সাহেব যাহা কিছু করিতেছিলেন উহার আসল অর্থ ছিল মুসলমানদের জন্য উপযুক্ত কাযী তৈরী করার ব্যাপারে সম্ভাব্য চেষ্টা করা। উহার জন্য প্রথম প্রয়োজন ছিল চিন্তা ভাবনার পর ইসলামী আইন-কানুন প্রণয়ন করা। এই কাজের জন্য তো তিনি আইন প্রণয়ন। মজলিস বা সমিতি গঠন করিয়াছিলেন। দ্বিতীয় প্রয়োজন ছিল, যে সমস্ত লোকের হাতে এই সমস্ত আইন প্রয়োগের ক্ষমতা দেওয়া হইবে, তাহাদের মধ্যে এমন শক্তি থাকিতে হইবে যেন কোন বাধা-বিঘ্ন তাহাদের আইন প্রয়োগ করিতে ঠেকাইয়া রাখিতে না পারে। ইমাম সাহেব তাঁহার ছাত্রদের বার বার সতর্ক করিয়া বলিতেন,—

"আল্লাহ তোমাদের যতটুকু 'ইলমই দান করিয়াছেন সেই 'ইলমের মর্যাদা রক্ষা করিতে আপ্রাণ চেষ্টা করিও। আমি আল্লাহ্‌কে সাক্ষী

করিয়া তোমাদের বলিতেছি, যে কোন আমীরের হীনতা হইতে উহার রক্ষণাবেক্ষণ করিও।" তিনি আরও বলিতেন,—"রাষ্ট্রের কোন চাকুরী তোমরা ঐ সময় পর্যন্ত গ্রহণ করিও না যতক্ষণ তোমরা একথা বিশ্বাস না করিবে যে তোমরা সেই চাকুরী গ্রহণ না করিলে এমন সব লোক দ্বারা সেই পদ পূরণ করা হইবে যাহাদের হাতে জনসাধারণ ক্ষতিগ্রস্ত হইবে।"

দেখা যায় এই অবস্থায় তিনি রাষ্ট্রের কাজ গ্রহণ করিতে পরামর্শ দিয়াছেন। এইরূপ পরামর্শ দেওয়ার কারণও বিদ্যমান ছিল। তাহা হইল হুকুমতের পক্ষ হইতে যে সব কাযী কুফায় নিয়োজিত হইতেন তাহাদের এজলাসে সমস্ত মামলা-মোকদ্দমার যে ফয়সলা হইত ইমাম সাহেব উহা জানিয়া লইয়া ফয়সালার মধ্যে এমন কতকগুলি দোষ-ত্রুটি বাহির করিতেন যাহাতে বেচারা কাযীরা হয়রান হইয়া যাইতেন। একটিই নয় এ ধরনের আরও ঘটনা আছে। বিশেষভাবে কুফার কাযী আবু লায়লা দ্বারাই দোষ-ত্রুটি সংঘটিত হইত। আবার সময় সময় ইবনে শাবরামাহও এমন দোষ-ত্রুটি করিয়া বসিতেন।

ইমাম সাহেবের বিনয় ও নম্রতা সম্বন্ধে এ পর্যন্ত যাহা কিছু বলা হইয়াছে উহাই তাহার সম্পর্কে কু-ধারণা দূর করার জন্য যথেষ্ট যে তাঁহার মধ্যে আত্মগৌরব বলিতে কোন কিছু ছিল না।

ইমাম সাহেবের বিনয়

ইমাম সাহেবের চারিত্রিক গুণের যে সব ঘটনা এই পর্যন্ত বলা হইয়াছে তাহা ছাড়াও নিজের বিদ্যাবুদ্ধির সম্পর্কে তাঁহার যে অনুভূতি ছিল তাঁহার নিজের উক্তিতেই উহা প্রকাশ পাইয়াছে। একবার এক ব্যক্তি কুফার বাজারে পৌঁছিয়া স্বয়ং ইমাম সাহেবের নিকটই জিজ্ঞাসা করিল,—"ফকীহ আবু হানীফার দোকান কোথায় ?"

ইমাম সাহেব বলিলেন,—"আরে ভাই, সে তো ফকীহ নয়, বরং জোর-যবরদস্তী মুফতী (ফতওয়া দানকারী) সাজিয়া বসিয়াছে।" (মু'ফিক ৯৪ পৃঃ)

জাফর আহমার নামক একজন বুযুর্গ বলেন,—"আমি ইমাম সাহেবের নিকট একটি মাসআলা জিজ্ঞাসা করিলাম। তিনি উহার উত্তর দেওয়ার পর আমি বলিলাম,—'যতদিন আপনি এই শহরে আছেন

ততদিন পর্যন্ত এই শহর মঙ্গল-শূন্য হইবে না।" ইহা শুনিয়া ইমাম সাহেব যে কবিতা পাঠ করিলেন,—উহার অর্থ এই,—"শহর অনাবাদীতে পরিণত হইয়াছে। তাই নেতা হওয়ার দক্ষতা না থাকা সত্ত্বেও আমি নেতা হইয়া বসিয়াছি। দুঃখের বিষয় যে তাই আমি একা নেতা ও ইমাম বলিয়া বিবেচিত হইতেছি।"

হাকাম ইবন হিশাম বলেন,—"আমি জিজ্ঞাসা করিলাম আপনি যে ফতওয়া দেন আপনি কি মনে করেন যে উহা সঠিক।" ইমাম সাহেব বলিলেন, "হইতে পারে যে, উহা ভুল হওয়া ব্যতীত আর কিছুই হইবে না।" হাসান ইবন সালিহ নামক একজন প্রসিদ্ধ আলিম লোকের নিকট তাঁহার নিজস্ব ঘটনা বলিতেন,—'কূফার শাসনকর্তা আমাকে ইবন আবী লায়লা এবং ইমাম সাহেবকে ডাকিয়া একটি মাসআলা জিজ্ঞাসা করিলেন।' হাসান বলেন, 'আমি যে উত্তর দিলাম উহা তাহাদের উত্তরের বিপরীত ছিল।' শাসনকর্তা বলিলেন,—'ইবনে আবী লায়লা এবং আবূ হানীফার ফতওয়া মতই কাজ করা হইবে।' আমি দেখিলাম, ইমাম সাহেব কি যেন চিন্তা করিতেছেন। অতঃপর তিনি গভর্নরকে বলিলেন, "জনাব! আমার উত্তর ঠিক হয় নাই। হাসানের ফতওয়াই ঠিক হইয়াছে।"

একবার কোন এক ব্যক্তি ইমাম সাহেবের সাথে কথাবার্তা বলিতেছিল। হঠাৎ সেই ব্যক্তি বলিয়া উঠিল, "খোদাকে ভয় করুন।" এই কথা শুনিতেই তাহার মুখ ফ্যাকাশে হইয়া গেল এবং মাথা নীচু করিয়া বলিতে লাগিলেন, আল্লাহ আপনার মঙ্গল বিধান করুন। যখন কাহারও নিজের বুদ্ধিমত্তার গর্ব হয় তখন আল্লাহকে স্মরণ করাইয়া দেওয়ার মত ব্যক্তির তাহার খুবই প্রয়োজন।"

একবার রাস্তা অতিক্রম করার সময় তাহার পা কোন এক বালকের পায়ের উপড় পড়িল। বালকটি বলিয়া উঠিল, 'বড় মিয়াঁ! কিয়ামতের দিন ইহার প্রতিশোধ গ্রহণ করা হইবে—তুমি কি উহাকে ভয় কর না?"

মাছার ইবন কিদাম, যিনি তখন তাহার সাথে ছিলেন, বলেন, 'এই কথা শুনার সাথে সাথেই ইমাম সাহেব বেহুঁশ হইয়া পড়িয়া গেলেন। আমি তাহাকে ধরিলাম। জ্ঞান ফিরিয়া আসিলে বলিলাম, 'সাধারণ একটি বালকের কথায় আপনার এই অবস্থা হইল?' তিনি বলিলেন, 'আমার ভয় হইতেছে, সে বলে নাই, বরং তাহাকে দিয়া বলানো হইয়াছে।'

শুধু ইহাই নয়—বলা যায় ইমাম সাহেবের সারাটা জীবন ইহার জীবন্ত প্রমাণ, যাহা তাঁহার জীবন-চরিত রচয়িতাগণ লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন যে, 'ইমাম আবু হানীফা কুফায় বড় কাযী ইবনে আবী লায়লার মীমাংসার বহু দোষ-ত্রুটি বাহির করিতেন এবং লোকের নিকট তাঁহার ভুল-ত্রুটি প্রকাশ করিতেন। এই সমস্ত ঘটনা যদি একজনে বর্ণনা করিতেন তবে উহাতে সন্দেহ করা যাইতে পারিত। তাহার এই সমস্ত ঘটনাবলী সংক্ষিপ্তাকারে এবং বিস্তারিতভাবে এত বর্ণনাকারী বর্ণনা করিয়াছেন যে তাহাতে সন্দেহ করার কোন কিছুই থাকিতে পারে না।'

ইহাতে কোন সন্দেহ নাই যে, অহংকার এবং আত্মপ্রেস প্রভৃতি হীন প্রবৃত্তি ব্যতীত যদি উহার ব্যাখ্যা অন্য কোন উপায়ে না হইত তবে ইমামের পূর্ণ জীবনী সম্মুখে রাখিয়া হয়ত ঐ সব বর্ণনা খন্ডনের একটি উপায় স্থির করিতে পারা যাইত।

কিন্তু পূর্বে বলা হইয়াছে, ইমামের সম্মুখে যে কাজ ছিল উহা পূর্ণ করার জন্য প্রকৃতপক্ষে এই পথ অতিক্রম করা বাধ্যতামূলক ছিল। তিনি তাঁহার সমস্ত চিন্তা-ভাবনা এবং চেষ্টা-সাধনা ব্যয় করিয়া ইসলামী আইনের সমস্ত বিভাগগুলিকে সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। আর নিজের তত্ত্বাবধানে রাখিয়া এমন সব লোক তৈয়ার করিতেছিলেন যে যদি তাঁহাদের হাতে ক্ষমতা অর্পণ করা হয় তবে তাহারা কোন কিছুর ভয় না করিয়া ঐ সমস্ত প্রণীত আইন-কানুন যথাযথভাবে প্রয়োগ করিতে সমর্থ হইবেন।

বিচার সম্পর্কীয় রাষ্ট্রীয়নীতির সংশোধন

বিচার কার্য সম্পর্কে হুকুমত যে নীতি প্রবর্তন করিয়া রাখিয়াছিল উহার দোষ-ত্রুটি জনসাধারণকে অবহিত না করা পর্যন্ত ইমাম সাহেবের অক্লান্ত পরিশ্রমলব্ধ বিষয়বস্তুর দিকে হুকুমত এবং জনসাধারণের দৃষ্টি আকৃষ্ট হওয়ার কি প্রয়োজন থাকিতে পারে?

এই বিষয়ে কোন কিছু না বলিয়া চুপ করিয়া থাকিলে, ইমাম সাহেব দেখিতেছিলেন, তাহার পরিশ্রম বৃথা যাইবে এবং যে নাদানদের দ্বারা হুকুমত কাজ করাইতেছে তাহাদের সংশোধনেরও কোন পথ খোলা থাকিবে না। কিন্তু এই কঠিন পথে অগ্রসর হইতে কতটা বাধার সম্মুখীন হইতে হইবে তাহা ইমাম সাহেব প্রত্যক্ষভাবেই উপলব্ধি করিতে পারিতেছিলেন। আসলে হুযুর (সাঃ)-এর প্রচারিত ধর্ম এবং তাঁহার উম্মতদের নাজাত ও সংশোধনের জন্য ইমাম সাহেবের মধ্যে যে উৎসাহ

ও উদ্দীপনার অগ্নিশিখা প্রজ্জ্বলিত ছিল উহা যদি তাঁহার ভদ্রতার সীমা-রেখা ডিঙাইয়া বিজয়ী না হইতে পারিত তবে এ কাজে ঝাঁপাইয়া পড়া তাঁহার মত লোকদের ক্ষমতা ছিল না।

চিন্তার বিষয় যে, যিনি সাধারণ বালকদের দাপটে ভয় পাইয়া বেহুঁশ হইয়া পড়িয়া যান, শাসনকর্তার ভরা দরবারে নিজের ভুল স্বীকার করেন, তাঁহার পক্ষে একজন প্রসিদ্ধ আলিমদের ভুল-ত্রুটি ধরিয়া দেওয়া সহজ কথা নয়। শুধু এক আধ বারই নয় বরং এই ভুল ধরাকে তিনি অভ্যাসে পরিণত করিয়া লইয়াছিলেন। এই খানেই শেষ নয় বরং শহরের অলি-গলিতে ঐ সমস্ত ভুলের প্রচার, উহাও আবার কোন অপরিচিত লোকের নিকট নয়, জানা-শোনা শহরবাসীর নিকটই করিয়াছিলেন। ধর্মের পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ প্রয়োজন উপলব্ধি করা ইমাম আবু হানীফা ছাড়া আর কাহারও দ্বারা সম্ভবপর হইত কি ?

আদালতের মীমাংসা সম্পর্কে ইমাম সাহেবের বিরামহীন হুঁশিয়ারী

ইহা কোন ব্যক্তিগত বিষয়বস্তু নহে বরং যাহা তাঁহাদের চরম উদ্দেশ্যে ছিল উহা সাধন করার জন্য হুকুমতের দোষ-ত্রুটি দেখাইয়া দেওয়া ব্যতীত আর কোন উপায় ছিল না। হুকুমতের দৃষ্টি যখন এদিকে আকৃষ্ট হইবে তখনই তিনি হুকুমতকে তাঁহার সারা জীবনের সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে বাধ্য করিতে পারিবেন।

বিরামহীনভাবে তিনি কাযী ইবনে লায়লার মাসআলা এবং মীমাংসার ভুল-ত্রুটি ধরিতেন। মনে হয় আইন সংশোধন করায় উহা বিস্ময়কর পন্থা। কিন্তু পরিতাপের বিষয় ইমামের জীবন-চরিত রচয়িতাগণ বহু ঘটনা উল্লেখ করিয়াছেন ঠিকই, কিন্তু উহার মধ্যে আইনানুগত সংশোধনের পরিবর্তে সভা গরম করার বিষয়বস্তুই বেশী রহিয়াছে। ইমাম সাহেবের বর্তমানেই ইবনে আবী লায়লা বহুদিন পর্যন্ত কুফার কাযীর পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তাহা হইলে, আল্লাহই জানেন, ইবন আবী লায়লার কত মীমাংসার তিনি দোষ-ত্রুটি দেখাইয়াছিলেন। যাহা যউক এই বিষয়ে দুই একটি উদাহরণ পেশ করিতেছি।

রওশনদানের মামলা

কথিত আছে, ইবন আবী লায়লার এজলাসে এক ব্যক্তি আরযী পেশ করিল, 'আমি আমার গৃহে একটি রওশনদান (ঘরে আলো

আলোর জন্য দেওয়ালে বা ছাদে যে ছিদ্র বা পথ রাখা হয়) বানাইতে চাই, কিন্তু আমার প্রতিবেশী আমাকে বাধা দিতেছে।'

প্রতিবেশীকে ডাকা হইল। সে তাহার অসুবিধা বর্ণনা করায় কাযী রওশনদান বানাইতে নিষেধ করিয়া দিলেন। সেই ব্যক্তি ইমাম সাহেবের নিকট এই সমস্যাটি বলিল। ইমাম সাহেব বলিলেন, 'তুমি যে দেয়ালে রওশনদান বানাইতে চাও—উহা ভাঙিয়া ফেলার জন্য এজলাশে আরযী পেশ কর।' ইবন আবী লায়লা বলিলেন, 'নিজের দেয়াল ভাঙিয়া ফেলার অধিকার প্রত্যেকেরই আছে।'

সেই ব্যক্তি বাড়ী আসিয়া দেয়াল ভাঙিয়া ফেলার কথা প্রচার করিতেই তাহার প্রতিবেশী দৌড়াইয়া গিয়া ইবন আবী লায়লাকে বলিলেন, 'হুজুর! রওশনদান তৈয়ার করার চেয়ে দেওয়াল ভাঙিয়া ফেলা যে আমার পক্ষে আরও মারাত্মক হইবে। কাযী সাহেব চুপ হইয়া গেলেন এবং বুঝিতে পারিলেন যে ইহাতে ইমাম সাহেবের হাত আছে।'

পাগলের মামলা

কোন এক মহল্লায় এক বৃদ্ধ বাস করিত। লোকে তাহাকে এক বিশেষ নাম দিয়াছিল। সে নামে কেহ তাহাকে ডাকিলে সে খুব গালাগালি করিত। একদিন কোন এক ব্যক্তি তাহাকে সেই নামে ডাকিতেই সে তাহাকে তো গালাগালি করিলই, অধিকন্তু তাহার পিতা-মাতাকেও যথেষ্ট গালাগালি করিল। সেই ব্যক্তি ইবন আবী লায়লার এজলাশে বৃদ্ধের নামে নালিশ করিল। কাযী সাহেব তদন্ত করিয়া বৃদ্ধকে চাবুক মারার নির্দেশ দিলেন। তাহার পিতা-মাতাকে গালি দিয়াছিল বলিয়া দ্বিগুণ শাস্তি দেওয়ার রায় দিলেন। মসজিদেই তাহাকে চাবুক মারা হইল। আর যাহাকে গালি দিয়াছিল তাহার পিতা-মাতা তখনও জীবিত ছিল।

ইমাম সাহেব এই মীমাংসার কথা শুনিয়া বলিলেন, 'কাযী সাহেব একটি নয় কয়েকটি ভুল করিয়াছেন। প্রথমতঃ শুনা যায় সেই বৃদ্ধ পাগল। সুতরাং প্রথমেই দেখা উচিত ছিল বৃদ্ধ সত্যই পাগল কি না? দ্বিতীয়তঃ তাহার পিতা-মাতা এখনও জীবিত। সুতরাং মামলা দায়ের করা তাহার পক্ষে নয়, বরং তাহার পিতা-মাতা দায়ের করিলে গ্রহণযোগ্য হইত। এইরূপ মামলা কাযী সাহেব কিরূপে গ্রহণ করিলেন? তৃতীয়তঃ তিনি মসজিদে চাবুক লাগাইয়াছেন অথচ মসজিদে চাবুক মারার স্থান নয়। চতুর্থতঃ একই স্থানে যদি

বহু লোককে গালি দেয় তজ্জন্য একই শাস্তি ভোগ করিতে হইবে, পৃথক পৃথক ব্যক্তির গালির জন্য পৃথক পৃথকভাবে শাস্তি দিতে হইবে না।" এরূপ তিনি আরও অনেক দোষ দেখাইয়া দিলেন।

কাযী ইবন লায়লা ইমাম সাহেবের এইরূপ সমালোচনা শুনিয়া হাকিমের গাম্ভীর্য বজায় রাখিয়া আদেশ দিলেন, "শরীয়ত সম্পর্কীয় কোন বিষয়ে সে যেন ফতওয়া না দেয়। এরূপ নির্দেশ কে হিজ্‌র কানুন বলে।"

ইহার কিছুদিন পর যুবরাজ কয়েকটি প্রশ্ন করিয়া ইবন আবু লায়লার নিকট পাঠাইয়া দিলেন এবং নির্দেশ দিলেন যে ইমাম আবু হানীফাকেও যেন এই বিষয়ে জিজ্ঞাসা করা হয়। ইমাম সাহেব সংবাদবাহককে বলিলেন,—"কাযী সাহেব আমাকে ফতওয়া দিতে নিষেধ করিয়া দিয়াছেন।" যুবরাজ এই সংবাদ পাইয়া নির্দেশ দিলেন—"এই নিষেধাজ্ঞা তাহার উপর হইতে উঠাইয়া লওয়া হউক।"

অতঃপর ইমাম সাহেবের উপর ইবন আবী লায়লার আর কোন আধিপত্য রহিল না। ইমাম সাহেব নির্বিঘ্নে ইবন আবী লায়লার সমালোচনা করিতে লাগিলেন।

সাক্ষী সম্পর্কে ইমাম সাহেবের দৃষ্টিভঙ্গি

ইহা অত্যন্ত বিস্ময়কর যে, সাক্ষীদের সংখ্যা, ঘটনাস্থলের অবস্থা দূরত্ব, ইত্যাদি প্রশ্ন করিয়া তাহাদেরকে দুর্বল করার জন্য শুধু এ যুগেই নয় সে যুগেও উকীলগণ যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেন।

ইমাম সাহেবের জীবনচরিত রচয়িতাগণ একটি ঘটনা উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন যে—এই প্রকারে সাক্ষীকে দুর্বল করার নীতি ইমাম সাহেব রহিত করিয়া দিয়াছিলেন। কথিত আছে, কোন একটি বাগানের মামলা চলা-কালে কাযী ইবন আবী লায়লা সাক্ষীকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"আচ্ছা, তুমি বল তো বাগানে গাছের সংখ্যা কত?" সাক্ষী বলিল, "আমি তো গাছ গুণিয়া দেখি নাই?" কাযী ইবনে লায়লা তাহার সাক্ষ্যও গ্রহণ করিলেন না। এই কথা ইমাম সাহেবের কানে উঠিল। তিনি সাক্ষীকে ডাকিয়া বলিলেন, তুমি কাযী সাহেবকে গিয়া জিজ্ঞাসা কর, "জনাব, আপনি এতদিন যাবত কুফার জামে মসজিদে এজলাস করিতেছেন এবং নামাযও পড়িতেছেন,—বলুন তো মসজিদে কতগুলি থাম?"

কাযী সাহেবকে একথা জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন, "আমি

তো কখনও গুণিয়া দেখি নাই যে কতগুলি থাম।" সাক্ষী বলিল, "তাহা হইলে আমি বাগানের গাছের সংখ্যা না জানায় আপনি কি করিয়া সিদ্ধান্ত করিলেন যে, আমি বাগান সম্বন্ধে অবগত নই।"

মোট কথা—এই প্রকারের ওযর-আপত্তি হুকুমতের নিয়োজিত কাযী ইবন আবী লায়লা এবং ইবনে শাবরামাহ্‌র প্রতি ইমাম সাহেবের পক্ষ হইতে প্রায়ই হইতে থাকিত। তাই ইবন আবী লায়লা বলিয়াছিলেন,—"এই কাপড়ের ব্যবসায়ী কে, যাহার পক্ষ হইতে সব-সময় আমার মাথার উপর আকাশ ভাঙিয়া পড়িতেছে।"

বেচারা ইবন আবী লায়লার অন্তর্দাহের সীমা ছিল না। অথচ কিছুই করিতে পারিতেন না। আর করিবেনই বা কি? ইমাম সাহেবের মত লোকের সামনে তাহার পাত্তা কোথায়? তাই কাপড়ের ব্যবসায়ী, জোলা ইত্যাদি বলিয়া মনের ঝাল কিছুটা প্রশমিত করিতেন।

জোলার কাহিনী

মূসা ইবনে 'ঈসা মক্কায় আব্বাসীদের আমলের শাসনকর্তা ছিলেন। হজ্জের সময় কাযী ইবন আবী লায়লা এবং ইবন শাবরামাহও মক্কায় উপস্থিত হইলেন। ঘটনাক্রমে ইমাম সাহেবও সেখানে ছিলেন। মক্কায় মূসা ইবন 'ঈসার কোন একটি চুক্তিপত্র লেখার প্রয়োজন দেখা দিল। তিনি প্রথমে সরকারী কাযীদ্বয়কে ডাকিয়া চুক্তিপত্রটি লেখার আদেশ দিলেন। কিন্তু একজনে লিখিলে অন্যজনে ভুল করিতেন। ফলে আর লেখা হইল না। উভয়ে সেখান হইতে চলিয়া আসিলেন।

কিছুক্ষণ পর ইমাম সাহেবও কোন প্রয়োজনবশত সেখানে পৌঁছিলেন। ইমাম সাহেবকে দেখিয়া তিনি খুব আনন্দিত হইলেন এবং চুক্তিপত্র লেখার ঘটনা পুনরায় বলিলেন। ইমাম সাহেব বলিলেন, "কোন লেখককে ডাকুন আমি চুক্তিপত্র লিখাইয়া দিতেছি।" চুক্তিপত্র লেখার পর পড়িয়া শুনানো হইল। মূসা যেভাবে চাহিয়াছিলেন ঠিক সেই ভাবেই হইয়াছিল। ইমাম সাহেব চলিয়া যাওয়ার পর মূসা কাযীদ্বয়কে ডাকাইয়া নিজে সেই চুক্তিপত্র পড়িয়া শুনাইলেন। কিন্তু প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত তাঁহারা একটি ভুলও ধরিতে পারিলেন না। মূসা বলিলেন, "ইহা ইমাম আবু হানীফার লেখা। কাযীদ্বয় একে অন্যের মুখের দিকে তাকাইতে লাগিলেন। পরে বাহিরে আসিয়া একজন অন্যজনকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কি সেই জোলাকে দেখিয়াছ যে, সে তখনই উহা লিখিয়াছিল।"

অন্যজনে বলিলেন,—"ভাই! জোলাও কি এমন সুন্দরভাবে লিখিতে পারে?"

মোট কথা জোলা, কাপড় বিক্রেতা ইত্যাদি বলা ব্যতীত কিই বা তাহাদের বলার ছিল? কেহ কেহ বলিয়াছেন, 'ইবন আবী লায়লা কোন কোন মামলায় ইমাম সাহেবকে জড়াইতে চাহিয়াছিলেন।" কিন্তু মনে হয় ইহা পরবর্তীকালের লোকের মনগড়া কথা। যাহারা প্রকৃত ঘটনা জানে না তাহারাই ইমাম সাহেব, কাযী ইবন আবী লায়লা ও অন্যান্য কাযীদের বিষয়ে মুখরোচক ঘটনা বলিয়া মজলিস গরম রাখিত। ইবন আবী লায়লা সম্বন্ধেও তাহারা এমন ঘটনা বলিয়াছে যাহা কস্মিন-কালেও তাহার দ্বারা হইতে পারে না। তাহারা এমন ঘটনাও লিপিবদ্ধ করিয়াছে যে, ইমাম সাহেবের নিকট কেহ কেহ এমন কথা বলিত যে, ইবন আবী লায়লা আপনাকে দোষারোপ করে। উত্তরে নাকি ইমাম সাহেব বলিতেন,—"তাহাকে বলিয়া দিও, যত ইচ্ছা আমার সম্বন্ধে বলুক! কিন্তু আমি তাঁহার গলার কাঁটা হইয়াই থাকিব।"

একথায় তো ইহাই বুঝা যায় যে, ইবন আবী লায়লার সাথে ইমাম সাহেবের কোন ব্যক্তিগত আক্রোশ ছিল কিন্তু ইমাম সাহেবের জীবনের কার্যধারা পর্যালোচনা করিলে দেখা যায় যে, ইবন আবী লায়লা তো একজন বড় আলিম ছিলেন, আর সামান্য লোকের সাথেও তিনি কদর্য ব্যবহার করিতেন না।

অধিকন্তু ইবন আবী লায়লার আক্রোশের কথা শুনিয়া তিনি বলিতেন, 'তিনি আমার সম্বন্ধে এমন সব কথা বলেন যে, আমি হয়ত তাঁহার বিড়াল ও গাধা সম্বন্ধেও সে কথা বলিতে পারিতাম না।"

ইহাতে মনে হয় ইবনে আবী লায়লা এবং অন্যান্য সরকারী কাযীগণ তাহাকে জোলা ইত্যাদি বলিতেন। ইমাম সাহেব ভদ্রতার খাতিরে ইবন আবী লায়লাকে তেমন কোন কথা বলা তো দূরের কথা, তাঁহার গাধা বিড়ালকেও তেমন কথা বলিতে পারিতেন না।

একথা সত্য যে, ইমাম সাহেব কিছুটা রসিকতা-প্রিয় লোক ছিলেন। হয়ত হাসি-ঠাট্টার কোন সময় এমন কথা বলিয়া থাকিবেন।

কথিত আছে, শেষ মামলায় ইবন আবী লায়লা বিরক্ত হইয়া কয়েক-জন লোক ঠিক করিয়া রাখিয়াছিলেন যে তাহার কোন বিষয়ে সন্দেহ হইলে উক্ত লোক ছাড়াও তাঁহারা তাঁহাদের নিজেদের পক্ষ হইতে সেই মাসআলা ইমাম সাহেবের নিকট জিজ্ঞাসা করিবেন। ফলে যাহাতে

ইমাম আর সেই বিষয়ে পরে কোন প্রকার সমালোচনা করিতে না পারেন। কিন্তু ইমাম সাহেব প্রশ্নের ধারা দেখিয়াই বুঝিতে পারিতেন এবং একটি কবিতা পাঠ করিতেন যাহার অর্থ এরূপ,—"কঠিন কাজের সময় এই বান্দার অনুসন্ধান করা হয় আর যখন হালুয়া মিঠাইয়ের উপর হাত বুলানো দরকার হয় তখন পড়ে 'জুনদুব'—এর।"

জুনদুব নাম দ্বারা ইমাম সাহেব ইবন আবী লায়লাকে বুঝাইয়াছেন। মোট কথা, ইমাম সাহেবের কাহারও প্রতি কোন ব্যক্তিগত আক্রোশ ছিল না। বরং ইসলামী রাষ্ট্রের বিচার এবং বিচার সংক্রান্ত বিষয় তিনি এমন এক পর্যায়ে দেখিতে চাহিয়াছিলেন যে মর্যাদার যোগ্য উহা ছিল। কিন্তু ক্ষমতাশালীগণ উহা উপলব্ধি করিতেন না। বরং তাঁহারা এই গুরুত্বপূর্ণ পদে এমন সব লোক বহাল করিয়া রাখিতেন যাঁহারা মোটেই উহার যোগ্য ছিলেন না। বিশেষতঃ সাধারণ কোন পল্লী গ্রামে বা ছোট শহরেই নয় বরং তৎকালীন রাজধানী কূফা বা আম্বায়ের মত স্থানে যেখানে দক্ষ ও শিক্ষিত লোকের বসতি ছিল সেখানেও এমন সব কাযী বা বিচারক নিযুক্ত করিয়া রাখিয়াছিলেন।

আদালত গৃহে একটি মীমাংসা সম্বন্ধে সমালোচনা

কাযী আবু ইউসুফের একজন ছাত্র হাসান ইবন আবু মালিক বলেন,—"ইমাম সাহেব একদিন ইবন আবী লায়লার এজলাসে উপস্থিত হইলেন। তাহার সাথে আবু ইউসুফ (রাঃ)ও ছিলেন। কাযী ইবন আবী লায়লা মনে করিলেন—যাহা হউক ভালই হইল, আমি মামলা মোকদ্দমা কতখানি সতর্কতার সহিত মীমাংসা করি, আজ আবু হানীফা স্বচক্ষে দেখিয়া যাউক। তাই তিনি আদেশ করিলেন,—"বাদী-বিবাদী। যাহারা আছে তাহাদের ভিতরে আসিয়া আরযী পেশ করিতে বল।"

এক ব্যক্তি বলিল—"অমুক ব্যক্তি আমাকে ব্যাভিচারিণীর পুত্র বলিয়া গালি দিয়াছে।"

কাযী সাহেব আসামীকে উদ্দেশ্য করিয়া বলিলেন "তোমার কি বলার আছে?"

ইমাম সাহেব তাহার কার্যপদ্ধতি দেখিয়া বলিলেন, "কাযী সাহেব আপনি একথা চিন্তা করিয়াছেন কি অভিযোগকারী তাহার অভিযোগ পেশ করিতে পারে কি না?"

—"কেন ?"

—"আসামী অভিযোগকারীকে নয়, বরং ব্যভিচারিণী শব্দটি তাঁহার মায়ের উপর আরোপ করিয়াছেন। সুতরাং অভিযোগ করার মালিক তাহার মা, বাপ নয়। এখন আপনি জিজ্ঞাসা করিতে পারেন—তাহার মা কি তাহাকে অভিযোগ করার জন্য উকীল নিযুক্ত করিয়াছে, না সে নিজেই মামলা দায়ের করিতেছে ?"

অভিযোগকারী বলিল, "না আমার মা আমাকে উকীল নিযুক্ত করেন নাই, বরং আমিই মামলা দায়ের করিতেছি।"

ইমাম সাহেব "এখন জিজ্ঞাসা করুন তাহার মা জীবিত কি না ? যদি জীবিত থাকে তবে উকীল হিসাবে দায়ের করিতে পারে। আর যদি মারা গিয়া থাকে তবে অন্য কথা।"

ইবন আবী লায়লা এই কথা শুনিয়া অভিযোগকারীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'তোমার মা জীবিত কি ?"

—"না।"

—"তোমার দাবী প্রমাণ করার জন্য সাক্ষী থাকিলে উপস্থিত কর।" ইমাম সাহেব বলিলেন,—"এখনও শেষ হইল না; আপনি জিজ্ঞাসা করুন, তাহা ছাড়া তাহার মায়ের অন্য কোন ওয়ারিছ আছে কি না ? যদি থাকে তবে তাহাকেও অভিযোগ করায় অংশগ্রহণ করিতে হইবে।"

কাযী সাহেব অভিযোগকারীকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে পারিলেন সে ব্যতীত তাহার মায়ের আর কোন ওয়ারিছ নাই। তাই তিনি মনে করিলেন, এবার হয়েছে। আসামীকে কিছু জিজ্ঞাসা করিতে উদ্যত হইতেই ইমাম সাহেব বলিলেন, "আপনি জিজ্ঞাসা করুন তাহার মা স্বাধীন ছিলেন, না ক্রীতদাসী।"

অভিযোগকারী বলিল, "স্বাধীন।"

কাযী সাহেব আবার কিছু জিজ্ঞাসা করিতে উদ্যত হইলে ইমাম সাহেব বলিলেন, জিজ্ঞাসা করুন, তাহার মা মুসলমান ছিলেন, না যিম্মী।" অভিযোগকারী বলিল, "আমার মা মুসলমান ছিলেন।"

ইমাম সাহেব বলিলেন, "এখন আপনার কাজ আরম্ভ করুন।" আসামীকে জিজ্ঞাসা করায় সে অপরাধ অস্বীকার করিল। অভিযোগকারীকে সাক্ষী উপস্থিত করিতে বলায় সে কুফার কয়েকজন প্রসিদ্ধ

লোকের নাম করিল। মামলার তারিখ পড়িল। ইমাম আবু হানীফা সাহেব আসন ছাড়িয়া উঠিলেন। কাযী সাহেব তাহাকে অপেক্ষা করিতে বলিলেন। কিন্তু তিনি অপেক্ষা না করিয়া চলিয়া আসিলেন।

হানাফী মযহাবের ফিকাহ সম্বন্ধে যাহার সাধারণ জ্ঞানও আছে সে জানে যে, মামলা সংক্রান্ত বিষয়ে এই সব প্রাথমিক পর্যবেক্ষণ অতি সামান্য কথা। এই সামান্য বিষয়গুলিও হুকুমতের নিয়োজিত কাযীদের জানা ছিল না। অথচ ইহাদিগকেই কাযীর পদে নিয়োগ করিতে হুকুমত কোন প্রকার দ্বিধা বোধ করিত না। সুতরাং ইহা হইতে অনুমান করা যাইতে পারে যে, ইমাম সাহেব বিচার বিভাগের সংশোধন করার জন্য কেন এত উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছিলেন।

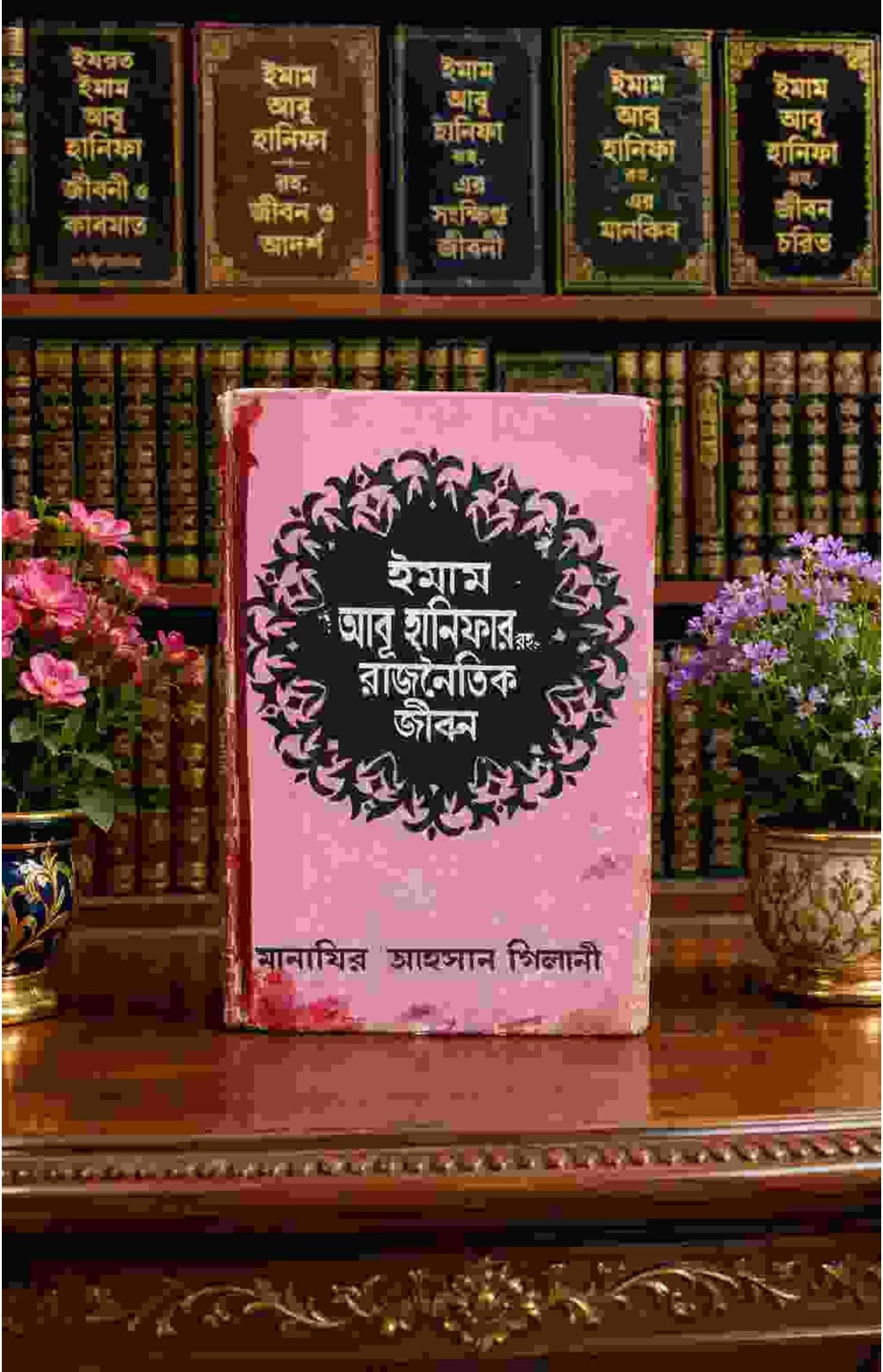
আদালতের উপর হুকুমতের প্রভাব

কাযী ইবন আবী লায়লা একজন সম্ভ্রান্ত ঘরের সন্তান। তাহার পিতা আবদুর রহমান ইবন আবী লায়লা বুযুর্গ তাবিঈ ছিলেন। তিনি ১২০ জন শুধু আনসার সাহাবীই দেখিয়াছিলেন। হযরত ওমর, হযরত আলী এবং হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ হইতে তিনি রওয়ায়েত করিতেন। এই দিক হইতে তিনি উপযুক্ত পিতারই সন্তান ছিলেন। তাঁহার প্রকৃত নাম মুহম্মদ। কিন্তু পিতা যে নামে প্রসিদ্ধ ছিলেন তিনিও সেই নামেই সকলের নিকট পরিচিত ছিলেন। তাহার পিতা খুব অল্প বয়সে মারা যান। তিনি তাহার পিতা সম্বন্ধে বলিতেন "আমার পিতার দুই স্ত্রী এবং ঘরে নবীয (এক প্রকার শরবত) তৈরী করার সবুজ রংয়ের দুইটি পাত্র ছিল। ইহা ব্যতীত আমার আর কিছুই মনে নাই।"

মুহাদ্দিসীদের নিকট তাঁহার স্মরণ-শক্তি সম্বন্ধে ত্রুটি থাকিলেও তাঁহার চরিত্র ও কার্যাবলী সম্বন্ধে কাহারও কোন অভিযোগ নাই। বরঞ্চ আবু ইউসুফের মধ্যস্থতায় একথাও বর্ণিত আছে যে, 'ইবন আবী লায়লার ন্যায় ধন-সম্পদ সম্পর্কে এমন সতর্ক আমি আর কাহাকেও দেখি নাই।'

কিন্তু প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক বলেন, "আব্বাসী হুকুমতের সবচেয়ে বড় নরঘাতক আবু মুসলিমের সাথে দেখা হইলে কাযী সাহেব তাঁহার হাত চুম্বন করিতেন।"

ইহা দেখিয়া কোন এক ব্যক্তি অভিযোগ করায় তিনি বলিয়াছিলেন,


ইমাম আবু হানিফা রহ. রাজনৈতিক জীবন
মানাযির আহসান গিলানী

'হযরত আবু উবায়দা ইবনে জারাহও তো হযরত ওমর (রাঃ)-এর হাত চুম্বন করিয়াছিলেন।' সেই ব্যক্তি একটু সাহস সঞ্চয় করিয়া বলিলেন, 'হযরত ওমর (রাঃ)-এর সাথে আবু মুসলিমের তুলনা?' ইবনে আবী লায়লা বলিলেন, 'আরে ভাই তুমিও আমাকে আবু উবায়দা মনে করিতেছ নাকি? আবু মুসলিম যখন ওমর নয় তখন এই বান্দা আবার আবু উবায়দা কখন হইল? যেমন রূহ তেমন ফেরেশতা।" জানি না একথা কতদূর সত্য। হয়ত আবু মুসলিমের ন্যায় অত্যাচারী নির্দয় লোকের কোপ-দৃষ্টি হইতে আত্মরক্ষার জন্যই কাকী আবী লায়লা এরূপ লৌকিকতা প্রদর্শন করিয়াছিলেন।

এখানে জায়েয না-জায়েযের প্রশ্ন নয়, বরং ইমাম সাহেব কাযীদের দায়িত্ব কতটা উচ্চে উঠাইতে চাহিয়াছিলেন সেই দিক দিয়া বিচার করুন—এই প্রকার নজীর দেখিয়া তাহার মনের অবস্থা কি হইত?

নিঃসন্দেহে ইমাম সাহেব এই আশা পোষণ করিতেন যেন জ্ঞান অজ্ঞতার সম্মুখে, ন্যায় অন্যায়ের সম্মুখে যেন মাথা নত না করে। আর যদি মাথা নত করিতে বাধ্য করে তবুও অদৃষ্টে যাহাই ঘটুক না কেন কখনও যেন মাথা নত না হয়। তিনি এই পদের ইলম ও আমল উভয় যিম্মাদারীকে চাহিতেন—যতদূর পারা যায় উহাকে উন্নত রাখিতে হইবে। 'ইলমের দিক হইতে তিনি যাহা করিতেছিলেন—উহার উদাহরণ আজও পৃথিবীর সম্মুখে বিদ্যমান। কার্যধারার দিক দিয়া তাহার শিক্ষা-দীক্ষায় যে ফলাফল প্রকাশ পাইয়াছে উহা ঐ সমস্ত বুযুর্গদের জীবন-চরিত পাঠ করিলে জানা যায় যাঁহারা তাঁহার পর বিচারকের পদে বহাল হইয়াছিলেন। উহা এক স্বয়ং-সম্পূর্ণ কিতাবের ঘটনা। কিন্তু কাযী ইবনে আবী লায়লার কাহিনীর মুকাবিলায় ইমাম সাহেবের শিক্ষ-দীক্ষায় যে ইনকিলাব সৃষ্টি করিয়াছিল কম পক্ষে উহার দুই একটি উদাহরণ পেশ করার লোভ সংবরণ করিতে পারিতেছি না।

ইমাম সাহেবের সাধনার ফল

আমরা দেখিয়াছি যাঁহার হাত চুম্বন করা হইয়াছিল তিনি কোন বাদশাহ বা খলীফা নন। অতি বড় হইলেও হুকূমতের একজন কর্মচারী। উহার মুকাবিলায় আব্বাসী খিলাফতের শ্রেষ্ঠ নরপতি হারূনুর রশীদের ঘটনা শুনুন। এই ঘটনা বিবৃতকারী হানাফী ঐতিহাসিক নহেন, খতীব বাগদাদী, যিনি হানাফী মাযহাবকে বিশেষ সুনজরে দেখিতেন না। তিনি আবু উবায়দা হইতে বলেন, 'আমরা

মুহাম্মাদ ইবন হাসানের (ইমাম আবু হানীফার শাগরিদ) সহিত উপবিষ্ট ছিলাম। ঘটনাচক্রে হারুনুর রশীদ সেখান দিয়া অতিক্রম করিতেছিলেন। তাঁহাকে দেখিয়া একমাত্র হাসান ব্যতীত আমরা সকলেই উঠিয়া দাঁড়াইলাম। বাদশাহর সম্মানার্থে সকলে দাঁড়ানোর পর কোন এক ব্যক্তির বসিয়া থাকা সামান্য কথা নয়। হারুন ভিতরে প্রবেশ করিয়া সর্বপ্রথমেই হাসানকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। হাসানের সাগরিদের মুখ ফ্যাকাসে হইয়া গেল। কিন্তু তিনি প্রশান্ত মুখে ভিতরে প্রবেশ করিলেন এবং কিছুক্ষণ পর হাসিমুখে ফিরিয়া আসিলেন।' হাসান নিজেই বলিলেন, 'খলীফা আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—সকলে দাঁড়াইল আর তুমি কেন বসিয়া রহিলে।' আমি বলিলাম, 'আপনি আমাকে যে দলে স্থান দিয়াছেন উহা হইতে বাহির হইয়া অন্য দলে যাওয়া আমার পসন্দ হইল না। আপনি আমাকে আলিম সম্প্রদায়ভুক্ত করিয়াছেন, সুতরাং আলিমদের দল পরিত্যাগ করিয়া আপনার দাসদের সম্প্রদায়ভুক্ত হওয়া কিরূপে পসন্দ করিতে পারি। আপনার চাচার ছেলে (নবীজীর প্রতি ইঙ্গিত ছিল) ইরশাদ করিয়াছেন, 'যে ব্যক্তি এই আশা পোষণ করে যে, লোকে তাহার সম্মান প্রদর্শনার্থে দন্ডায়মান হউক সে যেন তাহার স্থান জাহান্নামে ঠিক করিয়া লইল।' এই অবস্থায় যে বসিয়া রহিয়াছিল সে-ই সুন্নতের অনুসরণ করিয়াছে, আমার কথা শুনিয়া খলীফা বলিলেন, 'হে মুহাম্মাদ! তুমি সত্য বলিয়াছ।'

একদিকে ইসলামের গৌরব, অন্যদিকে হারুনুর রশীদ ক্রোধের সময় যাঁহার মুখের বাক্য ছিল, 'নিহত কর', তাঁহার সম্মুখেও ইমাম সাহেবের মুখের রং ফ্যাকাশে হইল না, বরং হারুনকেই ইমাম সাহেবের কঠোর সিদ্ধান্তের নিকট কোমল হইতে হইয়াছিল।

মোট কথা, ইমাম সাহেব তাঁহার ছাত্রদের মধ্যে যে গুণাবলী ও উপলব্ধি সৃষ্টি করিয়া দিয়াছিলেন উহা অফুরন্ত ফুলে-ফলে সুশোভিত হইয়াছিল। কিন্তু এরূপ গুণাবলী ও উপলব্ধি সৃষ্টি করায় তিনি যে কৃতকার্য হইতে পারিয়াছিলেন উহাকে আমরা তাঁহার কারামতই বলিতে পারি।'

ইমাম সাহেবের সৃষ্ট বিপ্লবের প্রতিক্রিয়া

কাযী আফিয়া সম্বন্ধে পূর্বে বর্ণিত হইয়াছে যে, ইমাম সাহেবের ফয়সালা কৃত সমাধান আসিয়া না দেখা পর্যন্ত পাকাপাকিভাবে লেখা

হইত না। এই আফিয়া সম্বন্ধে খতীব লিখিয়াছেন, 'আব্বাসী খলীফা মেহদী আফিয়াকে কাযীর পদে নিয়োগ করেন।' কিছুদিন কাজ করার পর তিনি একদিন কাগজ-পত্র বগলদাবা করিয়া মেহদীর সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। মেহদী মনে করিলেন—কোন রাজকর্মচারী অথবা আমার কোন আত্মীয়-স্বজন হয়ত তাহাকে কোন বিষয়ে চাপা দেওয়া কাগজ-পত্র লইয়া আমার নিকট আগমন করিয়াছেন।

যাহা হউক তিনি কাযী সাহেবের আগমন-হেতু জিজ্ঞাসা করিলেন। কাযী আফিয়া বলিলেন, 'আমীরুল মুমিনিন! দুই মাস যাবত দুইজন আমীরের মামলা চলিতেছে। মামলাটিও বেশ ঘোরালো আর দুই পক্ষের সাক্ষীও এমন মযবুত যে কোন পক্ষের অনুকূলেই রায় দিতে পারিতেছি না। মনে করিয়াছিলাম উভয় পক্ষের মধ্যে মিটমাট করিয়া দিব। তাই একটু চিন্তা-ভাবনা করিবার জন্য সময় কাটাইতেছিলাম।

ইত্যবসরে এক পক্ষ কেমন করিয়া জানিয়াছে আমি তাজা খেজুর খাইতে ভালবাসি। এখন খেজুরের মওসুম না হইলেও সে কোথা হইতে তাজা খেজুর সংগ্রহ করিয়া এবং আমার দ্বার রক্ষককে ঘুষ দিয়া সেই খেজুর লইয়া আমার নিকট উপস্থিত। আমি উহা দেখিয়া সেই ব্যক্তিকে চলিয়া যাইতে বলিলাম এবং দ্বারওয়ানকেও বরখাস্ত করিলাম। ঘটনা এখানেই শেষ হইল।

কিন্তু পরদিন যখন এজলাসে উভয় পক্ষ আমার সম্মুখে হাযির হইল তখন যেন আমি কোন-মতেই দুই পক্ষকে সমানভাবে দেখিতে পারিলাম না। আমীরুল মুমিনীন! ঘুষ গ্রহণ না করিয়াই যখন মনের এই অবস্থা, ঘুষ গ্রহণ করিলে না জানি কোন অবস্থা হয়। আমার ভয় হইতেছে, না জানি এই পথে থাকিয়া আমি আমার ধর্মকে বিসর্জন দেই কি না?'

ইহাই ইমাম সাহেবের বিপ্লবের প্রতিক্রিয়া। এইরূপ অনেক ঘটনা রহিয়াছে। ইমাম সাহেবের নিকট যাহারা শিক্ষা-দীক্ষা লাভ করিয়াছেন এবং তাঁহাদের সাহায্যে যাঁহারা মানুষ হইয়াছেন—শতাব্দীর পর শতাব্দী তাঁহাদের লইয়া এইরূপ ঘটনায় কিতাব পরিপূর্ণ।

এই সময় তো ইমাম সাহেবের কার্যনীতির উপর আলোচনা হইতেছিল—যাহা হুকুমতের নিয়োজিত কাযীদের ফয়সালা সম্বন্ধে তিনি নির্ধারিত করিয়া বলিয়াছিলেন। পরিষ্কার কথা এই প্রকার ফয়সালা এমনিই লোকের মধ্যে প্রচার হইয়া যাইত এবং লোকের পক্ষ হইতেও সমালোচনা করা হইত। আর ইমাম সাহেবও উহা লোকের

নিকট প্রচার করিতেন। উহার ফলাফল যদি ইহাই হয় যাহা ইমাম সাহেবের জীবন-চরিত রচয়িতাগণ ইয়াহইয়া ইবন আদম হইতে উদ্ধৃত করিয়াছেন।

কুফা ফিকায় পরিপূর্ণ ছিল এবং বহু ফিকাহবিদ এখানে বসবাস করিতেন। যেমন ইবন শাবরামাহ, ইবন আবী লায়লা, শরীক হাসান ইবন সাবাহ এবং তাঁহাদের ন্যায় আরও অনেকে। কিন্তু ইমাম সাহেবের সম্মুখে সকলের বাজারই ঠান্ডা হইয়া গিয়াছিল। (মুফিক ২য় জিলদ)

ইমাম সাহেবের উদ্দেশ্য পরিশেষে যেভাবে দেখা দিয়াছিল তৎসম্বন্ধে হাম্মাদ ইবন সালমা বলেন, 'যদিও ইবন আবী লায়লা. শাবরামাহ শরীক এবং সুফইয়ান ছাওরী ইমাম সাহেবের বিরোধিতা করিতেন, কিন্তু পরিশেষে ইমাম সাহেবই জয় লাভ করেন। আমীর ওমরাগণ তাহার মুখাপেক্ষী হন এবং খলীফাদের দরবারে তাহার প্রশংসা করা হইতে থাকে।' ইহা দেখার এবং চিন্তার বিষয় যে, আমীর-ওমরাদের সংশ্রব ত্যাগ করা, রাষ্ট্রের কোন প্রকার সহানুভূতি গ্রহণ না করিয়া জীবন যাপন করা, মাথার উপর রক্ত প্রবাহিত হইতে দেখার পরও—নিজের সিদ্ধান্তে আজীবন স্থির থাকায় ইসলামের মহান ব্যক্তিগণ তাঁহার সাথী ছিলেন। ইতিহাসের পাতায় স্বর্ণাক্ষরে তাঁহাদের নাম লিখিত রহিয়াছে।

কিন্তু আমীর-ওমরাদের সংশ্রব হইতে দূরে থাকিয়া তাঁহাদের নিজের মুখাপেক্ষী করা, নিজের মজলিসকে আমীর ও খলীফা সম্বন্ধীয় আলাপ-আলোচনা করা হইতে পবিত্র রাখিয়া নিজের কথা তাঁহাদের দরবারে-আলোচনা করিতে বাধ্য করা ইত্যাদিতে তিনি তাঁহার ব্যবস্থাপনা দ্বারা এমন এক অবস্থার সৃষ্টি করিয়া রাখিয়াছিলেন যে ইয়াহইয়া ইবন আদমের কথায় বলিতে হয়, 'খলীফা, আমীর-ওমরা এবং বিচারকগণ ইমাম সাহেবের প্রণীত আইন-কানুনের সাহায্যে মীমাংসা করিতে লাগিলেন এবং উহাকেই একমাত্র আইন হিসাবে গ্রহণ করিলেন।'

ইমাম সাহেব কাযী আবু ইউসুফকে যে ওসীয়তনামা লিখিয়াছিলেন, উহাতে অন্যান্য কথার মধ্যে ইহাও লিখিত ছিল যে, 'হুকুমত যদি কখনও তোমাকে কোন খিদমত করার দায়িত্ব দেয় তবে যতক্ষণ পর্যন্ত তুমি স্থির সিদ্ধান্তে না পৌঁছ যে তোমার জ্ঞানলব্ধ ইজতিহাদ এবং তোমার মীমাংসার এতটা ভরসা না কর যে, তোমার বলার পর আর কাহারও নিকট জিজ্ঞাসা করার প্রয়োজন হইবে না, ততক্ষণ পর্যন্ত তুমি তাহা গ্রহণ করিবে না।'

প্রকৃতপক্ষে ইমাম সাহেব এমন অবস্থার সৃষ্টি করিয়া রাখিয়াছিলেন যে, নিজের মতামতের অনুসারী করিয়া নয় বরং আলিম ও ধর্মের প্রতি অনুগত করিয়া হুকুমতকে তাহাদের সাহায্য গ্রহণ করিতে অন্ততঃ-পক্ষে বিচার বিভাগীয় সাহায্য লইতে, বাধ্য করিয়াছিলেন। উসমান ইবন 'আফ্ফান, যিনি হাদীস রওয়ায়েতকারীও ছিলেন, তিনি তাঁহার পিতার প্রত্যক্ষ দর্শন সম্বন্ধে বলেন,—"ইরাকবাসিগণ মামলা সম্পর্কে একে অন্যের সাথে তর্ক-বিতর্ক এবং বাগ-বিতন্ডা করিত কিন্তু যেখানে ইমাম আবু হানিফার রায় বলিয়া প্রকাশ করা হইত সেখানে আর অন্য কাহারও মতামত গ্রহণ করা হইত না। লোক ইমাম সাহেবের মতের বিরুদ্ধে কথা বলিতে ভয় পাইত। ইমাম সাহেবের ফয়সালা ব্যতীত আর কাহারও ফয়সালা গ্রহণ করিতে তাহারা মোটেই প্রস্তুত ছিল না।" (মুনাফিক ১৬৭ পৃঃ, ২য় জিল্দ)

আর প্রকৃত অবস্থাও এই যে, জনসাধারণ তো জনসাধারণ যাহার সমালোচনায় চাঁদমারীতে সরকারী কাযীদের ফয়সালা নিরাপদ ছিল না, বরং কাযী ইবন লায়লার কথা মুতাবিক "আকাশ মাথায় ভাঙিয়া পড়িতেছে" এবং যেরূপ জীবন্ত সমালোচনা হইত; উহা অসত্য প্রমাণ করার মত ক্ষমতা কাহারও ছিল না; ইমাম সাহেবের ছাত্র দাউদ তাঈ ইমাম সাহেব ও তাঁহার চেষ্টার বিবৃতি প্রসঙ্গে বলিয়াছেন,—"যদিও ইবন আবী লায়লা, ইবন শাবরামাহ, শরীফ ইত্যাদি কিছু সংখ্যক লোক ইমাম সাহেবের ক্ষতি সাধনে কিছু ব্রতী ছিলেন, তথাপি দিনের পর দিন ইমাম সাহেবের মর্যাদা উন্নত হইতে উন্নততর হইতে লাগিল। ছাত্রের সংখ্যা এত বাড়িতে লাগিল যে, কুফায় জামে মসজিদে তাহার জ্ঞানচর্চা-সভাই সবচেয়ে বড় হইয়া দাঁড়াইল। অবশেষে লোকের দৃষ্টি ইমাম সাহেবের উপর পতিত হইল। বড় বড় আমীর এবং রাজনীতি-বিদগণ তাঁহাকে সম্মান প্রদর্শন করিতে লাগিলেন। জটিল মীমাংসা সমাধানে ইমাম সাহেব অগ্রণী থাকিতেন। লোকে তাহার প্রশংসা করিতে লাগিল। ইমাম সাহেব এমন কাজ মুসলমানদের সম্মুখে পেশ করিলেন যাহা অন্যের দ্বারা সম্ভব হইত না। তাঁহার জ্ঞানের গভীরতাই তাঁহাকে এমনভাবে সাহায্য করার শক্তি যোগাইয়াছিল।

কিন্তু আমার মতে তাঁহার 'ইলম, বুদ্ধিমত্তা এবং ভাগ্য ছাড়াও এমন একটি গোপন বিষয় ছিল যাহা তাঁহাকে এত বড় সম্মানের অধিকারী করিয়াছিল সেই সম্বন্ধেই এখন কিছু আলোকপাত করিব। সে সময়কার আমীর-উমরাহদের তাঁহার ব্যক্তিত্ব এবং জ্ঞানলব্ধ কার্যাবলীর দিকে ঝুঁকিয়া পড়িতে আল্লাহ তাঁহাকে যে অপরিসীম

কৃতকার্য করিয়াছিলেন যাহা পূর্ব অধ্যায় সমূহে বিবৃত হইয়াছে। তিনি তাঁহার ছাত্রদের বলিতেন,—রাষ্ট্রের কোন চাকুরী তোমরা ঐ সময় পর্যন্ত গ্রহণ করিও না যতক্ষণ পর্যন্ত তোমাদের এই ধারণা না হয় যে উহা অন্যে গ্রহণ করিলে ক্ষতিগ্রস্ত হইবে।

আপনারা বিভিন্ন ক্ষেত্রে দেখিয়াছেন ইমাম সাহেবের সময় এই অবস্থাই দাঁড়াইয়াছিল। এখন প্রশ্ন হইল, এই অবস্থা দেখিয়াও কেন ইমাম সাহেব কোন সরকারী চাকুরী গ্রহণ করিলেন না। অথচ হুকুমত তাঁহার সম্মুখে সব কিছুই পেশ করিয়াছিলেন যাহা তিনি চাহিতেছিলেন এবং ভবিষ্যতে যাহা চাহিতে পারেন। তথাপি তিনি অস্বীকার করিলেন এবং সেই অস্বীকারের উপরই জীবনপাত করিলেন। আমার বিষয়বস্তুর প্রথম প্রশ্ন ইহাই ছিল। এখন সেই প্রশ্ন সম্বন্ধে চিন্তা করার সময় আসিয়াছে। কিন্তু সেই প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার পূর্বে ইমাম সাহেবের সাথে আব্বাসী হুকুমতের যে সম্পর্ক ছিল সে সম্পর্কে আলোকপাত করা যথাযথ হইবে।

পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, ইমাম সাহেব এমন এক অবস্থার সৃষ্টি করিয়াছিলেন যাহাতে ইমাম সাহেবের সাহায্য গ্রহণ করিতে এবং রাষ্ট্রীয় কার্যে তাহাকে অংশীদার করিতে হুকুমত বাধ্য হইয়াছিল। দ্বিতীয়ত ইমাম সাহেব নিজেও বলিয়াছেন, "জাফর মুনসুর খেলাফতের প্রথম দিকে, তিনি যখন মদীনা ছিলেন তখন, একদিন ইমাম মালিক, আবু জেব এবং আমাকে দরবারে ডাকিয়া পাঠান।" আমরা সকলে উপস্থিত হইলে মনসুর বলিলেন,—

"আল্লাহ তা'আয়ালা এই সময় আমাদের যে ইসলামী রাষ্ট্রের কর্ণধার করিয়াছেন—আপনারা কি মনে করেন যে, আমরা উহার যথার্থ হকদার ?"

সকলেই নিজস্ব মতামত ব্যক্ত করার পর ইমাম সাহেব যাহা কিছু বলিয়াছিলেন, "ইহার মধ্যে একথাই ছিল যে,—স্বীয় ধর্মের মঙ্গলকামী কাযীর উচিত নিজেও ক্রোধ হইতে পবিত্র থাকা। যদি তাহাই চাহেন তবে আপনি অবশ্য একথা জানেন যে, এখন আপনি আমাদের আল্লাহর জন্য সমবেত করেন নাই।"

অতঃপর বলিলেন,—

"আসলে আপনি জনসাধারণকে একথা বিশ্বাস করাইতে চাহেন যে, আমরাও আপনাদের সম্বন্ধে ঐ ধারণা পোষণ করি যাহা আপনারা নিজেদের সম্বন্ধে পোষণ করিয়া থাকেন।"

ইমাম সাহেবের কথার অর্থ এই ছিল যে, "আপনারা যেমন আপনাদের মুসলমানদের শাসক বলিয়া বিবেচনা করেন, তেমনি দুনিয়াবাসীকেও একথা জানাইতে চাহেন যে আমরাও আপন্যদের তাহাই মনে করি। সুতরাং অন্যান্য সকলেই আপনাদের সমর্থন করিবে।"

কিন্তু ইহার পূর্ব হইতেই আব্বাসী হুকুমতের সঙ্গে ইমাম সাহেবের সম্পর্ক গড়িয়া উঠিয়াছিল। ইহাতে শুধু ইমাম সাহেবের ব্যক্তিত্বই ছিল না বরং যে ব্যক্তির মধ্যে জনসাধারণকে প্রভাবান্বিত করার শক্তি থাকে, তাহাকে হাত করার জন্য পূর্ব হইতেই চেষ্টা করা হইয়া থাকে। এই গ্রন্থেরই কোন এক অধ্যায়ে বলা হইয়াছে আবুল আব্বাস কুফায় সমস্ত আলিমদের ডাকিয়া তাহাদের উপর দান বর্ষণের কথা দিয়াছিলেন। পরবর্তী খলীফা মনসুর উহার চেয়ে আর এক ধাপ বেশী অগ্রসর হইয়াছিলেন। ইহার অন্য একটি কারণ ইহাও হইতে পারে যে, সেই যুগে বিদ্যা-বুদ্ধিতে মনসুর নিজেও পারদর্শী ছিলেন। তাই জ্ঞানের সম্মান প্রদর্শন করার মানসেই হয়ত তিনি এক ধাপ উপরে উঠিয়াছিলেন।

ইমাম সাহেবের সাথে অন্য কোন ব্যাপারও ছিল। অর্থাৎ ক্রম-বর্ধমান আব্বাসী হুকুমতের সঙ্গে তাহার যে সম্পর্ক ছিল উহা কোন গোপন বিষয় ছিল না। হযরত যায়েদকে যে তিনি সাহায্য করিয়াছিলেন এবং তাহার প্রতি যে সহানুভূতিশীল ছিলেন। ইহা আব্বাসীয়দের নিকট গোপন ছিল না। তাহাড়া ইবরাহীম সাহেবের ঘটনা তো এই হুকুমতের সাথেই সংশ্লিষ্ট। আমি পূর্বেই বলিয়াছি ইবরাহীম সায়েগ ও ইমাম সাহেবের সংগে সম্পর্ক রাষ্ট্রের গোয়েন্দা বিভাগের নিকট কখনও গোপন করিতে পারে না। ইমাম সাহেবের পক্ষ হইতে যখন এমন সব ভয়ানক কাজ হইতেছিল তখন নিশ্চয়ই হুকুমত তাহাকে হাত করার চেষ্টা করিতে কোন প্রকারেই অবহেলা করে নাই।

কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করার পূর্বে যে কোমল ব্যবহার করিতে হয় আব্বাসী হুকুমতও সেই ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়াছিল। মনসুরও সেই পথ অবলম্বন করিয়াছিলেন। ইমাম সাহেব হইতে নিরাশ হইয়াই তাহার প্রতি কঠোরতা অবলম্বন করা হইয়াছিল। নিরাশ হওয়ার পর হুকুমত যাহা কিছু করিতে পারে ইমাম সাহেবকেও সেই অভিজ্ঞতা অর্জন করিতে হইয়াছিল।

পঞ্চদশ অধ্যায়

আব্বাসী হুকুমতের সঙ্গে ইমামের সম্পর্কের সূত্রপাত

'আব্বাসী হুকুমতের প্রথম খলীফা আবুল আব্বাসের পাঁচ বৎসর কাল শাসনের মধ্যে একটি ঘটনা ছাড়া অর্থাৎ আলিমদের পক্ষ হইতে আবুল আব্বাসের ভাষণের উত্তর দেওয়া ব্যতীত আর কোন ঘটনা ঘটিয়াছে বলিয়া দেখা যায় না। পরে আবু জাফর মনসুর সিংহাসনে আরোহণ করার পরও ইমাম সাহেব একেবারেই নীরব ছিলেন। মনসুর খলীফা হওয়ার পর তের-চৌদ্দ বৎসর পর্যন্ত ইমাম সাহেব আইন প্রণয়ন কাজে নীরব সাধনায় ব্রতী ছিলেন।

আবু জাফর মনসুর

এখন প্রশ্ন হইল আবু জাফর মনসুর এবং ইমাম সাহেবের মধ্যে কখন এবং কিভাবে সম্পর্ক স্থাপিত হইল। এই সম্বন্ধে বিভিন্ন ঐতিহাসিক মত একাশ করিয়াছে। তবে ঘটনা পর্যালোচনা করিলে যাহা পাওয়া যায় তাহাতে আমাদের মনে হয়, মনসুর যখন মদীনাতুস সালাম (বাগদাদ) নির্মাণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন এবং তজ্জন্য দেশের জ্ঞানী ও গুণীজনকে সমবেত করেন তখনই সর্বপ্রথম ইমাম সাহেবের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপিত হয়।

এই সম্পর্কে ঐতিহাসিক তাবারী লিখিয়াছেন,—"নাফ্‌স যাকিয়া মুহাম্মাদ ইবন আবদুল্লাহ এবং ইবরাহীম ইবন আবদুল্লাহ্‌র বিদ্রোহ ঘোষণার পূর্বেই মদীনাতুসসালাম নির্মাণের আসল কাজ আরম্ভ হইয়াছিল।" তাই তাবারীর মতে দেখা যায় বাগদাদ নগরী নির্মাণের পরিকল্পনা নফস যাকিয়ার বিদ্রোহ ঘোষণার পূর্বেই আরম্ভ করা হইয়াছিল। কিন্তু কাজ আরম্ভ হওয়ার পূর্বেই বিদ্রোহ হওয়ায় তখনকার মত কাজ সেখানেই স্থগিত রাখা হইয়াছিল।

বাগদাদ প্রতিষ্ঠার কাজে ইমাম সাহেবকে আহবান

বাগদাদ নগরী প্রতিষ্ঠার জন্য স্থান নির্বাচনের পরই আবু জাফর মনসুর ইমাম সাহেবকে তাহার দরবারে সর্বপ্রথম আহবান করিয়াছিলেন বলিয়াই অনেকের ধারণা। তাবারী সুলায়মান ইবন মুজাহিদ হইতে

বর্ণনা করেন, "মদীনাতুসসালাম প্রতিষ্ঠার স্থির সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার পর—মনসুর সিরিয়া, মুসিল, জাবাল, কুফা, ওয়াসিত, বসরা ইত্যাদি শহরে আদেশ পাঠাইলেন—প্রত্যেক প্রকারের কারিগর এবং শ্রমিক একত্রিত করা হউক। আরও নির্দেশ দিলেন, গুণী-জ্ঞানী ব্যক্তিগণ, যাহাদের মধ্যে আমানত ও সততা আছে, বিশেষভাবে যাহারা ইঞ্জিনিয়ার, প্রত্যেক শহর হইতে তাহাদের বাছাই করা হউক।

মনসুরের নির্দেশ মত যে সমস্ত লোক বাছাই করা হইয়াছিল তাহাদের মধ্যে হাজ্জায ইবন আয়তাত এবং আবু হানীফা গোলাম ইবন সায়েবের নামই সবিশেষ উল্লেখযোগ্য।

হয়ত এ কাজের জন্যই মনসুর সর্বপ্রথম ইমাম সাহেবের আহবান করিয়াছিলেন। বনী উমাইয়াদের খিলাফতকালে ইবন হুবায়রার বার বার চেষ্টা সত্ত্বেও যে ইমাম সাহেব কোন পদ গ্রহণ করিতে স্বীকৃত হন নাই, একথা মনসুরের না শোনার কোন কারণ থাকিতে পারে না। তথাপি মনসুরের উদ্দেশ্য উহাই ছিল যাহা ইমাম সাহেব তাহার সম্মুখেই বলিয়াছিলেন, "এই প্রকার লোক সমবেত করা জনসাধারণের শুভেচ্ছা গ্রহণ করার ইচ্ছা ব্যতীত আর কিছুই নহে।"

বিশেষ করিয়া ইমাম সাহেব তাহার কাজ ও জ্ঞানের মাধ্যমে এমন এক পরিবেশ সৃষ্টি করিয়া রাখিয়াছিলেন যাহাতে হুকুমত তাঁহাকে আহবান করিতে বাধ্য থাকিত। তাই মনসুর তাঁহাকে প্রথমে এমন কোন কাজের দায়িত্ব চাপাইতে ইচ্ছুক ছিলেন না যাহা তিনি অস্বীকার করিয়া বসিবেন।

প্রাসাদ নির্মাণের তত্ত্বাবধায়ক

ঐতিহাসিকগণ যদিও ঘটনাসমূহ বিশৃংখলভাবে বর্ণনা করিয়াছেন তথাপি সুলায়মান ইবন মুজাহিদের মধ্যস্থতায় তাবারী লিখিয়াছেন—'বাগদাদ নগরী নির্মাণকার্যের পরামর্শ করা পর্যন্ত ইমাম সাহেব কোন প্রকার অবাধ্য হওয়া ঠিক মনে করেন নাই। সুলায়মানের বর্ণনাতে আরও বুঝা যায় যে নির্মাণকার্য শেষ না হওয়া পর্যন্ত ইমাম সাহেব সহায়তা করিয়াছিলেন। কিন্তু আমার মতে তাহা ঠিক নয়। আমার ধারণায় নফসে যাকিয়ায় বিদ্রোহের পূর্ব পর্যন্ত নির্মাণের প্রারম্ভিক কার্য পর্যন্তই তিনি উহার সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন। সুলায়মানের মতে, 'শহর নির্মাণের পরিকল্পনা, ইট প্রস্তুত, ইট গণনা, শ্রমিকদের কাজ দেখা-শুনা ইত্যাদি ইমাম সাহেবের অধীনে ছিল।"

যদি এই কথা ঠিক হয় তবে আমার মতে নফসে যাকিয়ার বিদ্রোহ ঘোষণার পূর্ব পর্যন্ত বাগদাদ নগর নির্মাণের যে কাজ হইয়াছিল সম্ভবত ঐ পর্যন্ত ইমাম সাহেব উহার যিম্মাদারী গ্রহণ করিয়াছিলেন।[১] এই সম্বন্ধে তাবারী একটি মজার কথা বলিয়াছেন—"ইট গণনা করার কাজ ইমাম সাহেবের যিম্মায় ছিল।" সামান্য সামান্য অট্টালিকা নির্মাণের জন্য যেখানে দশ বিশ লাখ ইটের প্রয়োজন হয় সেখানে বাগদাদ নগরী নির্মাণের জন্য অবশ্য কোটি কোটি ইটের প্রয়োজন হইয়াছিল। এত ইট গণনা করা সহজ সাধ্য ছিল না। পরিশেষে এই হানাফী জ্ঞান যাহা দ্বারা তিনি শরীয়তের মাসয়ালার মধ্যে নিত্য-নতুন খুটিনাটি বাহির করিতেন সেই জ্ঞান এখানেই কাজে লাগিয়াছিল। অর্থাৎ যত ইট আনা হইত উহা স্তূপাকারে রাখার পর একটি বাঁশ দ্বারা তিনি উহা মাপিয়া দিতেন।

ইমাম সাহেব কেন এই কাজ গ্রহণ করিলেন

এখানে একটি প্রশ্ন হইতে পারে যে, যে সব কারণে ইমাম সাহেব বনী উমাইয়া খিলাফতের কোন কাজ গ্রহণ করেন নাই, আব্বাসী হুকুমতেও তো উহা বিদ্যমান ছিল। ইবরাহীম সায়েগের ঘটনায় বর্ণিত হইয়াছে যে, নব প্রতিষ্ঠিত আব্বাসী হুকুমতের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা ফরয ইমাম সাহেব ফতওয়া দিয়াছিলেন। ইবরাহীমও তাহার মধ্যে মত-বিরোধ ছিল—কোন পক্ষে এই আন্দোলন শুরু করা যায়।

অবশ্য এরূপ প্রশ্ন করা যাইতে পারে। কোন কোন বর্ণনা মতে দেখা যায় আব্বাসী খলীফা মনসূরও চাহিয়াছিলেন ইমাম সাহেব তাঁহার হুকুমতের অধীনে কাযীর পদ গ্রহণ করুন। ইমাম সাহেব

১। নফসে যাকিয়ার বিদ্রোহ করার পূর্বেই বাগদাদ নগরীর প্রাচীর মানুষ সমান নির্মাণ হইয়া গিয়াছিল। বিদ্রোহের সংবাদ পাইয়া মনসূর নিজেই বিদ্রোহ দমনে রওয়ানা হইয়া যান। কাজ বন্ধ থাকে। ইট, কাঠ ইত্যাদি তাহার ক্রীতদাস আসলামের যিম্মায় রাখিয়া যান। ইত্যবসরে সংবাদ আসিল, মনসূর পরাজয়বরণ করিয়াছেন। এই সংবাদ পাইয়া আসলাম অট্টালিকা নির্মাণের সাজ-সরঞ্জামে আগুন ধরাইয়া দিল। মনসূর এই খবর জানিতে পারিয়া আসলামকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেন আগুন লাগাইলে?" আসলাম উত্তর করিল, "শত্রু যেন এসব হস্তগত করিতে না পারে তাই আগুন লাগাইয়াছিলাম।" কৃপণ মনসূর আর কি বলিবেন তিনি "মনের দুঃখ চাপিয়া রাখিলেন।"

অস্বীকার করার পরই তাহাকে ইট গণনার কাজ এবং শ্রমিকদের কাজ দেখাশুনার জন্য নিযুক্ত করেন। কথিত আছে, ইমাম সাহেব অস্বীকার করার মনসুর শপথ করিয়াছিলেন, 'অবশ্যই আমি তোমাকে দ্বারা কাজ করাইব।' কিন্তু যখন দেখিলেন কাযীর পদ গ্রহণ করিতে রাযী হইতেছেন না, তখন তাহার শপথ পূর্ণ করার জন্য তাঁহাকে ঐ কাজের দায়িত্ব দিয়াছিলেন। এই সম্বন্ধে তাবারী বলেন, 'নিজের শপথ পূর্ণ করার জন্যই মনসুর তাঁহাকে এ কাজের দায়িত্ব দিয়াছিলেন।'

কিন্তু কাযীর পদ গ্রহণ করানোর জন্যই যদি মনসুর শপথ করিয়াছিলেন তবে ইট গণনার কাজ দিয়া সেই শপথ কিভাবে পূর্ণ করিলেন? দ্বিতীয়তঃ যিনি কাযীর পদ গ্রহণ করিতে অস্বীকার করিতে পারেন তাঁহার ইট গণনার কাজ গ্রহণে অস্বীকার করিতে বাধা কোথায়?

মনে হয় প্রথমে মনসুর কাযীর পদ গ্রহণ সম্বন্ধে কোন কথাই উল্লেখ করেন নাই, যদিও ভবিষ্যতে বলার মত আশা তিনি পোষণ করিয়া আসিতেছিলেন। কিন্তু প্রথম প্রথম ইমাম সাহেবকে অন্তরঙ্গ করায় অথবা যে ব্যাপারে বনী উমাইয়াগণ অকৃতকার্য হইয়াছিলেন সে কথা উল্লেখ করেন নাই। অথবা বলিয়া থাকিলে আকারে ইঙ্গিতে বলিয়াছিলেন। কিন্তু ইমাম সাহেব বুঝিতে পারিয়া কথার মোড় অন্য দিকে ঘুরাইয়া দিয়াছিলেন।

মনে হয় মনসুর ইমাম সাহেবকে বলিয়াছিলেন, 'এই স্থানে এই প্রথম মুসলমানদের রাজধানী নতুন নির্মাণ হইতেছে; এইজন্য প্রত্যেক

যেখানে বাগদাদ নগরীর পত্তন হইয়াছিল সেখানে একটি গীর্জায় কয়েকজন পাদ্রী ছিলেন। মনসুর একদিন তাহাদের গীর্জায় গিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "এখানে শহর নির্মাণ করিলে কেমন হয়?" পাদ্রী বলিলেন, "আমাদের ধর্ম গ্রন্থ মতে এখানে আবু দাওয়ানিক নামক কোন ব্যক্তি শহর নির্মাণ করিবেন।" দাওয়ানিক দানীক শব্দের বহু বচন; অর্থ পয়সা। আরবী ভাষায় কৃপণ ব্যক্তিকে আবু দাওয়ানিক বলা হয়। মনসুর পাদ্রীর কথা শুনিয়া হাসিয়া বলিলেন, "ইহাতো আমারই নাম।"

তিনি প্রত্যেক কর্মচারীর নিকট হইতে একটি পাই পয়সার হিসাব পর্যন্ত গ্রহণ করিতেন। কথিত আছে, কোন এক কর্মচারী কয়েক আনা পয়সার হিসাব দিতে না পারায় তাহাকে বন্দী করা হইয়াছিল।

বিষয়ের বিশেষজ্ঞদের আহবান করিয়াছি, আপনিও আসুন এবং আমার একাজে সাহায্য করুন।' আব্বাসীদের সম্বন্ধে ইমাম সাহেব যে ধারণা পোষণ করিতেন সে মতে এরূপ সাহায্য করাও তিনি অস্বীকার করিতেন। কিন্তু রাজধানী নির্মাণকাজে সাহায্য চাওয়ায় ইমাম সাহেব অস্বীকার করিয়াছেন বলিয়া কোথাও পাওয়া যায় না। সমস্ত ঐতিহাসিকগণ শুধু একথাই লিখিয়াছেন যে কাযীর পদ গ্রহণ করার জন্য যখনই তাহাকে বলা হইয়াছে তখনই তিনি অস্বীকার করিয়াছেন।

আল্লাহই ভাল জানেন যে, বাগদাদ নগরী নির্মাণকাজে সাহায্য করার পিছনে কোন রহস্য লুক্কায়িত ছিল। সৎ নিয়তে হইলে বলা যাইতে পারে যে বাগদাদের ভবিষ্যৎ ইতিহাস তাহার সম্মুখে ছিল। এই বাগদাদ হইতেই কোন কোন ওলী, কুতুব, আলিম, ফকীহ, মুহাদ্দিস ও মুফাস্সিরীন ইসলামী জগত পাইয়াছে। মনে হয় বাগদাদ নির্মাণ ছিল এই সমস্ত ফযীলতের ভিত্তি স্থাপন করা। তাই এমন নেক কাজে তিনি কিভাবে অংশগ্রহণ না করিয়া পারেন। কারণ প্রকাশ্যে তো মনসুরের হাতেই এই নির্মাণকার্য আরম্ভ হইয়াছিল। কিন্তু এই বাগদাদ শুধু মনসুর বা মনসুরের পরিবার-বর্গেরই ছিল না। এই বাগদাদ তো ছিল হযরত মাখরুফ কারনী, সবরী সাকতী, জুনায়দ বাগদাদী, শিবলী, গাওছে পাক সায়িজ্জদ আবদুল কাদির জিলানী, শিহাবউদ্দীন সুহরাওয়ার্দীর ন্যায় মহান আল্লাহ্‌র ওলীদের। ইহা ইমাম আহমদ ইবন হাসান এবং ইমাম আবু হানীফা (রাঃ)-এর চির শয্যার স্থান ছিল। সুতরাং আবু হানীফা (রাঃ)-এর ন্যায় একজন মহান ব্যক্তির তত্ত্বাবধানেই বাগদাদের নির্মাণকার্য আরম্ভ হওয়া যুক্তিগত ছিল।

অবশ্য এই যুক্তি সকলেই মানিয়া লইবে একথাও বলা যায় না। অবশ্য রাষ্ট্রের নিয়োজিত কাযীদের সঙ্গে ইমাম সাহেব তাঁহার স্বভাব-বিরুদ্ধ যে নীতি প্রচলন করিয়া রাখিয়াছিলেন যদি উহাকে সম্মুখে রাখিয়া চিন্তা করা যায় তবে হইতে পারে যে, সেই উদ্দেশ্যেই তাঁহাকে একাজের দায়িত্ব গ্রহণ করিতে প্রণোদিত করিয়াছিল।

মুসলমানদের জন্য বিশুদ্ধ ইসলামী নীতি হইতে উপকৃত হওয়ার জন্য তিনি যে সুযোগ-সুবিধার ব্যবস্থা করিয়া রাখিতে চাহিয়াছিলেন সরকারী কাযীদের মীমাংসায় তিনি দোষ-ত্রুটি বাহির করার জন্য যে ব্যবস্থাপনা করিয়াছিলেন, বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হইয়াছে যে

উহাতে তাহার আত্মদর্শন বা আত্মপ্রসাদ লাভ করার সান্ত্বনা ছিল না বরং তাহার প্রণীত আইন-কানুনের দিকে হুকুমতের দৃষ্টি আকর্ষণ করাই একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল। সুতরাং একথা কেন বলা যাইবে না, বাগদাদ নির্মাণের সহায়তার পিছনেও তেমনি কোন উদ্দেশ্য নিহিত ছিল।

ইমাম ও মনসুরের সাক্ষাতের পূর্ণ বিবরণ

খাওরিজমী তাঁহার উস্তাদ ইবন জাওনবী হইতে বর্ণনা করেন, কুফার শাসনকর্তা ঈসা ইবন মুসা খলীফা মনসুরের নির্দেশ মুতাবিক ইমাম সাহেবকে দরবারে খিলাফতে হাযির করিয়া বলিয়াছিলেন, "আমীরুল মুমিনীন! ইনি বর্তমান দুনিয়ার সর্বশ্রেষ্ঠ আলিম।"

অবস্থা অনুপাতে বুঝা যায়, বাগদাদ নগর নির্মাণের পরামর্শ করার জন্য যখন তাহার শাসিত এলাকার আলিমদের তাইগ্রীস নদীর তীরে আহবান করিয়াছিলেন, ইহা তখনকার কথা। ইহাই ছিল ইমাম সাহেবের মনসুরের সঙ্গে প্রথম সাক্ষাত অথবা ব্যক্তিগতভাবে প্রথম পরিচয়। কুফার শাসনকর্তা ঈসা ইবন মুসা ইমাম সাহেবের ইলম ও বুদ্ধিমত্তার পরিচয় ভালভাবেই জানিতেন তাই তিনি ইমাম সাহেবের পরিচয় মনসুরকে ঐভাবে দিয়াছিলেন। শাসনকর্তার এই কথা শুনিয়া মনসুর ইমাম সাহেবের দিকে তাকাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "নুমান! তুমি কাহার নিকট জ্ঞানার্জন করিয়াছ?"

ইমাম সাহেব ইহার সোজা উত্তরে 'হাম্মাদ ইবন সুলায়মানের নাম করিতে পারিতেন। কিন্তু তিনি এই সোজা উত্তর না দিয়া তাঁহার আইন-প্রণয়ন সমিতি সম্বন্ধে খলীফাকে অবগত করাইতে লাগিলেন। তিনি বলিলেন, হুযুর (সাঃ)-এর চারিজন সম্মানিত সাহাবা অর্থাৎ হযরত ওমর, হযরত আলী, হযরত আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ এবং হযরত আবদুল্লাহ ইবন আব্বাসের নিকট হইতে জ্ঞানার্জন করিয়াছি। (প্রকৃতপক্ষে এই চারিজন সাহাবা পর্যন্তই ফিকাহ্‌র বুনিয়াদ শেষ হইয়া যায়)

ইমাম সাহেব তাঁহার সম্পাদিত আইন-কানুনের কথা প্রকাশ করিয়া ইহাই বুঝাইতে চাহিয়াছিলেন যে, তাঁহার মজলিসে প্রণীত আইনের গুরুত্ব কত বড়। যেহেতু মনসুর স্বয়ং ইসলামী শিক্ষায় শিক্ষিত ছিলেন, ইসলামী শরীয়তের বুনিয়াদ সম্পর্কেও অবগত ছিলেন, তাই একথা শুনিয়াই তিনি বলিলেন: 'তুমি তো বেশ মযবুত পথ

অবলম্বন করিয়াছ। অন্য বর্ণনা মতে বলিয়াছিলেন, 'নিঃসন্দেহে উহাই একমাত্র ইলম।"

মোট কথা ইমাম সাহেবের মতে, ইসলামী আইন-কানুনের বিশুদ্ধ আকৃতি ছিল উহার সম্পাদন করার পর মুসলমানদের আইনানুগ জীবন যাপনের জন্য হুকুমত যেন উহা গ্রহণ করে। আর ইহাই ছিল তাহার একমাত্র চেষ্টা। এই জন্যই তিনি সরকারী কাযীদের মীমাংসায় দোষ-ত্রুটির বিরামহীন সমালোচনা করিতেন। তাই তিনি আজ হুকুমতের কর্ণধারের সম্মুখে প্রণীত আইন-কানুনের গুরুত্ব ও বুনিয়াদ সম্পর্কে প্রকাশ করিতেছিলেন। মূলত উদ্দেশ্য ছিল তাহাই।

সুতরাং বাগদাদ নির্মাণকার্যে তিনি যে অংশগ্রহণ করিয়াছিলেন উহার সমস্তটা উদ্দেশ্যই খলীফার উপর এইরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করা যে তিনি যে আইন-প্রণয়ন করিয়াছিলেন উহাতে শুধু ধর্মীয় সাহায্যই গ্রহণ করা হয় নাই বরং যে কারবারী অভিজ্ঞতা ইমাম সাহেব অর্জন করিয়াছিলেন উহাও ইহাতে শামিল ছিল। একথাও বলা যাইতে পারে যে, আলিমদের সম্পর্কে সাধারণ লোকের ধারণা তাহারা পার্থিব কাজে—অনভিজ্ঞ, পার্থিব কাজে তাহাদের পরামর্শ গ্রহণযোগ্য নয়, লোকের এই ভুল ধারণা মিথ্যা প্রতিপন্ন করার জন্যই হয়ত তিনি একাজে অংশগ্রহণ করিয়াছিলেন। ইমাম সাহেব তাহার কার্য দ্বারা মনসুরকে দেখাইয়াছিলেন—শুধু বড় বড় কাজই নয় বরং অতি সামান্য ইট গণনার কাজেও তিনি ইজতিহাদী অভিজ্ঞতা দেখাইতে পারেন।

নির্মাণ কাজের তত্ত্বাবধায়ন

এই সময় মনসুর ইমাম সাহেবকে যে কাজের দায়িত্ব অর্পণ করিয়াছিলেন তাবারী সেই সম্বন্ধে বলিয়াছেন, 'শহর নির্মাণের কাজ দেখাশুনা, ইট প্রস্তুতের কাজ দেখাশুনা, ইট গণনা করা এবং শ্রমিকদের কার্য পর্যবেক্ষণ করা। এই কাজ সুচারুরূপে সম্পাদন করিবার জন্য কত বড় বিবেক বুদ্ধি এবং জাগ্রত দৃষ্টির প্রয়োজন উহা শুধু সেই যুগেই নয় এই সময়ও ইমাম সাহেবের কার্যক্ষেত্রে অংশগ্রহণ হানাফী ফিকাহ শাস্ত্রের কার্যকর প্রমাণ হইতে পারে। যাহারা ইলমে দ্বীনকে পেশায় শরিণত করার পর বলিয়া ফিরিত, দুনিয়ার সাথে এবং উহার কার্যের সাথে আমাদের কোন সম্পর্ক নাই—ইমাম সাহেবের এই কার্যক্রম তাহাদের উপদেশ ও নসীহত হইতে পারে।

প্রকৃতপক্ষে অন্য কোন দ্বীনি 'ইলমের সাথে হউক কিংবা না হউক ফিকাহ এমনই এক ধর্মশাস্ত্র যে, যতক্ষণ পার্থিব কাজ কর্মের অভিজ্ঞতা অর্জিত না হয় ততক্ষণ পর্যন্ত কেহ ফিকাহ শাস্ত্রে পারদর্শী হইতে পারে না।

শাহী তাঁবুতে ইমাম সাহেব

বাগদাদ শহর নির্মাণ করার সময় তাইগ্রীস নদীর তীরে শাহী তাঁবু তৈয়ার করা হইয়াছিল। নফসে যাকিয়ার বিদ্রোহ ঘোষণার পূর্ব পর্যন্ত অধিকাংশ সময়ই মনসুর সেই তাঁবুতেই থাকিতেন। তিনি তাঁহার প্রিয় শহর নির্মাণ কল্পে ভিভিন্ন স্থান হইতে যে সমস্ত পারদর্শী ও সাহায্যকারী আনিয়াছিলেন তাহারাও খলীফার সাথে সেখানে থাকিতেন। তাহার সাথে ইমাম আবু হানীফাও (রাঃ) ছিলেন। মনে হয় এই শাহী তাঁবুতে ইমাম সাহেব দুই-চারি সপ্তাহই নয় বরং কয়েকমাস পর্যন্ত এখানে ছিলেন। তাই এই সুযোগে তিনি তাঁহার লক্ষ্যস্থলে পেঁাছার জন্যও চেষ্টা করিয়াছিলেন। যেমন বলা হইয়াছে যে, নির্মাণ কাজের দেখাশুনা এবং ইট গণনার কাজও তিনি এই উদ্দেশ্যে গ্রহণ করিয়াছিলেন। এই উদ্দেশ্য হাসিল করার জন্য তিনি তাঁহার স্বভাব-বিরুদ্ধভাবে খলীফার নিকট নিজের অভিজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছিলেন। এই প্রকার অভিজ্ঞতা প্রকাশের একটি উদাহরণ খাওয়ারিযমী হইতে উদ্ধৃত করা হইয়াছে।

অন্য আর একটি ঘটনা কাযী আবু ইউসুফ বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি বলেন, "যখন আমি রাষ্ট্রের সর্বপ্রধান কাযীর পদে অধিষ্ঠিত ছিলাম তখন খলীফার প্রাসাদের নিকটই থাকিতাম। একদিন দেখিলাম এক ব্যক্তি আমাদের সম্মুখ দিয়া যাইতেছে। লোকে বলাবলি করিতে লাগিল—'এই ব্যক্তি হিসাবে-কিতাবে খুব অভিজ্ঞ। উপস্থিত সকলে তাঁহার অভিজ্ঞতার জন্য সম্মান প্রদর্শন করিতেছেন।'

কাযী আবু ইউসুফ বলেন—"আমি কিছুদিন যাবত একটি হিসাব সংক্রান্ত মাসআলা লইয়া সমস্যায় ছিলাম। আমি ঐ ব্যক্তির হিসাবের অভিজ্ঞতার কথা শুনিয়া একদিন তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলাম। তিনি আমাকে কয়েকটি নিয়ম দেখাইয়া বলিলেন, 'এই নিয়মে করিলেই হইয়া যাইবে।' কিন্তু হইল না। অবশেষে তিনি বলিলেন, 'ইমাম আবু হানীফা যে একটি নিয়মের কথা বলিয়াছেন উহাই এখন বাকী রহিয়াছে। তিনি আমাকে সেই নিয়ম বলিয়া দিলেন, "আমার হিসাব সেই নিয়ম মত মিলিয়া গেল।"

আমার মনে হয় শাহী তাঁবুতে থাকাকালীন ইমাম সাহেব রাজ দরবারের এই হিসাবরক্ষককে এই রহস্য বলিয়া দিয়াছিলেন। সম্ভবত খলীফা এবং খলীফার পার্শ্বচরদের উপর ইমাম সাহেব এই প্রভাবই সৃষ্টি করিতে চাহিয়াছিলেন যে, আইন-প্রণয়ন শুধু ধর্মীয়ই নয় বরং যে সাধারণ জ্ঞান ও মেধার প্রয়োজন হয় উহাও তাঁহার আছে। উদ্দেশ্য, হুকুমত যেন তাঁহার প্রণীত আইনের উপর আস্থা স্থাপন করে।

তাঁবুতে সামান্য পরিসীমার মধ্যে খলীফার সাথে প্রায়ই তাঁহার দেখা-সাক্ষাৎ হওয়ার সুযোগ ঘটিত। এই সাক্ষাতের ফলে ইমাম সাহেব তাঁহার খোদাপ্রদত্ত জ্ঞান, তাঁহার কার্যাবলী এবং গুণাবলী দ্বারা খলীফার মন জয় করার অবারিত সুযোগ ঘটিয়াছিল। মনে হয় খলীফা অবসর সময়ে অন্যান্যদের সাথে ইমাম সাহেবকেও আহ্বান করিতেন। ইমাম তখন মনের কথা খুলিয়া বলিতেন। সময় সময় এমন সব কথাও বলিতেন যাহাতে তাঁহার উপস্থিত বুদ্ধির পরিচয় পাওয়া যাইত।

একটি কৌতুকপ্রদ ঘটনা

একবার কাযী ইবন আবী লায়লা মনসুরের দরবারে উপস্থিত হন অথবা দরবারে হাযির হওয়ার জন্য তাহাকে আহ্বান করা হইয়াছিল। তখন একটি কথা উঠে যে, যদি কোন সওদাগর তাঁহার পণ্য-দ্রব্যের বিষয়ে ক্রেতার নিকট বলে যে "আপনি যাহা ক্রয় করিতেছেন উহার কোন দোষ-ত্রুটি থাকিলে আমি তজ্জন্য দায়ী নই। ইহার পরও যদি আপনি ক্রয় করিতে চাহেন তবে আপনি ক্রয় করিতে পারেন।" ক্রেতা উক্ত বস্তু ক্রয় করার পর ত্রুটি ধরা পড়িল। তখন ক্রেতা উক্ত বস্তু ফেরত দিতে পারিবে কি না? ইমাম সাহেব বলিলেন—'সওদাগর তাহার কথা মুতাবিক কোন প্রকার যিম্মাদার নহেন।" কিন্তু কাযী ইবন আবী লায়লা বলিলেন, "যে বস্তুতে দোষ থাকে উহার উপর হাত রাখিয়া যতক্ষণ পর্যন্ত সওদাগর নির্দিষ্ট করিয়া না দিবে ততক্ষণ পর্যন্ত শুধু কথায় যিম্মাদারী হইতে মুক্তি পাইবে না।" উভয়ের মধ্যে তর্ক-বিতর্ক হইতে লাগিল। মনসুর খুব মনোযোগের সাথে শুনিতেছিলেন।

এমন সময় ইমাম সাহেব জিজ্ঞাসা করিলেন, "মনে করুন, একজন ভদ্র মহিলার একজন দাস আছে—তিনি তাঁহাকে বিক্রি করিতে চাহেন।

কিন্তু দাসের বিশেষ অঙ্গে কুষ্ঠের দাগ আছে। বলুন এখন কি সেই বিশেষ অঙ্গের উপর হাত রাখিয়া দাসের ত্রুটির কথা বলিবে ?"

ইবনে আবী লায়লা—"হাঁ, তাহাকে সেই বিশেষ অঙ্গের উপর হাত রাখিয়াই বলিতে হইবে।"

চিন্তা করুন, উপস্থিত দরবারিগণের এই ফতওয়া শুনিয়া কি অবস্থা হইয়াছিল। বর্ণিত আছে যে, ইবনে আবী লায়লার ফতওয়া শুনিয়া খলীফা মনসুর খুবই ক্রোধান্বিত হইয়াছিলেন।

হযরত ইমাম জা'ফর সাদিকের খিদমতে ইমাম সাহেবের প্রশ্ন

এই সমস্ত কাজেও মনসুরের সাহচর্যে ইমাম সাহেব নির্ভীক হইয়া উঠিলেন। এই পরম্পরায় মনসুরের কথামত ইমাম সাহেব এমন কিছু কাজও করিয়াছিলেন যে, যদি উহাতে তাহার কোন উদ্দেশ্য না থাকিত তবে কস্মিনকালেও তিনি উহা করিতেন না। যেমন—মনসুরের সাথে সাক্ষাৎ করার জন্য একবার ইমাম জা'ফর সাদিক (রঃ) তশরীফ আনিতেছিলেন। ইমাম ইবন যিয়াদ বলেন—মনসুর ইমাম সাহেবকে আহ্বান করিয়া বলিলেন, "লোকে ইমাম জাফর সাদিকের জ্ঞানের খুব প্রশংসা করে এবং তজ্জন্য তাঁহাকে খুব সম্মান করে। আপনি এমন কয়েকটি প্রশ্ন তৈয়ার করিতে পারেন কি যাহার উত্তর দেওয়া তাঁহার পক্ষে অসম্ভব হইয়া দাঁড়ায়।"

ইমাম সাহেব নবী পরিবারের খুবই ভক্ত ছিলেন। ইমাম জাফর সাদিক সম্বন্ধে তাঁহার ধারণা সম্পর্কে বর্ণিত আছে যে, একবার লোক ইমাম সাহেবকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি যে সমস্ত আলিমদের জানেন তাঁহাদের মধ্যে আপনার মতে শ্রেষ্ঠ ফিকাহবিদ কে ?" উত্তরে ইমাম সাহেব বলিয়াছিলেন, "জাফর সাদিকের চেয়ে শ্রেষ্ঠ ফিকাহবিদ আমার দৃষ্টিগোচর হয় নাই।"

ইমাম সাহেবের উস্তাদের তালিকার মধ্যে ইমাম জাফর সাদিকের নামও লিখিত রহিয়াছে। একথাও বর্ণিত আছে যে, ইমাম জাফর সাদিক যখন প্রথমবার কুফায় আগমন করেন আবু হানীফা সাগরিদগণ সহ তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে যান। প্রত্যক্ষদর্শী বলেন, "ইমাম আবু হানীফা ইমাম জাফর সাদিকের সম্মুখে এমন ভাবে বসিয়াছিলেন যে, ইমাম জাফর সাদিকের জ্ঞান-গরিমার প্রভাব যেন তাঁহার উপর বিস্তার করিয়াছিল।"

যাহাই হউক না কেন এই বিশ্বাস-ভক্তি থাকা সত্ত্বেও প্রকাশ্যে খলীফার নিকট বিশ্বস্ত হওয়ার জন্য ইমাম সাহেব এমন কতগুলি প্রশ্ন তৈয়ার করিলেন যাহা শুনিয়া মনসুরও চমকিয়া উঠিয়াছিলেন। মনসুরের জ্ঞানের পরিসীমার ঐ সমস্ত প্রশ্নের গুরুত্ব যত বেশীই হউক না কেন ইমাম সাহেব ইমাম জাফর সাদিকের জ্ঞানের গভীরতা সম্পর্কে খুবই জ্ঞাত ছিলেন। তাই তিনি এইরূপ প্রশ্ন পেশ করায় দোষের কোন কিছু দেখিতে পান নাই। হয়ত এই প্রশ্ন করা দ্বারা তিনি ইমাম জাফর সাদিকের আসন আরও উপরে উঠাইতে চাহিয়াছিলেন। বাস্তবিক পক্ষে তাহাই হইয়াছিল।

ইমাম জাফর সাদিক মনসুরের নিকট পেঁাছিবার পূর্বেই অর্থাৎ হীরায় যখন পেঁাছেন তখনই মনসুর ইমাম সাহেবকে পাঠাইয়া দিলেন। ইমাম জাফর সাদিকের সম্মুখে চল্লিশটি প্রশ্ন করা হইল। তিনি ধীরে-সুস্থে বিস্তারিতভাবে শুধু প্রশ্নের উত্তরই দিলেন না অধিকন্তু আরও বলিলেন, 'এই মাসআলা সম্বন্ধে ইরাকীদের এই মত, মদীনাবাসীদের এই মত এবং আমার মতামত এইরূপ।' ইমাম আবু হানীফা বলেন, 'চল্লিশটি প্রশ্নের উত্তর তিনি এমন নিখুঁতভাবে দিলেন যে, উহাতে আর কোন প্রকার সন্দেহ রহিল না।'

মনসুরের উদ্দেশ্য কার্যকরী হইল না। কিন্তু ইমাম সাহেবের ইচ্ছা পূর্ণ হইল। এই কঠিন প্রশ্নের উত্তর পাইয়া ইমাম জাফরের প্রতি তাঁহার ভক্তি আরও বাড়িয়া গেল।

খলীফার দরবারে ইমাম সাহেবের প্রভাব

সকাল হইতে সন্ধ্যা পর্যন্ত ইমাম সাহেব তাঁহার অভিজ্ঞতা খলীফা মনসুরের দরবারে পেশ করিতেন। ঐতিহাসিক মু'ফিক মা'মর ইবন হাসান হারুবী হইতে বর্ণনা করেন—পরিশেষে খলীফা মনসুরের অবস্থা দাঁড়াইয়াছিল এই যে,—'দেখা যাইত মনসুর ইমামকে অন্যের উপর স্থান দিতেন, প্রত্যেক কাজেই তাঁহাকে অগ্রণী করিতেন, নিজের হউক বা প্রজার, বিচারকের হউক বা আমীর ওমরাদের সকলের সম্পর্কেই ইমাম সাহেবের পরামর্শ গ্রহণ করিতেন।

ইহাতে বিস্ময়ের কিছুই নাই যে, তাঁহার অভিজ্ঞতার পরিণাম ইহাই হইবে। এমন কি খলীফা এবং তাঁহার বেগমের মধ্যস্থিত ঝগড়া-বিবাদেও বেগম মনসুর ইমাম সাহেবের উপর নির্ভর করিতেন।

খলীফা ও বেগমের ঝগড়ায় ইমাম সাহেবের মীমাংসা

হাসান ইবন আবূ মালিক তাঁহার পিতার নিকট এই সম্পর্কীয় একটি ঘটনা শুনিয়া বলিয়াছেন, "একবার মনসূর ও তাঁহার স্ত্রীর মধ্যে কিছুটা মনোমালিন্য দেখা দেয়। বেগমের অভিযোগ ছিল তিনি যে সম্মান ও মর্যাদার অধিকারিণী খলীফা উহার প্রতি উদাসীন। কিন্তু খলীফা অস্বীকার করিলেন। পরে ঠিক হইল তৃতীয় কোন ব্যক্তিকে এই বিষয়ে সালিশ মানা হইবে।'

খলীফা জিজ্ঞাসা করিলেন, 'তুমি কাহাকে সালিশ মান ?'

বেগম বলিলেন, 'ইমাম আবূ হানীফা।' (ইমাম তখন শাহী তাঁবুতে ছিলেন) খলীফা বলিলেন, 'হাঁ। আমিও তাহাকে মানি।' ইমাম সাহেবকে আহবান করা হইল। পর্দা লটকাইয়া পর্দার আড়ালে বেগম এবং অন্যদিকে ইমাম সাহেব এবং খলীফা বসিলেন। খলীফা ইমাম সাহেবকে উদ্দেশ্য করিয়া বলিলেন, 'পর্দার আড়ালে আমার বেগম। তাহার অভিযোগ আমি তাহার প্রতি উদাসীন, তাহার প্রাপ্য হক আমি আদায় করি না। এখন আমার জিজ্ঞাসা পুরুষ শরীয়ত মুতাবিক কয়জন মহিলার পাণিগ্রহণ করিতে পারে।'

ইমাম সাহেব—'চারিজন।'

খলীফা—'শরীয়ত মুতাবিক দাসী রাখার হক আছে কি ?'

ইমাম—'আছে।'

খলীফা—'এই অবস্থায় কোন মহিলার স্বামীকে একের অধিক স্ত্রী গ্রহণে আপত্তি থাকিতে পারে কি ?'

ইমাম—'না।'

এই প্রকার প্রশ্নোত্তরের পর খলীফা স্ত্রীকে উদ্দেশ্য করিয়া বলিলেন—'শুনেছো, উনি কি বলিতেছেন ?'

বেগম—"হাঁ, শুনিতেছি।'

এবার ইমাম সাহেব খলীফাকে উদ্দেশ্য করিয়া বলিলেন, 'আমীরুল মুমিনীন, এক শর্তের উপর একাধিক স্ত্রী রাখার অনুমতি আছে। যাহারা সকলের প্রতি সমান ব্যবহার করিতে পারিবে তাহারাই একাধিক স্ত্রী গ্রহণ করিতে পারে। সমান ব্যবহার করায় যাহার ক্ষমতা নাই বা যে সন্দেহ করে যে, আমি সমান ব্যবহার করিতে পারিব না, তাহার কর্তব্য এক স্ত্রীতেই সন্তুষ্ট থাকা। কুরআন বলেন, 'যদি তোমার সন্দেহ হয় যে ইনসাফ করিতে পারিবে না তবে একই স্ত্রী।'

'সুতরাং আল্লাহর নির্দেশ মানিয়া চলাই আমাদের কর্তব্য।' শেষের বাক্য দিয়া ইমাম সাহেব খলীফাকে বুঝাইতে চাহিয়াছিলেন যে, তুমি ন্যায় কাজ না করিয়া আল্লাহর বিরোধিতা করিতেছ এবং অন্যায়ভাবে শরীয়তের আইন দ্বারা নিজের স্বার্থকে চরিতার্থ করিতেছ।

শেষের বাক্যে বেগমের অভিযোগের সত্যতা প্রমাণ হওয়ায় বেগম অত্যন্ত প্রীত হইয়া লোক মারফত ইমাম সাহেবকে বহু মূল্যবান উপঢৌকন পাঠাইয়া দেন। ইমাম সাহেব বেগমের প্রেরিত লোকদের বলিলেন, 'বেগম সাহেবকে আমার সালাম দিয়া বলিবে তাঁহার জন্য আমি কিছু বলি নাই বরং দ্বীনি ফরয আদায় করিয়াছি। তোমরা ইহা লইয়া যাও। আল্লাহ তাঁহাকে সন্তুষ্ট রাখুন।'

মনে হয় এই ঘটনা বাগদাদ শহর নির্মাণের প্রারম্ভিক সময়ের। তাই এই প্রথমবার খলীফার ইচ্ছার বিরুদ্ধে ইমাম সাহেব সত্য প্রকাশ করিলেন। হয়ত মনসুর এই ব্যাপারে ততকিছু মনে করেন নাই। কিন্তু পরিশেষে তাঁহাদের সম্পর্কের অবনতি হইয়াছিল এবং ইহাই ছিল উহার প্রথম প্রকাশ।

খলীফার দরবারে ইমামের শত্রু

ইমাম সাহেবের প্রভাব-প্রতিপত্তি দেখিয়া কিছু সংখ্যক ঈর্ষাপরায়ণ দরবারী ভিতরে ভিতরে খুবই জ্বলিতেছিল। কিন্তু সুযোগ পাইতেছিল না। সম্ভবত এই ঘটনার পর প্রকাশ্যে মনের জ্বালা মিটাইবার সুযোগ পাইল। ঈর্ষাপরায়ণদের নেতা ছিল রবী। একদিন সে মনসুরকে বলিল, 'আমীরুল মুমিনীন! আপনি এই ব্যক্তির ইলম ও বুদ্ধিমত্তার প্রশংসা করেন,—অথচ আমি আলিমদের নিকট শুনিয়াছি এই ব্যক্তি আপনার মহান দাদা আবদুল্লাহ ইবন আব্বাসের বিরুদ্ধে ফতওয়া দিয়া থাকেন।' খলীফা জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কোন মাসআলার?' রবী বলিল, 'প্রতিজ্ঞা করিয়া মজলিস হইতে উঠিয়া যাওয়ার পর তাহার প্রতিজ্ঞার কোন কোন বিষয়বস্তু পৃথক করিলে; আপনার দাদার ফতওয়া ছিল, এরূপ পৃথক করা জায়েয এবং এইরূপ প্রতিজ্ঞাকারীর শপথ ভঙ্গ হয় না। আর আমি শুনিয়াছি, আবু হানীফা বলেন, 'শপথ করার সাথেই এইরূপ পৃথক করা কার্যকরী হইয়া থাকে, মজলিস খতম হওয়ার পর অর্থহীন। যে ব্যক্তি এরূপ করিবে তাহার শপথ ভাঙিয়া যায়।'

খলীফা ইমামের দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'ব্যাপার কি?' ইমাম সাহেব বলিলেন, 'আমীরুল মুমিনীন! এই ব্যক্তি কি বলিতে

চায় আপনি বুঝিয়াছেন কি ? এই ব্যক্তির কথার অর্থ এই যে—আপনার সৈন্য এবং অন্যান্য ব্যক্তিগণ আপনার হাতে হাত রাখিয়া যখন আনুগত্যের শপথ করে তখন তাহারা ইচ্ছা করে যে, এই শপথের কার্যক্ষমতা নষ্ট করিয়া দেয় অর্থাৎ শপথ করার পর শপথ গ্রহণকারীদের এই ক্ষমতা দেওয়া হয় যে, বাড়ী পৌঁছিয়া এই মনস্থ করে যে, অমুক অমুক অবস্থায় অনুগত থাকা নিজের পক্ষে নিষ্প্রয়োজন। তখন শরীয়ত মুতাবিক অনুগত থাকা তাহার পক্ষে নিষ্প্রয়োজন হইয়া যায়।[১] আপনি চিন্তা করিয়া দেখুন ইহা কতবড় বিপজ্জনক কথা।"

ইমাম সাহেবের এই কথা শুনিয়া রবীর মুখ রক্তহীন ফ্যাকাশে হইয়া গেল। কারণ সৈন্যদেরকে খেপাইয়া তোলার দায়িত্ব সে নিজের কাঁধে চাপাইয়া লইয়াছিল। কিন্তু মনসুর বুঝিতে পারিলেন দরবারীদের ঈর্ষাপরায়ণতাই ইহার মূল। তাই তিনি হাসিয়া বলিলেন, 'রবী, প্রাণের মায়া থাকিলে ইমামের পিছনে পড়া ছাড়িয়া দাও।'

দরবার হইতে বাহির হইয়া রবী ইমাম সাহেবকে বলিল, 'আজ তো আপনি আমার রক্ত দ্বারা হোলি খেলা খেলিতে চাহিয়াছিলেন।' ইমাম সাহেবও উত্তর দিলেন, 'আরে ভাই ! তুমিই কম কিসে ?'

মনসুরের দরবারে আবুল আব্বাস তুসী নামক আরও একজন লোক ছিলেন। তিনিও ইমাম সাহেবের প্রভাবকে সহ্য করিতে পারিতেন না। একদিন তিনি ভরা দরবারে ইমাম সাহেবকে জিজ্ঞাসা করিলেন 'আমীরুল মুমিনীন যদি আমাদের কাহাকেও আদেশ দেন যে, অমুক ব্যক্তিকে নিহত কর ; অথচ আমরা জানি না যে, সেই ব্যক্তির অন্যায় কি ? এই অবস্থায় সেই ব্যক্তিকে নিহত করা বৈধ হইবে কি ?' ইমাম সাহেব জিজ্ঞাসা করিলেন, 'আবুল আব্বাস, বল তো আমীরুল মুমিনীন সঠিক নির্দেশ দেন, না অন্যায়ভাবে ?" তুসী বলিলেন, 'আমীরুল মুমিনীন কেন অন্যায়ভাবে নির্দেশ দিবেন। ইমাম সাহেব উত্তর করিলেন, 'তবে আমাদের পক্ষে তাঁহার নির্দেশ পালন করিতে দ্বিধা কোথায় ?'

১. আব্বাসী যুগে শপথ গ্রহণের সময় বলা হইত, 'যদি আমি আমার শপথ অনুযায়ী কাজ না করি তাহা হইলে আমার স্ত্রী তালাক হইয়া যাইবে, আমার দাস-দাসী মুক্ত হইয়া যাইবে এবং গৃহ হইতে পায়ে হাঁটিয়া হজ্জ করিব।' এই শপথ করার পর গৃহে ফিরিয়া আসিয়া যদি বলিত, 'যতক্ষণ আমার ইচ্ছা ততক্ষণ আমি আমার শপথ মত চলিব।' এই কথা বলিতেই শপথ আর শপথ থাকিত না। এই মাসআলা ফিকাহ শাস্ত্রের কঠিন বিষয়।

তুসী মাথা নত করিয়া চুপ হইয়া রহিলেন।

দরবারী লোক ঈর্ষাপরায়ণ হইবে ইহাতে আর বিস্ময়ের কি আছে? এমন কি রাজপ্রাসাদের নওকর চাকরদের মধ্যেও কেহ কেহ মনসুরের মুখে ইমাম সাহেবের যশঃকীর্তন শুনিয়া ঈর্ষাপরায়ণ হইয়া উঠিয়াছিল।

কাযী আবু ইউসুফ বলেন, 'রাজপ্রাসাদে একজন দাস ছিল যাহাকে খলীফা বেশ সমীহ করিতেন। সেই দাসও ইমাম সাহেবের প্রতি ঈর্ষান্বিত হইয়া অনেক সময় সত্য-মিথ্যায় অনেক কিছু খলীফাকে বলিত। কিন্তু খলিফা তাহাকে বার বার সাবধান করিয়া বলিয়াছিলেন—সে যেন ইমাম সাহেবের বিরুদ্ধে কিছু না বলে। কিন্তু সে নিরস্ত হইল না। একদিন সে খলীফাকে বলিল, 'আপনি ঐ ব্যক্তির এত প্রশংসা করেন কেন? তিনি যদি আমার প্রশ্নের উত্তর দিতে পারেন তবেই না বলিব তিনি একজন বিজ্ঞ আলিম।' খলীফা বলিলেন, 'বেশ তো, প্রশ্ন করিও। কিন্তু মনে রাখিও। আবু হানিফা যদি প্রশ্নের উত্তর দিতে পারেন তবে তোমার আর উপায় নাই।'

একদিন ইমাম সাহেব খলীফার নিকট বসা ছিলেন। সেই দাস আসিয়া বলিল, 'আপনি তো সকলের প্রশ্নেরই উত্তর দিয়া থাকেন। কিন্তু আমার প্রশ্নের উত্তর দিতে পারিলেই না বুঝিব আপনি একল বিজ্ঞ আলিম।'

ইমাম সাহেব আর কি বলিবেন? হয়ত বলিয়াছেন, 'আচ্ছা, বল তোমার প্রশ্ন কি?'

দাস প্রশ্ন করিল, 'আচ্ছা বলুন তো, পৃথিবীর মধ্যবর্তী স্থান কোথায়?' 'তুমি যেখানে বসিয়া আছ।' দাস তাহার জবাবে কিইবা আর বলিতে পারে। সে আবার প্রশ্ন করিল 'পৃথিবীতে পা বিশিষ্টদের সংখ্যা বেশী না মাথাওয়ালাদের?' ইমাম সাহেব তেমনি-ভাবে উত্তর দিলেন, 'পা ওয়ালাদের।' আবার জিজ্ঞাসা করিল, 'পৃথিবীতে নরের সংখ্যা বেশী না নারীর?' ইমাম সাহেব বলিলেন, 'নরও বেশী আর নারীর সংখ্যাও কম নয়। আচ্ছা, বল তো, তুমি কোন দলের?' এই দাসটি ছিল নপুংসক, সে এই কথায় একেবারে চুপ হইয়া গেল।

এই দাসের এইরূপ প্রশ্ন ইমাম সাহেবের নিকট অবশ্য অসহনীয় ছিল। কিন্তু যে উদ্দেশ্যে তিনি সব কিছু সহ্য করিতেছিলেন এবারও তাহাই করিলেন। কিন্তু খলীফা ইমামের মনোভাব বুঝিতে পারিলেন

এবং দাসকে খুব শাস্তি দিয়া বলিলেন, 'ভবিষ্যতে তুমি আর এ ধরনের কাজ করিবে না।' (মুনাফিক, ১৬১ পৃঃ, ১ম জিলদ)

যদিও ইহা অর্থহীন কাহিনী তথাপি যদি সত্য হয় তবে ইহাই অনুমান করা যাইতে পারে যে, ইমাম সাহেব খলীফার দরবারে এবং খলীফার উপর কতটা প্রভাব বিস্তার করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন।

মনসুরের শাহী তাঁবুতে পৌঁছিয়া যদি ইমাম সাহেব এই চিন্তায় থাকিতেন যে, যেভাবে হউক সম্ভাব্য উপায়ে মনসুরকে হাত করিতে হইবে; আর আমরা দেখিয়াছিও যে, বিভিন্ন উপায়ে তাঁহাকে হাত করিয়া তিনি তাঁহার প্রণীত আইনের দ্বারা এমন প্রভাব বিস্তার করিতে চাহিয়াছিলেন যে, ভবিষ্যতে তাঁহার প্রণীত আইনকেই যেন হুকুমতের একমাত্র আইন করিতে বাধ্য থাকেন। তিনি তাঁহার আইন সম্বন্ধে এতটা আস্থাশীল ছিলেন যে, কুরআন ও সুন্নত মুতাবিক ইহাই একমাত্র আইন এবং মুসলিম জীবন ধারা এবং ঝগড়া-বিবাদের মাসআলা তাঁহার প্রণীত আইন অনুযায়ী ফয়সালা হওয়ার মানসেই তিনি এতসব করিতেছিলেন। ইমাম তো ছিলেন এই চিন্তায়। আর অন্য দিকে মনসুরের চিন্তা ছিল কিভাবে তিনি ইমাম সাহেবকে হাত করিবেন।

ইমামকে মনসুরের প্রথম উপঢৌকন

একথা সঠিকভাবে বলা যাইতে পারে না যে, তাইগ্রীস নদীর তীরবর্তী তাঁবুতে কখন হইতে মনসুর তাঁহার কাজ আরম্ভ করিয়াছিলেন। তবে ঐতিহাসিকদের বর্ণনা মতে এতটা বলা যাইতে পারে যে, ইমাম সাহেবের গুণ ও জ্ঞানে আনন্দিত হইয়া অথবা আনন্দ প্রকাশ করার পর তাঁহাকে নিজের অনুগত ও কৃতজ্ঞ বানানোর উদ্দেশ্যে দশ হাযার দিরহামের একটি উপঢৌকন মনজুর করিলেন।

এই ঘটনার বর্ণনাকারী মুগীল ইবন বুদায়ল বলেন, 'ইমাম সাহেবকে আহ্বান করিয়া দশ হাযার দিরহামের তোড়া পেশ করিয়া বলিলেন, 'আমার একান্ত ইচ্ছা আপনি ইহা গ্রহণ করুন।'

মনে হয় ইহাই প্রথম টোপ যাহা শিকারের মুখের সম্মুখে তুলিয়া ধরা হয়। আর এই পথে ইহাই ছিল ইমাম সাহেবের প্রথম পরীক্ষা। এই পথ হইতে বাঁচিয়া থাকার জন্যই আল্লাহ তায়ালা কারবারের মাধ্যমে তাঁহাকে এত দান করিয়াছিলেন যে, এই দশ হাযার দিরহাম

তাহার নিকট অতি তুচ্ছ। কিন্তু এখন অবস্থা ছিল অন্য রকম। কারণ দেশের অধিপতি এই অর্থ দিতেছিলেন। দিতেছিলেন তো নয় বরং গ্রহণ করিতে বাধ্য করিতেছিলেন। ইহা গ্রহণ না করা এক প্রকার খলীফার আদেশের অবাধ্য হওয়া। আর ইমাম সাহেব তখনও সম্পর্কচ্ছেদ করার অভিলাষী ছিলেন না। তিনি এক বিশেষ সমস্যায় জড়িত হইয়া পড়িলেন।

বর্ণনাকারীগণ কিছু উল্লেখ না করিলেও মনে হয় তিনি ওযর-আপত্তি পেশ করিয়া কিছু সময় চাহিয়াছিলেন। আজ নয় কাল এসম্বন্ধে যাহা করার করিব। তিনি দরবার হইতে ফিরিয়া আসিয়া খারেজা ইবন মুসায়িব নামক একজন বন্ধুকে ডাকিয়া বলিলেন 'ভাই, আমি তো বিশেষ সমস্যায় পড়িয়া গিয়াছি। যদি অর্থ গ্রহণ না করি তবে খলিফা আমার প্রতি বিরূপ হইবেন। আর যদি গ্রহণ করি তবে আমার ধর্মের মধ্যে এমন একটি জিনিস প্রবিষ্ট করাইব যাহা আমার পসন্দ নয়।'

খারেজাও বেশ বুদ্ধিমান লোক ছিলেন এবং মনসূরের স্বভাবও ভালভাবে জানিতেন। তিনি ইমাম সাহেবকে পরামর্শ দিলেন 'আপনি খলীফাকে একথা বিশ্বাস করান যে, আপনি কখনও টাকা-পয়সা পাওয়ার আশা করেন নাই। খারেজার কথার অর্থ ছিল এই যে, খলীফার দরবারে যে সমস্ত লোক যাতায়াত করে তাহারা এইরূপ আর্থিক লাভের আশাই বেশী করে। আপনার সম্বন্ধেও তাহার এই ধারণা তাই আপনাকে দিরহাম দিতেছেন। অন্যথায় খলীফা যে কৃপণ স্বভাবের লোক, তিনি কোন দিন এই বিরাট আর্থিক ক্ষতি স্বীকার করিতে পারেন না।

ইমাম সাহেব খারেজার তাৎপর্য বুঝিতে পারিয়া দ্বিতীয় দিন দরবারে উপস্থিত হইয়া সেমতেই নিজের বক্তব্য পেশ করিলেন। তাঁহার পরামর্শ কার্যকরী হইল। খলীফা সেই দিরহাম রাজকোষে জমা রাখিতে নির্দেশ দিলেন।

মনসূরের দ্বিতীয় উপঢৌকন

ইমাম সাহেবকে হস্তগত করার জন্য মনসূর মনে করিলেন—অবশ্যই তাহাকে কিছু গ্রহণ করাইতে হইবে। তাই তিনি দশ হাযার দিরহামের সাথে অনুপম সৌন্দর্যের অধিকারিণী একজন যুবতী দাসীও পাঠানোর মনজুরী দিলেন। যদি ইহা দ্বিতীয় ঘটনা হয় তবে খারেজার দেওয়া পূর্ব পরামর্শ এখানে কার্যকরী হইতে পারে না। কারণ এইবার মনসূর

ইমাম সাহেবকে প্রকৃতপক্ষেই আয়ত্তে আনার চেষ্টায় ছিলেন। তাই তিনি দিরহামের সাথে এমন এক বস্তু ইচ্ছাকৃতভাবে প্রেরণ করিতেছিলেন যে, আর্থিক লোভে ইমাম না পড়িলে, কমপক্ষে মনসূরের অভিজ্ঞতা মতে আদম সন্তান উহার লোভ হইতে খুব কমই বাঁচিয়া থাকিতে পারে।

ইমাম সাহেবের উত্তর

ইমাম সাহেবও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছিলেন, খলীফা যদি বিগড়াইয়া যায় যাউক কিন্তু প্রকৃত অবস্থা প্রকাশ করিতেই হইবে। তাই তিনি টাকা ফেরত দেওয়ার কারণস্বরূপ বলিলেন—

'আমীরুল মুমিনীন যদি তাঁহার নিজস্ব তহবিল হইতে আমাকে দিতেন তবে হয়ত আমি উহা গ্রহণ করিতাম। কিন্তু ইহা তো মুসলমানদের বায়তুল মালের অর্থ। কোনমতেই উহা গ্রহণ করার আমার অধিকার নাই। আমি যদি দরিদ্র হইতাম তবে হয়ত উহা গ্রহণ করা আমার পক্ষে জায়েয হইত। আর যদি আমি সৈনিক হইতাম, শত্রুদের সাথে যুদ্ধ করিতাম, তবে সৈনিকদের যেখান হইতে দেওয়া হয় আমিও হয়ত সেই তহবিলের অর্থ হিসাবেই গ্রহণ করিতাম। আমি কোন দলেরই লোক নই। সুতরাং আপনিই ইনসাফ করুন—আমি কি ভাবে উহা গ্রহণ করিতে পারি।

ইমাম সাহেবের এই কথার উত্তর তিনি আর কি দিতে পারেন। অন্য এক বর্ণনায় দেখা যায় খলীফার উপঢৌকন গ্রহণ করিতে অস্বীকার করিলে খলীফা ইমাম সাহেবকে বলিয়াছিলেন, 'আচ্ছা, তাহা হইলে আপনি লোকের নিকট একথা প্রকাশ করিবেন না যে, আমি খলীফার দেওয়া উপঢৌকন গ্রহণ করি নাই।'

এতো গেল দিরহামের কথা। বাকী রহিল যুবতী দাসীর কথা। লজ্জাবশতঃ তিনি খলীফার নিকট এসম্বন্ধে কিছু বলিতে পারিলেন না। কিন্তু মনসূরের বর্তমান দরবারী এক কালের মন্ত্রী এবং ইমাম সাহেবের প্রতি সুধারণা পোষণকারী হামীদ ইবন অবদুল মালিককে বলিলেন—

'ভাই, আমি তো বৃদ্ধ মানুষ—রমণীদের ব্যাপারে দুর্বল হইয়া পড়িয়াছি; তুমিই বল এই অবস্থায় এই বেচারীকে গ্রহণ করিলে তাহার প্রতি কত বড় অন্যায় করা হইবে। বাকী রহিল বিক্রি করিয়া টাকা লওয়া। আমীরুল মুমিনীনকে বলিয়া দিও যে, আমার কি শক্তি

যে, যে রমণী স্বয়ং খলীফার মালিকানা হইতে আমার হাতে আসিয়াছে তাহাকে বিক্রি করিয়া দিই।'

পরবর্তীকালে মনসুর বলিতেন, আবু হানীফা আমাকে ধোঁকা দিয়াছিলেন অর্থাৎ নানা প্রকার টালবাহানা করিয়া আমার অর্থ গ্রহণ করেন নাই।'

কি তামাশার কথা! অন্যের নিকট হইতে মুক্তি পাওয়ার মানসে অবশ্য একে অন্যকে ধোঁকা দিয়া থাকে। কিন্তু টাকা ফেরত দেওয়ার সময়ও যে ধোকা দেওয়া হয়—ইহা বিস্ময়ের কথা বৈকি? কিন্তু কি করিবেন এক আব্বাসী খলীফা মুসলমানদের একজন ইমাম সম্পর্কে এই সাক্ষী দিতেছেন।

কিন্তু টাকা ফেরত দেওয়া নেওয়ার কাজ এখানে শেষ হইলেও সমস্যার সমাধান এখানেই শেষ হইল না। টাকা ফেরত দেওয়ায় উহা মনসুরের মনে কাঁটার ন্যায় বিদ্ধ হইতে লাগিল। তিনি ইমামকে হস্তগত করিতে চাহিয়াছিলেন এবং তাঁহাকে দিয়া নিজের কার্যসিদ্ধি করিতে চাহিয়াছিলেন, তাই অনেকটা কোমল পন্থা অবলম্বন করিয়াছিলেন। কিন্ত ইমাম সাহেবের স্বভাব-প্রকৃতির কথাও তাঁহার জানা ছিল। বনী উমাইয়াদের শাসনকালের কথা নিশ্চয়ই কর্ণগোচর হইয়াছিল। ইবরাহীম সায়েগের সাথে তাঁহার যে সম্পর্ক ছিল উহাও তাঁহার কান পর্যন্ত না পেঁাছার কোন কারণ ছিল না। অর্থ সম্পর্কীয় অভিজ্ঞতা নিজের চোখেই দেখিলেন। সম্ভবতঃ তাঁবুতে থাকাকালীন এই কয়টি ঘটনার কথাই তাঁহার জীবনচরিতে বর্ণিত হইয়াছে।

মনসুরের দরবারে ইমামের সত্য উদ্‌ঘাটন

রবী ইবন ইউসুফের মধ্যস্ততায় আল-ফারুকী বর্ণনা করিয়াছেন, 'হঠাৎ মুসিলবাসী মনসুরের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিয়া বসিল। তাহাদের সম্পর্কে কি ব্যবস্থা করা যায় তার উদ্দেশ্যে আহূত সকল দরবারীকে (যেখানে ইমাম সাহেবও ছিলেন) উদ্দেশ্য করিয়া মনসুর বলিলেন, 'মুসিলবাসী প্রতিশ্রুত হইয়াছিল যে, তাহারা আমার ও আমার হুকুমতের অনুগত থাকিবে কখনও অবাধ্য হইবে না। একথাও বলিয়াছিল যে, যদি তাহারা কখনও অবাধ্য হয় তবে তাহাদের হত্যা করার অধিকার খলীফার থাকিবে। এখন তাহারা আমার নিয়োজিত শাসনকর্তার বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়াছে। এমতাবস্থায় শরীয়ত মুতাবিক ও

তাহাদের প্রতিশ্রুতি মত তাহাদিগকে নিহত করা আমার পক্ষে জায়েয হইবে কি না ?

একজন খোশামোদী পরিষদ দাঁড়াইয়া বলিলেন, নিশ্চয়ই তাহাদের উপর হইতে আপনার দায়িত্ব তুলিয়া দেওয়া হইয়াছে। তাহাদের সম্পর্কে আপনি যাহা ইচ্ছা তাহাই করিতে পারেন। আপনি যদি তাহাদের ক্ষমা করেন তবে উহা আপনার বদান্যতা। আর যদি শাস্তি প্রদান করেন তবে তাহাদের চুক্তি মুতাবিকই তাহারা পাওয়ার উপযুক্ত।'

কিন্তু মনসুরের ঈপ্সিত ব্যক্তি এই লোক নয়। প্রকৃতপক্ষে তিনি তাঁহার স্বপক্ষে ইমাম সাহেবের ফতওয়া চাহিতেছিলেন। যখন দেখিলেন ইমাম সাহেব কিছু না বলিয়া চুপ করিয়া রহিয়াছেন—তখন তিনি বলিলেন—

'ওহে শায়খ ! এ সম্পর্কে আপনার অভিমত কি ?'

আবার অগ্নি পরীক্ষা আসিয়া দাঁড়াইল ইমাম সাহেবের মাথার উপর। ইমাম সাহেবের পূর্ববর্তী কার্যসমূহ দেখিয়া খলীফা মনে করিয়াছিলেন কোন প্রকার আন্দোলন করার সম্ভাবনা আছে। তাই তিনি ইমাম সাহেবকে লক্ষ্য করিয়াই প্রশ্ন করিয়াছিলেন। ইমাম সাহেব দাঁড়াইয়া ভূমিকা স্বরূপ বলিলেন, 'এই সময় যিনি নবুওতের স্থলাভিষিক্ত হওয়ার দাবীদার আমি কি তাঁহার সম্মুখে দন্ডায়মান হই নাই ? আশা করি আমি এখন যেখানে দন্ডায়মান উহা মুসলমানদের আশ্রয়স্থল।

মনসুর বলিলেন, 'হাঁ, আপনি ঠিকই বলিয়াছেন।'

অতঃপর ইমাম সাহেব বলিলেন, 'আমীরুল মুমিনীন ! মুসিল যদি এই প্রকার কোন চুক্তি আপনার সাথে করিয়া থাকে 'বিদ্রোহ করিলে আপনি তাঁহাকে হত্যা করিতে পারিবেন' তবে তাহারা এমন এক বস্তুর অধিকার আপনাকে দিয়াছে যাহা তাহাদের অধিকার বহির্ভূত।'

'অর্থাৎ নিজের জীবনের উপর কাহারও কোন অধিকারই দেওয়া হয় নাই। তাই আত্মহত্যা করা ইসলামে হারাম। সুতরাং এইরূপ অধিকার অন্যকে সে কিভাবে দিতে পারে ? ইহার পরও যদি আপনি তাহাদের হত্যা করার ইচ্ছা করেন তবে আপনি এমন এক কাজ করিবেন যাহাতে আপনার কোন অধিকার নাই। আমীরুল মুমিনীন ! খোদার চুক্তি অধিক মযবুত উহাকেই সম্পাদন করা হউক।'

খোদা জানেন মনসুর কি চিন্তা করিলেন। তিনি যেন চঞ্চল হইয়া উঠিলেন এবং সাথে সাথে দরবার বরখাস্ত করিয়া দিলেন। লোক চলিয়া গেলে তিনি অত্যন্ত কোমলকন্ঠে ইমাম সাহেবকে বলিলেন—'আপনি যথার্থই বলিয়াছেন।'

ইহার পর ইমাম সাহেব মনসুরের নির্দেশ মত শাহী তাঁবু হইতে বাড়ী ফিরিয়া আসিলেন।

আবু জাফরের আকাঙ্ক্ষা

শাহী তাঁবু হইতে ইমাম সাহেব বাড়ী রওয়ানা হওয়ার সময় মনসুর অতি কোমলভাবে ওসীয়ত স্বরূপ বলিলেন, 'একটু খেয়াল রাখিবেন যেন এরূপ ফতওয়া জনসাধারণকে না দেওয়া হয় যাহাতে আপনাদের খলীফার উপর কোন প্রকার বিপদ আসিয়া চাপিয়া বসে। আপনিও অবগত আছেন যে, এরূপ ফতওয়া দেওয়ায় হুকুমতের শত্রুদের পক্ষে হুকুমতের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার সুযোগ হয়।

আমার যতদূর ধারণা এই ঘটনার পরই ইমাম সাহেব শাহী তাঁবু হইতে মুক্তি পান। আরো মনে হয়—ইমাম সাহেবের উপস্থিতি তিনি নিরাপদ বলিয়া মনে করিয়াছিলেন। তাই তিনি নরমভাবে ইমাম সাহেবকে বুঝাইয়া বাড়ী যাওয়ার অনুমতি দিয়াছিলেন এবং তাঁহাকে সময় সময় আসা যাওয়ার জন্য অনুরোধ করিয়াছিলেন।

ইমাম সাহেবের উত্তর

উত্তর দান প্রসংঙ্গে ইমাম সাহেব বলিলেন, 'ইহা বেশ কিছুটা কঠিন কাজ। আপনার নৈকট্য লাভের ফলাফল দেখিয়াছি যে, অগ্নি পরীক্ষায় পড়িতে হয়। তাছাড়া অন্তরে অন্তরে আপনার দরবারে আসা যাওয়ার ইচ্ছা পোষণ করিলে আপনি যদি আসা যাওয়া বন্ধ করিয়া দেন তবে উহা দুঃখের কারণ হইবে। আমীরুল মুমিনীন! সত্য বলিতে কি আপনার নিকট এমন কোন কিছু নাই যাহা আশা করিতে পারি। নিরাপদে থাকার জন্য যদি যাতায়াত করিতে হয় তবে আলহামদুলিল্লাহ! আমি এমন কোন অন্যায় করি নাই যে, যাহার জন্য হুকুমতের কয়েদখানাকে ভয় করিতে হইবে।"

"আমীরুল মুমিনীন! যাহারা আপনার নিকট হইতে কিছু পাওয়া এবং নেওয়ার আশা রাখে তাহারাই আপনার দরবারে বেশী যাতায়াত

করে। খোদার শুকর! যিনি আপনাকে অমুখাপেক্ষী করিয়াছেন তিনি তাঁহার নিকট ব্যতীত আর সকল হইতে আমাকে অমুখাপেক্ষী করিয়াছেন। আমাকে ক্ষমা করিবেন। আমি তাহাদের ন্যায় (যাহাদের দ্বারা আপনার দরবার পরিপূর্ণ থাকে) হইতে পারিব না।"

মোট কথা তখন মনসুর ইমাম সাহেবকে তাঁবু হইতে বিদায় করিয়া দিলেও ইমাম সাহেব তাহার অন্তরে বিভিন্ন পথে যে চিরস্থায়ী স্মৃতি রাখিয়া গিয়াছিলেন উহা কখনও মুছিবার মত ছিল না। তাঁহার অসাধারণ ব্যক্তিত্ব যাহা মনসুর স্বচক্ষে তাঁবুতে কয়েক মাস পর্যন্ত দেখিয়াছিলেন—কোন কারণ নাই যে, তিনি উহা ভুলিতে পারেন। হযরত বায়দ সহিদের সাথে ইমামের সহানুভূতি, সরল মতবাদ, নির্ভীক উত্তর, স্পষ্টবাদিতা, গভীর জ্ঞান ইত্যাদির পরিচয় মনসুরের ব্যক্তিগত জীবনে গভীর রেখাপাত করিয়াছিল।

দ্বিতীয় বার শাহী দরবারে গমন

ঐতিহাসিকগণ বলেন যে, মনসুর ইমাম সাহেবের বিষয়ে নিশ্চিন্ত ছিলেন না। অথচ তাঁহাকে সরাসরিভাবে দরবারে আহ্বান করাও সমুচিত মনে করিতেন না। তাই ইমাম সাহেব চলিয়া যাওয়ার কয়েকদিন পর মদীনা হইতে ইমাম মালিক এবং তথাকার প্রসিদ্ধ 'আলিম ইবন আবী যেবকে আহ্বান করিলেন। সাথে সাথে কুফার শাসনকর্তা ঈসা ইবন মুসাকে লিখিলেন—"আবু হানীফাকেও পাঠাও।"

তিনজন আলেম ও বুযুর্গকে নির্জনে ডাকিয়া মনসুর জিজ্ঞাসা করিলেন—"আপনারা সত্য করিয়া বলুন, আল্লাহ্ যে শাসন ক্ষমতা আমাদের হাতে দিয়াছেন আমরা প্রকৃতপক্ষে উহার উপযুক্ত কিনা?"

ইমাম সাহেবের উত্তর

মনে হয় মনসুরের এই জাতীয় প্রশ্নের উত্তর অন্যত্র কোথাও সংক্ষিপ্তভাবে লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে। এখানে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করিব। ইমাম সাহেব প্রথম ভূমিকাস্বরূপ বলিলেন—"স্বধর্মের হিতাকাঙ্ক্ষীর কর্তব্য নিজকে ক্রোধ হইতে পবিত্র রাখা।"

অতঃপর বলিলেন ঃ

"আপনি আপনাকে প্রত্যেক প্রকার অযথা ধারণা হইতে পবিত্র

রাখিয়া যদি চিন্তা করেন তবে দেখিতে পাইবেন—আল্লাহ্‌র ইচ্ছামত নিজকে গঠন করার জন্য আপনি আমাদের আহবান করেন নাই বরং জনসাধারণের উপর আপনার প্রভাব স্থায়ী করার জন্য আহবান করিয়াছেন অর্থাৎ আপনার সম্বন্ধে আপনি যেমন ধারণা পোষণ করেন আপনার ভয়ে আমরাও যেন সেইরূপ সনদ প্রদান করি।"

অতঃপর নির্ভীকভাবে আবু জাফরকে বুঝাইয়া বলিলেন ঃ

"শুনুন! আপনি এমন এক সময় শাসন ক্ষমতা হস্তগত করিয়াছেন যখন ফতওয়া দানে সমর্থ আলিমদের মধ্যে দুইজন আলিমও আপনার সমর্থক ছিলেন না। আপনি অবগত আছেন যে, খিলাফত এমন একটি জটিল বিষয় যাহার সমাধান জনসাধারণের হাতে; তাহারাই খলীফা নির্বাচন করার একমাত্র অধিকারী। হযরত আবু বকর (রাঃ)-এর উদাহরণ আপনার সম্মুখে। ততদিন (ছয়মাস) তিনি শাসন ক্ষমতা পরিচালনা করেন নাই যতদিন পর্যন্ত ইয়ামনের মুসলমানের সমর্থনের সংবাদ তিনি পান নাই।"

ইমাম হাফিজউদ্দীন আল-কারদুরী, ইমাম আহমদ মাদানী এবং হালাবী এই বর্ণনা করিয়াছেন; সেহেতু ইহাতে কোন প্রকার সন্দেহের অবকাশ নাই। মুসলিম জাহানের একচ্ছত্র অধিপতির সম্মুখে এমন কথা বলা যেমন তেমন সাহসের কাজ নয়। ইহা কোন সাধারণ কথা নয় বরং ইহা ছিল মনসুরের খিলাফতের কাঠামোতে কুঠার মারা। আজ যেন ইমাম সাহেব মনসুরের মুখের উপরই বলিয়াছিলেন যে, তোমার হুকুমত কোন মতেই শরীয়তসিদ্ধ নয়। ইমাম সাহেব ইবরাহীম সায়েগের নিকট যে কথা বলিয়াছিলেন সেদিন হইতে তাহার পন্থা কিছুটা ভিন্ন ধরনের ছিল।

এখানে চিন্তার বিষয় এই যে, মনসুরের জিজ্ঞাসার পর সত্য গোপন করা ইমাম সাহেবের ঈমান ও অন্তঃকরণ কখনও পসন্দ করিতে পারে নাই। ইবরাহীমের নিকট ইমাম সাহেব যাহা কিছু বলিতেছিলেন উহার সারাংশ ইহাই ছিল যে, ক্ষমতার অধীকারী হওয়া ব্যতীত এমন অবস্থায় সত্য প্রকাশ কোন সময়ই কার্যকরী হইতে পারে না। সুতরাং তখনকার এবং এখনকার অবস্থার মধ্যে পার্থক্য ছিল। মনে হয় ইমাম সাহেব কুফা পেঁাছার পর আব্বাসী হুকুমতকে ধ্বংস করার যে গোপন পরিকল্পনা চলিতেছিল তিনি শুধু উহার সংবাদই রাখিতেন না বরং উহাতে অংশও গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি যে সংঘবদ্ধ শক্তির অপেক্ষায়

ছিলেন উহা তাঁহার নিকট উন্মোচন হইয়াছিল। হইতে পারে এই শক্তি সঞ্চয়ের পিছনে তাঁহারও হাত ছিল।

ইহাই তো হওয়া উচিত ছিল যে, ইমাম সাহেবের উত্তর শুনার পর সেখানেই তাঁহার শেষ ফয়সালা শুনাইয়া দিতেন। ইহাতেই অনুমান করা যাইতে পারে যে, ইবনে আবী যেব যখন উত্তর দিতেছিলেন তখন ইমাম সাহেব ও ইমাম মালিক জল্লাদের তরবারীর নীচে গর্দান ঝুঁকাইয়া দেওয়ার জন্য তৈয়ার হইতেছিলেন।

কিন্তু মনসুর শত বদমেজাজী হইলেও রাজনৈতিক স্বার্থের উপর কখনও ব্যক্তিগত স্বার্থকে স্থান দিতেন না। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে ইহাই ছিল তাঁহার কৃতকার্যের গোপন রহস্য। আমরা দেখিয়াছি ইমাম সাহেব মনসুরের দেওয়া উপঢৌকন ফেরত দেওয়ার সময় বলিয়াছিলেন, —"আপনি গ্রহণ না করার কথা অন্য কাহারও নিকট প্রকাশ করিবেন না।" মুসিলবাসীদের সম্পর্কে ফতওয়া দেওয়ার পর বলিয়াছিলেন— "আপনি এমন কোন ফতওয়া দেওয়া হইতে বিরত থাকিবেন যাহা দিলে আপনাদের খলীফার উপর বিপদ আসিতে পারে।"

তিনি যাহা কিছু বলিতেছিলেন উহা রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সাধন করার জন্য বলিতেছিলেন। তিনি জানিতেন এই সমস্ত লোকের সাথে কোন প্রকার অন্যায় ব্যবহার করিলে যে বিপদ আগামীকাল ঘটার সম্ভাবনা আছে উহা আজই ঘটিয়া যাইবে। সেই যুগের রাজনৈতিক দৃষ্টি-ভঙ্গি মনসুরের পুত্র মেহদীর কথায় প্রকাশ পাইয়াছে যে, ইমাম সাহেবের ন্যায় লোকের সাথে তাহারা কোন প্রকার বাড়াবাড়ি করা হইতে এই জন্য বিরত থাকিতেন যে, তাহারা ইয়াযিদী মতের ছবি হুসায়ন হত্যার আয়নায় দেখিতে পাইতেন।

কিন্তু যাহাই হউক তখনকার মত মনসুর তিনজনকেই বাড়ী ফিরিয়া যাওয়ার নির্দেশ দিলেন।

এখন ইমাম সাহেবের রাজনৈতিক জীবনে দুইটি ঘটনাই গুরুত্বপূর্ণ ছিল। প্রথমটি নফসে যাকিয়া এবং তাঁহার ভাই ইবরাহীম ইবন 'আবদুল্লাহ্‌র বিপ্লবের সময় প্রকাশ্যভাবে ইমাম সাহেবের উহাতে অংশ গ্রহণ করা এবং দ্বিতীয়টি কাযীর পদ গ্রহণ করা অর্থাৎ মনসুর বিভিন্ন সময় তাঁহাকে আহ্বান করিয়া তাঁহাকে কাযীর পদ গ্রহণ করিতে বাধ্য করিতে চাহিতেন। প্রথম তাঁহার নব-নির্মিত শহর মদীনাতুস সালামের কাযীর পদ গ্রহণ করিতে বলেন। ইমাম সাহেব

অস্বীকার করায় আলকারদুরীর বর্ণনা মতে বসরা, কুফা এবং বাগদাদের পার্শ্ববর্তী এলাকাসমূহের কাযীর পদেও তাঁহাকে নিয়োগ করিতে চাহেন।

অবশেষে সকল ঐতিহাসিকের মতে মনসুর এই প্রস্তাবও পেশ করেন যে, তাঁহাকে কাযীর পদে নিয়োগ করা হইল এবং মুসলিম জাহানের যেখানেই কাযীর প্রয়োজন হইবে উহা ইমাম সাহেবের হাতেই হইবে।

কিন্তু ইমাম সাহেব তাঁহার সিদ্ধান্ত হইতে এক চুলও এদিক সেদিক হইলেন না। অতঃপর মনসুর ইমাম সাহেবের সাথে যে নির্মম ব্যবহার করিয়াছিলেন কোন ঐতিহাসিকই না উহার সময় বা তারিখের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়াছেন, আর না উহা বিস্তারিতভাবে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। তাঁহারা শুধু সংক্ষিপ্তাকারে ঘটনা লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন।

সবচেয়ে কঠিন সমস্যা হইল এই যে,—নফসে যাকিয়ার বিদ্রোহ এবং কাযীর পদ গ্রহণ করার ঘটনার মধ্যে কোনটা আগে বা পরে হইয়াছে তাহা জানা যায় না। বহুদিন পর্যন্ত চিন্তা-ভাবনার পর যে সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া গিয়াছে উহাই এখানে বর্ণনা করা হইবে।

মনে হয় নফসে যাকিয়ার বিদ্রোহ পর্যন্ত ইমাম সাহেব ও মনসুরের মধ্যে যে আলাপ-আলোচনা হইয়াছিল অর্থাৎ ইবন আবী যেব ও ইমাম মালিক সহ যে কথাবার্তা হইয়াছিল উহা শেষ আলাপ-আলোচনা। ইমাম সাহেবের স্পষ্ট ভাষণ মনসুরের মনের সমস্ত সন্দেহ যাহা তিনি ইমাম সাহেব সম্পর্কে করিতেন উহা দূর হইয়া নিঃসন্দেহে পরিণত হইয়াছিল। কিন্তু কি করা যায়? তবে কি সমস্ত সমস্যার সমাধান তরবারি দ্বারাই করা হইবে মনসুর এই সমস্ত চিন্তাই করিতেছিলেন।

পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, বাগদাদ নির্মাণ কাজে তিনি ব্যস্তছিলেন এবং এ কাজের জন্য তাইগ্রীস নদীর তীরে তাবুতে আস্থান করিতে-ছিলেন এবং এখানে থাকিয়াই নির্মাণ কাজের দেখাশুনা করিতেন।

একদিন তিনি দ্বি-প্রহরের সময় তাইগ্রীস নদীর তীরে কোন এক খৃস্টান সন্ন্যাসীর আশ্রমে বিশ্রাম করিতেছিলেন ঠিক সেই সময় মদীনা হইতে বাগদাদের দূরত্ব নয়দিনে শেষ করিয়া হুসায়ন ইবন সখর নামক এক ব্যক্তি হাপাইতে হাপাইতে খলীফার দেহরক্ষী রবী'কে বলিল—"আমি নির্জনে খলীফার সাথে সাক্ষাৎ করিতে চাই।" রবী' একটু ইতস্ততঃ করিয়া তাহাকে খলীফার সামনে উপস্থিত করিল। যেই সন্দেহ মনসুর মনে মনে পোষণ করিতেছিলেন—সংবাদবাহক তাহাই

বলিল—"মুহাম্মাদ ইবন 'আবদুল্লাহ মদীনায় বিদ্রোহ ঘোষণা করিয়াছেন।"

এ কথা শুনিতেই যেন মনসুরের চোখের সম্মুখ দিয়া বিদ্যুৎ প্রবাহিত হইয়া গেল। জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কি নিজের চোখে দেখিয়াছ?" সংবাদবাহক উত্তরে বলিল, "জি, হাঁ! আমি নিজে দেখিয়াছি।" তিনি যখন রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর মিম্বরে বসা ছিলেন তখন আমি তাহার সহিত কথাবার্তা পর্যন্ত বলিয়াছি।

মনসুরের ব্যাকুলতার পরিমাণ ইহা দ্বারাই করা যায় যে, বাগদাদ নির্মাণের কার্যসূচী তখনই বাতিল করিয়া দিলেন এবং তখনই রওয়ানা হইয়া কুফায় আসিয়া দম ছাড়িলেন। কথিত আছে, পঞ্চাশ দিন পর্যন্ত তিনি জায়নামাজেই বসা ছিলেন এবং সেখানেই শয়ন করিতেন। একটি রঙীন জামা-ই পরিধান করিতেন এবং উহা খুবই ময়লা হইয়া গিয়াছিল। বিদ্রোহ দমন না করা পর্যন্ত তিনি অন্য জামা পরিধান করেন নাই।

নফসে যাকিয়ার বিদ্রোহের গুরুত্ব

১৪৪ অথবা ১৪৫ হিজরীর মধ্যবর্তী সময়ে এই ঘটনা সংঘটিত হইয়াছিল অর্থাৎ হিজরতের প্রায় দেড় শত বৎসর পর। এই সময়ের মধ্যে হযরত হাসান ও হুসায়ন (রাঃ)-এর সন্তান-সন্ততিদের কয়েক পুরুষ শেষ হইয়া গিয়াছিল। দুই ভাইয়ের অনেক সন্তান-সন্ততিও হইয়া গিয়াছিল। প্রথমে তাঁহারা দুই ভাই ছিলেন। কিন্তু পরবর্তীকালে দুই ভাইয়ের সন্তানগণ দুইটি বংশে পরিণত হইল। হাসানী সৈয়দ এবং হুসায়নী সৈয়দ। উভয় বংশের লোকেরাই বেশীর ভাগ মদীনায় বসবাস করিতেন।

হাসানী সৈয়দ বংশ

ইসলামের রাজনৈতিক সমস্যার প্রথম অবস্থা ছিল কারবালা প্রান্তর। আর হযরত যায়দ ইবন আলীর শহীদ হওয়ার সাথে সাথে উহা প্রায় শেষ হইয়া গিয়াছিল। আর ইহা ছিল হুসায়নী সৈয়দদের সমস্যা। কিন্তু হাসানী সৈয়দদের পক্ষ হইতে তখন পর্যন্ত রাজনৈতিক ঘটনা প্রকাশ পায় নাই। হুসায়নী বংশের শক্তি-সামর্থ যেন শেষ হইয়া গিয়াছিল। হযরত ইমাম বাকের বা জাফর সাদিক এবং অন্যান্য হুসায়নী বুযর্গগণ জীবনের মোড় ঘুরাইয়া দিয়াছিলেন। কিন্তু

হাসানী বংশের উৎসাহ-উদ্দীপনা তখনও জাগরূক ছিল। আমি যে সময়কার কথা বলিতেছি তখন হাসানী বংশের নেতা ছিলেন হযরত 'আবদুল্লাহ ইবন হাসান ইবন হাসান ইবন আলী (রাঃ)।

হযরত মুহাম্মাদ ইবন আবদুল্লাহ নফসে যাকিয়া

হযরত 'আবদুল্লাহ্‌র এক পুত্রের নাম ছিল মুহাম্মাদ। ছোট সময় হইতেই তাঁহার ধর্মের প্রতি একনিষ্ঠতা দেখিয়া লোকে তাহাকে নফসে যাকিয়া অর্থাৎ পবিত্র ব্যক্তি বলিত। যেহেতু তাহার নাম মুহাম্মাদ, পিতার নাম আবদুল্লাহ এবং মায়ের নামও বোধহয় আমিনা ছিল, সেহেতু যে সব হাদীসে ইমাম মেহদীর আবির্ভাব এবং বিদ্রোহের কথা উল্লেখ রহিয়াছে, তাই কিছুসংখ্যক এই মুহাম্মাদ বা নফসে যাকিয়াকেই মেহদী বলিয়া বিশ্বাস করিতে লাগিল। যেমন আব্বাসিগণ বিশ্বাস করিত শাসন ক্ষমতা বনী উমাইয়াদের হাত হইতে তাহাদের হাতে আসিবে। তেমনি হাসানী বংশেও এই সুধারণা প্রসার লাভ করিয়াছিল যে, ইমাম মেহদী তাহাদের মধ্যে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন এবং বনী আব্বাসীদের নিকট হইতে তাঁহাদের নিকট ক্ষমতা হস্তান্তর হইবে।

হাসানী বংশের জিহাদের কার্যকরী পরিকল্পনা

এই ধারণাই ক্রমান্বয়ে বাস্তবে পরিণত হইল। যে সময় মনসুর খিলাফতের আসন দখল করেন তখন হাসানী বংশের রাজনৈতিক প্রস্তুতি প্রায় পূর্ণতা লাভ করিয়াছিল। মুহাম্মদ নফসে যাকিয়ার পিতা আবদুল্লাহ তখনও জীবিত। আবদুল্লাহ্‌র কয়েকজন ভাই ছাড়াও প্রাপ্তবয়স্ক কয়েকজন ছেলে ছিলেন। তাঁহারা বিপ্লবের কেন্দ্রস্থল মদীনায় স্থাপন করিবেন বলিয়া স্থির করিলেন। ইহা ব্যতীত প্রত্যেক প্রদেশে নিজেদের এক একজন করিয়া লোক পাঠাইবার ব্যবস্থা করিলেন। তাঁহারা নিজস্ব প্রদেশের মুসলমানদের বর্তমান হুকুমতের বিরুদ্ধে আন্দোলন করিতে উৎসাহী করিবেন। আল-মাস'উদী লিখিয়াছেন সকল শহরের লোকই নফসে যাকিয়ার হাতে বায়'আত গ্রহণ করিয়াছেন। অতঃপর কোন প্রদেশে কাহাকে পাঠানো হইয়াছিল—তাহাদের নামের তালিকাও লিপিবদ্ধ করিয়াছেন।

নফসে যাকিয়ার পুত্র আলী ইবন মুহাম্মাদকে মিসর, অন্য পুত্র আবদুল্লাহ্‌কে খোরাসান, অন্য পুত্র হাসানকে ইয়ামন, তাহার ভাই

মূসাকে মূসিল; ইদরীসকে আফ্রিকা, মরক্কে; অন্য ভাই ইবরাহীমকে বসরা পাঠানো হইয়াছিল। [১]

আব্বাসী খিলাফত ধ্বংসের অভিপ্রায়

হাসানী বংশের এই বিপ্লব সাধারণ বিপ্লব ছিল না। বরং সমস্ত ইসলামী জগতে বিদ্রোহ ঘোষণা করিয়া একদিনেই আব্বাসী বংশকে ক্ষমতাচ্যুত করা হইবে, ভিতরে ভিতরেই এই প্রস্তুতি চলিতেছিল এবং এক নির্দিষ্ট তারিখেই বিদ্রোহ ঘোষণা করা হইয়াছিল। অবস্থা এতটা নাযুক হইয়াছিল যে, আল-ইয়াফী প্রত্যক্ষদর্শীদের বর্ণনা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন যে, 'যদি মনসূর সৌভাগ্যশালী না হইত তবে তাঁহাকে অবশ্যই পরাজয় বরণ করিতে হইত।'

১। প্রত্যেকেই স্ব-স্ব-এলাকায় মুসলিম অধিবাসীদের স্বমতে আনিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। অতঃপর নফসে যাকিয়া মদীনায় নিজকে খলীফা হিসাবে প্রচার করিলেন। কিন্তু আব্বাসী খলীফার হাতে পরাজয় বরণ করিয়া হযরত নফসে যাকিয়া শহীদ হইলেন। অন্যান্য যাঁহারা যেখানে ছিলেন সেখানেই শহীদ হইলেন, কেহ বা বন্দী হইয়া তিলে তিলে মৃত্যুবরণ করিলেন। অবশ্য ইদরীস ইবন আবদুল্লাহ নফসে যাকিয়ার ভাই মরক্কো ও আফ্রিকার শেষ প্রান্তে একটি স্বতন্ত্র রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। উহা আর এক ইতিহাস।

এই ভাগ্য বিপর্যয়ের পর হাসানী বংশ ও হুসায়নী বংশ জীবনের মোড় ঘুরাইয়া দিয়া শান্তিতে বসবাস করার মনস্থ করিলেন। যখনই তাহারা রাজনৈতিক পথে কোন হুকুমতের শাসনভার গ্রহণে মনস্থ করিয়াছেন-তখনই মনে হইয়াছে, আল্লাহ্ তাঁহাদের কাজে সম্মত হন নাই। ইহার ভাল-মন্দ আল্লাহই অধিক জ্ঞাত।

কিন্তু অভিজ্ঞতায় যাহা দেখা যায় তাহা এই যে, শাসন ক্ষমতা যাহাদের হাতে আসে তাহারা প্রথমে কম হইলেও ক্ষমতা বৃদ্ধির সাথে সাথে ফেরআউনে পরিণত হইতে থাকে। তাহারা সকলের মাথা কাটিতে পারিবে অথচ তাহাদের বিরুদ্ধে সত্য কথা বলারও কাহার অধিকার নাই। ফলে তাহারা ইহকাল ও পরকালে বদনামের পাত্র হইয়া থাকে। হযরত মুহাম্মাদ (সঃ)-এর বংশধর যাহাতে এমন বদনামের অধিকারী না হয় তজ্জন্যই হয়ত আল্লাহ তা'আলা তাহাদিগকে হুকুমতের অধিকারী হওয়া হইতে দূরে সরাইয়া রাখিয়াছিলেন।

হাসানী বংশের এই প্রচেষ্টা ইতিহাস বিস্তারিতভাবে লিপিবদ্ধ করিয়াছে। এখানে আমি শুধু এতটাই বলিব যে, নফসে যাকিয়ার ভাই ইবরাহীম যিনি বসরায় প্রচার কার্য চালাইতেছিলেন, বসরা ছাড়াও তাঁহার প্রতিনিধি কুফায় গোপনে গোপনে লোকের নিকট হইতে বায়আত গ্রহণ করিতেছিলেন। এখানে বেশ কাজ হইতেছিল। সমস্ত ঐতিহাসিকই একমত যে, আব্বাসী খিলাফত ধ্বংস করার জন্য কুফায় এক লক্ষ তরবারি গোপনে প্রস্তুত হইয়াছিল।

আবূ জাফরের সংবাদ প্রাপ্তি

আবূ জাফর অন্য কোথাও না গিয়া একেবারে কুফায় গিয়া অবস্থিত হইলেন। হয়ত মনসূর সংবাদ পাইয়াছিলেন যে, বিপ্লবের প্রধান আড্ডা মদীনার পরই কুফা। কথিত আছে, ঈসা ইবন মূসা-মনসূরের পর যাহার খলীফা হওয়ার কথা ছিল, মনসূর তাহাকে ডাকিয়া বলিলেন, 'ভাই! এই সব যাহা কিছু হইতেছে শুধু তোমাকে আর আমাকে নিহত করার উদ্দেশ্যই। এখন হয় তুমি মদীনায় যাও, আমি এখানে থাকি—নয়ত তুমি এখানে থাক আমি মদীনায় যাই।'

অতঃপর ঈসা মদীনা যাওয়ার জন্য তৈয়ার হইলেন। আর মনসূর এখানে জায়নামায বিছাইয়া পঞ্চাশ দিন পর্যন্ত অপেক্ষা করিতে লাগিলেন—তাঁহার মাথা ইবরাহীমের নিকট যায় না ইবরাহীমের মাথা তাঁহার হাতে আসে।

আব্বাসীদের বিরুদ্ধে সর্বশ্রেষ্ঠ বিপ্লবে ইমাম সাহেবের অংশগ্রহণ

আব্বাসী হুকুমতের প্রারম্ভে তাঁহারা যতটা বিপদের সম্মুখীন হইয়াছিলেন সম্ভবতঃ শতাব্দীব্যাপী হুকুমতের ইতিহাসেও তাহার নযীর ছিল না। মদীনায় ইমাম মালিক (রঃ) ফতওয়া দিয়াছিলেন আব্বাসীরা জোরপূর্বক লোকের নিকট হইতে আনুগত্যের শপথ গ্রহণ করিয়াছেন। পরিণাম এই দাঁড়াইল যে, হাতে গণা কয়েকজন লোক ব্যতীত আর সকলেই মুহাম্মাদ নফসে যাকিয়ার পাশে আসিয়া দাঁড়াইলেন।

নবী-যুগের খন্দক যাহা প্রায় বিলীন হইয়া গিয়াছিল উহা আবার নূতনভাবে খনন করা হইল। দেড়শত বৎসর পর মনে হইতেছিল যে, আবার নবীবরের পবিত্র যুগ তাহাদের চোখের সামনে ভাসিয়া উঠিয়াছে। রফসে যাকিয়ার প্রতিনিধিগণ যে যে এলাকায় কাজ

করিতেছিলেন কম ও বেশ প্রত্যেক স্থানেই তাহারা কৃতকার্য হইয়াছিলেন। আল-ইয়াকী বলেন, 'তাইগ্রীস নদীর তীরবর্তী তাঁবু হইতে মনসুর কুফায় আসিয়া জায়নামাযে বসার পর প্রত্যহ তাঁহার নিকট বিপ্লবের সংবাদ আসিতে লাগিল।

যাহা হইবার তাহা তো হইতেছিল। জিজ্ঞাসা হইল এই, আন্দোলনে ইমাম সাহেবের কি প্রকার অংশ ছিল। ইবরাহীম সায়েগের ঘটনায় ইমাম সাহেবের মতামত বিস্তারিতভাবে আলোচিত হইয়াছে। সেই বিপ্লবের আগে 'উপেক্ষা কর এবং দেখ' নীতির উপর তিনি ছিলেন। সুশৃংখল সমবেত শক্তি ব্যতীত ব্যক্তিগতভাবে কোন বিপদে ঝাঁপাইয়া পড়িলে যেখানে নিহত হওয়ার আশংকা আছে—এমন কাজের তিনি বিপক্ষে ছিলেন। এই অবস্থায় সম্ভাব্য সত্যের পথে অগ্রসর হওয়াই তাঁহার নীতি ছিল। এ বিষয়ে ইমাম সাহেব যে উদাহরণ স্থাপন করিয়া গিয়াছেন তাহা আপনারা পাঠ করিয়াছেন।

বিপ্লব সম্পর্কে ইমাম সাহেবের মতবাদ প্রকাশ

তখন সময়ের পরিবর্তন সাধিত হইয়াছে। যে বাধার সম্মুখীন হইয়া ফরয আদায় হইতে বিরত থাকা যাইত সে বাধা আর তখন ছিল না। ইসলামী জগতের শ্রেষ্ঠ শক্তি সমবেত হইয়াছিল এবং ইমামের শর্ত, এই সমবেতভাবে বিপ্লবের বল্গা এমন এক ব্যক্তির হাতে থাকিতে হইবে যিনি ধর্মের ব্যাপারে নিরাপদ ও নির্ভীক হইবেন যিনি পূর্ণতা লাভ করিয়াছিল অর্থাৎ এমন ব্যক্তি নেতৃত্ব দিবেন যাহাকে ধর্ম ও ঈমানের দিক হইতে পূর্ণভাবে বিশ্বাস করা যায়।

এই সমস্ত ঘটনাবলী মুহাম্মাদ নফসে যাকিয়া এবং তাঁহার ভাই ইবরাহীমের মধ্যে পূর্ণভাবে বিদ্যমান ছিল। কোন কোন কিতাবে লিখিত আছে যে, মুহাম্মাদ ইবন আবদুল্লাহর ইবাদত-বন্দেগী এবং খোদা ভক্তি দেখিয়াই লোকে তাঁহাকে 'নফসে যাকিয়া', তদ্রূপ তাহার ভাই ইবরাহীমকে 'নফসে রাযিয়াহ' উপাধি দিয়াছিল। তাছাড়া বীরত্ব নির্ভীকতা, বদান্যতা যাহা হযরত আলী (রঃ)-এর বংশের প্রকৃতিগত স্বভাব উহা তাঁহাদের মধ্যে বিদ্যমান ছিল। এই গুণাবলীর জন্যই লোক তাঁহাদের পাশে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল।

বিপ্লবে প্রকাশ্য সাহায্য

ইমাম সাহেবের প্রতীক্ষা করার সময় চলিয়া গিয়াছিল। তাঁহার সৌভাগ্য যে প্রতীক্ষার সময় অতিবাহিত হওয়ার পর আল্লাহ তাআলা

তাহার মনের সবচেয়ে বড় আকাঙ্খা পূর্ণ করার সুযোগ উপস্থিত করিয়া দিলেন।

আল-ইয়াফী বলেন, "কুফায় ইবরাহীমের সহায়তার জন্য যাহারা লোকদিগকে প্রস্তুত করিতেছিলেন তাঁহাদের মধ্যে অগ্রণী ছিলেন ইমাম সাহেব এবং কুফার বিশিষ্ট কয়েকজন লোক। যেমন ইবরাহীম হাসীম, আবু খালিদ আহমার, ঈসা ইবন ইউনুস, ইবাদ ইবন আওয়াল, ইয়াযীদ ইবন হারুন ইত্যাদি মনীষীগণ। ইঁহারা প্রত্যেকেই বড় বড় দলের নেতা ছিলেন। ইবরাহীম সায়েগের ঘটনায় ইমাম সাহেব নিজেকে যতটা গোপন রাখার চেষ্টা করিয়াছেন তেমনি ইবরাহীম ইবন আবদুল্লাহর সহায়তায় ততটা প্রকাশ করিতেছিলেন। বয়সও প্রায় ৬৬ বৎসর হইয়াছিল।" ঐতিহাসিকগণ লিখিয়াছেন, "ইবরাহীমকে সাহায্য করার জন্য ইমাম সাহেব লোকদিগকে প্রকাশ্যভাবে বলিতেন এবং লোকদিগকে নির্দেশ দিতেন, তাহার সাথী হইয়া হুকুমতের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ কর।"

ইহার অর্থ তো এই দাঁড়ায় যে, হুকুমতের প্রতিশোধ গ্রহণ করার প্রতি বে-পরওয়া হইয়া প্রকাশ্যভাবেই তিনি ইবরাহীমের সহায়তা করিতেছিলেন। শুধু তিনি নিজেই নন তাঁহার অনুগত সবাইকে তিনি একাজ করার জন্য উৎসাহ দান করিতেন। আমর (امر) শব্দের ব্যবহারগত অর্থ লইলে ইহাই দাঁড়ায় যে—ইবরাহীমের সাথী হইয়া অত্যাচারী সরকারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করা ফরয। তিনি উহাকে কিরূপ ফরয মনে করিতেন সে সম্বন্ধে প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস ইবরাহীম ইবন সুওয়াইদ বলেন, "আমি ইবরাহীম ইবন হাসানের বিদ্রোহ ঘোষণা করার সময় ইমাম সাহেবের নিকট জিজ্ঞাসা করিলাম, ফরয আদায় করার পর পুনরায় হজ্জ করা ভাল না ইবরাহীমের সাথী হইয়া সরকারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা ভাল ?"

ইমাম সাহেব বলিলেন, "এই যুদ্ধে শরীক হওয়া পঞ্চাশ হজ্জ পালনের চেয়ে অধিক পুণ্যের কাজ।"

হুসায়ন ইবন সালমাহ রাজহী বলেন, 'একজন মহিলা ইমাম সাহেবের নিকট বলিতেছিলেন, 'আমার ছেলে ইবরাহীমকে সাহায্য করিতেছে। আমি তাহাকে নিষেধ করা সত্ত্বেও সে আমার কথা গ্রাহ্য করিতেছে না।'

ইমাম সাহেব সেই মহিলাকে বলিলেন, "দেখ, এমন পুণ্যের কাজ হইতে তোমার ছেলেকে বিরত রাখিও না।"

হাম্মাদ ইবন আইন বলেন, 'ঐ সময় ইমাম সাহেব ইবরাহীমকে সাহায্য করার জন্য লোকদের উৎসাহ দিতেন।'

ইমাম সাহেব এই কাজ কতটা নির্ভীকভাবে করিতেন তৎসম্বন্ধে তাহারই একজন ছাত্র যাফর ইবন হুসায়ন বলেন, "ইবরাহীমের বিপ্লবের সময় ইমাম সাহেব উচ্চৈঃস্বরে লোকদের সাথে কথাবার্তা বলিতেন অর্থাৎ আব্বাসীদের বিরুদ্ধে ইমাম সাহেব যাহা বলিতেন প্রকাশ্যেই বলিতেন।"

আব্বাসীদের বিরুদ্ধে জিহাদের ফতওয়া

আব্বাসীদের বিরুদ্ধে জিহাদ করা পঞ্চাশ হজ্জের চেয়েও বেশী পুণ্যশীল-একথা বলিয়াই তিনি চুপ থাকিতেন না বরং প্রকাশ্যভাবে তাঁহা সাহায্যার্থে কর্মক্ষেত্রে ঝাঁপাইয়া পড়িয়াছিলেন। ইমাম সাহেব ফতওয়া দিয়াছিলেন—'অমুসলিম সম্প্রদায়ের সাথে জিহাদ করার চেয়ে বর্তমান অবস্থায় হুকুমতের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করা অধিক পুণ্যের কাজ।" এই ফতওয়ার দরুন মুহাদ্দিছদের একটি বড় দল ইমাম সাহেবের প্রতি ক্ষুব্ধ ছিলেন।

প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস ইবরাহীম ইবন মুহাম্মদ আল-ফাযারী সম্পর্কে খতীব একটি ঘটনার উল্লেখ করিয়াছেন,—ইবরাহীম তখন আসিয়া সীমান্তের সৈন্য ছাউনিতে ছিলেন। ইবরাহীমের ভাষ্যে খতীব বলেন 'আমি তখন সিরিয়া সীমান্তের ছাউনি মাছীছায় ছিলাম। আমি সংবাদ পাইলাম যে, আমার ভাই হাসান ইবরাহীমের সাথে যোগ দিয়াছে এবং সেই বিপ্লবেই নিহত হইয়াছে। এই সংবাদ পাইয়া আমি কূফায় পেঁাছিলাম। কূফায় আসিয়া সংবাদ পাইলাম যে, আবু হানীফার ফতওয়ার মুতাবিকই আমার ভাই জিহাদে শরীক হইয়া নিহত হইয়াছে। আমি ইমাম আবু হানীফার নিকট গিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, 'তুমিই কি ফতওয়া দিয়া আমার ভাইকে নিহত করাইয়াছ ?"

মুহাদ্দিস ইবরাহীম বলেন, "আব্বাসীদের সমর্থক ইমাম সাহেব একথা জানা সত্ত্বেও বলিলেন, 'হাঁ, আমিই আব্বাসীদের বিরুদ্ধে জিহাদের ফতওয়া দিয়া তোমার ভাইকে উৎসাহ দিয়াছি।'

ইবরাহীম একথা শুনিয়া বলিলেন, "আল্লাহ যেন তোমার মঙ্গল না করেন।"

ইমাম সাহেব বলিলেন, 'আমারও সেই অভিমত।' অতঃপর

ইবরাহীমকে উদ্দেশ্য করিয়া বলিলেন, "তুমিও যদি তোমার ভাইয়ের সাথে শহীদ হইয়া যাইতে তবে এখন যেখান হইতে তুমি আসিয়াছ উহা অপেক্ষা ভাল হইত।'

ইবরাহীম আল-ফাযারী পরবর্তীকালে হারুনুর রশীদের নিকট এই ঘটনা বর্ণনা প্রসঙ্গে ইমাম সম্বন্ধে বলিতেন—

"আমীরুল মুমিনীন। আপনার মহান দাদা মনসুরের বিরুদ্ধে ইবরাহীম যখন বিদ্রোহ ঘোষণা করিয়াছিলেন তখন আমার ভাইও ইবরাহীমের সাথে জিহাদে যোগ দিয়াছিল। কিন্তু আমি উহার পরিবর্তে কাফিরদের বিরুদ্ধে জিহাদ করাই পসন্দ করিয়াছিলাম। এই উদ্দেশ্যে ইমাম আবু হানীফার নিকট গিয়াছিলাম। তিনি আমার কথা শুনিয়া বলিয়াছিলেন 'তোমার ভাই যে কাজ করিয়াছে উহা তোমার পসন্দনীয় কাজ হইতে অনেক ভাল।'

(ইবন আসাকির, ২৫৫ পৃঃ, ২য় জিলদ)

ইবরাহীম আল-ফাযারী ইমাম সাহেবের পরামর্শ না শুনিয়া রোমকদের সাথে জিহাদ করার জন্য সেই সময় মাছীছার সৈন্য শিবিরে চলিয়া গিয়াছিলেন। খোদাই জানেন, রোমীয়দের সাথে জিহাদ করার সৌভাগ্য তাহার হইয়াছিল কি না ?

সে যাহাই হউক-প্রকৃতপক্ষে ইহা ঐ মাসআলা যাহার বর্ণনা পূর্বেও করা হইয়াছে। আবু বকর জাসসাস এবং হাফিজ ইবনে হযমের মধ্যস্থতায় বর্ণিত করা হইয়াছে যে, প্রথমে বনী উমাইয়া এবং পরে যখন বনী আব্বাসের হাতে শাসন ক্ষমতা আসিল তখন মুহাদ্দিসদের একটি দল এই নীতির সমর্থক ছিলেন যে, যে বা যাহারাই হুকুমতের পরিচালক হউক না-কেন তখন তাহাদের বিরুদ্ধে কিছু বলা শরীয়ত মুতাবিক অবৈধ। তাঁহারা যাহা কিছু করুন-না-কেন মযহাবী অনুশাসন মতে চুপ করিয়া থাকিতে এবং তাহাদের অনুগত থাকিতে হইবে। আবু বকর জাসসাস তাঁহাদের এই নীতির ব্যাখ্যা এরূপ ভাবে করিয়াছেন—

"তাহাদের নীতি, হুকুমতের অত্যাচার ও উৎপীড়ন করার বিরুদ্ধে কোন কিছু বলিতে নাই। এমন কি যাঁহাকে নিহত করা আল্লাহ ত'আলা হারাম করিয়াছেন হুকুমত তাঁহাকে হত্যা করিলেও বিরোধিতা করিতে নাই।'

আবু বকর জাসসাস লিখিয়াছেন, "তাহাদের মতে ন্যায়ের আদেশ এবং অন্যায়ের বিরোধিতা করার সীমারেখা ঐ সমস্ত লোকদের

পর্যন্ত সীমিত যাঁহারা হুকুমতের কোন শক্তি রাখে না। আর জনসাধারণকে শুধু মৌখিক উপদেশ দিবে অথবা হাত দ্বারা বারণ করার সম্ভাবনা থাকিলে তাহাই করিবে। কিন্তু কোন অবস্থাতেই তরবারী ব্যবহার করিতে পারিবে না।"

জাসসাস মুহাদ্দিসীদের এই সম্প্রদায়কে হাশ্‌বিয়া নামে অভিহিত করিয়াছেন। তাঁহাদের বিশ্বাস ছিল, হুকুমতের বিরুদ্ধে সত্যের আদেশ ও অন্যায়ের নিষেধ করা পুণ্যের কাজ নয় বরং তাহাতে ঝগড়া-বিবাদ ও অশান্তির সৃষ্টি হয়।

পূর্বে আলোচনা করা হইয়াছে যে, ইসলামী রাষ্ট্রনীতির কয়েকটি বুনিয়াদী সমস্যার মধ্যে ইহাও একটি গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা। ইসলামী রাষ্ট্রনীতি সম্পর্কে যে গ্রন্থ রচনা করা হয় তাহাতেই এই বিষয়ে বিস্তারিত ভাবে আলোচনা করা সম্ভব। তবুও আমি যতদূর সম্ভব এই গ্রন্থে আলোচনা করিয়াছি। কিন্তু আল-ফাযারী ইহা ছাড়াও এখানে যে অন্য বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত করিয়াছেন আমি সেই বিষয়েই কিছু আলোকপাত করিতে চাই।

অর্থাৎ জোরযবরদস্তী পূর্বক মুসলমানদের রাজনৈতিক ক্ষমতা হস্তগত করিয়া মুসলমানদের উপর যাহারা জাহান্নামের আগুন জ্বালাইয়া রাখিয়াছে তাহারা তাহাদের রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সাধন করার মানসে ইসলামী আইন-কানুন মুতাবিক চলা নিষ্প্রয়োজন মনে করিয়া থাকে। তাহাদের এই অন্যায় উৎপীড়ন বন্ধ করার যদি কোন সুযোগ হয় তখন কি তাহাদের এই অন্যায় উৎপীড়ন বন্ধ করার ব্যবস্থা করিতে হইবে, না এই কথা মনে করিয়া যে, অত্যাচারী হউক বা উৎপীড়নকারী হউক মুসলমানদের হাতেই তো ক্ষমতা রহিয়াছে, সুতরাং তাহাদের বিরোধিতা না করিয়া এমন স্থানে চলিয়া যাইতে হইবে যেখানে কাফিরদের বিরুদ্ধে জিহাদ করার সুযোগ-সুবিধা পাওয়া যাইবে?

আল-ফাযারী তখন এই মাসআলাই দিয়াছিলেন। তিনি এবং তাঁহার মতবাদে বিশ্বাসী অন্যান্য মুহাদ্দিসগণ এই ধারণাই পোষণ করিতেন যে, যাহা কিছুই হউক না কেন কোন অবস্থাতেই কোন মুসলমানের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করা জায়েয নহে। তাহারা যাহা কিছুই করুন না কেন সেদিক খেয়াল না করিয়া কাফেরদের বিরুদ্ধেই ফরয জিহাদ আদায় করিতে হইবে।

সত্য বলিতে কি সেই যুগেও এ বিষয় লইয়া মুসলমানদের মধ্যে বেশ তর্ক-বিতর্ক এবং দলাদলির সৃষ্টি হইত। তাহারা বনী উমাইয়াদের

বিরুদ্ধাচারণ করায় হযরত আলী (কঃ)-কে দোষী সাব্যস্ত করিয়াছিল। তাহাদের অভিযোগ ছিল, মুসলমান কাফেরদের বিরুদ্ধে জিহাদ করিয়া আসিতেছিল, দেশের পর দেশ ইসলামী হুকুমতের অধীনস্থ করিতেছিল এমন সময় হযরত আলী (কঃ) ইসলামী রাষ্ট্রের খলীফা হইলেন।

হযরত আলী (কঃ) খলীফা হওয়ার পর মুজাহিদ বাহিনীর লক্ষ্য এমন এক সম্প্রদায়ের প্রতি নিবদ্ধ করিলেন যাঁহারা তওহীদের কালেমা পাঠকারী মুসলমান ছিলেন। তাঁহারা বলেন, "যুদ্ধ ও শক্তি পরীক্ষা কাফেরদের সাথে হইত হযরত আলী (কঃ) সেই যুদ্ধ ও শক্তি পরীক্ষা মুসলমান-মুসলমানে বাধাইয়া দিলেন। এক মুসলমানের অন্য মুসলমানের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করার নীতি হযরত আলী (কঃ) প্রথম প্রবর্তন করিলেন।'

এই সমস্ত বিষয়বস্তুকে উদ্দেশ্য করিয়া তাহারা হযরত আলী (কঃ) সম্পর্কে যে সব অশোভন উক্তি করে উহার অভিযোগ একমাত্র আল্লাহর নিকট করা ব্যতীত প্রতিকারের দ্বিতীয় কোন ব্যবস্থা আজও হয় নাই, আর কখনও হইবে বলিয়াও বিশ্বাস হয় না। হযরত আলী (কঃ)-এর খিলাফতকালের চিত্র অংকিত করিয়া তাহারা বলে যে, হযরত আলী (কঃ)-এর ন্যায় এমন দুর্বলচেতা ও অকৃতকার্য শাসক ইসলামী জগতে আর কেহ ছিলেন না। তাঁহার অকৃতকার্যতার প্রমাণ এই যে, তাঁহার শাসনকালে এক ইঞ্চি পরিমাণ জমিও ইসলামী রাষ্ট্রের আওতাভুক্ত হয় নাই, বরং ইসলামের যে শক্তি ও সুনাম ছিল তাঁহার খিলাফতকালেই উহা অনেকাংশে দুর্বল ও ক্ষুণ্ণ হইয়া পড়িয়াছিল।

কিন্তু দুঃখের বিষয় তাহাদের এই ভ্রান্তি দূর করার জন্য যে বিস্তৃত আলোচনার প্রয়োজন উহা এই গ্রন্থের বিষয়বস্তুও নয় এবং উহার স্থান এই গ্রন্থে সংকুলানও হইবে না। তবে ভবিষ্যতে এই বিষয়ে পুংখানুপুংখরূপে আলোচনা করার আশা রহিল।

ইসলামী আইন প্রবর্তনের জন্য ইমামের উৎসাহ-উদ্দীপনা

হয়ত বিষয়বস্তু হইতে কিছু দূরে সরিয়া পড়িতে হইয়াছে। কথা হইতেছিল ১৪৫ হিজরীর যখন সমস্ত ইসলামী জগত একত্রিত হইয়া মদীনাকে কেন্দ্র করিয়া নফসে যাকিয়ার নেতৃত্বাধীনে আব্বাসী হুকুমতকে ধ্বংস করার জন্য তৈয়ার হইয়াছিল সমস্ত প্রদেশগুলির তরবারিই কোষমুক্ত হইয়াছিল তখন নফসে যাকিয়ার ভাই ইবরাহীম বসরা

হইতে বিপ্লবী বাহিনী লইয়া কূফা রওয়ানা হইয়াছিলেন। এই কূফা-তেই "আব্বাসী খলীফা মনসূর ময়লা কাপড় পরিধান করিয়া জায়নামাযে এই সংকল্পে বসিয়া রহিয়াছিলেন যে, হয় ইবরাহীমের মাথা আমার সামনে আসিবে—নয় আমার মাথা ইবরাহীমের হাতে যাইবে।

ইমাম আবূ হানিফা (রঃ) ইবরাহীমের পক্ষ লইয়া প্রকাশ্যভাবে কূফায় কাজ চালাইয়া যাইতেছিলেন। ইমাম সাহেব মুহাদ্দিস ফাযা-রীর ভাই হাসানকে আব্বাসীদের পক্ষ ত্যাগ কারাইয়া ইবরাহীমের পক্ষাবলম্বন করিতে রাযী করাইয়াছিলেন। এই বিপ্লবেই হাসান শহীদ হই। মধ্যে এমন একটি সমস্যা দেখা দিল যে, ১৩৫ হিজরী হইতে একশত বৎসর পিছনের এই কুফা এবং বসরার আশে পাশেই জঙ্গে জামাল ও জঙ্গে সিফফীনের যে ভয়ানক হানাহানির দৃশ্য দেখা গিয়াছিল সেই বিতর্কেই আবার লিপ্ত হইয়া পড়িতে হইল। দৃশ্যতঃ যদিও দুইটি ঘটনার মধ্যে একশত বৎসরের ব্যবধান, কিন্তু সমস্যা সেদিনও যাহা ছিল আজও তাহাই হইল। একদিকে মুসলমানদের একটি দল যাহাদের সম্মুখে কর দাতাদের সংখ্যার বৃদ্ধি, ইসলামেরও এবং মুসলমানদেরও সবচেয়ে বড় খেদমত ছিল, আর অন্যদিকে যাহারা ছিলেন তাহাদের লক্ষ্য ছিল হুযূর (সঃ)-এর রচিত আইন-কানুন প্রতিষ্ঠা করা। এই জন্য জীবন উৎসর্গ করিতেও তাহারা কুণ্ঠিত ছিলেন না। মনে হয় জীবনের শেষ সুবর্ণ সুযোগ মনে করিয়া ইমাম সাহেবও জান কবুল করিয়াছিলেন।

"আব্বাসীয়দের হাতের ক্রীড়নক আল-আছীর বলেন—"যাহার সম্বন্ধে সামান্য পরিমাণ সন্দেহ হইত হুকুমতের সৈন্যগণ তাহাকে ধরিয়া লইয়া যাইত। কিন্তু আমরা দেখিতে পাইয়াছি যাহার উপর ইমাম সাহেবের সামান্য পরিমাণ প্রভাবও ছিল তিনি তাহাকেই প্রকাশ্যভাবে ইবরাহীমের সাথে যোগ দিতে উৎসাহ দিতেন। শুধু নফল পঞ্চাশ হজ্জের উপরই নয় বরং কাফিরের বিরুদ্ধে জিহাদ করার চেয়ে তখন ধন-সম্পদ এবং প্রাণ দিয়া এম বিপ্লবে সাহায্য করাকে অধিক পুণ্যের কাজ বলিয়া তিনি ফতওয়া দিতেন। কারণ এই বিপ্লবকারিগণ আল্লাহর কিতাব, রসূলের সুন্নত এবং খোলাফায়ে রাশেদীনের আদর্শে আবার হুকুমতকে সুপ্রতিষ্ঠিত করার জন্যই এই বিপ্লব আরম্ভ করিয়াছিলেন।

ইমাম সাহেবের ছাত্রদের জীবনের উপরও আশংকা

এই সম্পর্কে ইমাম সাহেবের উৎসাহ-উদ্দীপনা যে চরমে পৌঁছিয়া-ছিল উহার অনুমান ইহা দ্বারাই করা যায় যে, ইমাম সাহেব এবং

তাহার পরিবারবর্গের উপরই যে-কোন সময় হুকুমতের করাল শাস্তি নামিয়া আসিতে পরে, তাহাই নয় বরং ইমাম সাহেবের প্রিয় ছাত্র যাফর ইবন হুযাইলের বর্ণনা মতে জানা যায় যে, ইমাম সাহেবের আমল প্রণয়ন সমিতির সভ্য থাকুন বা তাহার শিক্ষা মজলিসের ছাত্র থাকুন, মোট কথা যাহারা ইমাম সাহেবের সাথে শিক্ষাগত সম্পর্ক রাখিতেন তাহাদের জীবনের উপরও এক ভয়াবহ অবস্থা নামিয়া আসিয়াছিল। আর উহা কিরকম ভয়াবহ ছিল? যাফর ইবন হুযামল সেই অবস্থা দেখিয়া ইমাম সাহেবকে বলিয়াছিলেন—"আমাদের গর্দানে ফাঁসীর দড়ি না লটকানো পর্যন্ত আপনি একাজ হইতে বিরত থাকিবেন না।"

ইমাম সাহেবের প্রত্যেক ছাত্র অথবা তাঁহার আইন প্রণয়ন সমিতির প্রত্যেক সভ্য ইহাই অনুমান করিতেছিলেন যে, আজ না হউক কাল অবশ্য আমাদের ফাঁসিকাষ্ঠে ঝুলিতে হইবে। যতদূর মনে হয় কোন প্রকার ফলাফলের দিকে মোটেই দৃষ্টিপাত না করিয়া ইমাম সাহেব এই অগ্নিসাগরে ঝাঁপাইয়া পড়িয়াছিলেন এবং সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন —যত বিপদই আসুক না কেন কোন মতেই সংকল্পচ্যুত হইব না।

কোন কিছু তাঁহাকে সংকল্পচ্যুত করিতে পারিল না। বরং তাঁহার উৎসাহ-উদ্দীপনা দিনের পর দিন বাড়িয়াই চলিল। ফল এই দাঁড়াইল যে,—যে সমস্ত তরবারি সময়ের অপেক্ষায় ছিল ইমাম সাহেবের প্রচারে তার চেয়েও বেশী সময়ে বাহির হইয়াছিল। কিন্তু ইহা যে ইমাম সাহেবের কত বড় কাজ ছিল উহা অপরিমিত বর্ণনায় বোঝা সম্ভব নয়।

ইমাম সাহেবের সাফল্য

বনী উমাইয়া এবং বনী আব্বাসের ক্ষমতার দ্বন্দ্বে যদিও আবু মুসলিম খোরাসানীর নামই আগে আগে দেখা যায় এবং এই পর্যন্ত যাহা কিছু বর্ণিত হইয়াছে উহাতেও আবু মুসলিমকেই গুরুত্ব দেওয়া হইয়াছে তথাপি সত্য বলিতে কি আব্বাসীদের কৃতকার্যে আবু মুসলিমের বুদ্ধির গুরুত্বই ছিল সর্বাধিক। উপস্থিত বুদ্ধি, এবং ধোকা ও ফেরেব্বাজী দ্বারা অবশ্য তিনি বড় বড় কাজ সমাধা করিয়াছেন। কিন্তু আব্বাসীদের ক্ষমতা বৃদ্ধির মূলে যে লৌহ-মানব কাজ করিয়াছিলেন জনসাধারণ সম্বন্ধে সামান্যই অবগত।

আব্বাসীদের প্রথম প্রধান সেনাপতি কাহতাবাহ

আরবের প্রসিদ্ধ দানবীর হাতেম তাঈ বনী তাঈ বংশের লোক। বনী তাই বীরত্ব ও নির্ভীকতার জন্য সমস্ত আরবে প্রসিদ্ধ ছিল। আরবের দুর্ধর্ষ দস্যুরা এই বংশের লোক। সমস্ত আরব তাহাদের ভয়ে সদা কম্পবান থাকিত। 'জা' ও 'সালমা' পাহাড়ের সবুজ শ্যামল গগনচুম্বী চূড়ায় ছিল তাহাদের আড্ডা। আইয়্যামে জাহেলিয়াতের ইতিহাসের পাতা তাহাদের খুন-খারাবীর কাহিনীতেই পরিপূর্ণ। আব্বাসীদের পরম সৌভাগ্য যে ঠিক যখন তাহাদের আন্দোলন সিপাহী সংগ্রামের পর্যায় পেঁাছিল তখন বনী তাঈ-এর কাহতাবাহ নামক একজন বয়োবৃদ্ধ এবং অভিজ্ঞ সেনাপতি আব্বাসীদের হাতে আনুগত্যের শপথ গ্রহণ করিলেন।

প্রথম যেদিন আবু মুসলিম নিয়মমাফিক সৈন্যবাহিনী লইয়া বনী উমাইয়াদের বিরুদ্ধে রওয়ানা হইলেন সেই দিনই আব্বাসীদের ইমাম ইবরাহীমের আদেশে তাহাকে আব্বাসী সেনাবাহীর প্রধান নিযুক্ত করা হইল। সমস্ত ঐতিহাসিক একমত যে আবু মুসলিমই কাহতাবাহ্‌কে সিপাহসালার অর্থাৎ প্রধান সেনাপতির পদে নিয়োগ করেন এবং সমস্ত আব্বাসী সৈন্যদিগকে তাহার অধিন্যস্থ করিয়া দিলেন। সৈন্য নিয়োগ ও বরখাস্তের ভারও তাহার হাতে ন্যস্ত করা হইল। যেখানে যেখানে সৈন্য ছিল এই নির্দেশ পাঠানো হইল যে তাহারা যেন বিনা বাক্য ব্যয়ে কাহতাবাহ্‌র আদেশ মানিয়া লয়।

ইহার পর বনী আব্বাস ও বনী উমাইয়াদের মধ্যে যে কয়টি যুদ্ধ সংঘটিত হইয়াছে—প্রত্যেকটি যুদ্ধেই কাহতাবাহ্‌ অগ্রভাগে ছিলেন। আবু মুসলিমের তীক্ষ্ন বুদ্ধি এবং কাহতাবাহ্‌র বাহুবল—এই দুইটি উপকরণের উপরই আব্বাসী হুকুমত প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। মার্ভ নিশাপুর, জুরজান, রে, ইস্পাহান, নিহাওয়ান্দ মোট কথা যেখানে যেখানে বনী উমাইয়াদের সাথে প্রবল সংগ্রাম হইয়াছিল। সেই সবগুলির বিজয়ী সেনাপতিই ছিলেন কাহতাবাহ্‌। পরিশেষে ইবন হুবায়রার সাথে যখন ইরাক আসে তখন ফুরাতের মধ্যবর্তী স্থানে এক অন্ধকার রাতে সাংঘাতিকভাবে আঘাত পাইয়া নদীর মধ্যে পড়িয়া যান। সাথিগণ তাহাকে পানি হইতে উঠাইলে সে বলিল, 'আমার জখমের সংবাদ যেন লোকের মধ্যে প্রচার না হয়। বরং এই আঘাতে যদি আমার মৃত্যু হয় তবে আমার হাত-পা বাঁধিয়া নদীর মধ্যে ফেলিয়া দিও যেন লোকে আমার মৃত্যুসংবাদ জানিতে না পারে।'

কাহতাবাহ্‌র সন্দেহ হইয়াছিল তাহার মৃত্যু সংবাদ জানিতে পারিলে সৈন্যদের মনোবল ক্ষুণ্ন হইয়া যাইবে। তাহার আয়ু পূর্ণ হইয়া গিয়াছিল; অল্পক্ষণ পরই সে মারা গেল। তাহার নির্দেশমত হাত-পা বাঁধিয়া তাহাকে নদীতে নিক্ষেপ করা হইল।

ভোরবেলা কাহতাবাহ্‌কে না দেখিয়া সকলেই মনে করিল তিনি হয়ত কোথাও কোন জরুরী কাজে গিয়াছেন। কিন্তু পরে তাঁহার ভাসমান দেহ একটি নালার মুখে পাওয়া গেল। কিন্তু পৃথিবীর আজ পর্যন্ত কেহ জানে না কাহ্‌তাবাহ্‌ কখন এবং কাহার হাতে মারা গিয়াছিল।

আব্বাসীদের দ্বিতীয় সেনাধ্যক্ষ হাসান ইবন কাহ্‌তাবাহ্‌

কাহ্‌তাবাহ্‌র মৃত্যুর পর তাঁহারই ওসীয়ত মতে এবং সৈন্যদের মতানুযায়ী কাহ্‌তাবাহ্‌র পুত্র হাসান আব্বাসী বাহিনীর প্রধান সেনাপতি পদে অধিষ্ঠিত হইলেন। ইহার পর আব্বাসীদের যাবতীয় ফৌজী ব্যাপারে কাহতাবাহ্‌র পরিবর্তে তাঁহার পুত্র হাসানের নাম দেখা যায়। পিতার পর তিনিও ছিলেন আব্বাসী বাহিনীর সর্বেসর্বা। কিন্তু একথা বলা যায় না যে, ইমাম সাহেবের দৃষ্টি কখন হইতে হাসানের উপর ছিল। তবে ঘটনাক্রমে অনুমিত হয় মনসুর যেদিন হইতে ইমামকে টাকায় বশীভূত করার চেষ্টায় ছিলেন সেদিন হইতে হাসানের সাথে ইমাম সাহেবের প্রত্যক্ষ পরিচয় হয়। দশ হাযার দিরহামের তোড়া এই হাসানের মারফতই মনসুর ইমাম সাহেবের খিদমতে পেশ করিয়াছেন।

হাসান যখন এই দিরহামের তোড়া ইমাম সাহেবের সম্মুখে রাখিলে ইমাম তাহা দেখিয়া এতটা দুঃখিত হইয়াছিলেন যে, তাঁহার মুখ দ্বারা কোন কথা বাহির হইতেছিল না। অন্যান্যের সাথে হাসানের যে অভিজ্ঞতা ছিল উহার পরিপ্রেক্ষিতে ইহা ছিল হাসানের পক্ষে এক বিস্ময়কর অভূতপূর্ব অভিজ্ঞতা। তিনি চিন্তা করিতেছিলেন টাকা পাইয়া আনন্দ করার পরিবর্তে কেন তিনি দুঃখিত হইলেন? ইমাম আবু হানীফার এই স্বভাব এবং সচ্চরিত্রতা দেখিয়া হাসান ইবন কাহতাবাহ্‌ অভিভূত হইয়া পড়িল। ইহার পর হইতেই হাসান ইমাম সাহেবের নিকট যাওয়া-আসা করিতে লাগিল। কেননা ইহার পর মনসুর হাসানের কার্যাবলী দেখিয়া গোয়েন্দা বিভাগকে আদেশ দিলেন, "দেখ তো, কাহার পরামর্শে হাসান এরূপ করিতেছে?"

কয়েকদিন পর তিনি রিপোর্ট পাইলেন, 'তিনি ইমাম আবু হানীফার নিকট যাতায়াত করেন।'

কিন্তু কতদিন যাবত তিনি যাওয়া-আসা করিতেন উহা সঠিকভাবে বলা যায় না। তবে কাহতাবাহ্‌র অন্য পুত্র হাসানের ভাই মনসুরকে বলিয়াছিলেন, "আমীরুল মুমিনীন! এক বৎসর হইতে আমরা তাঁহার চাল-চলন কাথাবার্তায় পরিবর্তন লক্ষ্য করিতেছি। তখন হইতেই আমাদের সন্দেহ হইয়াছে যে, তিনি অন্য কোন লোকের সাথে গভীর সম্পর্ক স্থাপন করিতেছেন।"

ইমামের দরবারে হাসান

ইহাতে মনে হয় ইবরাহীম ইবন আবদুল্লাহ্‌র আন্দোলন যখন ভিতরে ভিতরে কুফা এবং বসরায় দানা বাধিতেছিল ঠিক সেই সময় ইমাম সাহেব আব্বাসী বাহিনীর এই প্রাণকেন্দ্রকে স্বপক্ষে আনার চেষ্টা করিতেছিলেন। ইহা কোন সাধারণ কথা নয়। আব্বাসী বাহিনী হইতে হাসানের চলিয়া আসা মানেই তাহার একা নয় বরং হাসানের প্রভাব যে সব উচ্চপদস্ত এবং সামান্য সৈনিকদের উপর ছিল তাহাদেরও চলিয়া আসা। এক কথায় বলা যাইতে পারে ইমাম সাহেবের এই কাজে আব্বাসী বাহিনীর শক্তি ও সামর্থের মূলে পদাঘাত কারার সামিল ছিল। যাহার পিতার শক্তিতে আব্বাসী হুকুমতের উত্থান এবং বর্ধন তাহারই প্রতিনিধি এবং স্থলাভিষিক্তকে স্বপক্ষে আনা সহজ কথা নয়। তাহাদের যাবতীয় সম্মান, প্রভাব, প্রতিপত্তি ও ধন-দৌলত এই চাকরীর উপরই ভিত্তি করিয়া হইয়াছিল। তাই হাসানের সৈন্যবাহিনী হইতে বিদায় হওয়ার অর্থই ছিল ঐ সবকে লাথি মারিয়া বিদায় করিয়া দেওয়া। কোন্ উপায়ে কোন্ কথায় ইমাম সাহেব হাসানকে স্বমতে আনিয়াছিলেন সেকথা বলা যায় না। শুধু সম্মান প্রতিপত্তি হারাইবে ইহাই নয় বরং ব্যাপারটি হইতেছিল স্বয়ং খলীফা আবু জাফরের সাথে। কিছুদিন পূর্বে এই আবু জাফর মনসুরই খিলাফতের সর্বপ্রধান সহায়ক আবু মুসলিম খোরাসানীকে কাহারও কোন সুপারিশ কানে না লইয়া নির্মমভাবে হত্যা করিয়াছেন।

তাই এমন সন্ধিক্ষণে হঠাৎ সৈন্যবাহিনীর দায়িত্বপূর্ণ কাজ হইতে অবসর গ্রহণ করা যে পরিণামে কি ভীষণ দুর্বিপাক আনিবে হাসান তাহা অনবগত ছিলেন না। ইহাকে ইমাম সাহেবের কারামত মনে করা যায়। আর কারামত না হইলেও আব্বাসী বাহিনীর প্রধান সেনাপতিকে স্বমতে আনা ইমাম সাহেবের প্রধান রাজনৈতিক সফলতা বলিতে দ্বিধা থাকে না।

আবু সহাফ কাবীর বলেন, "আসার পর হাসান ইমাম সাহেবের নিকট আরয করিতেছিলেন—আমার পূর্বাবস্থা যাহাই থাকুক না কেন এখন আমার শুধু জিজ্ঞাসা যে, যদি আমি তওবাহ করি তবে আমার তওবাহ আল্লাহ তা'য়ালা কবুল করিবেন কি না ?"

ইমামের উত্তর

ইমাম সাহেব বলিলেন,—

"যদি তুমি আল্লাহ্‌র নিকট সঠিক নিয়ত কর এবং সত্যবাদী হইয়া তোমার পূর্ববর্তী কৃতকার্যের জন্য লজ্জিত হইয়া এমন অবস্থায় উপনীত হও যে দুইটি কার্যের যে কোন একটি তোমাকে করার অধিকার দেওয়া হয় অর্থাৎ যদি বলা হয়, যে তুমি কোন মুসলমানকে (হুকুমত যাহার কথা বলে) নিহত কর অথবা নিজে নিহত হওয়ার জন্য তৈয়ার হও, এই অবস্থায় যদি তুমি নিজে নিহত হওয়ার জন্য তৈয়ার হইয়া যাও এবং খোদার সম্মুখে প্রতিশ্রুত হও যে, যাহা কিছু করিয়াছ উহা জীবনে আর পুনরাবৃত্তি করিবে না তবে তোমার এই সংকল্প এবং ইচ্ছাই তোমার তওবাহ্‌।"

হাসানের প্রতিশ্রুতি

হাসান ইমাম সাহেবের কথা গভীর মনোযোগের সাথে শুনার পর দ্বিতীয় কোন প্রশ্ন না করিয়াই খাঁটি সৈনিকের মতই উত্তর করিলেন, 'আমি তাহাই করিব।' অতঃপর তিনি বলিলেন 'আমি আল্লাহ্‌র নিকট প্রতিশ্রুতি দিতেছি যে, হুকুমতের নির্দেশে আমি এই পর্যন্ত যত মুসলমানকে নিহত করিয়াছি আর কখনও উহা করিব না।" (মুফিক ১৮৩, পৃঃ, ১ম জিলদ)

এই প্রতিশ্রুতি দেওয়ার পর তিনি পঁত্রিশ ছয়ত্রিশ বৎসর পর্যন্ত জীবিত ছিলেন। খতীব বলেন, "চুরাশি বৎসর বয়সে হারুনুর রশীদের খিলাফতের সময় তিনি ইনতিকাল করেন। কিন্তু তিনি যাহা বলিয়াছিলেন উহাতে স্থির ছিলেন।" পরীক্ষার সময়ও অতি শীঘ্র আসিয়া পড়িল অর্থাৎ যে বিপ্লব এতদিন ভিতরে দানা বাধিতেছিল উহা প্রকাশ হইয়া পড়িল। মদীনা হইতে নফসে যাকিয়ার বিপ্লবের কথা মনসুরের কানে পেঁাছিল। ইহার কয়েকদিন পরই ইবরাহীম বসরার এবং কুফায় বিদ্রোহের ঝান্ডা উড্ডীন করিলেন। মনসুর হাসানকে ডাকিয়া পাঠাইলেন।

হাসান খলীফার দরবারে উপস্থিত হওয়ার পূর্বে ইমাম সাহেবের খিদমতে হাযির হইয়া ঘটনা বলিলেন। ইমাম সাহেব তাঁহাকে বলিলেন, 'হাসান! তোমার তওবাহ্‌র পরীক্ষার সময় আসিয়াছে। তুমি আল্লাহ্‌র নিকট যে প্রতিশ্রুতি দিয়াছ উহা যদি পূর্ণ কর তবে আশা করি আল্লাহ তোমার তওবাহ্‌ কবুল করিবেন। আর যদি না কর তবে আজ পর্যন্ত যাহা কিছু করিয়াছ এবং ভবিষ্যতে যাহা কিছু করিবে তজ্জন্য অবশ্যই শাস্তি ভোগ করিতে হইবে।"

হাসান বলিলেন, "আমি আল্লাহ্‌কে সাক্ষ্য করিয়া বলিতেছি আপনার নিকট দেওয়া প্রতিশ্রুতি অবশ্য আমি পালন করিব।"

খলীফার দরবার হইতে আর ফিরিয়া আসিতে পারিবে না মনে করিয়া ইমাম সাহেবকে কোন কোন বিষয়ে ওসীয়ত করিয়া খলীফার নিকট তিনি উপস্থিত হইলেন খলিফা তাঁহাকে কোন কাজে নিযুক্ত করিলে অসুস্থতার অযুহাত পেশ করিয়া উহা হইতে মুক্তি চাহিলেন কিন্তু মনসূর তাঁহার কোন ওযর-আপত্তিই গ্রহণ করিলেন না এবং বলিলেন, 'তোমাকে অবশ্য সৈন্য পরিচালনা করিতে হইবে।' আরও কথাবার্তা কি হইয়াছিল বলা যায় না। অতঃপর হাসান বলিলেন,—

"আমিরুল মুমিনীন! আপনি আমাকে যে যুদ্ধে পাঠাইতে চাহেন সে সম্বন্ধে আমার শেষ অনুরোধ উহাতে অংশগ্রহণ করিতে আমি সম্পূর্ণরূপে অপারগ। আপনার শাসনকালে আমি যত লোক নিহত করিয়াছি; আল্লাহর জন্যই আমি আপনার আজ্ঞা পালন করিয়াছি—তবে অনেক কিছু অর্জন করিয়াছি। আর যদি আল্লাহ্‌র নাফরমানী করিয়া থাকি তবে এই পাপের বোঝাই আমার জন্য যথেষ্ট।"

মনসূর হাসানের কথা শুনিতেছিলেন আর জ্বলিতেছিলেন। আর এই চিন্তাও করিতেছিলেন যে, আমার আজ্ঞাবহ সেনাপতিকে কে আমার অবাধ্য করিল! দরবারে হাসানের ভাই হামিদ ছিলেন। তিনি এই অবস্থা দেখিয়া পূর্ব কথা আবার বলিলেন অর্থাৎ এক বৎসর যাবত আমরা তাঁহার এই পরিবর্তন লক্ষ্য করিতেছি। তখন হইতেই আমাদের সন্দেহ হইতেছিল তিনি হয়ত অন্য কাহারও সাথে মেলামেশা করিতেছেন এবং তিনি নিজের সমাজ ব্যবস্থা বাড়াইয়া তুলিতেছেন।

নফসে যাকিয়া এবং ইবরাহীমের শাহাদত

পরিতাপের বিষয় যে, এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা বর্ণনায় আমাদের রাজনৈতিক ভাষ্যকারগণ একেবারে নীরব,—বিশেষভাবে

তাবারী, কামিল ইবন কাছীর, ইত্যাদি ইতিহাস এ বিষয়ে চুপ করিয়া থাকায় আমাদের আরও সন্দেহজনক করিয়া তোলে। কিন্তু যখনই আমরা দেখিতে পাই যে, মুহাম্মাদ নফসে যাকিয়া এবং ইবরাহীমের বিপ্লব আরম্ভ করার পূর্বে কাহতাবার মৃত্যুর পর আব্বাসীদের প্রত্যেকটি যুদ্ধে হাসান ইবন কাহতাবাহ্ সৈন্য পরিচালনা করিতেন আর ঠিক সেই বিপ্লবের সময়ই কোন ইতিহাসে হাসানের নাম পর্যন্ত উল্লেখ নাই। হাসানের পরিবর্তে দেখিতে পাই তাহার ভাই হামীদের নাম।

নফসে যাকিয়াকে দমন করার জন্য আবু জাফর মনসুর তাহার ভ্রাতুষ্পুত্র 'ঈসা ইবন মুসাকে মদীনা পাঠান। সেই বাহিনীর সেনাপতিও ছিল হামীদ ইবন কাহতাবাহ্। এই কমবখতই নফসে যাকিয়ার বুকে বর্শা আমূল বিদ্ধ করিয়া দেয়। নফসে যাকিয়া মাটিতে পড়িয়া গেলে এই নিষ্ঠুর হামীদই তাহার পবিত্র মস্তক দ্বিখন্ডিত করিয়া ঈসা ইবন মুসার সম্মুখে পেশ করিয়াছিল। ঈসা সেই দ্বিখন্ডিত মাথা উপহারস্বরূপ মনসুরের দরবারে পাঠাইয়া দেন। অতঃপর সেই পবিত্র মাথা বর্শার অগ্রভাগে বিদ্ধ করিয়া কূফার বাজারের রাস্তায় রাস্তায় ঘুরাইয়া দেখানো হইয়াছিল।

মদীনার বিপ্লব আয়ত্তে আনার পর মনসুর ঈসা ইবন মুসা এবং হামীদকে মদীনা হইতে ডাকিয়া পাঠান। পুনরায় এই হামীদ এবং ঈসাকেই ইবরাহীম ইবন আবদুল্লাহকে দমন করার জন্য কূফা পাঠানো হয়। কূফা হইতে ৪৮ মাইল দূরবর্তী খামরা নামক প্রান্তে উভয় বাহিনীর মুকাবিলা হয়। প্রথম প্রথম হামীদই পরাজয় বরণ করিতে থাকে। কথিত আছে হামীদ ও তাহার সৈন্যগণ পরাজয় বরণ করিয়া যুদ্ধক্ষেত্র ছাড়িয়া পলায়ন করিতে থাকিলে ঈসা ইবন মুসা চিৎকার করিয়া বলিতেছিলেন, 'খোদার শপথ! খলীফার অনুগত থাক।' হামীদ পলায়ন করিতে করিতেই বলিতেছিলেন, 'আগে তো জীবন বাঁচাই।'

কিন্তু কারবালার যুদ্ধক্ষেত্রে নবী পরিবারের ভাগ্য যেমন ছিল এখানেও উহার পুনরাবৃত্তি ঘটিল। ইবরাহীম ইবন আবদুল্লাহ শহীদ হইলেন। তাই ইমাম আবু হানীফার সাথে সম্পর্ক স্থাপন না করিলে এই যুদ্ধেও আমরা হামীদের পরিবর্তে হাসানকেই দেখিতে পাইতাম।

আফসোস! হাসানের এই ঘটনাকে কোন ঐতিহাসিকই তেমন গুরুত্ব দেন নাই। অন্যথায় আমরা দেখিতে পাইতাম যে, মনসুর একজন

চিন্তাশীল রাজনীতিবিদ ছাড়াও একজন বীর ও সাহসী লোক হওয়া সত্ত্বেও তখন এই দুই ভাইয়ের বিদ্রোহ ঘোষণা করায় কতটা ভগ্ন মনোরথ ও হতাশ হইয়া গিয়াছিলেন। কথিত আছে, বখত নামক একজন জ্যোতিষী যদি তাহাকে সান্তনা না দিত তবে তিনি যে কুফা হইতে পলায়ন করিয়া 'রে'—যাওয়ার সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন উহা হইতে কেহই তাহাকে ফিরাইয়া রাখিতে পারিত না। মনসুর যখন পলায়ন করার জন্য তৈয়ার হইয়াছিলেন ঠিক সেই সময়ই কোথা হইতে যেন বখত আসিয়া দৃঢ়তার সাথে বলিয়াছিল, "আমীরুল মুমিনীন! আপনিই জয়ী হইবেন।"

মনসুর কিন্তু তাঁহার কথায় বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারিলেন না।

জ্যোতিষীর কথায় খলীফা বিশ্বাস স্থাপন করিতেছেন না দেখিয়া সে বলিয়াছিল,—"বিজয় সংবাদ না আসা পর্যন্ত আমাকে বন্দী করিয়া রাখুন।"

অবশেষে জ্যোতিষীর কথাই ঠিক হইল। মনসুর জয়লাভ করিলেন। এই মনসুরকেই তাঁহার জীবনে বিশ-পঁচিশটি যুদ্ধে লিপ্ত হইতে হইয়াছিল। কিন্তু এই অবস্থায় তাঁহাকে কখনও পড়িতে হয় নাই। তাবারী বলেন,—"কুফা হইতে বাহির হওয়ার প্রত্যেকটি রাস্তায় তিনি দ্রুতগামী ঘোড়া এবং উট এইজন্য প্রস্তুত রাখার আদেশ দিয়া রাখিয়াছিলেন যে, পলায়ন করার প্রয়োজন হইলে যেন যে কোন পথ দিয়া পলায়ন করা যায়। তিনি এতটা ভয় পাইয়া গিয়াছিলেন যে, ইবরাহীমকে নিহত না করা পর্যন্ত এই যুগের ন্যায় সান্ধ্য আইন জারী করিয়া রাখিয়াছিলেন।" খলীফার নির্দেশ ছিল,—"যে ব্যক্তি 'এশার নামাযের পর ঘর হইতে বাহির হইবে তাহাকে বিনা প্রশ্নে নিহত করা হইবে।"

তাছাড়া পাঁচশত সৈন্য অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত হইয়া সারা রাত কুফার অলি গলি পাহারা দিত। মনসুর তখন বিস্ময়কর পন্থা আবিষ্কার করিয়াছিলেন। তাবারী বলেন,—"প্রত্যহ রাত্রে সৈন্যদের একটি অংশ চুপচাপ কোন নীরব রাস্তা দিয়া শহরের বাহির হইয়া যাইত। ভোর হওয়ার পর তাঁহারা এমন ভাবে শহরে প্রবেশ করিত যেন নূতন কোন সৈন্যবাহিনী আগমন করিল। উদ্দেশ্য ছিল কুফাবাসী যেন ভয় পায় যে নিত্য-নূতন সৈন্য আসিয়া জমা হইতেছে।"

তাছাড়া মনসুর সৈন্য শিবিরের আশেপাশে বহু দূর পর্যন্ত কোন প্রয়োজন ব্যতীতই রাত্রে আগুন লাগাইয়া রাখিত। আগুন দেখিয়া

লোকে যেন মনে করে যে, অসংখ্য সৈন্য শিবিরে আগুন জ্বালাইয়া রাখা হইয়াছে। আরও লিখিত আছে লোকের অন্তরে ভয়ের উদ্রেক করার জন্য কুফাবাসী সকলকেই কালো পোশাক পরিধান করার নির্দেশ দিয়াছিলেন, কারণ 'আব্বাসীরা এবং তাঁহাদের সমর্থকগণ কালো পোশাক পরিধান করিতেন। অথচ একথা কে না জানে যে, কালো পোশাক পরিধান করিলেই কি শত্রু-মিত্রের মধ্যে পার্থক্য করায় কি ভাবে সাহায্য পাওয়া যায়? যে শত্রু, যে রাষ্ট্রের দুশমন কালো পোশাক পরিধান করিলেই কি সে মিত্রে পরিণত হইবে? বরং এই ছদ্মবেশে তাহার শত্রুতাকে আরও সুবিধামত লুকাইয়া রাখিতে পারে মনে হয়। কিন্তু ইহাতে মনে হয় কালো রং ব্যতীত অন্য কোন রংয়ের পোশাকধারীকে দেখিলেই ভয়ে তাঁহার অন্তরাত্মা কাঁপিয়া উঠিত। ইহার পরিণাম সম্বন্ধে তাবারী বলেন—

"বেচারা মুদ্দী, কসাই, ফেরিওয়ালাগণ কোন না কোনভাবে তাহাদের পোশাক কালো রংয়ে রঞ্জিত করিয়া লইয়াছিল। কালো রংয়ের অভাবে শেষ পর্যন্ত তাহারা দোয়াতের কালী দ্বারা কাপড় রং করিয়া লইত।"

এই সময়কার এমন আরও বহু ঘটনা ঐতিহাসিকগণ উল্লেখ করিয়াছেন। হইতে পারে ইহার অন্য কোন কারণও ছিল। যেমন প্রত্যেক দিক হইতে নিরাপদ হওয়ার পর অধিকাংশ সৈন্যগণকেই বিভিন্ন প্রদেশে পাঠাইয়া দেওয়ার পর শান্তভাবে বাগদাদ নির্মাণের কাজে মনোনিবেশ করিয়াছিলেন। কিন্তু এই সময় হঠাৎ বিদ্যুতের ন্যায় নফসে যাকিয়া ও ইবরাহীমের বিদ্রোহ ঘোষণার সংবাদ তাহার কানে আসিয়া পৌঁছিল। কথিত আছে, তিনি ঘাবড়াইয়া গিয়া কেবলই বলিতেন—"এখন আমি কি করিব! সমস্ত সৈন্য তো বিভিন্ন প্রদেশে পাঠাইয়া দিয়াছি।" অতঃপর শপথ করিয়া বলিতেন— এই ভুল আর জীবনে দ্বিতীয় বার করিব না। কম পক্ষে ত্রিশ হাযার সৈন্য সর্বদা আমার সাথে সাথে রাখিব।"

কিন্তু মনসুরের ন্যায় ব্যক্তির পক্ষে সৈন্য সংগ্রহ করা মোটেই কষ্টসাধ্য ছিল না। তাঁহার সামান্য ইঙ্গিতে প্রত্যেকটি প্রদেশ হইতেই সৈন্য আসিয়া সমবেত হইতে পারিত। হইতে পারে সৈন্য-সংখ্যা কম দেখিয়া তাহার এই অবস্থা হইয়াছিল। কিন্তু প্রকৃত ঘটনা ছিল অন্যরূপ। তাবারী লিখিয়াছেন "সৈন্য সংক্রান্ত ব্যাপারে মনসুর একজন প্রবীণ লোকের পরামর্শ চাহিলে তিনি বলিয়াছিলেন—এইটা আবার কঠিন

কাজ কোথায়? আপনি সিরিয়া হইতে চারি হাযার সৈন্যের একটি বাহিনী চাহিয়া পাঠান।" মনসুর বৃদ্ধের পরামর্শ শুনিয়া যাহা বলিয়াছিলেন তাহারও মনে হয় অন্য কোন কারণে তাহার মাথা ঠিক ছিল না। অর্থাৎ মনসুর বলিয়াছিলেন—"সেখান হইতে কে আমার জন্য সৈন্য পাঠাইবেন?"

বৃদ্ধ এই কথা শুনিয়া রাগতভাবে বলিয়াছিলেন—"কে পাঠাইবে অর্থ? আপনি সেখানকার শাসনকর্তাকে লিখুন না কেন?"

মনসুরের ন্যায় লোকের পক্ষে সিরিয়া হইতে কুফা এবং বসরায় সৈন্য আনা মোটেই দুঃসাধ্য ছিল না। কিন্তু তাহাকেও তো নিজের আয়ত্তে থাকিতে হইবে? তিনি নিজকে কত অসহায় মনে করিয়া বলিয়াছিলেন যে—"সেখান হইতে কে আমার জন্য সৈন্য প্রেরণ করিবে?"

এইরূপ আতঙ্কগ্রস্ত হওয়ার কারণ সমূহের মধ্যে ইহাও একটি প্রধান কারণ যে, উত্তরাধিকারী সূত্রে প্রাপ্ত হাসানের ন্যায় একজন প্রভুভক্ত সুদক্ষ এবং অভিজ্ঞ সেনাপতির পরিবর্তন সাধন হওয়া। হাসানের পরিবর্তন যদি তাহার একার পরিবর্তনই হইত তবে কোন চিন্তার কারণ ছিল না বরং নানারূপ সন্দেহ চিন্তায় মনসুরকে পাগল প্রায় করিয়া তুলিয়াছিল যে, হাসানের সাথে সাথে আর কে কে বিগড়াইয়া গেল। তিনি সর্বদা এই চিন্তাই করিতেন যে, এই প্রকার সিপাহী বিপ্লবের অবস্থা না জানি কখন কি রূপ ধারণ করিয়া সম্মুখে দাঁড়ায়? আমরা তাহাকে দেখিতে পাইয়াছি বখত নামক জ্যোতিষী যদি তাহাকে বারন না করিত তবে তিনি কুফা হইতে অবশ্যই পলায়ন করিতেন।

'আব্বাসীয়দের মনের অবস্থা তখন যে কি ছিল উহা আমরা নফসে যাকিয়ার শাহাদত সময়কার ঘটনাই দেখিতে পাই। হাসানের ভাই হামীদ নফসে যাকিয়ার বক্ষদেশে তীর বিদ্ধ করিয়াছিল এবং সেই নরাধমই তাহার পবিত্র মাথা তাহার দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়াছিল। হামীদ প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত আব্বাসীয়দের দাসানুদাসই ছিল। কিন্তু প্রথমে যখন নফসে যাকিয়া যুদ্ধক্ষেত্রে অবতরণ করিয়া আব্বাসী সেনাপতি হামীদকে সম্মুখ যুদ্ধে আহ্বান জানাইয়াছিলেন তখন নিজের প্রাণের ভয়েই হামীদ বীর কেশরীর সম্মুখ যুদ্ধে অবতরণ করিতে দ্বিধাগ্রস্ত হইয়া গা ঢাকা দিয়া থাকিতেন। হামীদের এই প্রকার ইতস্তত ভাব দেখিয়া মনসুর ভ্রাতুষ্পুত্র 'ঈসা ইবন মুসা বলিয়াছিল—

"আমি দেখিতেছি, তুমি নফসে যাকিয়ার ব্যাপারে যেন ইতস্তত করিতেছ। তুমি যেন তাহাকে সুযোগ দেওয়ার জন্য আপ্রাণ এড়াইয়া চলিতেছ।'

ইহার উত্তরে দুর্ভাগা হামীদ বলিয়াছিলেন, "নবী পরিবারের প্রতি আমার সহানুভূতি আছে মনে করিয়া তুমি আমাকে অযথা দোষারোপ করিতেছ। খোদার শপথ! মুহাম্মাদকে দেখা মাত্রই আমি হত্যা করিব অথবা নিজে নিহত হইব।"

এই সব কথা বলার উদ্দেশ্য এই যে, হাসানের মনের পরিবর্তন হওয়ায় আব্বাসীয়দের মনে কিরূপ সন্দেহ দানা বাধিয়াছিল। হামীদের ন্যায় ব্যক্তি যিনি হাতের তালুতে জীবন রাখিয়া আব্বাসীয়দের পক্ষে যুদ্ধ করিতেছিলেন—তিনিও তাহাদের সন্দেহ হইতে মুক্ত ছিলেন না। কিন্তু কি করা যাইতে পারে? আব্বাসীয়দের নিকট হামীদ তো হাসানেরই সহোদর। আর ইহাই ছিল ঈসার মনি সন্দেহের কারণ। আর এই সন্দেহ এতটা বদ্ধমূল হইয়া দাঁড়াইয়াছিল যে ঈসা হামীদের মুখের সম্মুখেই সেই সন্দেহ প্রকাশ করিয়া দিয়াছিলেন।

সে যাহাই হউক না কেন ইমাম সাহেবের রাজনৈতিক কার্যাবলীর প্রধান কৃতত্ব হইল আব্বাসী সেনাবাহিনীর দক্ষিণ হস্ত ভাঙিয়া ফেলিতে তিনি সফলকাম হইয়াছিলেন। ভাগ্যের লেখা কেহ খন্ডাইতে পারে না। হযরত ইবরাহীম ইবন আবদুল্লাহ্‌র উক্তি মতেঃ "আমরা কিছু চাহিয়াছিলাম আর আল্লাহ্‌ অন্য কিছু চাহিয়াছিলেন।" ইহা অন্য কথা কিন্তু চেষ্টার দিক হইতে কোন সুপ্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্রকে বানচাল করার সর্বপ্রধান এবং সর্বশেষ চেষ্টা হইল সৈন্যদের মধ্যে বিদ্রোহ বাধাইয়া দেওয়া।

আমরা দেখিয়াছি এই পর্যায়ে ইমাম সাহেব পূর্ণভাবে সফলতা অর্জন করিয়াছিলেন। সেনাবাহিনীর প্রধান অঙ্গকেই তিনি নিষ্কর্মা করিয়া দিয়াছিলেন। কিন্তু ভাগ্যের লিখন ছিল অন্যরূপ। হয়ত এই ভাগ্য বিপর্যয়ের দরুনই সাধারণ ঐতিহাসিকগণ এই ঘটনা তাহাদের গ্রন্থে স্থান দেন নাই। অন্যথায় ইবরাহীম ইবন আবদুল্লাহ যদি সেদিন পরাজয় বরণ না করিয়া জয়ের নিশান উড্ডীন করিতে পারিতেন তবে হয়ত পৃথিবীর বিরাট বিরাট জঙ্গী চালের মধ্যে ইমাম সাহেবের এই কৃতকার্যতাও একটি চাল হিসাবে স্বর্ণাক্ষরে লিখিত থাকিত।

যুদ্ধে ইমাম কেন অংশ গ্রহণ করেন নাই

এই কাহিনী তো ইবরাহীম ইবন 'আবদুল্লার শহীদ হওয়ার সাথে সাথেই শেষ হইয়া গেল। কিন্তু ঘটনা সম্পর্কে এখনও আমার কিছু বলার আছে।

অর্থাৎ ইমাম সাহেবের জীবন-চরিত রচয়িতাগণের মতে ইবরাহীমের সংগ্রামে ইমাম সাহেব কি ততটা অংশই গ্রহণ করিয়াছিলেন যতটা তাহারা বর্ণনা করিয়াছেন? তাহা হইলে প্রথম প্রশ্নের উদয় হয় আর উদয়ই বা হইবে কি? খতীব বাগদাদীর বর্ণনা মতে তো মনে হয় যে, মুহাদ্দিস আল-ফাযারী তো তাঁহার ভাইয়ের ব্যাপারে ইমাম সাহেবকে বলিয়াই ফেলিয়াছিলেন আমার ভাইকে পরামর্শ দিয়া ইব্রাহীমের সাথে যুদ্ধে পাঠাইয়াছ আর নিজে এখানে বসিয়া বসিয়া ফতওয়া দিতেছ।' এই প্রশ্ন তখনও যেমন করা হইয়াছিল আজও করা যাইতে পারে।

আল-ফাযারীর প্রশ্নে ইমাম সাহেব উত্তর দিয়াছিলেন—"লোকের আমানত যদি আমার নিকট গচ্ছিত না থাকিত কিংবা অন্য কোন বিশেষ প্রয়োজন বাধা না দিলে আমি কখনও এই সংগ্রামে অংশগ্রহণ করা হইতে বিরত থাকিতাম না।"

হয়ত স্মরণ থাকিতে পারে যে হযরত যায়দ (রঃ)-এর বিপ্লবের সময়ও ইমাম সাহেব সংগ্রামে অংশগ্রহণ না করায় এই প্রকার প্রশ্নই করা হইয়াছিল। বর্তমানের ন্যায় তখনও ইমাম সাহেবের এই যিম্মাদারীর প্রশ্ন ছিল।

ইমাম সাহেবের কূফা পরিত্যাগ না করায় আমার মতে ইহাও একটি কারণ ছিল যে, ইমাম সাহেব মনে করিয়াছিলেন, যুদ্ধক্ষেত্রে যাওয়ার পর হয়ত শত্রু হত্যা করিবেন কিংবা নিজে শহীদ হইবেন উভয়টিরই সম্ভাবনা রহিয়াছে। একথাও আমরা জানি যে, ইমাম সাহেবের বাণিজ্য কুঠিতে অন্যের গচ্ছিত অর্থের পরিমাণ সামান্য ছিল না বরং কোটি কোটি টাকা ছিল। হঠাৎ শহীদ হইয়া গেলে উহা যথার্থ মালিককে ফিরাইয়া দেওয়া দুঃসাধ্য হইয়া উঠিত।

কিন্তু আমার মতে এই একটি কারণই কূফায় থাকার জন্য যথেষ্ট নয়। এই প্রসঙ্গে তাবারী বলিয়াছেন—হযরত ইবরাহীম বসরা হইতেই বিদ্রোহ ঘোষণা করিয়াছিলেন। ইহার প্রধান একটি কারণ এই যে—সেই সময় বসরার আব্বাসীদের শাসনকর্তা ছিলেন সুফইয়ান ইবন

মুআবিয়া। যদিও তিনি প্রকাশ্যে প্রভুদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন নাই তথাপি ভিতরে ভিতরে তিনি ছিলেন ইবরাহীমের পূর্ণ সমর্থক। ইবরাহীম শাসনকর্তার কুঠি ঘেরাও করিলে সুফইয়ান কিছু সময়ের জন্য কুঠিতে আবদ্ধ থাকেন। অতঃপর সন্ধির প্রস্তাব করিয়া শাসনকর্তার কুঠি এবং বসরার রাজকোট বিপ্লবীদের হাতে ছাড়িয়া দেন।

এই সুযোগ গ্রহণের জন্যই ইবরাহীম বসরাকে বিপ্লব ঘোষণার স্থান নির্বাচিত করিয়াছিলেন। কিন্তু ঘটনা প্রসঙ্গে একথাও জানা যায় যে, কূফায় ইব্রাহীমের যে সমস্ত সমর্থক ছিল—তাহাদের মধ্যে অভিমত ছিল-বসরায় যুদ্ধ-বিগ্রহ করা হইবে না। বরং বসরার সমর্থকদের সাথে লইয়া ইবরাহীম বাহির হইতে কূফা আক্রমণ করিবেন এবং আমরা ভিতর হইতে সাহায্য করিব।

তাই দেখা যায় যে, এই পরামর্শ মতে ইবরাহীম নিজেই কূফা আগমন করিতেছিলেন। সুতরাং ইমাম সাহেবের কূফা যাওয়ার প্রয়োজনই বা কি ছিল। দ্বিতীয়—কূফার প্রতিনিধি দল ইবরাহীমকে কূফা যাওয়ার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন কূফাবাসী প্রস্তুত হইয়া রহিয়াছে। আপনাকে স্বচক্ষে দেখার পর তাহারা একজন একজন করিয়া আপনার জন্য জীবন উৎসর্গ করিবে। আর যদি আপনি না যান তবে হয়ত বিভিন্ন কারণে তাহাদের মত পরিবর্তন হইয়া যাইবে।"

এই কথাই প্রমাণিত হয় যে, কূফাবাসীদের মনের অবস্থা কিরূপ ছিল। এই প্রকার লোকদিগকে আয়ত্তে রাখার জন্য অবশ্য কোন দায়িত্বশীল লোককে তাহাদের সাথে থাকিতে হয়। আমি মনে করি এই কাজ সমাধা করার জন্যই ইমাম সাহেব কূফা পরিত্যাগ করিয়া অন্য কোথাও যান নাই। তাছাড়া মনসুর ভয় পাইয়া যে সমস্ত পন্থা অবলম্বন করিয়াছিলেন উহার মধ্যে ইহাও একটি ছিল যে কূফা হইতে বসরা যাওয়ার রাস্তার মধ্যে স্থানে স্থানে পাহারা দেওয়ার জন্য ঘাঁটি করিয়া রাখিয়াছিলেন। মনসুরের নির্দেশ ছিল কূফা হইতে যে ব্যক্তি বসরা যাইবে তাহাকে হত্যা করিতে। এই নির্দেশ মতে বহু লোক জীবন হারাইয়াছিল।

এই সমস্ত কারণ ও অসুবিধা বিদ্যমান থাকায় ইমাম সাহেব কূফা হইতে বসরা গিয়া ইবরাহীমের সাথে অংশগ্রহণ করিতে পারেন নাই। তাছাড়া অভিজ্ঞতায় দেখা গিয়াছে কূফাবাসীদের মনের যে অবস্থা তাহাতে এমন একজন লোকের কূফায় থাকা প্রয়োজন ছিল যিনি

তাহাদের সম্বন্ধে স্থির থাকায় বুদ্ধি পরামর্শ এবং উৎসাহ যোগাইতে পারেন। আমি প্রথমেই বলিয়াছি, ইবরাহীমের স্বচক্ষে কূফায় এক লক্ষ তরবারি প্রস্তুত হইয়া রহিয়াছিল। এই লোকদের দেখা-শুনার জন্যও ইমাম সাহেব কূফা ছাড়িয়া অন্যত্র যাইতে পারিতেন না। ইহাতে কোন সন্দেহ নাই যে, বাহির এবং ভিতর হইতে আক্রমণ করার যে পরিকল্পনা করা হইয়াছিল ভাগ্য যদি সে পথের প্রতিবন্ধক না হইত তবে হালওয়ান কেন পরজগতে পেঁছার আগে মনসুরের জন্য পলায়ন করায় অন্য কোন পথ ছিল না। কিন্তু কূফা হইতে ৪৮ মাইল দূরবর্তী 'বাখমারা' যুদ্ধক্ষেত্রেই ভাগ্য আব্বাসীয়দের স্বপক্ষে ফয়সালা করিয়া দিল।

সত্য বলিতে কি দ্বিতীয় প্রশ্ন যাহা স্বাভাবিকভাবেই মনে উদয় হইতে পারে উহার উত্তরও কমপক্ষে আমরা এই ঘটনার আলোকেই পাইতে পারি।

অর্থাৎ হযরত ইবরাহীম ইবনে আবদুল্লাহর সংগ্রামে ইমাম সাহেবের সাহায্য এবং উৎসাহ যদি উহাই হয় যাহা এপর্যন্ত বর্ণিত হইয়াছে তবে তিনি মনসুরের কোপানল হইতে কিভাবে বাঁচিয়া রহিলেন? তখনকার অবস্থা তো এই ছিল যে, এশার নামাযের পর যাহাকেই ঘরের বাহিরে রাস্তায় চলা-ফেরা রত অবস্থায় পাওয়া যাইত তাবারীর মতে 'তাহাকেই, তখনই ধরিয়া কম্বল দিয়া ঢাকিয়া এমন এক স্থানে আনিয়া রাখা হইত যেখানে সে সমস্ত রাত অতিবাহিত করিত। সকাল বেলা তাহাকে জিজ্ঞাসাবাদ করার পর হয় ছাড়িয়া দেওয়া হইত নতুবা জেলখানায় আবদ্ধ করিয়া রাখা হইত।' (তাবারী, ২৪৮ পৃঃ, ৯ম জিলদ)

আরও লিখিত আছে, 'গোটা শহর মনসুরের নিয়োজিত গোয়েন্দায় গিজ গিজ করিত। তাহারা শহরের বিভিন্ন লোক সম্পর্কে মনসুরকে সংবাদ দিত।' খলীফার একজন নির্ভরশীল লোক হইতে তাবারী বর্ণনা করেন 'যে ব্যক্তি সম্বন্ধে মনসুর এমন সংবাদ পাইতেন যে সে ব্যক্তি ইবরাহীমের মতালম্বী তখনই মনসুর কাহতাবাহর দাস সালামকে নির্দেশ দিতেন এই ব্যক্তির খবর সংগ্রহ কর।' এই সংবাদ লওয়ার অর্থ কি ছিল তৎ সম্পর্কে সালামের পুত্র আব্বাস যাহা বলিত উহা তাবারী লিপিবদ্ধ করিয়াছেন 'আমার পিতা সালাম খলীফার নির্দেশ পাওয়ার পর রাতের অপেক্ষা করিতে থাকিতেন। নীরব নিঝুম রাতে সিঁড়ি বাহিয়া আমার পিতা সেই সন্দেহজনক ব্যক্তির বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিতেন। সেই ব্যক্তিকে ঘরের বাহির করিয়া হত্যা করিতেন

এবং খলীফাকে বিশ্বাস করানোর জন্য নিহত ব্যক্তির আংটি দেখাইতেন।

সুতরাং অবশ্যই এই প্রশ্ন করা যাইতে পারে যে, যখন এত সব কিছু হইতেছিল তখন ইমাম সাহেব প্রকাশ্যভাবে ইবরাহীমকে সাহায্য করিয়াও কিভাবে তিনি নিরাপদ থাকিতে পারিলেন ?

যতদূর আমার মনে হয় ইমাম সাহেব অন্যান্য শহরবাসীদের মত ছিলেন না। তাঁহার বিদ্যা, বুদ্ধি, খোদাভক্তি, পাক-পবিত্রতা শুধু কুফারই নয় বরং ইরাক এবং সমগ্র প্রাচ্যের ইমাম বানাইয়া রাখিয়াছিল। পরবর্তীকালে মনসুর ইমাম সাহেবের সাথে যে অমানুষিক ব্যবহার করিয়াছিলেন উহা দেখিয়া মনসুরের চাচা আবদুস সামাদ ঘাবড়াইয়া গিয়া বলিয়াছিলেন, "তুমি আজ কি করিলে ? এক লক্ষ তরবারী নিজের দিকে নিজেই উঠাইয়া নিলে। এই ব্যক্তি যে (আবু হানীফা) সমস্ত ইরাক এবং প্রাচ্যবাসীদের ইমাম।"

তাই আবু জাফর মনসুর তখন যে রাহুর কবলে ছিলেন তদুপরি ইমাম সাহেবের সাথে অন্য কোন প্রকার অন্যায় ব্যবহার করিয়া দ্বিতীয় বিপদ ডাকিয়া আনার মত বিবেকহীন ছিলেন না। কি বিপদে যে পড়িতে হইবে উহা মনসুর ব্যতীত অন্য কাহারও উপলব্ধি করার ছিল না। তিনি সর্বদাই চিন্তা করিতেন এই বুঝি কুফাবাসী আমার ঘাড়ের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িল। আবু জাফর মনসুরের দরবারী সুলায়মান ইবন মুজাহিদ বলেন, "এই দুর্যোগের সময়ই যখন আমরা ননো চিন্তা-ভাবনায় অস্থির তখন আমার এক বন্ধু আমার নিকট আসিয়া করুণ স্বরে বলিতে লাগিল, 'সুলায়মান ! তোমার ও তোমার পরিবারস্থ সকলের জন্য নিরাপদ একটি স্থানের ব্যবস্থা করিয়া লও। কুফাবাসী যে কোন সময় তোমার প্রভুর উপর ঝাঁপাইয়া পড়িতে পারে।"

সুলায়মান বলেন, "একথা শুনিয়া আমি দৌড়াইয়া খলীফার নিকট গেলাম এবং তাঁহাকে এই সংবাদ দিলাম। খলীফা তখনই ইবন মাকরানকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। ইবন মাকরান ছিলেন কুফার প্রসিদ্ধ অলংকার নির্মাতা। ভিতরে ভিতরে সে খলীফার পক্ষে গোয়েন্দাগিরি করিত। ইবন মাকরান উপস্থিত হইলে খলীফা বলিলেন, 'আল্লাহ তোমার অমঙ্গল করুন ! কুফাবাসী বুঝি আক্রমণ করিবে।' ইবন মাকরান একথা শুনিয়া বলিল, 'আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন ? এরূপ কিছু ঘটিলে অবশ্য আমি জানিতে পারিব।' তাহার কথায় খলীফা কিছুটা আশ্বস্থ হইলেন।"

মোট কথা, এরূপ বহু ঘটনায় বুঝা যায় এই অবস্থায় যদি মনসুর ইমাম আবু হানীফার উপর হাত না উঠাইয়া থাকেন তবে দূরদর্শীর ন্যায়ই কাজ করিয়াছেন। কিন্তু পরবর্তীকালে মনসুর ইমাম সাহেবের সাথে যে অমানুষিক ব্যবহার করিয়াছিলেন উহার মূলেই ছিল ইমাম সাহেবের ইবরাহীমকে সাহায্য এবং সমর্থন করা। সাময়িকভাবে বিপদ এড়াইবার জন্যই মনসুর এই পন্থা অবলম্বন করিয়াছিলেন। শামসুল আয়িম্মা যারানজরী হইতে আল-কারুরী যে বর্ণনা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন উহা পাঠ করিলে মনে হয় ভবিষ্যতে ইমাম সাহেবের সাথে যে ব্যবহার করা হইবে উহার পথ তখন হইতে উদ্ভাবন করা হইয়াছিল। এ সম্বন্ধে আল-কারুরী লিখিয়াছেন ঃ

"ইবরাহীম ইবন আবদুল্লাহ যখন বসরায় বিদ্রোহ ঘোষণা করেন তখন লোকে মনসুরকে সংবাদ দিল ইমাম আবু হানীফা এবং আমাশ ইবরাহীমের সাথে চিঠিপত্র লিখিয়া যোগাযোগ রক্ষা করিতেছেন। মনসুর এই কথা শুনিয়া ইবরাহীমের পক্ষ হইতে একখানি জাল চিঠি আমাশের নামে অন্যখানা ইমাম সাহেবের নামে লিখাইয়া নিজের কাছে রাখিয়া দিলেন।"

মনে হয় ভবিষ্যতে মনসুর ঈমাম সাহেবের সাথে যে ব্যবহার করার ইচ্ছা পোষণ করিতেছিল—ইহাই ছিল উহার ভূমিকা। ভবিষ তে যদি ইমাম সাহেব ইবরাহীমকে সাহায্য ও সমর্থনের কথা অস্বীকার করে তবে যেন সাক্ষীস্বরূপ এই জালপত্র উপস্থিত করিতে পারে।

মনসুর যদি এরূপ অবৈধ কাজ করার সিদ্ধান্ত করিয়া থাকেন তবে তখন হইতেই ভবিষ্যত কর্মধারা ঠিক করিয়া রাখিয়াছিলেন। হাসান ইবন কাহতাবাহ যখন মুহাম্মাদ নফসে যাকিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে অস্বীকার করেন তখন মনসুর নির্দেশ দিয়াছিলেন. "দেখ! এই ব্যক্তিকে কে আমার নির্দেশ পালন করিতে নিষেধ করিতেছে।" অন্য এক বর্ণনামতে মনসুর নাকি একথাও বলিয়াছিলেন, "তীক্ষ্ন দৃষ্টি রাখ হাসান কোন আলিমের নিকট যায় অথবা কোন আলিম হাসানের নিকট গমানাগমন করে।"

গোয়েন্দা বিভাগ রিপোর্ট দিয়াছিল, "হাসান ইমাম আবু হানীফা (রঃ)-এর নিকট যাতায়াত করিয়া থাকেন।"

মনসুর এই সমস্ত কাজ এই জন্যই করিতেছিলেন যে, ভবিষ্যতে যেন ইমাম সাহেবকে পাকা-পোক্তভাবেই আটকাইতে পারেন। ইহা সাধারণ

লোকের ঘটনা নয়। ইহা ছিল ইরাক ও প্রাচ্যের ইমামের ঘটনা। এই জন্যই প্রচুর প্রমাণাদি সংগ্রহ করার প্রয়োজন ছিল। ভবিষ্যতে জনসাধারণকে যেন তিনি বুঝাইতে পারেন যে, তিনি যাহা কিছু করিতেছেন—তাহার স্বপক্ষে এত প্রচুর পরিমাণ প্রমাণ আছে যে; যাহাকে অস্বীকার করা অসম্ভব। বরং তিনি ইমাম সাহেবের বিদ্রোহমূলক কাজের জন্য যাহা করিতেছেন উহা অইনানুগতভাবেই করিতেছেন।

শাহী দরবারে ইবরাহীমের বিচ্ছিন্ন মাথা

কথিত আছে, হযরত ইবরাহীমের পবিত্র মাথা যখন মনসুরের সম্মুখে রাখা হইয়াছিল তখন সেই মাথা দেখিয়াই মনসুর কাঁদিয়া ফেলিয়াছিলেন। মনসুরের অশ্রু সেই খন্ডিত মাথার উপর পড়িতেছিল। মনসুর কাঁদিতেছিলেন এবং বলিতেছিলেন, "আল্লাহ্‌র কসম! আমি এই অবস্থা দেখা কখনও পসন্দ করি না। কিন্তু কি করিব ইবরাহীম তুমি আমার সাথে আর আমি তোমার সাথে জড়িত হইয়া পড়িয়াছিলাম।' (কামিল - ১২ পৃঃ ৫ম জিলদ)

তারপর সাধারণ দরবার বসিল। খলীফার দরবারীগণ একে অন্যের নিকট আসা-যাওয়া করিতে লাগিল এবং ইবরাহীম সম্পর্কে যা তা বলিতে লাগিল। কিন্তু মনসুর উদাস নয়নে বসিয়া থাকা ব্যতীত একটি কথাও বলিতেছিলেন না। জাফর ইবন হানজালাহ নামক এক ব্যক্তি আসিয়া মনসুরকে উদ্দেশ্য করিয়া বলিলেন, 'আপনি আপনার চাচাতো ভাইয়ের সাথে যে ব্যবহার করিয়াছেন—আল্লাহ আপনাকে উহার প্রতিদান দিক। তিনি আপনার সাথে যে ব্যবহার করিয়াছেন তজ্জন্য আল্লাহ তাহাকে ক্ষমা করুন।"

একথায় মনসুর কিছুটা আশ্বস্ত হইলেন। কথিত আছে, কোন নরাধম মনসুরকে সন্তুষ্ট করার জন্য হযরত ইবরাহীমের পবিত্র মুখমন্ডলে থুথু নিক্ষেপ করিল। কিন্তু মনসুরের আদেশে কোন একজন সেই নরাধমের নাকে মুখে ঘুষি মারিয়া ধরাশায়ী করিয়া ফেলিল। অবশেষে মনসুরের আদেশে পা ধরিয়া হেঁচড়াইয়া দরবার কক্ষ হইতে বাহিরে রাখিয়া আসিল। কিন্তু সত্যই কি মনসুরের চোখে পানি ছিল? যদি ছিল তবে উহা কোন প্রকারের পানি? আমার তো মনে হয় ইহা ছিল জনসাধারণের সমর্থন আদায় করার একটি ভান, একটি পন্থা। লোকে যেমন উপরস্থ ব্যক্তি হইতে কার্যোদ্ধার করার জন্য

তোষামোদ করিয়া থাকে, তেমনি বিশ্বাস করুন, উপরস্থ ব্যক্তিরাও অধীনস্থদের তোষামোদ করে।

বিপ্লব দমন হওয়ার সাথে সাথেই ইমাম সাহেবকে ধর-পাকড় করার ব্যবস্থা জনসাধারণের চাপে পড়ার ভয়েই করেন নাই। ইহা ইমাম সাহেবের পক্ষে শুধু সাময়িক সুবিধা ছিল। ইমাম সাহেবও অবগত ছিলেন যে, তাহার সহিত অতঃপর কি ব্যবহার করা হইবে। যেদিন হইতে তিনি ইবরাহীমের পক্ষাবলম্বন করিয়াছিলেন অন্যায় ন্যায় পথে পা বাড়াইয়াছিলেন সেদিন হইতেই তিনি বুঝিয়াছিলেন দুইটি মর্যাদার একটি অবশ্য তাহার ভাগ্যে আছে অর্থাৎ 'জয়ী হইলে গাযী, মরিলে শহীদ হইবেন—এই সুযোগ কেন ছাড়িব। তাই প্রকাশ্য ভাবেই ইবরাহীমের পক্ষাবলম্বন করিয়াছিলেন।'

ইবরাহীম সায়েগ এবং আবু হানীফার কার্যের পরিণতি সম্বন্ধে উভয়ের মধ্যে দ্বিমত ছিল না। দ্বিমত ছিল কোন পথে অগ্রসর হইলে পরিণতি পর্যন্ত পৌঁছিতে পারিবেন। ইমাম সাহেব চাহিয়াছিলেন কোন এক সমবেত শক্তির সাহায্যে ফরয আদায় করিতে। কিন্তু ইবরাহীম সায়েগের মত কলন্দরী স্বভাবের লোকের পক্ষে ইহা ছিল অতি দূরের পথ। তাই তিনি মার্ভ-এর ভূমিতেই নিজের কাহিনী সমাপ্ত করিয়া দিয়াছিলেন। অন্যদিকে ইমাম সাহেব ভবিষ্যতের অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। আল্লাহ মানুষের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিয়া থাকেন। তাই দেখা যায় মৃত্যুর পূর্বে ৬৫ বৎসর মতান্তরে ৮৫ বৎসর বয়সের সময় তিনি ইবরাহীমের বিপ্লবে যোগদান করিয়া বহু দিনের প্রতীক্ষা ও আশা পূর্ণ করিলেন।

যাহা কিছুই হউক এবং যতদিনই প্রতীক্ষা করিতে হইয়াছিল আল্লাহ তাহাকে নেক কাজে অংশগ্রহণ করার সুযোগ দান করিয়াছিলেন। মৃত্যুর পূর্বে যদি এই সুযোগ না পাইতেন তবে ইবরাহীম সায়েগের সাথে কথাবার্তা বলিয়াছিলেন—উহাতে লোকে তাহাকে ভীরু কাপুরুষ বলার সুযোগ পাইত ইহাতে কোন সন্দেহই নাই যে নফসে যাকিয়ার বিদ্রোহের সময় ইসলামী রাষ্ট্রের সর্বস্থানে যেভাবে প্রস্তুতি চলিতেছিল—উহাতে বিপ্লবীদেরই জয়লাভ করারই অধিক সম্ভাবনা ছিল। একথাও বলা হইয়াছে যে, এই বিপ্লবের সময় মনসুর যতটা আতংকগ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন অন্য কোন সময় আর এতটা চঞ্চল হন নাই।

কিন্তু তবুও যুদ্ধের আগুনে যে ব্যক্তি ঝাঁপাইয়া পড়ে তাহার সম্মুখে যুদ্ধের দুইটি শাখা বিদ্যমান থাকে। যুদ্ধের এই দ্বিতীয় বিশেষত্বের প্রতি যদি ইমাম সাহেবের দৃষ্টি না থাকিত তবে আর কাহার থাকিতে পারিত। প্রকাশ্যভাবে সমর্থনের নীতির জয়-পরাজয় এবং উহার যাবতীয় পরিণতি সম্বন্ধে চিন্তা করিয়া তিনি ইহাতে অংশগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাই ভবিষ্যতে যাহা কিছু সংঘটিত হইয়াছিল ধৈর্যের সাথে তিনি উহা সহ্য করিয়া গিয়াছেন। এই সম্বন্ধে ইমাম সাহেবের জীবনের শেষ অধ্যায়ে আলোচনা করিব।

ষষ্ঠদশ অধ্যায়

বাগদাদ নির্মাণের অবশিষ্ট কাজ সম্পূর্ণ

شکر کہ جنازہ بمنزل رسید অর্থাৎ 'আল্লাহ্‌র শুকরিয়া যে, জানাযা ঠিক মত স্থানে পৌঁছিয়াছে'—এই পারসী কবিতাংশটুকু মনসুর আরবীতে অনুবাদ করিয়াছেন অথবা আরবী কবিতাকেই কেহ হয়ত পারসীতে অনুবাদ করিয়াছেন। এই কবিতা দ্বারাই বুঝা যায় যে, মনসুরের অন্তর কতটা শান্তি লাভ করিয়াছিল। হুসায়ন বংশীয় বিপ্লবের সম্ভাবনা হযরত যায়দ শহীদ হওয়ার এবং হাসানী বংশীয় ভবিষ্যত বিপ্লবের সম্ভাবনা হযরত নফসে যাকীয়া ইবরাহীমের শহীদ হওয়ার পর শেষ হইয়া গেল। মনসুর স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিলেন। এই অবস্থায় সর্বপ্রথম তাহার মনে যে কাজ করার বাসনা উদিত হইতে পারে স্বভাবতই উহা ছিল বাগদাদ নগর তৈরীর অবশিষ্ট কাজ সমাপ্ত করা। ইবন খালদুন বলেন, "আবু জাফর মনসুর নফসে যাকিয়া এবং ইবরাহীমের বিদ্রোহ দমন করার পর—ইবন হুবায়রার শাহী-প্রসাদ হইতে বাহির হইয়া বাগদাদ পৌঁছিলেন এবং উহার নির্মাণ কার্যে মনোনিবেশ করিলেন।"

নির্মাণ কার্যের তত্ত্বাবধায়ক পদে হাজ্জাজ ইবন আরতাত

পলাতক রাজমিস্ত্রীগণ আবার ফিরিয়া আসিল। তাইগ্রীস নদীর তীরে আবার পূর্বের ন্যায় শাহী তাঁবু পড়িল। পরামর্শের জন্য পূর্বে যে সব লোক ছিল তাহাদের আহ্বান করা হইল। কিন্তু আলিমদের মধ্যে একমাত্র ইমাম আবু হানীফাই ছিলেন না। কুফার একজন আলিম হাজ্জাজ ইবন আরতাতকে তাঁহার পরিবর্তে ডাকা হইল। হয়ত প্রথম বারও তিনি ইমাম সাহেবের সাথে ছিলেন। কিন্তু এবার হাজ্জাজকেই সকল কাজের প্রথম ভাগে দেখা যাইতে লাগিল। ইমাম সাহেবকে আহ্বান না করার কারণ ইহা ব্যতীত আর কি হইতে পারে যে, তিনি প্রকাশ্যভাবে রাষ্ট্রবিরোধীদের দলে যোগদান করিয়াছিলেন। ইমাম সাহেব সম্বন্ধে হাজ্জাজ ইবন আরতাত যে সব কথা বলিতেন উহার একটি আল-খতীব লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। হাজ্জাজ বলিতেন "আবু হানীফা বুদ্ধিমানের মত কাজ করেন নাই। আল্লাহ্‌ তাহাকে সুবুদ্ধি দান করুন।"

নিশ্চয়ই এই কথা দ্বারা হাজ্জাজ নিজেরই প্রশংসা করিতেছিলেন যে, ভবিষ্যত সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করিয়াই তিনি পদক্ষেপ করিয়াছিলেন যাহার বদৌলতে তিনি আজ খলীফার দরবারে এত সম্মানিত। এমন কি পরিশেষে তিনি খলীফার বিশিষ্ট দরবারীদের মধ্যে পরিগণিত হইয়াছিলেন।

ইহার ফলেই বাগদাদের জামে মসজিদের নকশা খলীফা মনসূর হাজ্জাজ দিয়াই করাইয়াছিলেন এবং কিবলাহ্ নির্দিষ্ট করার সময় তাহারই রায় মানিয়া লওয়া হইয়াছিল। কিন্তু পরিশেষে দেখা গিয়াছিল কিবলাহ্ নির্দিষ্ট করা ঠিক হয় নাই।

মোট কথা, ইমাম আবূ হানীফার মুকাবিলায় মনসূর হাজ্জাজের পদমর্যাদা দিনের পর দিন বর্ধিত করিতে লাগিলেন। প্রথম তাহাকে বসরার কাযীর পদে পরে কূফার কাযীর পদে নিয়োগ করেন। পরিশেষে মনসূর যুবরাজ মেহদীর সাথে তাহাকে খোরাসান পাঠাইয়া দেন। হাজ্জাজ খোরাসান হইতে বহু ধন-দৌলত লইয়া দেশে প্রত্যাবর্তন করিয়াছিলেন।

(কথিত আছে হাজ্জাজ প্রথমাবস্থায় খুব গরীব ছিলেন অথচ একজন ভাল 'আলিম ছিলেন। বাড়ীতে সূতা কাটিয়া দাসী দ্বারা বাজারে বিক্রয় করিয়া দিন গুযরান করিতেন। কিন্তু হুকুমতের অধীনে কাজ গ্রহণ করার পর তিনি আর ইলমে দ্বীনের পরওয়া করিতেন না। খতীব বলেন—"বসরার কাযীদের মধ্যে হাজ্জাজই প্রথম ঘুষ গ্রহণ করিয়াছিলেন।" এই দরিদ্র হাজ্জাজই খোরাসান হইতে দেশে প্রত্যাবর্তন করার সময় তাহার আগে পিছে সত্তর জন গোলাম ছিল। ধন-দৌলতের তো কোন হিসাবই ছিল না।)

ইবরাহীমের সাহায্যকারীদের পরিণাম

ইমাম সাহেব লক্ষ্য করিতেছিলেন, যাহারা হযরত ইবরাহীমের বিপ্লবে পরোক্ষ ও প্রত্যক্ষভাবে জড়িত ছিলেন এমন কি যাহাদের সম্বন্ধে এই ব্যাপারে সামান্য পরিমাণও সন্দেহ হইত, মনসূর কুফা হইতে যাওয়ার পর তাহাদের নিকট হইতে প্রতিশোধ গ্রহণ করিতেছিলেন। বসরার নেতৃস্থানীয় যাহারা ইবরাহীমকে সাহায্য করিয়াছিলেন—মনসূর বসরার শাসনকর্তা সালাম ইবন কুতায়বাকে নির্দেশ পাঠাইলেন, 'তাহাদের বাড়ীঘর ধ্বংস করিয়া ফেল এবং বাগানের খেজুর গাছ কাটিয়া ফেল।'

আবু জাফরের বিদ্বেষমূলক কাজ

হযরত নফসে যাকিয়ার এক পুত্র আবদুল্লাহ আশতার সিন্ধু দেশের এক হিন্দু রাজার আশ্রয়ে কালাতিপাত করিতেছিলেন। মনসুর এই সংবাদ পাইয়া তথাকার শাসনকর্তা 'আমর ইবন হাফ্সকে লিখিলেন—"হিন্দু রাজা স্বেচ্ছায় আবদুল্লাহকে তোমার হাতে সমর্পণ না করিলে তুমি তাহার রাজ্য আক্রমণ কর।"[১]

কিন্তু আক্রমণ করার পূর্বেই আবদুল্লাহ আব্বাসীদের হাতে শাহাদত প্রাপ্ত হন। একাজ দ্বারাই মনসুরের বিদ্বেষের পরিমাণ বুঝা যায়। এই ঘটনা তো শত শত বৎসর পূর্বের, তথাপি চিন্তা করিয়া দেখুন, ইমাম সাহেবের চোখের সম্মুখে এই সমস্ত ঘটনা সংঘটিত হওয়ায় তাহার অবস্থা তখন কোন পর্যায়ে ছিল।

হযরত ইমাম মালিকের শাস্তি ভোগ

যাহা হউক ইহাই ছিল রাজনীতিবিদদের সাথে মনসুরের ব্যবহার। কুফা হইতে বাগদাদ আসিয়া উঁহার নির্মাণ কার্যে আত্মনিয়োগ করার পর আমরা দেখিতে পাই যে, দারুল হিজরত মদীনার ইমাম হযরত মালিক (রঃ)-এর উপরও মনসুর প্রতিশোধ গ্রহণার্থে ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছিলেন। হযরত নফসে যাকিয়ার বিপ্লবের ঘটনায় বর্ণনা করা হইয়াছে যে, লোক যখন তালাক সম্পর্কীয় বায়'আত সম্বন্ধে ইমাম মালিকের নিকট ওজর-আপত্তি পেশ করিয়াছিল তখন ইমাম মালিক ফতওয়া দিয়াছিলেন জোর-যবরদস্তী বায়'আত গ্রহণ করা হইয়াছে, ইহাতে তালাক হয় না।

১। নফসে যাকিয়ার অন্যান্য প্রতিনিধিদের ন্যায় আবদুল্লাহ আশতারকে সিন্ধুর শাসনকর্তা আমর ইবন হাফস-এর নিকট পাঠানো হইয়াছিল। সিন্ধুর শাসনকর্তা নফসে যাকিয়ার পক্ষাবলম্বন করিলেন। ইত্যবসরে সংবাদ আসিল মনসুর জয় লাভ করিয়াছেন। আবদুল্লাহ চিন্তিত হইয়া পড়ায় আমর বলিলেন, "চিন্তার কারণ নাই। পাশেই এক হিন্দু রাজা আছেন, তিনি ভিন্ন ধর্মাবলম্বী হইলেও নবীজীর একান্ত ভক্ত।" আবদুল্লাহ তাহার নিকট আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। হিন্দু রাজা তাহাকে পুত্রবৎ লালন-পালন করিতে লাগিলেন। কিন্তু একদিন আটক নদীর তীরে আবদুল্লাহ শিকার করিতে যান। সেখানে আব্বাসী বাহিনী তাহাকে হঠাৎ আক্রমণ করায় তিনি শাহাদত লাভ করেন।

আল্লাহ ভাল জানে স্বয়ং মনসুর নির্দেশ দিয়াছিলেন অথবা মদীনার শাসনকর্তা জাফর ইবন সুলায়মান আব্বাসী নিজে ইমাম মালিককে দোষারোপ করিলেন যে, "তুমি বায়'আত সম্পর্কে যে ফতওয়া দিয়াছিলে উহা প্রকাশ্য রাষ্ট্র-বিরোধিতা।" এই অপরাধে তাঁহাকে চাবুক মারিলেন এবং একথাও বর্ণিত আছে, কাঁধের নিকট হইতে হাতের জোড়া পৃথক করিয়া দিয়াছিলেন। এই জন্য জীবনের শেষ পর্যন্ত তিনি পূর্ণভাবে হাত উঠাইতে পারিতেন না এবং চাদর উঠাইয়া গায়ে দিতে পারিতেন না। কাহারও মতে তাঁহাকে ত্রিশ, আবার কেহ বলেন, একশত চাবুক মারা হইয়াছিল। চাবুক মারার চোটে তিনি বেহুঁশ হইয়া পড়িয়া গিয়াছিলেন। সংবাদ শুনিয়া লোক দৌড়াইয়া আসিতে লাগিল। কথিত আছে, হুঁশ ফিরিয়া আসিলে তিনি প্রথম কথা বলিয়াছিলেন—"হে লোক সকল! তোমরা সাক্ষী থাক আমি আমার প্রহারকারীকে ক্ষমা করিয়া দিলাম।"

ওয়ারাদারদী বলেন—আমি তখন ঘটনাস্থলে ছিলাম। আমি দেখিতেছিলাম—চাবুকের প্রহারের সাথে সাথে ইমাম সাহেব বলিতেছিলেন—

اللهم اغفر لهم فانهم لا يعلمون

"হে আল্লাহ! ইহারা অজ্ঞ; ইহাদিগকে ক্ষমা কর।"

ইমাম মালিক (রঃ)-এর দোষ কি ছিল? লোকে তাহার নিকট মাসআলা জিজ্ঞাসা করিয়াছিল; তিনি তাহার বিবেক-বিবেচনা এবং ইজতিহাদ মত উত্তর দিয়াছিলেন। তাছাড়া এই বিপ্লবের মধ্যে তাঁহার অন্য কোন প্রকার সাহায্য বা আগ্রহ ছিল বলিয়া কোথাও পাওয়া যায় না। বরং যে সব ঐতিহাসিক ইমাম মালিকের এই ঘটনা বর্ণনা করিয়াছেন তাঁহারা সকলেই এক বাক্যে এই ফতওয়ার কথা উল্লেখ করতঃ পরে লিখিয়াছেন—

اسرع الناس الى محمد و لزم مالك بيته

"লোক মুহাম্মাদ নফসে যাকিয়ার হাতে বায়'আত গ্রহণ করার জন্য ভাঙিয়া পড়িল এবং ইমাম মালিক তাঁহার ঘরে গিয়া চুপচাপ বসিয়া রহিলেন।"

প্রত্যক্ষভাবে অংশগ্রহণ না করাই যদি ইমাম মালিক (রঃ)-এর সাথে এরূপ ব্যবহার করা হইয়াছিল তবে ইমাম আবু হানীফা (রঃ)

যিনি প্রকাশ্যভাবে ইবরাহীমের সাথে অংশগ্রহণ করিয়াছিলেন এবং হুকুমতে আব্বাসীর প্রধান সেনাপতি হাসান ইবন কাহতাবাহ্‌কে খলীফার নির্দেশ অমান্য করাইতে কৃতকার্য ইইয়াছিলেন তাহার অপরাধ নিশ্চয়ই ইমাম মালেকের চেয়ে বেশী ছিল। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় যে, ইমাম আবু হানীফার আগেই ইমাম মালিকের উপর প্রতিশোধ গ্রহণ করা হইল।

এখানে আরও একটি প্রশ্নের উদয় হয় যে, ইমাম মালিক বহুদিন মদীনায় ছিলেন, তাহার উপর প্রতিশোধ গ্রহণ করা হইল অথচ ইমাম সাহেব কুফায় থাকা সত্ত্বেও কিভাবে তিনি বাঁচিয়া রহিলেন? তাছাড়া কোন বিষয়ে কোন জিজ্ঞাসাবাদ করা হইয়াছে বলিয়াও কোথাও পাওয়া যায় না। শুধু এতটাই দেখা যায় যে, বাগদাদ নগর নির্মাণ কার্যে ইমাম সাহেবের পরিবর্তে হাজ্জাজ ইবন আরতাতকে পরামর্শদাতা হিসাবে লওয়া হইয়াছিল। একথা ঠিক যে, ইমাম সাহেবের ইন্তিকালের ঘটনাবলী বর্ণনা প্রসঙ্গে ইতিহাসবেত্তাগণ ইবরাহীমের বিপ্লবের বিষয়ে আলোচনা করিয়া বলিয়াছেন, হুকুমত তাঁহার উপরও প্রতিশোধ গ্রহণ করিতে ইচ্ছুক ছিল। ১৫০ হিজরীতে ইমাম সাহেব ইন্তিকাল করেন অর্থাৎ ইমাম সাহেবকে এই ব্যাপারে অপরাধী সাব্যস্ত করা হইলেও চারি বৎসর পর করা হইয়াছিল। তাই প্রশ্ন হইল—এই দীর্ঘ সময় কেন তাহাকে অপরাধী সাব্যস্ত করা হইল না এবং আশাতীতভাবে তিনিই বা কিভাবে নিরাপদ রহিলেন।

ঐতিহাসিকগণ ইহার কোন নির্দিষ্ট উত্তর দেন নাই। কিন্তু আমি এখন যে সব ঘটনার উল্লেখ করিব আশা করি উহার মধ্যেই সেই উত্তর পাওয়া যাইবে।

ইমাম মালিককে চাবুকের শাস্তি প্রদান

মদীনার শাসনকর্তা জাফর ইবন সুলায়মান হযরত ইমাম মালিককে চাবুকের শাস্তি প্রদান করিয়াছিলেন। জাফরের অবস্থা ছিল এই যে, ইবরাহীম ইবন আবদুল্লাহ্‌র বিপ্লবের সময় যুদ্ধ সংঘটিত হইলে তিনি কোন কোন কাজে বেশ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছিলেন এবং উহারই প্রতিদান হিসাবে তাহাকে মদীনার শাসনকর্তা করা হইয়াছিল। সুতরাং তাঁহার সম্বন্ধে বুঝিতে হইবে যে, তিনি ছিলেন হুকুমতের নবদাস। আর নবদাসদের পুরানো স্বভাব হইল—'খরগোশ পাকড়াও করার অবিশ্রান্ত কোশেশ।' কিন্তু কুফার অবস্থা ছিল উহার সম্পূর্ণ বিপরীত।

আস-সাফফাহ্‌র যুগ হইতেই 'ঈসা ইবন মূসা কুফার শাসনকর্তা ছিলেন। প্রায় বার তের বৎসর একাদিক্রমে কুফার শাসনভার তাঁহার হাতে ছিল। অথচ তাঁহার চেষ্টাতেই নফসে যাকিয়া এবং ইবরাহীমের বিপ্লব দমন হইয়াছিল। কিন্তু উহার প্রতিদান আবু জাফর মনসুর এইভাবে দিলেন যে, আস-সাফ্‌ফাহ আবু জাফরের পর খেলাফতের বায়'আত 'ঈসার জন্যে গ্রহণ করা সত্ত্বেও আবু জাফরের মতের পরিবর্তন হইয়া গেল। এই পরিবর্তন প্রথম হইতেই তাঁহার মধ্যে দেখা দিয়াছিল।

নফসে যাকিয়ার বিদ্রোহ দমন করার সময় মনসুর যখন 'ঈসাকে মদীনা পাঠাইতেছিলেন তখনই তাঁহার মনের ইচ্ছা ছিল যদি নফসে যাকিয়া নিহত হয় তবুও ভাল আর 'ঈসা নিহত হইলেও আমার পথের কাঁটা দূর হইয়া গেল। মনসুর খলীফা হওয়ার পর হইতেই এই আশা পোষণ করিয়া আসিতেছিলেন যে, তাঁহার পর তাঁহারই পুত্র মেহদী খলীফা হইবেন। নফসে যাকিয়ার বিদ্রোহ দমন করার পর আর কোন প্রকার অসুবিধা না থাকায় তিনি প্রকাশ্যভাবেই বলাবলি করিতেন। একদিন 'ঈসাকে ডাকিয়া পরিষ্কারভাবেই তিনি একথা বলিলেন। 'ঈসার উপর ইহার কিরূপ প্রতিক্রিয়া হইতে পারে তাহা সহজেই অনুমেয়। অনেক তর্ক-বিতর্ক বাদানুবাদের পর বেচারা 'ঈসা মেহদীর জন্য নিজের হক ছাড়িয়া দিলেন।

এই ঘটনা পুরাপুরি আলোচনা করা আমার উদ্দেশ্য নয় বরং উদ্দেশ্য এই যে, বৎসরের পর বৎসর যাহার হাতে কুফার শাসন ক্ষমতা ছিল এবং তাহার সম্মুখেই যদি শাসনতন্ত্র বিকল হইয়া যায় এবং এই বিকল অবস্থা যদি সর্বনাশা রূপ ধারণ করে তবে এই অবস্থায় যদি হুকুমত ইমাম সাহেবের দোষত্রুটি ধরা হইতে একটু দৃষ্টি ফিরাইয়া রাখে তবে ইহাই ছিল সেই অবস্থার সময়োপযোগী কাজ।

হাজ্জাজ ইবন আরতাতের প্রথম অশুভ সূচনা

একদিকে তো কুফার শাসনকর্তা 'ঈসার ভাগ্য বিপর্যয় এইভাবে ঘটিতেছিল অন্যদিকে ইমাম আবু হানীফার পরিবর্তে মনসুর যে আলিমকে অর্থাৎ হাজ্জাজের পদমর্যাদা দিনের পর দিন উন্নত করিয়া চলিতেছিলেন তাহার দ্বারা এমন সব ভুলত্রুটি হইতে লাগিল যাহা বর্ণনাতীত। ইমাম আবু হানীফা তো ইমাম আবু হানীফাই ছিলেন কিন্তু একজন সাধারণ মৌলভী দ্বারা যে কাজ হইতে পারে হাজ্জাজকে দ্বারা তাহাও হইতেছিল না। হাজ্জাজের প্রথম দুর্বিপাক ছিল

ভবিষ্যৎ ইতিহাস প্রসিদ্ধনগরীর জামে মসজিদের কিবলাহ্ নির্ধারণে ভুল কর। পাঁচ বার মুসল্লীদের কিবলাহ্মুখী হইয়া দাঁড়াইবার জন্য কাতার বাকা করিয়া দাঁড়াইতে গিয়া যে ঝামেলা পোহাইতে হইত তজ্জন্য মুসল্লীদের মুখ হইতে হাজ্জাজকে উদ্দেশ্য করিয়া যে মধুর ভাষা বাহির হইত তাহাতে তাহার সুনাম কি করিয়া অবশিষ্ট থাকিত! অন্য কোন খলীফা বা বাদশাহ হইলে খরচের প্রতি পরওয়া না করিয়া উহা ভাঙিয়া ফেলিয়া পুনরায় ঠিক করিয়া দিতেন। কিন্তু মনসুরের ন্যায় কৃপণ ব্যক্তি এইরূপ অপচয় করিতে যাইবেন কেন?

কিন্তু পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের সময় হাজ্জাজ সম্পর্কে মুসল্লীদের সমালোচনা শুনিয়া মনসুর তাহাকে বেশীদিন আর শাহী তাঁবুতে রাখা যুক্তিসঙ্গত মনে না করিয়া বসরার কাযী করিয়া পাঠাইয়া দিলেন। কিন্তু সেখানে গিয়া তিনি ঘুষ লওয়া আরম্ভ করায় কুফার কাযী পদে নিয়োগ করিলেন। যেখানে তিনি অত্যন্ত দৈন্যের সাথে জীবন যাপন করিয়াছেন সেই কুফায় কাযী হইয়া আসার পর লোকের সম্মুখে বাহির হইতে খুবই লজ্জাবোধ করিতেন। এমনকি এই লজ্জার দরুণ জামায়াত ও জুমু'আ পর্যন্ত পরিত্যাগ করিয়া দিয়াছিলেন।

মনে হয় মনসুর তাঁহাকে এই লজ্জা হইতে রক্ষা করার জন্যই যুবরাজ মেহদীর সাথে হাজ্জাজকে খোরাসান পাঠাইয়া দিয়াছিলেন; তাঁহাকে এমনভাবে রক্ষা করার অন্য কারণও ছিল। সেই কারণ হইল মনসুর ইমাম হানীফার স্থলে স্থান দিয়াছিলেন। তাই তিনি নিজেই তাঁহাকে অপদস্থ করিতে ইচ্ছুক ছিলেন না। দ্বিতীয়তঃ হাজ্জাজ সেই যুগের 'আলিমদের রীতিনীতিকে পরিত্যাগ করিয়া মনসুরের অনুরোধে 'আব্বাসীয়দের ন্যায় কালো পোশাক পরিধান করিতেন। এই সমস্ত কারণেই তাহাকে পদচ্যুত করিয়া অপদস্থ করেন নাই। তবে ইরাক-বাসীদের ঘৃণার দৃষ্টি হইতে তাঁহাকে দূরে খোরাসান পাঠাইয়া দিয়াছিলেন।

ইমাম মালিকের নিকট রাজনৈতিক ক্ষমা প্রার্থনা

ইহার কিছুদিন পরই আব্বাসীয় মনসুর হজ্জ উপলক্ষে মদীনা পৌঁছেন এবং বিশেষভাবে ইমাম মালিক (রঃ)-কে ডাকিয়া আনেন। অতঃপর মদীনার শাসনকর্তা সুলায়মান তাহার সাথে যে দুর্ব্যবহার করিয়াছিলেন উহা জাফর ইবন সুলায়মানের ব্যক্তিগত কাজ বলিয়া উল্লেখ করেন এবং তজ্জন্য ইমাম সাহেবের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করেন।

শুধু ক্ষমা প্রার্থনাই করেন নাই বরং ইমাম সাহেব চলিয়া যাওয়ার পর জাফরকে ধরিয়া আনিয়া ইমাম সাহেবের নিকট একথা বলিয়া পাঠাইলেন যে 'এই ব্যক্তি হযরতের সাথে যে দুর্ব্যবহার করিয়াছে তজ্জন্য তাহাকে আপনার নিকট পাঠাইলাম। আপনার যেভাবে ইচ্ছা আপনি ইহার নিকট হইতে প্রতিশোধ গ্রহণ করিতে পারেন।'

উত্তরে মহান স্বভাবের মালিক হযরত ইমাম মালিক (রঃ) বলিয়াছিলেন, আল্লাহর কসম! আল্লাহ্‌র রসুলের সান্নিধ্য লাভের খেয়ালে প্রতিটি চাবুকের আঘাতের সাথে সাথেই আমি তাহাকে ক্ষমা করিয়া দিয়াছিলাম।

ইমাম মালিকের সাথে সম্পর্ক প্রসার করার চেষ্টা

মনসুর এখানেই শেষ করিলেন না বরং যতদিন মদীনায় ছিলেন ততদিন পর্যন্ত ইমাম মালিকের সাথে সম্পর্ক গভীর করার এবং তাহাকে সন্তুষ্ট করার চেষ্টায় রহিলেন। স্বয়ং ইমাম মালিক বলেন, 'মনসুর মদীনায় থাকাকালীন একদিন আমি তাঁহার নিকট গেলাম এবং তাঁহার আসনের এক পাশেই বসিলাম। এমন সময় একটি ছেলে বার বার ভিতর বাহির করিতেছিল। মনসুর আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'এই বালকটি কে আপনি চিনেন?' আমি অস্বীকার করায় তিনি বলিলেন, 'এই বালকটি আপনার প্রভাব দেখিয়া ভয় পাইয়া এরূপ বারবার ভিতর বাহির করিতেছে।'

অতঃপর তিনি আমাকে দ্বীন সম্পর্কীয় কয়েক প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন। আমি উহার কোনটি হালাল এবং কোনটি হারাম বলিয়া দিলাম। তিনি আমার উত্তর শুনিয়া বলিলেন, 'বর্তমান সময় আপনার ন্যায় জ্ঞানী ও আলিম আর কেহ নাই।'

আমি বলিলাম 'খোদার শপথ! আমীরুল মু'মিনীন, আসল ঘটনা তা নয়।'

'না, না আমি সত্যই বলিতেছি, কিন্তু আপনি আপনাকে গোপন করিয়া রাখার চেষ্টা করিতেছেন।'

কিন্তু স্মরণ থাকিতে পারে যে, 'আমীরুল মু'মিনীন! ইনিই পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ আলিম--এই বাক্য দ্বারা তাইগ্রীস নদীর শাহী তাঁবুতে কুফার শাসনকর্তা 'ঈসা ইবন মুসা ইমাম আবু হানীফার পরিচয় দিয়াছিলেন এবং এই ঈসাকেই যুবরাজের পদ হইতে পদচ্যুত করিয়া মনসুর হজ্জ করিতে আসিয়াছিলেন।

মালিকী ফিকাহ্ সম্বন্ধে মনসুরের অভিমত

ইমাম মালিক (রঃ)-কে তখনকার প্রখ্যাত জ্ঞানী ও বিজ্ঞ আলিম বলার পর আরও বলিলেন—

'যদি আমি জীবিত থাকি তবে আপনার ইজতিহাদী মাসায়েল গ্রন্থাকারে সাজাইয়া রাখিব এবং সমস্ত প্রদেশে উহার কপি পাঠাইয়া দিয়া নির্দেশ দিব যেন লোকে সেই মাসআলা অনুযায়ী ধর্ম-কর্ম সমাধা করে।'

আবু জাফরের কথায় যাহা অবগত হওয়া যায় এবং প্রকৃত ঘটনাও তাহাই যে আজ যাহা মালিকী মযহাব নামে পরিচিত আবু জাফরের একথা বলার সময়ই নয় বরং উহার পরও ইমাম মালিকের জীবিতাবস্থাও তাহার মাসআলা-মাসায়েল একত্রে সংকলিত করা হয় নাই। সত্য বলিতে কি এমন কিছু করার চেষ্টাও ইমাম সাহেব করেন নাই যে, মুসলিম জীবনধারার সর্বদিক দৃষ্টি রাখিয়া কিতাব ও সুন্নতের অনুকরণে উহার জন্য আইন প্রণয়ন করিবেন। বরং তাহার সম্বন্ধে যতটা অবগত হওয়া যায় তাহাতে দেখা যায়, কেহ কোন মাসআলা জিজ্ঞাসা করিলে তিনি তাহার জানামতে উত্তর দিয়া দিতেন। আবার কখনও বা বলিতেন, 'তোমার প্রশ্নের উত্তর আমার জানা নাই।'

কিন্তু আবু জাফরের উপরোক্ত কথায় মনে হয় যে, তিনি ইমাম মালিক (রঃ)-এর ইজতিহাদী ফলাফলকে গ্রন্থাকারে সন্নিবেশিত করিয়া উহা রাষ্ট্রের আইন হিসাবে চালাইতে মনস্থ করিয়াছিলেন।

রাজনৈতিক গোপন উদ্দেশ্য

কিন্তু প্রশ্ন হইল এই প্রকার ধারণা ইহার পূর্বে কেন আবু জাফর মনসুরের মনে উদয় হয় নাই? ইমাম মালিক এবং তাহার ইলমের সুখ্যাতি তো বহুদিন যাবতই লোকের মুখে মুখে ছিল। মনসুর কয়েকবার মদীনায় আসিয়াছেন—আবার চলিয়া গিয়াছেন। কিন্তু ইতিপূর্বে কখনও তিনি ইমাম মালিকের সম্মুখে এমন বাসনা প্রকাশ করেন নাই।

এখন যদি এই কথা মনে করা হয় যে, ইমাম আবু হানিফা (রঃ)-এর মুকাবিলায় হাজ্জাজ ইবন আরতাত হইতে নিরাশ হইয়া এমন একটি অবস্থারই তিনি সৃষ্টি করিতে চাহিয়াছিলেন—তবে এমন দাবী করা সীমাতীত হইবে। তবে অন্যান্য উদ্দেশ্যের সাথে ইহাও যে একটি উদ্দেশ্য ছিল একথা অস্বীকার করার উপায় নাই।

এখন তাহার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে যাহার যাহা ইচ্ছা বলুক। কিন্তু যখন চিন্তা করি যে, তখনকার দুনিয়ার সর্বশ্রেষ্ঠ নরপতি মনসুর 'সর্বাধিক জ্ঞানী' 'সর্বশ্রেষ্ঠ আলিম' ইত্যাদি খেতাবে ভূষিত করিয়া রাষ্ট্রের যাবতীয় ক্ষমতা ইমাম মালিকের চরণে অর্পণ করেন যে, 'আপনার ইজতিহাদ ও বিদ্যা-বুদ্ধিকে যেভাবে ইচ্ছা পরিচালনা করিয়া উহাকে রাষ্ট্রের আইন-কানুন হিসাবে কার্যকরী করুন। আর শরীয়ত মত উহাতে কোন দোষও ছিল না। ইমাম আবু হানীফা (রঃ) তো তাহাই চাহিতেন। এই উদ্দেশ্যে ইমাম আবু হানীফা (রঃ) এই ইসলামী শরীয়তকে এক সুশৃংখল কাঠামোতে ঢালিয়াও দিয়াছিলেন।

ইমাম মালিকের উত্তর

আবু জাফরের উদ্দেশ্য শুনিয়া ইমাম মালিক (রঃ) যে উত্তর দিয়াছিলেন আজও ইতিহাসের পাতায় উহা স্বর্ণাক্ষরে লিখিত রহিয়াছে। বিভিন্ন স্থানে এই সম্বন্ধে উল্লিখিত আছে—

'আমীরুল মু'মিনীন! আপনি কখনও এরূপ কাজ করিবেন না। প্রথম হইতেই বিভিন্ন 'আলিমদের মতামত মুসলিম সমাজে প্রচলিত আছে। তাহারা হাদীস শুনিয়াছেন, রওয়ায়েত বর্ণনা করিয়াছেন। প্রথমে তাহারা যাহা শুনিয়াছেন সে মতে তাহারা আমল করিয়াছেন এবং উহাকেই তাহারা ধর্ম হিসাবে মানিয়া লইয়াছেন। সুতরাং যে এলাকার লোক যে নীতি অনুসরণ করিয়াছে—উহাই তাহাদিগকে নির্বিঘ্নে করিতে দিন।' (মিযানুল কুবরা)

ইমাম মালিক (রঃ)-এর এই প্রসিদ্ধ উক্তি দ্বারা—মুসলমানদের বিভিন্ন মতবাদ সম্পর্কে তাহার যে দৃষ্টিভঙ্গির নমুনা পাওয়া যায় ফিকাহ সংকলনে যেদিকে ইঙ্গিত করা হইয়াছে—উহা এক অন্য বিষয়বস্তু। এখানে আমি অন্য কিছু বলিতে চাই—অর্থাৎ যদি একথা মনে করা হয় যে, ইরাকের 'আলিম বলুন বা ইমাম আবু হানীফা এবং তাহার ছাত্রবৃন্দই বলুন তাহাদের বিরুদ্ধে আবু জাফর বিরুদ্ধ মতবাদ প্রতিষ্ঠিত করিতে যাইয়া এই ব্যাপারে ইমাম মালিকের দ্বারা যেভাবে উপকৃত হইতে মনস্থ করিয়াছিলেন এবং ইমাম মালিক তাহার কথা দ্বারা মনসুরের উদ্দেশ্য যেভাবে বানচাল করিয়া দিয়াছিলেন—উহাতে বিস্ময়ের কিছুই নাই।

ইমাম মালিক কখনও হাজ্জাজ ইবনে আরতাতের ন্যায় হীন বুদ্ধি-সম্পন্ন 'আলিম ছিলেন না যে রাষ্ট্রের মনোভাব বুঝিতে পারিয়াই

ইমাম আবূ হানীফার ন্যায় লোককে বেওকুফ প্রতিপন্ন করিবেন এবং স্বকীয়তাকে রাষ্ট্রের পায়ে জলাঞ্জলি দিবার জন্য প্রস্তুত হইয়া যাইবেন। আল্লাহ না করুন তিনি যদি তাহাই হইতেন তবে হাজ্জাজ ও হাজ্জাজের ন্যায় 'আলিমগণের যেমন দুনিয়ার খাতায় নাম নাই ইমাম মালিকও সেই খাতায় স্থান পাইতেন। কিন্তু তিনি জানিতেন বিষয়বস্তু ভাল হউক বা মন্দ হউক মনসূরে যে উদ্দেশ্য ব্যক্ত করিয়াছিলেন উহা ভুল ছিল।

আমার তো মনে হয় তিনি উন্নত দৃষ্টিভঙ্গি ও দূরদর্শিতার যে নজীর স্থাপন করিয়াছেন উহা মুসলিম ইতিহাসে কেন বিশ্ব ইতিহাসেও বিরল। প্রকাশ্যে তো মনে হয় তিনি এক সুবর্ণ সুযোগ ছাড়িয়া দিলেন। আল্লাহর উদ্দেশ্যে তিনি এই সুবর্ণ সুযোগ পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। ঘটনাবলীতে ইহাই প্রমাণিত করিয়াছে যে সেই আল্লাহ-ই না তাঁহাকে ধ্বংস হইতে দিয়াছেন, না তাঁহার উদ্দেশকে।[১]

মোট কথা, ইমাম আবূ হানীফা এবং তাহার ইলমী খেদমতের প্রতিক্রিয়া হুকুমতে 'আব্বাসীয়া এবং অন্যান্য পাশ্চাত্য দেশগুলিতে যেমন প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল উহার ক্ষমতা ও প্রতিক্রিয়া ধ্বংস করার এই একই তদবীর ছিল যে, ইমাম মালিককে ইমাম আবূ হানীফার বিরুদ্ধে দাঁড় করাইয়া দেওয়া। সমস্ত মুসলিম বিশ্বে একমাত্র ইমাম মালিকই এমন ব্যক্তি ছিলেন যাঁহার দ্বারা হুকুমত ইমাম আবূ হানীফার বিরোধিতা করায় উপকৃত হইতে পারিত। কিন্তু ইমাম মালিক কয়েকটি কথা দ্বারাই মনসূরের আশা-আকাঙ্ক্ষা বানচাল করিয়া দিয়াছিলেন।

১। পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি যে, ইমাম তাঁহার মাসআলাসমূহ কোন গ্রন্থাকারে লিখিয়া রাখিয়া যান নাই। ইমাম সাহেব কোন মাস-আলার উত্তর দিলে তাহার ছাত্র আশহাব উহা লিখিয়া রাখিতেন। ইমাম মালিক বলিতেন 'লিখিয়া রাখিও না! কারণ আমি জানি না ভবিষ্যতে আমার এই মতে আমি ঠিক থাকিব কি না?' কিন্তু আল্লাহ্‌র রহমতে তাহার মাসআলার সংকলন হইয়াছিল। প্রাচ্যে যেমন 'আব্বাসী হুকুমত হানাফী আইন-কানুন মানিয়া লইতে বাধ্য হইয়াছিল তদ্রূপ বনী উমাইয়া হুকুমত পাশ্চাত্যে ইমাম মালিকের প্রবর্তিত আইন-কানুন রাষ্ট্রের আইন-কানুন করিয়া লইয়াছিল। মালিকী মযহাবে যেমন বিখ্যাত 'আলিম হইয়াছেন তেমনি বড় বড় গ্রন্থও প্রণয়ন হইয়াছে। আমার মনে হয় তাহার নিঃস্বার্থপরতার জন্যই আল্লাহ্‌ তাঁহাকে এরূপ সম্মানিত করিয়াছেন।

আব্বাসী হুকুমত ইমাম মালিক হইতে নিরাশ

যদিও 'আব্বাসী হুকুমতের পক্ষ হইতে সময় সময় আবু জাফরের শাসনকালে এবং মেহদী ও হারুনুর রশীদের শাসনাকালেও বিভিন্ন পন্থায় ইমাম মালিককে আহ্বান জানাইয়াছিলেন তথাপি ইমাম মালিকের সিদ্ধান্ত একজন ইমামের সিদ্ধান্তই ছিল। প্রথমে মনসুরকে যাহা বলিয়াছিলেন পরবর্তীকালেও তাহাই বলিয়াছিলেন। তাহার জীবন রচয়িতাগণ বিস্তারিতভাবে এই সমস্ত উল্লেখ করিয়াছেন।

এই সম্বন্ধে একটি চমকপ্রদ ঘটনার উল্লেখ রহিয়াছে। খলীফা মেহদী মদীনায় আসিলেন। এই উপলক্ষে দুই হাযার আশরাফী ইমাম মালিকের খিদমতে পাঠানো হইল। ইমাম সাহেব আশরাফী গ্রহণ করিলেন। কয়েকদিন পর মেহদীর বিশিষ্ট লোক রবী' ইমাম সাহেবের নিকট আসিয়া বলিলেন 'খলীফার ইচ্ছা আপনি তাহার সাথে বাগদাদ চলুন।'

ইমাম মালিক উত্তরে রবী'কে বলিলেন—

'খলীফা যে আশরাফী পাঠাইয়াছেন—উহা তদ্রূপ অবস্থায়ই আমার নিকট রাখা আছে।'

অর্থাৎ আশরাফী দিয়া যদি খলীফা আমাকে তাহার আজ্ঞাধীন করিতে চান তাই আমি উহা স্পর্শও করি নাই। যেভাবে পাঠানো হইয়াছিল ঠিক সেই ভাবেই আমি ফেরত দিতে পারি। অতঃপর নবীজীর এই হাদীস শুনাইয়া দিলেন—

'মদীনাবাসীদের জন্য মদীনায় অবস্থান করাই ভাল। হায়! লোকে যদি তাহা জানিত।'

পূর্বে যেরূপ উল্লেখ করা হইয়াছে, আবু জাফর এবং ইমাম হানীফার মধ্যস্থিত ঘটনাবলী লোকে এমনভাবে বর্ণনা করিয়াছেন যে কোন সময় উহা সংঘটিত হইয়াছে তাহার সময় নির্ধারণ করা খুবই কষ্টকর।

ইমাম আবু হানীফা সম্বন্ধে মনসুরের শেষ সিদ্ধান্ত

আমার যতদূর ধারণা হাজ্জাজ ইবন আরতাতের অকৃতকার্যতা এবং ইমাম মালিকের উত্তরে মনসুরের মধ্যে যে নিরাশার সুর বাজিয়া

উঠিয়াছিল উহার পর তিনি ইমাম আবূ হানীফা সম্বন্ধে শেষ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার ইচ্ছা করিলেন। ইবরাহীমের বিপ্লবের ঘটনাবলীতে মনসূর ইমাম সাহেবের সংগে বিশেষ কোন সম্পর্ক রাখিতেন না। পরে সমস্ত বিপদাপদ কাটিয়া গেলে তিনি ইমাম সাহেবের সঙ্গে শেষ বারের মত একটি বুঝাপড়া করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিলেন।

বাগদাদ নগর নির্মাণের সময়

ইমাম আবূ হানীফা (রঃ) ১৫০ হিজরীর রজব মাসে ইনতিকাল করেন। মনসূর বাগদাদ নগর নির্মাণের দ্বিতীয় পর্যায় ১৪৬ হিজরীতে আরম্ভ করেন। লোকে বলে নির্মাণ কার্যে চারি বৎসর লাগিয়াছিল। বাগদাদ নির্মাণের সমাপ্তি এবং ইমাম সাহেবের ইনতিকাল প্রায় এক সময় হইয়াছিল। এই চারি বৎসরের মধ্যে ১৪৭ হিজরী পর্যন্ত তো মনসূর হজ্জ সমাধা এবং ইমাম মালিকের সাথে আলাপ-আলোচনাতেই ব্যস্ত ছিলেন। সেমতে ইহাই বুঝিতে হয় যে ইমাম সাহেবের ও মনসূরের মধ্যে নতুন সম্পর্ক ১৪৮ হিজরীতে বা ইহার আগে বা পরে কোন এক সময়ে স্থাপিত হইয়াছিল। যতদূর মনে হয় এই দুই আড়াই বৎসর কালই কয়েকবার ইমাম খলীফার দরবারে গমনাগমন করিয়াছেন।

মুঁফিক 'আলী ইবন আলী হামীরী হইতে বর্ণনা করেন 'আবূ জাফর ইমাম সাহেবকে কুফা হইতে ডাকিয়া আনিয়া নিজের কাছে রাখিলেন এবং কাযীর পদ গ্রহণ করার জন্য বার বার চাপ দিতে লাগিলেন।

ইহার অর্থ এই দাঁড়ায় যে, কয়েকবার ইমাম সাহেব আহবান করিয়া আনিয়া নিজের কাছে রাখিয়াছিলেন এবং কাযীর পদ গ্রহণ করিতে চাপ দিতেছিলেন। ইহা ইমাম সাহেবের জীবনের শেষ দুই আড়াই বৎসরের ঘটনা। পর্যায়ক্রমে আমি সেই সব ঘটনাই এখন উল্লেখ করিব।

কূফার ইলমী পরিবেশ

ইহা যে সময়কার ঘটনা কূফা ছিল ইসলামের 'গম্বুজ' স্বরূপ। শুধু শান-শওকত ধন-দৌলতের দিক হইতেই এই শহর মর্যাদা-সম্পন্ন ছিল না বরং 'ইবাদত-বন্দেগী, তাকওয়া-পরহেযগারী ও বিদ্যা-বুদ্ধির অসংখ্য ঝর্ণা এই শহরকে সঞ্জীবিত করিয়া রাখিয়াছিল। সেই সময় পর্যন্ত তিনটি বিষয়ের ইলম বা বিদ্যারই গুরুত্ব মুসলমানদের মধ্যে

বেশী ছিল। (১) কুরআন, কিরাত-তাজবীদ, (২) হাদীস ও সুন্নত। (৩) ফিকাহ ও ইজতিহাদ। এই তিনটি বিষয়ে অভিজ্ঞতাসম্পন্ন বহু ইমামও কূফায় ছিলেন। তাহাদের মধ্যে অনেকেই এমন ছিলেন যে তাহার নিজস্ব বিষয় ছাড়া অন্য বিষয়ের সম্বন্ধ খুব কম রাখিতেন। আবার কেহ কেহ তাহার নিজস্ব বিষয় ছাড়াও অন্যান্য বিষয়ের উপর বেশ দক্ষতা রাখিতেন।

বিশেষভাবে হাদীস ও ফিকাহ্‌তে কোন কোন লোকের এই অবস্থা ছিল যে, তাহার নিজস্ব বিষয় তো বর্ণনা করিতেনই তদুপরি কেহ কোন প্রশ্ন করিলে হাদীস, সাহাবা এবং তাবঈনদের বর্ণনা যাহা তাহাদের স্মরণে থাকিত তাহা দ্বারাই প্রশ্নকারীর প্রশ্নের উত্তর দিয়া দিতেন। আবার কেহ কেহ কিয়াস এবং নিজের ইজতিহাদ দ্বারাও কার্যোদ্ধার করিতেন। একদিকে যেমন তাঁহারা মুহাদ্দিস ছিলেন অন্যদিকে ফকীহ এবং মুজতাহিদের দলেও পরিগণিত হইতেন।

এই ধরনের সর্বজনমান্য মুহাদ্দিস ছিলেন সুফইয়ান সাওরী। তাঁহার আসল কাজ ছিল সমবেত লোকের সম্মুখে নিজের রায় প্রকাশ করা যাহার মধ্যে হুযুর (সঃ)-এর হাদীস, সাহাবাদের ফতওয়া এবং তাবিঈনদের ফতওয়াও বিদ্যমান থাকিত। ইহা ছিল তাহার জ্ঞানের প্রধান সম্পদ।

কিন্তু মানব জীবনের প্রত্যেকটি দিকের সমস্যা সম্বন্ধে প্রশ্ন করা, উহার উত্তর নির্ধারণ করা, উহা ছাত্রদিগকে শিক্ষা দেওয়া এবং ছাত্রদের মধ্যে ইজতিহাদ ও সংকলনের শক্তি সৃষ্টি করা—আমার যতদূর মনে হয় কূফায় একমাত্র ইমাম সাহেবের আইন প্রণয়ন সমিতি ছাড়া আর কোথাও হইত না। ব্যক্তিগতভাবে কেহ যদি এমন কোন চেষ্টা করিয়াও থাকেন তবে তাহারা ছিলেন কাযী ইবন আবী লায়লা, ইবন শাবরামাহ এবং হাজ্জাজ ইবন আরতাত। এই তিন জন বুযুর্গ সম্বন্ধে পূর্বে বহু কিছু আলোচনা করিয়াছি।

সুফইয়ান ছাওরী, শরীফ ইবন 'আবদুল্লাহ, মা'ছার ইবন কুদাম এবং ইমাম আবু হানীফা (রঃ)-এর বাগদাদে আহ্‌বান

মনে হয় মদীনা হইতে বাগদাদ প্রত্যাবর্তন করার পর মনসুর ইমাম সাহেবকে আহ্‌বান করিতে ইচ্ছা করিয়াও তাঁহাকে একা আহ্‌বান করা যুক্তিসঙ্গত মনে করেন নাই। আল্লাহ্‌ জানেন ইহার পিছনে কি রহস্য ছিল। হইতে পা তাঁকে একা আহ্‌বান করিলে জনসাধারণের

নিকট তাঁহার গুরুত্ব বাড়িয়া যাইবে অথবা ইমাম সাহেবকে ইহাই বুঝাইতে চাহিয়াছিলেন যে, 'তুমি যে একাই বিশিষ্ট 'আলিম এমন ধারণা আমার মধ্যে নাই।' আবু জাফর এই সময় যে কথাবার্তা বলিয়াছিলেন উহা দ্বিতীয় ধারণাকেই বেশী সমর্থন করে।

যাহা হউক কুফায় আবু জাফর মনসুরের ফরমান পেঁাছিল। আবু হানীফা, সুফইয়ান ছাওরী, শরীফ ইবন আবদুল্লাহ নখঈ এবং মা'ছার ইবন কুদামাকে অতি সত্তর শাহী দরবারে পাঠানো হউক।[১]

ইমাম সাহেব এবং সুফইয়ান ছাওরী ব্যতীত 'আবদুল্লাহ ইবন শরীফ এবং মা'ছার ইবন কুদামও যে কুফার মাননীয় ব্যক্তিদের মধ্যে ছিলেন উহাতে কোন সন্দেহই নাই। কিন্তু আবু হানীফা তো আবু হানীফাই ছিলেন। সত্য বলিতে কি সুফইয়ান ছাওরীর কাতারে দাঁড়ানোর মত সমর্থ এই দুই হযরতের ছিল না—যদিও তাঁহাদের 'ইলমী খিদমত প্রায়ই তাঁহার সমপর্যায়ভুক্ত ছিল। তাঁহারা শাহী দরবারে পেঁাছার পূর্বে কোন কোন সূত্র হইতে একথাও অবগত হইতে পারিয়াছিলেন যে—হুকুমতের কোন চাকুরী গ্রহণ করার জন্যই আমাদেরকে আহ্বান করা হইয়াছে। তাহারা সকলেই সমপর্যায়ভুক্ত না হইলেও কেহই হুকুমতের চাকুরী গ্রহণ

১। কাযী শরীফ ইবন আবদুল্লাহ সম্বন্ধে পূর্বে বলা হইয়াছে যে, মেহদী বাবুর্চি তাহাকে ডিমের হালুয়া খাওয়াইয়া বলিয়াছিল—"এখন এই ব্যক্তি আর কোথাও পলায়ন করিতে পারিবে না।"

মা'ছার ইবন কুফার জামে মসজিদে হাদীস পাঠ করিতেন। তাঁহার মা অত্যন্ত পরহেযগার ছিলেন। ইবন ছা'দ বলেন—"ইবন কুদাম তাঁহার মাকে কোন আসনে বসাইয়া কাঁধে লইয়া মসজিদে যাইতেন। বৃদ্ধা মা 'ইবাদত-বন্দেগী করিতেন আর তিনি নিজে উপস্থিত সকলের সম্মুখে হাদীস পাঠ করিতেন। আবার মাকে কাঁধে লইয়া বাড়ী ফিরিতেন। বাড়ী এবং মসজিদ ব্যতীত অন্য কোথাও যাইতেন না।"

হযরত সুফইয়ান ছাওরী একজন মহান ওলী ছিলেন। ইবন জাওযী বলেন—তাহার ত্রিশ হাযার হাদীস মুখস্থ ছিল। তিনি কখনও উহা ভুলেন নাই। ইবরাহীমের বিপ্লবের সময় লোকে ফতওয়া জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলিয়াছিলেন—এ বিষয়ে আমি আদেশও করিতে পারি না, নিষেধও করিতে পারি না। প্রথমাবস্থায় তিনি আমীরদের সাহায্য গ্রহণ করিতেন। পরে সন্দেহ হওয়ায় আর গ্রহণ করেন নাই। জীবিকা নির্বাহের জন্য বন্ধু ও ভক্তদিগকে কিছু মূলধন দিয়া রাখিয়াছিলেন—উহার আয় হইতেই কোনমতে পানাহার করিতেন। আবু জাফর তাঁহাকে হুকুমতের কাজ গ্রহণ করানোর চেষ্টা করিয়াও কৃতকার্য হইতে পারেন

করিতে ইচ্ছুক ছিলেন না হইতে পারে এই অনিচ্ছার কারণ এক এক-জনের নিকট বিভিন্ন ধরণের ছিল। কিন্তু কুফার সকলেই একথা জানিত যে, চাকুরীর জন্য বেচারা ইবন আবী লায়লা এবং ইবন শাবরামাহ্‌র দুর্গতিই না ভোগ করিতে হইত।[২] ইবন সা'দ বলেন—

ইবন শাবরামাহ্‌ এবং ইবন আবী লায়লার নিয়ম ছিল প্রত্যেহ 'এশার পর গল্প-গুজব করার জন্য কুফার শাসনকর্তা 'ঈসা ইবন মুসার নিকট উপস্থিত হইতেন। তাহারা সওয়ারীতে আরোহণ করিয়া শাসনকর্তার বাসভবনের দ্বারে উপস্থিত হইতেন এবং প্রবেশ করার অনুমতির জন্য অপেক্ষা করিতে থাকিতেন। কিছুক্ষণ পর দ্বাররক্ষক আয়ায প্রবেশ করিতে বলিত অথবা বলিত—'আপনারা বাড়ী চলিয়া যাইতে পারেন।" ইবন শাবরামাহ্‌ কবি স্বভাবের লোক ছিলেন। ছুটি পাওয়ার আনন্দের তিনি যে কবিতা রচনা করিয়া পাঠ করিতেন উহার অর্থ ছিল—যখন 'এশার সময় হয় আর ঘুম আসিয়া চোখে বাসা বাধে তখন আয়ায দুইটি আরামের মধ্যে একটি আরামের সংবাদ প্রদান করে (অর্থাৎ গল্প করা বা ছুটি পাওয়া উভয়ই আরামপ্রদ)।

চারিজন 'আলিমের সম্মুখে মনসুরের উদ্দেশ্য জ্ঞাপন

চারিজন 'আলিমই উপস্থিত হইলেন। ইবরাহীমের বিপ্লবের পর খলীফার সাথে এই তাহাদের প্রথম সাক্ষাত। খলীফা তাহাদিগকে

নাই। কথিত আছে, তিনি মক্কা শরীফ থাকাকালীন শুনিতে পাইলেন আবু জাফর হজ্জ করিতে আসিতেছেন। তিনি চিন্তিত হইয়া আল্লাহ্‌র নিকট দোআ করিলেন—"আল্লাহ তুমি আমাকে আবু জাফরের হাত হইতে মুক্তি দাও।

২। ইবন শাবরামাহ্‌ একজন বিজ্ঞ 'আলিম ও বুযুর্গ ব্যক্তি ছিলেন। প্রথমে তাঁহাকে য়ামনের শাসনকর্তা করিয়া পাঠানো হয়, পরে পদচ্যুত হন। য়ামনের প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস মু'আয় বলেন, 'য়ামন হইতে যাওয়ার সময় আমি তাঁহার সাথে সাথে চলিতেছিলাম। তিনি আমাকে বলিলেন —"ভাই আল্লাহ্‌র শোকর যে, যে জামা পরিধান করিয়া আসিয়াছিলাম উহা পরিধান করিয়াই যাইতেছি।" ইহার পর কিছুক্ষণ চুপ থাকিয়া আবার বলিলেন—"ইহা হালাল সম্পর্কে বলিলাম, হারামের তো কোন স্থানই নাই।"—ইবনে শাবরামাহ নিজেও অনেক মাসআলা ইজতিহাদ করিয়াছেন। তিনি বিবাহের ব্যাপারে পাত্রের বয়স ১৮ এবং পাত্রীর বয়স ১৬ বৎসর নির্ধারণ করিয়া দিয়াছিলেন। কয়েক বৎসর পূর্বে মিসর সরকার রাজ্যে এই নিয়ম প্রবর্তন করিয়াছিলেন।

সান্ত্বনা দিয়া বলিলেন—"একটি ভাল কাজ ব্যতীত অন্য কোন কারণে আমি তোমাদিগকে আহ্বান করি নাই।"

মাছার এবং সুফইয়ান কিভাবে মুক্তি পাইলেন

ঘটনা যদি ইহাই হয় তবে সকলকে লক্ষ্য করিয়া বলা হইলেও যতদূর আমার বিশ্বাস ইহা দ্বারা অনেকাংশে ইমাম সাহেবকেই উদ্দেশ্য করা হইয়াছিল। কেননা, তিনি তাঁহার চোখে অপরাধী ছিলেন। সে যাহাই হউক হঠাৎ দেখা গেল মাছারা ইবন কুদাম গুটি গুটি পায়ে খলীফার নিকট গিয়া তাঁহার হাত ধরিয়া মুসাফাহা করিয়া বলিলেন; 'বলুন! আজ-কাল আপনার অবস্থা কেমন? এই বান্দা যখন এখানে ছিল না তখন আপনি কেমন ছিলেন? আপনার মেষপালের ঘোড়াগুলি কেমন আছে? আপনার পাশে অমুক অমুক ব্যক্তি যাহারা থাকে তাহারা এবং আপনার দাস-দাসীরা কেমন আছে? কূফার বাঁধের নিকট অলি-গলির অবস্থা নাকি খারাপ!'

মাছার এই অবস্থা দেখিয়া সমস্ত দরবার হতবাক হইয়া গেল যে, মাছার কেন এমন সব কথাবার্তা বলিতেছে, তাঁহার হইল কি?

পরে মাছার বলিলেন, 'আই! আপনি আমাকে কাযী নিয়োগ করিতে চান?'

অবশেষে কোন একজন অগ্রসর হইয়া তাঁহাকে সরাইয়া দিল এবং বলিল, তাঁহার মস্তিষ্ক বিকৃতি ঘটিয়াছে। কেহ কেহ বলেন, 'ইমাম সাহেব তাহাকে বলিয়া দিয়াছিলেন যে, তুমি পাগলের ভান করিবে।'

মোট কথা, মাছার বাঁচিয়া গেলেন। অবশিষ্ট রহিলেন সুফইয়ান। তাঁহার সম্বন্ধে বলা হয় যে—তিনি পলাইয়া গিয়াছিলেন। আল্লাহ্ জানেন, হয়ত মাছারের এরূপ করার যে হট্টগোলের সৃষ্টি হইয়াছিল সেই সুযোগেই তিনি পলাইয়া যাইতে সমর্থ হইয়াছিলেন। অথবা যেমন বর্ণিত আছে যে, রাস্তাতেই কোন এক অজুহাতে আত্মগোপন করিয়াছিলেন।

কাযীর পদ গ্রহণের প্রস্তাব ঃ ইমামের অস্বীকার

এখন শুধু ইমাম সাহেব এবং কাযী শরীফই দরবারে ছিলেন। আবূ জাফর বলিলেন, 'আমি আপনাকেই কূফার কাযী নিয়োগ করিতে চাই।' পূর্বেও বহুবার এই কথা বলা হইয়াছিল এবং ইমাম সাহেবের

জীবনচরিত রচয়িতাগণও ইমাম সাহেবের পক্ষে নানারূপ ওযর আপত্তি পেশ করিয়াছেন।

মনে হয় কূফায় কাযীর পদে ইমাম সাহেবকে নিয়োগ করিতে চাহিলে—কূফায় বিশেষ অবস্থার প্রতি ইঙ্গিত করিয়া ইমাম সাহেব মনসূরকে বলিয়াছিলেন যে—'কূফাবাসীদের অবস্থা[১] সম্পর্কে আপনি ভালভাবেই অবগত আছেন। আমি এখানে একজন সাধারণ নাগরিক হিসাবে বসবাস করিয়া আসিতেছি। কোন প্রকার কর্মচারীর বা রাষ্ট্রীয় শক্তি এই শহরে আমার নাই। কিন্তু আমাকে যদি সেখানকার কাযী করিয়া পাঠান তবে লোকে আমার বংশগত মর্যাদার প্রতিই বেশী লক্ষ্য করিবে।'

ইমাম সাহেব পরিষ্কার ভাষায় আরও বলিলেন,—এখানকার লোক জানে আমার পিতা একজন রুটি প্রস্তুতকারী ছিলেন। চিন্তা করিয়া দেখুন এক রুটিওয়ালার পুত্রের আদেশ-নিষেধ কি কূফাবাসী বরদাশত করিতে পারিবে? তাহারা যে আমার উপর ইট পাথর নিক্ষেপ করিবে ইহাতে বিস্ময়ের কিছুই নাই।

মনসূর ইমাম সাহেবের কথা চুপ করিয়া শুনিতেছিলেন। তখনও

১. কূফা হযরত ওমর (রঃ)-এর আমলের প্রতিষ্ঠিত শহর। হযরত ওমর সা'দ ইবন আবী ওয়াক্কাসকে শাসনকর্তা করিয়া পাঠাইলেন। লোকে তাঁহার নামে অভিযোগ পেশ করিল। তাঁহাকে সরাইয়া আম্মার ইবন ইয়াসারকে পাঠাইলেন। লোকে অভিযোগ করিল—এ দুর্বল রাজনীতি বুঝে না। হযরত ওমর বলিয়াছিলেন—কূফাবাসীদের লইয়া কি করি? কঠোর ব্যক্তি সম্বন্ধে অভিযোগ করে, দুর্বলকে ঘৃণা করে। কথিত আছে, হযরত সা'দ ইবন আবী ওয়াক্কাস বিদায় গ্রহণের সময় তাহার সম্বন্ধে অভিযোগকারীর জন্য দোআ করিয়াছিলেন,—এই ব্যক্তি যদি আমার নামে অযথা অভিযোগ করিয়া থাকে তবে যেন সে অনেক বয়স পায় এবং বিপদাপদে পতিত হয়। সেই ব্যক্তি অনেক বয়স পাইয়াছিল এবং যুবতী মেয়েদের পিছনে রাস্তায় রাস্তায় ঘোরাফেরা করিত। লোকে বলিত—ওহে বৃদ্ধ, একি অন্যায় কাজ করিতেছ? সে বলিত—ইহা সা'দ ইবন আবী ওয়াক্কাসের বদদোআর ফল। সা'দ বলিয়াছিলেন—কূফার শাসনকর্তা এবং প্রজাসাধারণ কেহই যেন কাহারও প্রতি সন্তুষ্ট না থাকে। হাজ্জাজের পূর্ববর্তী শাসনকর্তাদের প্রতি ক্ষেপিয়া গেলে কূফাবাসী মসজিদের মধ্যেই তাঁহাকে ইট পাথর নিক্ষেপ করিত। হাজ্জায তরবারির সাহায্যে এই প্রথা বিলোপ করিয়াছিল।

বাগদাদের নির্মাণ কার্য শেষ হয় নাই। যদি হইত তবে হয়ত বাগদাদের কাযীর পদই প্রস্তাব করিতেন—যেমন পরবর্তীকালে করিয়াছিলেন। এই ভাবেই তিনি রেহাই পাইলেন।

কাযী শরীফের কাযীর পদ গ্রহণ

শুধু কাযী শরীফই ধরা পড়িলেন। তিনি তাঁহার মস্তিষ্কের দুর্বলতার কথা বলিলেন। মনসুর বলিলেন—এই জন্য বাদামী তৈলের ফালুদা তৈরী করিয়া পান করাইবার ব্যবস্থা করিয়া দিব। অতঃপর কয়েকটি শর্তাধীনে কাযী শরীফ কাযীর পদ গ্রহণ করিলেন। ইমাম সাহেবের জীবনচরিতে এই বিষয়ের আলোচনা আছে বলিয়া বাধ্য হইয়া বর্ণনা করিতে হইতেছে। অন্যথায় এই ঘটনা বর্ণনায় ইমাম সাহেবের জীবনীতে তেমন কোন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নাই।

যাহা হউক ইবরাহীমের বিপ্লবের পর ইমাম ও মনসুরের মধ্যে যে অন্তরায় সৃষ্টি হইয়াছিল উভয়ের মধ্য হইতে সেই অন্তরায় দূর হইয়া গেল। আবার উভয়ের মধ্যে আলাপ-আলোচনার সূত্রপাত হইল। মনে হয় ইহার পর বার বার মনসুর তাহাকে আহ্বান করিতে আরম্ভ করেন এবং তাহাদের আলাপ-আলোচনার বিষয়বস্তু বহু লোকে লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। কোন কোন বর্ণনায় প্রমাণিত হয় যে, অন্য আর একবারও ইমাম সাহেবের সাথে কাযী শরীফ ও সুফইয়ান ছাওরীকে নব নির্মিত বাগদাদ শহরে আহ্বান করিয়াছিলেন। কিন্তু আমার মনে হয় ইহা একই ঘটনা। কেহ মাছার কথা উল্লেখ করিয়াছেন, কেহ বা করেন নাই। তাই লোকে ইহাকে পৃথক পৃথক ঘটনা মনে করিয়াছেন।

সে যাহাই হউক, অন্যান্যের সাথে একবার হউক বা কয়েকবারই হউক ইমাম সাহেবকে আহ্বান করা হইয়াছিল—উহাতে দুই কথাই জানা যায়। প্রথম কথা, প্রথম দুই একবার অন্যান্যের সাথে এবং পরে কয়েকবার শুধু ইমাম সাহেবকেই অহ্বান করা হইয়াছিল। দ্বিতীয় কথা, প্রত্যেক বারই তাহাকে রাষ্ট্রের কোন কাজ গ্রহণ করার জন্য আমন্ত্রণ জানানো হইয়াছিল।

কাযীউল কুযাতের পদ গ্রহণের প্রস্তাব

আফসোস! এই সাক্ষাৎকার সম্বন্ধে অনেকেই অনেক কথা লিখিয়াছেন, কিন্তু একটি বিষয় যাহা তাহারাই বর্ণনা করিয়াছেন উহার প্রতি তেমন গুরুত্ব দেন নাই। সম্ভবত আমি পূর্বেই এ সম্বন্ধে বলিয়াছি যে,

কাযীর পদ ইমামের সম্মুখে একই আকৃতিতে পেশ করা হয় নাই, বরং একই শহর যেমন—কুফা অথবা বসরার কাযীর পদে অভিষিক্ত করিতে চাহিয়াছেন এবং উহার অধীনস্থ যে সমস্ত এলাকা ছিল উহার কাযীর পদেও ইমাম সাহেবকে নিয়োগপত্র দিতে চাহিয়াছিলেন।

আবার তাঁহারাই বলেন, 'তাঁহাকে কাযীউল কুযাত অর্থাৎ রাষ্ট্রের প্রধান বিচারপতির পদে অভিষিক্ত করিতে চাহিয়াছিলেন।'

মুফিক আহমদ ইবন বুদায়ল হইতে বর্ণনা করেন এবং লিখেন যে, আহমদ হইতে মুহাম্মাদ ইবন হাসান বর্ণনা করিয়াছেন, 'বিচারের সমস্ত দায়িত্ব তাঁহাকে অর্পণ করা হইল এবং তৎসহ এই দায়িত্বও অর্পণ করা হইল যে, ইসলামী রাষ্ট্রের সমস্ত কাযীই তাঁহার নিয়ন্ত্রণে থাকিবে।'

ইহার অর্থ এই দাঁড়ায় যে, ইসলামী রাষ্ট্রের কাযী নিয়োগ ও বরখাস্তের ক্ষমতাও মনসুর ইমাম সাহেবের হাতে অর্পণ করার ইচ্ছা করিয়াছিলেন। যদি একথা সত্য হয় তবে ইসলামী বিচার বিভাগের ইতিহাসে ইহা এক অবিস্মরণীয় বিপ্লবাত্মক ঘটনা। কিন্তু পরিতাপের বিষয় যে, এই সম্পর্কে বর্ণনাকারীগণ দুইটি বর্ণনা, অর্থাৎ একটি সংক্ষিপ্তাকারে অন্যটি বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করিলেও এমন দায়সারাভাবে করিয়াছেন যে সাধারণ পাঠক উহার গুরুত্ব উপলব্ধি করিতে মোটেই সক্ষম হইবে না। এমন কি বিষয়টি জ্ঞানী সমাজের নিকটও তেমন গুরুত্বপূর্ণ হইয়া দেখা দেয় নাই। সুতরাং মনে করা হয় যে, 'কাযীউল কুযাতের' নয়া পদ সৃষ্টির প্রতি প্রথম হারুনুর রশীদই মনোনিবেশ করিয়াছিলেন। তিনিই আবু ইউসুফকে 'কাযীউল কুযাতের' পদে প্রথম বহাল করিয়াছিলেন।

একথা সত্য যে, আবু ইউসুফই ইসলামের ইতিহাসের প্রথম 'কাযীউল কুযাত' ছিলেন। কিন্তু 'কাযীউল কুযাতের' পদ সৃষ্টির গুরুত্ব যে হারুনুর রশীদই প্রথম উপলব্ধি করিয়াছিলেন একথা সত্য নয়। দেখা যাইতেছে—মনসুরের শাসন আমলেই একথা উঠিয়াছিল। ইমাম সাহেব যদি আবু জাফরের প্রস্তাব মানিয়া লইতেন তবে আবু ইউসুফের পরিবর্তে ইমাম সাহেবের নামই 'কাযীল কুযাত' হিসাবে ইতিহাসে লিখা থাকিত।

যাহা হউক, এদিকে লোকের দৃষ্টি নিবদ্ধ হউক কিংবা না হউক যদি এরূপ কিছু হইয়াই থাকে তবে অবশ্য চিন্তার বিষয় যে, এমন কিছু করার ধারণা কোথা হইতে আবু জাফরের অন্তরে উদয় হইল ?

একথা সত্য যে, আবু জাফর ইমাম সাহেবকে শিকারে পরিণত করিতে চেষ্টায় ছিলেন। প্রথমে ইমাম সাহেবের শক্তি খর্ব করার জন্য হাজ্জায ইবন আরতাতের মাথায় করুণার হাত রাখিয়াছিলেন। হাজ্জায অক্ষম প্রতিপন্ন হইলে ইমাম মালিকের স্মরণাপন্ন হইলেন। সেখান হইতে নিরাশ হওয়ার পর সোজাসুজি ইমাম সাহেবকেই তাঁবুতে আনার চেষ্টা করিলেন। শিকারী যেমন শিকারের মুখের সম্মুখে টোপ এই উদ্দেশ্যে পরিবর্তন করিয়া দেয় যে, এইটা না হয় ঐটা গিলিবেই। মনসুরের কার্যধারাও ছিল ঠিক তদ্রূপ। কিন্তু ইমাম সাহেবের জন্য তিনি কেন বিশেষ ভাবে কাযীর পদ দেওয়াকে টোপ স্বরূপ গ্রহণ করিয়াছিলেন? তাঁহার নিকট কি টোপস্বরূপ ব্যবহার করার জন্য বস্তুর অভাব ছিল? ইচ্ছা করিলে কোন বড় একটি প্রদেশের শাসনকর্তা করিতে পারিতেন অথবা যে-কোন দফতরের একটি মন্ত্রীত্ব পদে বহাল করিতে পারিতেন। এরূপ আরও কিছুতে নিয়োগ করার ক্ষমতা তাহার ছিল।

অভিজ্ঞতাপ্রসূত জ্ঞানে যতদূর মনে হয় ইবরাহীমের বিপ্লবের পূর্বে যখন ইমাম সাহেব শাহী তাঁবুতে ছিলেন বাগদাদ নগর নির্মাণ পরিকল্পনায় আবু জাফর যখন অন্যান্য আলিমদের সাথে ইমাম সাহেবকেও সাথে রাখিয়াছিলেন তখন ইমাম সাহেব তাঁহার যে মতামত প্রকাশ করিতেন উহা হইতেই মনসুর ধারণা করিয়া লইয়াছিলেন যে, এই ব্যক্তি শুধু কাযী হইতেই ইচ্ছুক নয় বরং রাষ্ট্রের এই বিভাগটিকে তিনি সম্পূর্ণরূপে নিজের আয়ত্তে রাখিতে চান—যাহা মুসলমানদের ঝগড়া-বিবাদের ফয়সালার সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত। সুতরাং ইহাতে আশ্চর্য হওয়ার মত কিছুই নাই। আমি এই সম্পর্কে যাহা কিছু লিপিবদ্ধ করিয়াছি আপনি পুনরায় উহা পাঠ করুন।

আসল কথা তো এই যে, সুশৃংখল এক সমিতির মাধ্যমে ইসলামী আইন-কানুন সংকলন ও প্রণয়ন করা এবং সাথে সাথে সরকারী কাযীদের মীমাংসিত বিষয়ের উপর অনবরত বজ্রপাত করা, অতঃপর খলীফার সান্নিধ্য যখন পাওয়া যায় তখন নিজের জ্ঞান-গরিমা ও বুদ্ধিমত্তা দ্বারা খলীফাকে প্রভাবিত করার চেষ্টা করিতে থাকা। ইহার পূর্বে ইমাম সাহেব যাহা কিছু করিতেছিলেন ঐ সব দেখিয়া শুনিয়া যদিও ইমাম সাহেবের নিকট নিজের ইচ্ছাকে সরাসরিভাবে প্রকাশ করেন নাই তথাপি তাঁহার জীবনের সমস্ত কার্যাবলী দেখিয়া শুনিয়া যে কেহ এই সিদ্ধান্তেই পৌঁছিবে যে সিদ্ধান্তে মনসুর পৌঁছিয়াছিলেন।

ইমাম সাহেবেরই চেষ্টা-প্রসূত এই উপলব্ধি। অধিকন্তু ইমাম মালিকের সম্মুখে আবু জাফর বলিয়াছিলেন যে, "আপনার ইজতিহাদী আইন-কানুন সংকলন করত উহাকেই রাষ্ট্রের আইন-কানুনে প্রবর্তন করিব", আমার মনে হয় ইহা ইমাম সাহেবেরই সৃষ্ট ধারণা। যে আশা পোষণ করিয়া ইমাম সাহেব জীবিত ছিলেন উহাকেই ধ্বংস করিয়া প্রতিশোধ গ্রহণ করার বোধ হয় ইহাই ছিল প্রকৃষ্ট পন্থা। ইমাম সাহেবের আশা-ভরসাকে বানচাল করার উপযুক্ত পথই ছিল ইমাম মালিকের আইন-কানুন প্রবর্তন করা। আল্লাহ তাআলা যদি মালিকের মধ্যে আধ্যাত্মিক দর্শন শক্তি দ্বারা ইমাম সাহেবের এই প্রচেষ্টাকে দর্শন না করাইতেন তবে এ পর্যন্ত ইমাম সাহেব যাহা কিছু করিয়াছিলেন সবই বৃথায় পর্যবেসিত হইত। তাহার আইন প্রণয়ন সমিতির চেষ্টা-প্রসূত সমস্ত সম্পদ, যে উদ্দেশ্যে তিনি তাহার ছাত্রদিগকে গঠন করিতেছিলেন। অর্থাৎ তিনি যে বলিতেন—"আমার ছাত্রদের মধ্যে কেহ মুফতী হওয়ার, কেহ কাযী হওয়ার এবং কেহ বা কাযী এবং মুফতী তৈয়ার করার ক্ষমতায় ক্ষমতাবান" এই সব কিছুই ধ্বংস হইয়া যাইত। কিন্তু ইমাম মালিক মনসূরকে এমনভাবে নিরাশ করিলেন যে ইমাম আবু হানীফাকে আয়ত্তে আনার কোন পথই তাহার জন্য খোলা রহিল না। এই অকৃতকার্যতার জন্য মনসূর সারাটা জীবন অনুতাপ করিয়া গিয়াছিলেন।

আমার তো মনে হয় যে, ইসলামী আদালতের এই ব্যবস্থাপনা অর্থাৎ হুকুমত কোন ব্যক্তির অভিজ্ঞতা এবং বিবেক বুদ্ধি যাচাই না করিয়াই যাহাকে কাযী বানাইয়া বিভিন্ন এলাকায় পাঠাইয়া দিতেন, উহার ফল এই হইত যে, নিজের বুদ্ধি-বিবেচনা মুতাবিক আবোল-তাবোল ফয়সালা করিত,—এই সম্বন্ধে বহু কিছু আলোচনা করিয়াছি। আরও বলিয়াছি যে, ইসলামী আদালতের এই সমস্ত নীতি বিগর্হিত ব্যবস্থাপনা ইমাম সাহেব দূর করার জন্য সচেষ্ট ছিলেন।

এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য তাঁহার সর্বপ্রধান এবং সর্বপ্রথম পদক্ষেপ ছিল আইনপ্রণয়ন সমিতি এবং তাঁহার যাবতীয় প্রচেষ্টা এখানেই সীমিত করিয়া রাখিয়াছিলেন। বসরার বিখ্যাত গ্রন্থকার আবদুল্লাহ ইবনে মুকাফ্ফা আব্বাসী খলীফা মনসূরের নিকট তৎকালীন বিচার বিভাগ সম্বন্ধীয় অভিযোগপত্র নিম্নরূপে প্রেরণ করিয়াছিলেন।

"আদালতের বিচার-সংক্রান্ত রায় সম্পর্কে যে দারুণ মতবিরোধ ও মতভেদ দেখা দিয়াছে আমি সেদিকে আমীরুল মুমিনীনের দৃষ্টি

আকর্ষণ করিতেছি। লোকের জানমাল মান-ইযযত সম্বন্ধে এই প্রকার বিভিন্নতা পরিলক্ষিত হইতেছে। ঘটনা এই যে, হীরার (কুফা হইতে ছয় মাইল দূরবর্তী শহর) কাযী যে মামলায় গর্দান উড়াইয়া দেওয়ার নির্দেশ দেন ঠিক তদ্রূপ মামলায়ই দেখা গিয়াছে কুফার কাযী হীরার কাযীর বিপরীত রায় দিয়াছেন।"

সেই পত্রে তিনি আরও উল্লেখ করিয়াছিলেন—

"বহু ফয়সালা তো বনী উমাইয়া হুকুমতের দৃষ্টান্তে সমাধা করা হয়। যদি কেহ প্রশ্ন করে যে এরূপ ফয়সালা কোন্ দলীল মতে করা হইল? তখন কাযিগণ না রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর যুগের ফায়সালার দৃষ্টান্ত দান করে না খোলাফায়ে রাশিদীনের যুগের, বরং কাযীগণ বলিয়া থাকে আবদুল মালিক ইবনে মারওয়ানের যুগে অমুক কাযী এরূপ মামলার এরূপ রায় দিয়াছিলেন। এরূপ অন্যান্য শাসকবৃন্দের দৃষ্টান্ত দিয়া প্রশ্নকারীকে চুপ করিয়া দেয়।"

তৎপর তিনি তাঁহার স্বীয় মত প্রকাশ করিয়াছিলেন—"ইসলামী আইন-কানুন হাদীছ এবং ছহীহ কিয়াস মুতাবিক প্রণয়ন করা প্রয়োজন এবং উহাকেই আদালতের প্রবর্তন করিয়া এইরূপ অন্যায়কে বিলোপ করিয়া দেওয়া কর্তব্য।" (আল-কাযা ফীল ইসলাম, ৮৫ পৃঃ)

ইবন মুকাফফা যদি এরূপ কোন পত্র খলীফাকে লিখিয়া থাকেন তবে মনে হয় উহাও ছিল ইমাম সাহেবেরই কাজের প্রতিক্রিয়া। আর যদি প্রতিক্রিয়া নাও হয় তবু উহা ছিল তাহার প্রস্তাবনা আর ইমাম সাহেব একাজ শেষ করিয়া ফেলিয়াছিলেন। বিশ বৎসরের একান্ত চেষ্টায় তিনি যে ইসলামী আইন-কানুনের সংকলন করিয়াছিলেন এবং উহাকে কার্যকরী করার জন্য তিনি যে ছাত্র সমাজ তৈয়ার করিয়াছিলেন তাহাদিগকে গোটা মুসলিম জাহানে না হউক অন্ততঃ আব্বাসী হুকুমতের অন্তর্গত প্রাচ্যের শহরগুলিতে ছড়াইয়া দিয়াছিলেন। খোরাসান ও ইরাকের এমন কোন কেন্দ্রীয় শহর ছিল না যেখানে ইমাম সাহেবের ছাত্র না ছিল! আর তাহারা কেমন ছাত্র? যদি একথা সত্য হয় যে, ইমাম সাহেবের চারিজন ছাত্র এমন ছিলেন যাহাদের সম্বন্ধে হাসান ইবন হাম্মাদ বলিয়াছেন—"মাসআলার হাফেয ছিলেন চারি ব্যক্তি যেমন, কুরআনের হাফেয থাকেন। ইঁহারা ছিলেন জাফর, আবু ইউসুফ, আসাদ ইবন ওমরাহ এবং আলী ইবন মাসহার।"

ইমাম সাহেবের আইন-প্রণয়ন সমিতির সংকলিত মাসআলার সংখ্যা খাওয়ারিযমীর মতে ছিল ৮৩ হাযার। পাঠক চিন্তা করুন, কুরআন

শরীফের ন্যায় উহাকে কন্ঠস্থ রাখা কি সাধারণ কাজ ছিল ? কিন্তু ইমাম সাহেব যেরূপ গুরুত্ব দিয়া কাজ আরম্ভ করিয়াছিলেন উহাতে বিস্ময়ের কিছুই নাই। ইমাম সাহেব ছাত্রদিগকে বলিতেন—"এমন জ্ঞানার্জন কর যাহাতে লোক তোমাদের মুখাপেক্ষী হয়। যতক্ষণ পর্যন্ত তোমার আত্মপ্রত্যয় না হয় যে, অন্যের কথা তোমার কথার উপর লোকে স্থান দিতে পারিবে না ততক্ষণ পর্যন্ত হুকুমতের কোন কাজ গ্রহণ করিও না।'

যাহা হউক এরূপ কথা আরও যাহা পূর্বে বর্ণনা করিয়াছি উহার প্রতি লক্ষ্য করিলেই প্রত্যয় হইবে যে, ইমাম সাহেবের বিশিষ্ট ছাত্রগণ তাহার সংকলিত কানুনসমূহ কন্ঠস্থ করিয়া রাখিয়াছিলেন।

ছাত্রাবস্থায় কাযী আবু ইউসুফ একবার ভীষণ অসুস্থ হইয়া পড়েন। ইমাম সাহেব বারবার তাহাকে দেখিতে যাইতেন। একদিন আসিয়া দেখেন আবু ইউসুফের অবস্থা খুবই খারাপ। তাহার মুখ হইতে বাহির হইয়া পড়িল ঃ ইন্না লিল্লাহে... ... ...রাজেউন। তারপর তিনি খুবই নিরাশ কন্ঠে বলিলেন—"আমার পর মুসলমানদের অনেক বিষয়ই আমার আশা ছিল, তোমার নিকট তাহারা পাইবে।" মুফিক, ১৯ পৃঃ ১ম জিলদ)

কথিত আছে, তিনি আরও বলিয়াছিলেন—"যদি তোমার মৃত্যুর বিপদে লোককে নিপতিত করা হয় তবে অনেক লোকই মারা যাইবে।"

এখন আমার প্রশ্ন হইল এই প্রকার উক্তি থাকা সত্ত্বেও যদি ইহা বুঝা যায় যে কাযী আবু ইউসুফ সম্বন্ধে যে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছিল অর্থাৎ হারুনুর রশীদের সময় হুকুমতে আব্বাসীয়ার বিচার বিভাগীয় সম্পূর্ণ দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল সে সম্বন্ধে বিশদভাবে আলোচনা হইবে এবং সাধারণত পৃথিবীর সকলে যে সম্বন্ধে অল্প বিস্তৃত জ্ঞাত—উহা হঠাৎ কিছু ছিল না বরং পূর্ব স্থিরীকৃত বিষয়বস্তুই ছিল। এক-বিশেষ ব্যবস্থা যাহা ইমাম সাহেব মুসলমানদের জন্য করিয়া রাখিয়াছিলেন—"সে মতেই ঘটনা বাস্তবে ঘটিয়াছিল। সুতরাং উহাকে অস্বীকার করার কোন কারণই থাকিতে পারে না।"

আবু দাউদ শরীফের রাবী শাজা ইবন মাখসাদ হইতে মুফিক বর্ণনা করেন—কাযী আবু ইউসুফ একদিন শাজার নিকট বলিয়াছিলেন, "ইমাম আবু হানীফা কতই না বরকত বিশিষ্ট লোক ছিলেন। ইহকাল এবং পরকাল উভয় জগতের পথই আমাদের জন্য খুলিয়া দিয়াছিলেন।"

এক আবু ইউসুফের এই উক্তিকে ইমাম আবু হানীফার ঐ উক্তির

সাথে মিলাইয়া দেখুন যাহা তিনি আবু ইউসুফের অসুস্থ অবস্থায় বলিয়াছিলেন। ইহা কি আবু ইউসুফের স্পষ্ট স্বীকারোক্তি ছিল না যে অবস্থা ভবিষ্যতে তাহার সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছিল—উহাতে ইমাম আবু হানীফারই হাত ছিল।

এক আবু ইউসুফই নয় বরং ইমামের ছাত্রদের অবস্থা পাঠ করুন যাহাদিগকে তিনি আব্বাসী হুকুমতের বিভিন্ন এলাকায় ছড়াইয়া রাখিয়াছিলেন। তাহাদের পরিমাণ সম্বন্ধে শাফিই মযহাবের ঐতিহাসিক হাফিয ইবন হজর 'খায়রাতুল হেসান' নামক গ্রন্থে বলিয়াছেন—"যাহারা ইমাম আবু হানীফার নিকট শিক্ষা গ্রহণ করিয়াছেন তাহাদের যথার্থ সংখ্যা নির্ণয় করা কষ্টসাধ্য ব্যাপার।" এই জন্যই কেহ কেহ বলিয়াছেন, "ইমাম সাহেবের ছাত্রের সংখ্যা এত যে, মুসলিম জগতের অন্য কোন ইমামের ছাত্র সংখ্যাই তত নয়।"

অতঃপর বলিয়াছেন—"বিগত যুগে কোন কোন মুহাদ্দিছ ইমাম সাহেবের ছাত্রদের নামের যে তালিকা প্রণয়ন করিয়াছেন উহাতে প্রায় আটশত ছাত্রের নাম-ধাম পাওয়া যায়।"

এই ব্যাপারে মুফিক ৭৩০ ব্যক্তির নাম গণনা করিয়াছেন। মুসান্নফীনের গ্রন্থকার এই তালিকা লিখিতে গিয়া তাহাদের যে সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিয়াছেন তাহাতে দেখা যায় ইহাদের মধ্যে পঞ্চাশজন ইমাম-সাহেবের মৃত্যুর পর আব্বাসী হুকুমতের কাযীর পদ গ্রহণ করিয়াছিলেন। ইমাম সাহেবের ছাত্রদের মধ্যে যদি ইহাই কাযীর সংখ্যা ধরা হয় তবে ভুল করা হইবে। কারণ, এই সংখ্যা তো ঐসব কাযীদের যাহাদের নাম আসমাউর রিজাল এবং ইতিহাসে স্থান পাইয়াছে। সাধারণতঃ সিহাহ কিতাবে তাহাদের বর্ণিত কিছু হাদিছ লিপিবদ্ধ করায়-আসমাউর রিজালে তাহাদের নামই উল্লেখ করা হইয়াছে। অন্যথায় ইমাম সাহেবের পর তাহার ছাত্রদের মধ্যে যাহারা কাযীর পদ গ্রহণ করিয়াছেন তাহাদের সংখ্যা ইহার চেয়ে অনেক বেশী। যেমন কাযী তওবাহ ইবন সায়াদ মারুজী। রিজাল কিতাবে তাহার নাম উল্লেখ নাই, কিন্তু তিনি কাযী ছিলেন। তিনি ইমাম সাহেবের ছাত্রদের মধ্যে বিশেষ-মর্যাদাসম্পন্ন ছিলেন।

১। এখানে স্মরণ রাখিতে হইবে যে, যাহারা ইমাম সাহেবের নিকট মাসআলা শিক্ষা করিয়া অন্যের নিকট বর্ণনা করিয়াছেন—ইহা তাহাদের সংখ্যা। অন্যথায় মুফিকই ইমাম সাহেবের ছাত্র সংখ্যা হাযার হাযার বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

মুফিক নসর যিয়াদ হইতে বর্ণনা করেন—একদিন ইমাম মালিকের মজলিসে কাযীদের সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে তওবাহ ইবন সা'দ মারযী নাম উল্লেখ হইল। তওবাহ্‌র নাম শুনিয়া ইমাম মালিক বলিলেন, 'আমার বাসনা তাঁহার মত একজন লোক আমাদের মধ্যেও হউক।'

এখন চিন্তা করিয়া দেখুন যাঁহাদের নাম তালিকাভুক্ত নয় তাঁহারা কেমন লোক ছিলেন।

যাঁহারা কাযীর পদ গ্রহণ করিয়াছিলেন তাঁহারা ছাড়াও আব্বাসী হুকুমতের এমন কোন শহর ও বন্দর ছিল না যেখানে ইমাম সাহেবের ছাত্র পাওয়া না যাইত। তাঁহাদের মধ্যে এমন একটি দল ছিল যাঁহারা শিক্ষাদানে ফতওয়া ফরায়েয করায় স্ব স্ব এলাকার শীর্ষ স্থানীয় ছিলেন। ইমাম সাহেবের ছাত্রগণ কোন শহরে ছিলেন মাহমূদ হাসান টুনকী উহাদের নাম 'মুজিল্ল মুসান্নিফীন' নামক গ্রন্থে উল্লেখ করিয়াছেন। শহরগুলি হইল ঃ

বসরা, ওয়াসিত, মুসিল, জযরাহ, রাকাহ, নাসীবাঈন, দামেশক, রামলাহ, মিশর, য়ামন, ইয়ামাহ, বাহরায়ন, বাগদাদ, আহওয়ায, কিরমান ইসফাহান, হালওয়ান, আস্তারাবাদ, হামদান, রে, কোমেশ দামআন, জুরজান, পেশাওয়ার, সারাখ্‌স, নেসাওয়ার, মার্ভ, বুখারা, সমরকন্দ, কাশ, তিরমিযি, বলখ, হিরাত, কোহিস্তান, সিজিস্তান, রাম এবং খাওয়ারিযম।

ইহা ছাড়া ইমামের জন্ম ও বাসস্থান কূফা এবং মক্কা ও মদীনা শরীফ যেখানে ইমাম সাহেব বৎসরের পর বৎসর অতিবাহিত করিতেন উহাদের নাম এই তালিকায় নাই। সে যুগে মানুষের চলা-ফেরার যে অবস্থা ছিল বিশেষ করিয়া হজ্জ গমনেচ্ছুগণ খোরাসান হইতে স্থলপথে কূফায় আগমন করিতেন, ইহার প্রতি লক্ষ্য করিলে এই তালিকা দেখিয়া বিস্ময়াভিভূত হওয়ার কিছুই নাই। এ সম্বন্ধে হয়ত পূর্বেও কিছুটা ইঙ্গিত দেওয়া হইয়াছে। সত্য বলিতে কি এই প্রকার ঘটনার গায়বী সাহায্যও হইয়া থাকে। মুফিক আবদুল্লাহ ইবন উবায়দুল্লাহ হইতে একটি কাহিনী বর্ণনা করিয়াছেন যে, আবদুল্লাহ বলেন, আমি একদিন দেখিলাম আমার পিতা মসজিদে হারামে বসিয়া এক ব্যক্তির সাথে তর্ক-বিতর্ক করিতেছেন। মনে হইল লোকটি বিদেশী। তিনি তাৎপর্যময় প্রশ্নাদি জিজ্ঞাসা করিতেছিলেন। আমার পিতা তাঁহার

প্রশ্নের গভীরতা দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'তোমার বাড়ী কোথায় ?' তিনি বলিলেন, 'তাঞ্জানিয়া, মক্কা শরীফ হইতে কয়েক হাজার মাইল দূরে।'

আমার পিতা আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, 'তাহা হইলে এমন সব প্রশ্ন তুমি কোথায় পাইলে ?' তিনি বলিলেন, 'ইমাম আবু হানীফা (রঃ)-এর কিতাব হইতে।' পরে বলিলেন, 'আমাদের দেশে ইমাম মালিক এবং আওযায়ীর মতবাদ অনুসরণকারী থাকিলেও ইমাম আবু হানীফার মতবাদেই ফতওয়া দেওয়া হইয়া থাকে।'

যাহাই হউক না কেন আব্বাসী আমলের প্রথম দিকে বিচার বিভাগে যে বিশৃংখলার সৃষ্টি হইয়াছিল উহাকে পুনরায় সুশৃংখলতায় আনার জন্য আব্বাসী হুকুমতের সমস্ত বিচার বিভাগীয় দায়িত্ব একজনের হাতে সোপর্দ করাই যুক্তিসঙ্গত ছিল। আবু জাফর যে প্রস্তাব দিয়াছিলেন উহা ইমাম সাহেবের উদ্ভাবিত প্রস্তাব ছিল। তিনি ইসলামী আদালতগুলি একই নিয়মে পরিচালনা করার জন্য জীবনের বাযী লাগাইয়া দিয়াছিলেন। কোন সন্দেহ নাই যে আবু জাফর ইমাম সাহেবকে বশে আনার জন্য ইমাম সাহেবেরই পসন্দনীয় শেষ টোপ পেশ করিয়াছিলেন। আমাদের জ্ঞান তো এ কথাই বলে যে, তিনি উহা গ্রহণ করিবেন। স্থানীয় বা কয়েকটি প্রদেশের কাযীর পদ গ্রহণ করা যেমন অস্বীকার করিয়াছিলেন তেমনিভাবে রাষ্ট্রের শ্রেষ্ঠ বিচারকের পদ তিনি গ্রহণ করিবেন না।

ইমামের শেষ পরীক্ষা

আমার মতে ইহাই ছিল ইমাম আবু হানীফা (রঃ)-এর জীবনের শেষ পরীক্ষা। তিনি কি সিদ্ধান্ত করিলেন ইহাই দেখার মত বিষয়। একথা সত্য যে হুকুমতের প্রস্তাব যদি তিনি গ্রহণ করিতেন তবে দৃশ্যত ইহাই উপলব্ধিতে আসিতে যে যাহার জন্য তিনি বাঁচিয়া রহিয়াছিলেন উহাতে তিনি সফলকাম হইয়াছেন। কিন্তু আমাদের বুদ্ধিমত তিনি যদি কাজ করিতেন তবে আবু হানীফা কিভাবে হইতে পারিতেন।

চিন্তা করিয়া দেখিতে হইবে যে তিনি যদি কাযীউল কুযাতের পদ গ্রহণ করিয়া আব্বাসী হুকুমতের শ্রেষ্ঠ মর্যাদার অধিকারী হইতেন অর্থাৎ এইভাবে যদি আবু জাফরের আইন উযীরের পদে বহাল হইতেন এবং এই সম্মানের সাথে বিপুল পরিমাণ অংকের বেতন ও অন্যান্য আমদানী

আসিত যেমন কাযীউল কুযাতের পদ গ্রহণ করার পর কাযী আবু ইউসুফ পাইতেন তবে উহার পরিণাম কি হইত ;[৯]

তখন নিঃসন্দেহে এমন এক সময় ছিল যখন লোক এমন পদ ও এই ধন সম্পদ পাওয়ার জন্য সব কিছু করিতে পারিত। না নিজে মরিতে ভয় পাইত, না অন্যকে মারিতে। মুসলমান মুসলমানকে হত্যা করিত। অতি আপন লোকও যদি পথের প্রতিবন্ধক হইত তবে তাহাকে সরাইয়া দিতে মোটেই দ্বিধাগ্রস্ত হইত না। মোট কথা, পদমর্যাদা এবং ধন-সম্পদ সঞ্চয়ের জন্য যাহা হইয়া থাকে তখনও তাহাই হইতেছিল।

কিন্তু ইমাম আবু হানীফা (রঃ) যদি তাহার ইলমকে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা-লাভের উপকরণ স্বরূপ ব্যবহার করিতেন, যদি দুনিয়াবাসীকে এই সিদ্ধান্ত গ্রহণের সুযোগই দিতেন, তাহার নিজের নিয়ত যাহাই থাকুক না কেন, তবুও তাহার জীবনভর সাধনা যে ব্যর্থতায় পর্যবসিত হইত ইহাতে কোন সন্দেহই ছিল না। এক সাময়িক সফলতা ব্যতীত উহা কখনও চিরস্থায়ী হইত না, যেমন আজকালও সেরূপ হাজার দৃষ্টান্ত রহিয়াছে। কোন মতেই ইমাম সাহেবের অক্লান্ত পরিশ্রম চিরস্থায়ী হইয়া থাকিত না।

বিপদ ছিল এই যে, সর্বশেষ টোপ ইমামের সম্মুখে রাখা হইয়াছিল। আবু জাফরের আসল উদ্দেশ্য ছিল ইমাম সাহেবকে বসে রাখা। ইমাম হইতে আবু জাফর যে অভিজ্ঞতা অর্জন করিয়াছিলেন উহাতে তিনি

১। হিসাব করিলে দেখা যাইত যে, কাযী আবু ইউসুফের এমন মাস যাইত না যে মাসে তাঁহার লাখ লাখ দিরহাম আমদানী না হইত। খলীফা, তাঁহার বেগম এবং তাহাদের আত্মীয়-স্বজন বড় বড় অংকের অর্থ উপঢৌকন দিতেন। টাকা-পয়সা ছাড়াও বহু মূল্যবান কাপড় ও অন্যান্য দ্রব্যাদি দেওয়া হইত। হারুনুর রশীদ যখন পুরস্কৃত করিতেন তখন উহার পরিমাণ হইত লাখ দুইলাখ দিরহাম। দশ হাযারের কম বোধ হয় কখনও দেন নাই। হারুনুর রশীদ কাযী ইউসুফকে খুব সম্মান করিতেন। কাযী সাহেব ঘোড়া বা খচ্চরে আরোহণ করিয়া তাঁহার সহিত দেখা করিতে আসিতেন। পর্দা যখন উঠিত তখনও তিনি সওয়ারী অবস্থায়ই থাকিতেন। হারুন প্রথমে সালাম করিতেন এবং একটি কবিতা পাঠ করিতেন। উহার অর্থ, পাগড়ী বাঁধিয়া, চাদর গায় দিয়া আমার সম্মুখে আসিলেন। কাযী ইউসুফের আস্তাবলে সব সময় সাত শত খচ্চর এবং তিন শত ঘোড়া বাঁধা থাকিত।

বুঝিয়াছিলেন, ইমামকে রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে জড়িত করা অথবা তাহাকে পৃথিবীর আলো-বাতাস হইতে বঞ্চিত করা ব্যতীত অন্য কোন প্রতিষেধক নাই। তিনি সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন যেভাবে হউক এই বিপদকে দূর করিতেই হইবে। এই উদ্দেশ্যেই তিনি যাহা কিছু করার করিতেছিলেন। বিচার বিভাগের ন্যায় এমন সম্মানিত বিভাগের সমস্ত ক্ষমতা তাই তাঁহাকে অর্পণ করিতে চাহিয়াছিলেন। ইহার পর আর কোন টোপ থাকিলে উহা ছিল খেলাফত।

মন্ত্রী 'আবদুল মালিকের পরামর্শ"

এই শেষ টোপ ফেলিয়া আবু জাফর অপেক্ষায় রহিলেন যে, দেখা যাক ইমাম সাহেব এখন কি করেন ? আবু হাফস কাবিরীর পুত্র আবু 'আবদুল্লাহ্ মুহাম্মাদ হইতে বর্ণিত আছে, খলীফা এবং ইমাম সাহেবের মধ্যে যখন এই প্রকার দ্বন্দ্ব চলিতেছিল তখন আবু জাফরের মন্ত্রী 'আবদুল মালিক ইবন হামীদ যিনি ইমাম সাহেবেরই একজন ভক্ত ছিলেন।-একদিন তিনি ইমাম সাহেবের খেদমতে উপস্থিত হইয়া বলিলেন—

ان امیر المؤمنین یطلب علیک علة فان لم تفرض صدقک علی نفسک ما ظن بک۔

"আমীরুল মুমিনীন তো শুধু বাহানা তালাশ করিতেছেন। আপনি যদি তাহার প্রস্তাবনাকে গ্রহণ না করেন তাহা হইলে আমরা আপনার প্রতি যে সন্দেহ পোষণ করি উহা আপনি সত্যে পরিণত করিবেন।"

ইমাম সাহেবের সম্মুখে এখন মাত্র দুইটি পথই খোলা ছিল। আবু জাফরের প্রস্তাব গ্রহণ করিয়া তাঁহার জীবনের সব সম্পদ ধ্বংস করিয়া দেওয়া অথবা তাঁহার সম্বন্ধে সন্দেহকে সত্যে পরিণত করিয়া তাঁহার উদ্দেশ্যকে চিরস্থায়ী করার জন্য নিজের জীবনকে চরম দুর্যোগের জন্য প্রস্তুত রাখা।

উৎপীড়ন সম্বন্ধে বিভিন্ন বর্ণনার সমালোচনা

আমাকে পরিতাপের সহিত বলিতে হইতেছে যে, ইমাম সাহেবের জীবনচরিত রচয়িতাগণ নিজেদের উৎসাহের চরিতার্থ করিতে এমনই ব্যস্ত ছিলেন যে, প্রয়োজনীয় বিষয়গুলি অপ্রয়োজনীয় মনে করিয়া লোকচক্ষুর অন্তরাল করিয়া রাখিয়াছেন। যেমন আবু জাফর ইমামকে

এত টাকা দিয়াছিলেন এই ঘটনাকে অথবা ইমাম সাহেবকে চাবুক মারার ঘটনায় এতটা উৎসাহ দেখাইয়াছেন যে, কতটা চাবুক মারিয়াছিলেন তাহার সংখ্যা নির্ধারণে বেশ মাথা ঘামাইয়াছেন। কেহ বলিয়াছেন, প্রত্যহ দশটি চাবুক মারিয়াছেন, আবার কেহ বা ত্রিশের কোঠায় ঠেলিয়া উঠাইয়াছেন।

খলীফার এই দুর্মতির জন্য তাহার চাচা আবদুস সামাদ তাঁহাকে ধমকাইয়াছিলেন। তখন আবু জাফর ভয় পাইয়া বলিয়াছিলেন-"চাচা! আমি প্রত্যেকটি চাবুক মারার জন্য ত্রিশ হাযার করিয়া দিরহাম জরিমানা দেওয়ার জন্য প্রস্তুত আছি। আপনি তাহাকে বুঝাইয়া বলুন।" কিন্তু ইমাম সাহেব রাযী হইলেন না। অতঃপর বর্ণনাকারী স্বীয় বক্তব্য লিপিবদ্ধ করিয়াছেন—'চিন্তার বিষয় যে, ইহা ঐ সময়কার কথা যখন একটি দিরহাম এখনকার একশত দিরহামের সমান ছিল। কেননা, তখনকার দিনে আজকালকার মত টাকা-পয়সার এত ছড়াছড়ি ছিল না।"

যতদূর মনে করি স্বয়ং বর্ণনাকারীদের নিকট এই পরিমাণ অর্থের যতই গুরুত্ব থাকুক না কেন কোটি না হউক লাখ লাখ টাকার কারবারী ইমাম আবু হানীফার নিকট এই পরিমাণ অর্থের কোন গুরুত্বই ছিল না। এই সব বর্ণনাকারীদের নিকট ইহা বিরাট কিছু ছিল বলিয়া বার বার ইহা বর্ণনা করিয়াছেন অথবা কাহিনীকে চটকদার করার মানসে মারপিটের ঘটনাকে চিন্তা-ভাবনা না করিয়াই যে ইহার সমালোচনা হইতে পারে কিনা, বেশ ঘুরালো করিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। কেহ কেহ এমন কথাও বলিয়াছেন যে, 'আকাবীন' নামক খোলা মাঠে ইমামকে চাবুক মারা হইত। এখানেও বিরতি না দিয়া এমন কথাও বলিয়াছেন যে, 'পরনে শুধু পায়জামা রাখিয়া হাতবাঁধা অবস্থায় রক্ষিগণ তাঁহাকে কয়েদখানা হইতে বাহির করিত এবং তামাশা দেখার জন্য লোকদিগকে আহবান করিয়া তাঁহাকে বেত্রাঘাত করা হইত। বেত্রাঘাতে সমস্ত শরীর জর্জরিত হইয়া রক্তধারা প্রবাহিত হইত। সেই অবস্থায়ই বাগদাদের অলি গলিতে তাঁহাকে ঘুরানো হইত। কয়েকদিন পর্যন্ত এই অবস্থা চলিতে লাগিল।"

নিঃসন্দেহে এরূপ কথা দ্বারা অত্যাচারের মাত্রাধিক্য বর্ণনা করিয়া লোকের মনে করুণার উদ্রেক করা যায়। কিন্তু এক শ্বাসে ইহার সহিত আরও বলিয়াছেন যে, এই অবস্থায়ই ইমাম সাহেব মৃত্যুবরণ করিলেন। সেখানে জানাযার নামায আদায় করা হইয়াছিল, মুসল্লী দ্বারা সে মাঠ ভরিয়া গিয়াছিল। অনুমান পঞ্চাশ হাযার লোক সালাতে জানাযায়

শরীক হইয়াছিল। স্নানের সংকুলান না হওয়ায় ছয় বার জানাযা আদায় করা হইয়াছিল। এমন কি যাহারা শরীক হইতে পারে নাই তাহারা বিশ অথবা উহারও অধিক দিন পর্যন্ত কবরের উপর জানাযা আদায় করিয়াছিল। ইমাম সাহেবের মৃত্যু সংবাদ শহরে ছড়াইয়া পড়িলে সকলেই তাঁহার জন্য অশ্রু মোচন করিয়াছিল।

এখন প্রশ্ন হইল এই যে যে ব্যক্তি প্রত্যেকটি লোকের নিকট এমন প্রিয় ও সম্মানিত ছিলেন মনসুরের জ্ঞান কি এমনই ভোতা ছিল যে তাঁহার মত এমন একজন মযহাবের ইমামকে প্রকাশ্যস্থানে উৎপীড়ন করিয়া পরে শহরের অলি-গলিতে ঘুরাইয়া দুনিয়ার লোককে তাঁহার বিরোধী করিয়া তোলেন? এই গ্রন্থের কোথাও হয়ত আমি মনসুর তনয় মেহদীর কথা উল্লেখ করিয়া বলিয়াছি যে, মেহদী এবং সুফইয়ান ছাওরীর মধ্যে যখন কোন বিষয়ে তিক্ত কথাবার্তা হইয়াছিল তখন মেহদীর দরবারী রবী 'বলিয়াছিল' 'আমীরুল মুমিনীন! এই অজ্ঞের এত সাহস যে আপনার সম্মুখে মাথা তুলিয়া কথা বলে। আমাকে আদেশ করুন আমি তাহার গর্দান উড়াইয়া দিতেছি।'

উত্তরে মেহদী ক্রোধান্বিত হইয়া বলিয়াছিলেন—'চুপকর কমবখ্‌ত! তিনি এবং তাঁহার মত লোকেরা তো ইহাই চায় যে, আমরা তাঁহাদের নিহত করি যেন তাঁহাদের সৌভাগ্য আমাদের দুর্ভাগা বানায়।" আব্বাসী সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতাগণ কি এই রাজনৈতিক রহস্য অজ্ঞাত ছিলেন?

আসল কথা হইল শুধু ইমাম সাহেবের ঘটনাতেই নয় বরং এরূপ প্রায় ঘটনায়ই দেখা গিয়াছে যে—প্রকৃত ঘটনা বর্ণনায় খুব কম লোকই সন্তুষ্ট থাকে। আল্লাহ্‌ই জানেন, তাহারা কেন এই ধারণা পোষণ করেন যে, আমি মানুষের মনকে যেমন প্রতিক্রিয়াশীল করিতে চাই প্রকৃত ঘটনায় তাহা সৃষ্টি হইবে না। তাই তাহারা অমূলক ঘটনা ও বর্ণনার প্রশ্রয় লইয়া থাকে। ইহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ কারবালার ঘটনা। কারবালা প্রান্তরে রসূল পরিবারের সাথে যে নির্দয়, মর্মান্তিক ও পৈশাচিক ব্যবহার করা হইয়াছিল উহা কম হৃদয়-বিদারক নহে। আল্লাহ্‌ই জানেন বর্ণনাকারীগণ প্রকৃত ঘটনাকে যথার্থ মনে না করিয়া কেন উহার সাথে মনগড়া আবোল-তাবোল ঘটনার সংযোজন করিয়াছেন। ইমাম আবু হানীফার ব্যাপারেও এমন কিছু বাড়াবাড়ি করা হইয়াছে বলিয়াই আমার বিশ্বাস।

অবশ্য আমি একথাও বলি না যে, মনসুরের আদেশে ইমাম সাহেবকে

বেত্রাঘাত করা হয় নাই। আমার কথা হইল এই ব্যাপারেও বাড়াবাড়ি বর্ণনা দেওয়া হইয়াছে। ইমাম আবুল মাহাসিন হাসান 'আলী মারগিয়ানানী (ইনি ফিকাহ্ হিদায়া গ্রন্থকারের উস্তাদ) যে পত্র বুখারা হইতে আল্লামা মুফিকের নিকট লিখিয়াছিলেন সেই পত্র সম্বন্ধে মুফেক বলেন—'আবদুল আযীয ইবন আসান যাহার নিকট হইতে 'আল্লামা মারগিয়ানানী এই ঘটনা শুনিয়াছেন, তিনি ইমাম সাহেবের এই ঘটনা স্বচক্ষে দেখিয়াছেন।' আবদুল আযীয ইবন আসান বলেন—'মনসুর কাযীর পদ গ্রহণ করার জন্য ইমাম সাহেবকে আহ্বান করিলেন। ইমাম সাহেব অস্বীকার করায় উভয়ের মধ্যকার তর্ক-বিতর্ক চরমে পৌঁছিল। মনসুর ক্রোধান্বিত অবস্থায় ইমাম সাহেবকে যা-তা বলিলেন, এবং বেত্রাঘাতও করিলেন।' মারগিয়ানানী বলেন—'আমি আবদুল আযীযকে জিজ্ঞাসা করিলাম তুমি ইমাম সাহেবকে উৎপীড়িত হইতে স্বচক্ষে দেখিয়াছ?'

উত্তরে তিনি যাহা বলিলেন অবশ্য উহা চিন্তা করিয়া দেখার মত। তিনি বলিলেন—'ইহা তো খলীফার সম্মুখে হইয়াছিল। খলীফার সম্মুখে আমি কিভাবে যাইতে পারি?'

অতঃপর বলিলেন—'যখন দরবার হইতে ইমাম সাহেবকে বাহির করা হইল তখন দেখিলাম, তিনি শুধু পায়জামা পরিধান করিয়া রহিয়াছেন এবং পিঠে বেত্রাঘাতের চিহ্ন, শরীর বাহিয়া রক্ত পড়িতেছে।'

অন্যের শুনা বর্ণনা হইতে নিশ্চয়ই প্রত্যক্ষদর্শী আবদুল আযীযের বর্ণনা অধিক সত্য। আবদুল আযীযের বর্ণনা হইতে নিম্নোক্ত বিষয়গুলি অবগত হওয়া যায়। অর্থাৎ আবদুল আযীযের বর্ণনা হইতে বুঝা যায় যে ইমাম সাহেবের এই ঘটনা জনসাধারণের দৃষ্টির অন্তরালে হইয়াছিল। সাধারণ জ্ঞানও ইহার পক্ষপাতী। আবদুল আযীয বলিয়াছেন যে—ইমাম সাহেবকে বাহিরে আনা হইল। উহার সহিত দু'একটি শব্দ অধিক আছে। উহা হইল—

ولكن اخرج مجردا الى الدار فى السراويل

ইমাম সাহেবের পায়জামা পরিহিত অবস্থায় দার'-এর দিকে বাহিরে আনা হইল। (দার) শব্দের অর্থ কোথাও আঙ্গিনা করিয়াছি। ইহাতে মনে হয় খলীফার নিজস্ব প্রাসাদের সম্মুখে এই ঘটনা হইয়াছিল যেখানে সর্বসাধারণের প্রবেশ নিষিদ্ধ। অতঃপর তাহাকে প্রাসাদের আঙ্গিনায় আনা হইয়াছে যেখানে সকলেই যাইতে

পারে। আবদুল আযীযও সেখানেই ইমাম সাহেবকে দেখিয়াছিলেন। সুতরাং শাহী প্রাসাদের ঘেরাওর মধ্যেই ইমাম সাহেব ছিলেন বাহিরের কোন স্থানে নয়।

কত বিস্ময়কর যে, এই আবদুল আযীযের উক্তির অংশ-বিশেষ আমি স্থানে স্থানে উদ্ধৃত করিয়া আসিয়াছি যে, বেত্রাঘাত করার পর মনসুরের চাচা আবদুস সামাদ[১] দৌড়াইয়া আসিয়া বলিলেন, 'আমিরুল মুমিনীন! আপনি আজ একি করিলেন? এক লক্ষ তরবারি আজ আপনি নিজের উপর উন্মুক্ত করিয়া দিলেন? ইনি যে ইরাকবাসীদের ইমাম, প্রাচ্যবাসীদের ফকীহ।'

যদি ইহাই ঘটনা হয় এবং যথার্থভাবে ঘটনা ইহাই ছিল, 'তবে মনসুরের ন্যায় ঝানু রাজনীতিবিদ ইরাক ও প্রাচ্যের মুসলমানে পরিপূর্ণ বাগদাদে নগরীতে প্রকাশ্য স্থানে ইমামের সাথে এমন পৈশাচিক ব্যবহার করিতে সাহস পাইতেন না। বরং আবদুল আযীযের বর্ণনায় ইহাই মনে হয় যে, মনসুর সাময়িক ক্রোধের বশীভূত হইয়া নিজস্ব প্রাসাদের অভ্যন্তরে ইমাম সাহেবকে বেত্রাঘাত করার আদেশ দিয়াছিলেন। আর ইহাও ছিল তাঁহার ন্যায় লোকের পক্ষে ভুল—যে সম্বন্ধে তাঁহার চাচা তাঁহাকে তখনই সতর্ক করিয়াছিলেন। ইমাম সাহেবকে বাহিরে লইয়া আসার পর আবদুস সামাদ খলীফার নিকট সুপারিশ করায় ইমাম সাহেবকে বাড়ী যাওয়ার অনুমতি দেওয়া হইয়াছিল।

ইহাতে আমার কথাকেই সমর্থন করা হয় যে, প্রাসাদের আঙিনাতে আবদুস সামাদ ইমাম সাহেবকে দেখিয়াছিলেন। পরে লিখিত আছে: আবদুস সামাদ ইমাম সাহেবের কাপড়-চোপড় ঠিক করিয়া দিলেন এবং তাঁহাকে বাড়ী পর্যন্ত পেঁছাইয়া দিলেন।

১. আব্বাসী বংশের একজন ঐতিহাসিক বিস্ময়কর ব্যক্তি। কথিত আছে ৮১ বৎসর তিনি জীবিত ছিলেন। প্রথম যে দাঁত তাঁহার উঠিয়াছিল উহা কখনও পড়ে নাই এবং সেই দাঁত সহই কবরে গিয়াছিলেন। তিনি হুযুর (সাঃ)-এর চাচাতো ভাই আবদুল্লাহ ইবন আব্বাসের আপন পৌত্র ছিলেন। তিনি আব্বাসী খলীফা আবুল আব্বাস, মনসুর, মেহদী, হাদী এবং হারুনুর রশীদ এই পাঁচজন খলীফার শাসন যুগ দেখিয়াছেন। একদিন তিনি খলীফা হারুনকে রসিকতা করিয়া বলিয়াছিলেন, 'আমীরুল মুমিনীন! আপনার দরবারে আপনার চাচার চাচা এবং তারও চাচার চাচা উপস্থিত আছেন। অর্থাৎ এই কথা দ্বারা তিনি নিজের দিকেই ইঙ্গিত করিয়াছিলেন।'

ইহাতে একথাও জানা যায় যে, শাহী প্রাসাদ হইতে ইমাম সাহেব যথাযথ কাপড়-চোপড় সহই বাহির হইয়া আসিয়াছিলেন। মোট কথা এই প্রকার বর্ণনা যে, বাজারে ঘুরানো এবং আকাবাইনের খোলা মাঠে বেত্রাঘাত করা, আমার মতে, অযথা কথা যাহা লোকে ইচ্ছাপূর্বক ঘটনাকে কৌতুকপ্রদ বা মর্মান্তিক করার জন্য সংযোজন করিয়াছে।

কাযীউল কুযাতের পদ সম্পর্কে আলাপ-আলোচনা

যাহা হউক আমি একথাই বলিতে চাই যে, স্থানীয় কাযী বা কয়েকটি প্রদেশের কাযীর পদ গ্রহণে অস্বীকার করায় মনসুর ইমাম সাহেবকে আব্বাসী হুকুমতের কাযীউল কুযাত পদে নিয়োগ করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করার পর উভয়ের মধ্যে যে আলাপ-আলোচনা হইয়াছিল, সে বিষয় কেহই সুশৃংখলভাবে লিপিবদ্ধ করেন নাই। বিক্ষিপ্তভাবে যাহা কিছু বর্ণনা করিয়াছেন, উহা হইতে একথা বলা খুবই কষ্টসাধ্য যে কোন্ পদ প্রস্তাবনার সময় কোন্ কথা বলিয়াছিলেন। শুধু অনুমানের উপর নির্ভর করিয়া এতটাই বলা যাইতে পারে যে, কুফার কাযীর পদ গ্রহণ করিতে বলায় ইমাম সাহেব বলিয়াছিলেন, 'আমি একজন রুটি প্রস্তুতকারকের ছেলে। কুফাবাসী আমাকে কাযীর পদে দেখিয়া আমার মাথায় ইট-পাটকেল নিক্ষেপ করিবে।'

রাজধানী বাগদাদের কাযীর পদ গ্রহণ করার প্রস্তাব করিলে ইমাম সাহেব যাহা বলিয়াছিলেন উহার অর্থ এই দাঁড়ায় যে, 'আদালত ও ইনসাফ আল্লাহ্‌র আমানত, উহা বাদশাহ্‌দের উপরই ন্যস্ত করা হয় সুতরাং উহার দায়িত্ব অন্য কোন ব্যক্তির উপর চাপাইতে যদি হয় তবে সে এমন ব্যক্তি হইবে—যাহার অন্তরে কাহারও কোন ভয় নাই।' অতঃপর ইমাম সাহেব নিজের সম্বন্ধে বলিলেন, 'আপনার উচিত নয় আমার উপর নির্ভর করা। যদি আমি স্বেচ্ছায়ও এই দায়িত্ব গ্রহণ করি তবুও আমি আপনাকে অবগত করাইতে চাই যে, 'আপনার বিপক্ষে যদি কোন ফয়সালা করার সুযোগ কোন সময় আমার সম্মুখে আসে আর যদি আমাকে ধমকি দেওয়া হয় যে—হয় বাদশাহ্‌র স্বপক্ষে রায় দাও—অন্যথায় তোমাকে ফোরাত নদীতে ডুবাইয়া মারা হইবে, তখন আমি মরিতে প্রস্তুত থাকিব অথচ মতের পরিবর্তন করিব না। স্বেচ্ছায় এই পদ গ্রহণ করিলেই যখন আমার এই অবস্থা, তখন চিন্তা করুন, আমার অনিচ্ছায় জোর-যবরদস্তী করিয়া যদি আমাকে কাযী বানানো হয়তখন যে কি করিব সে কথা সহজেই বুঝিতে পারিতেছেন।'
(মুফিক, ১৭১ পৃঃ, ২য় জিলদ)

ইহার পর ইমাম সাহেব আরও বলিলেন, আপনার দরবারীদের জন্য এমন লোকের প্রয়োজন যিনি আপনার জন্য হইলেও তাহাদের মান-ইয্যত বজায় রাখে।'

ইহার অর্থ এই দাঁড়ায় যে, যিনি খলীফার বিরুদ্ধে ফয়সালা করিতেও বদ্ধপরিকর, ইহাতে জীবনের প্রতিও যাহার দয়ামায়া নাই, এমন ব্যক্তি আপনার দরবারীদের প্রতি এই খেয়াল কখন করিবে যে কোন ফয়সালায় তাহাদের ইযযত গেল, আর কোন ফয়সালায় ইযযত গেল না। মনে হয় রাজধানীর কাযীর পদ গ্রহণ করিতে বলায় তিনি এই উত্তর দিয়াছিলেন।

এইরূপ কথাবার্তা বলার সময় ইমাম সাহেব একথাও বলিয়াছিলেন যে, 'কাযী হইতে এমন লোকের প্রয়োজন যিনি আপনার, আপনার পরিবারস্থ লোকের এবং ফৌজী পদস্থ কর্মচারীদের বিরুদ্ধেও ফয়সালা দিবার শক্তি রাখেন।'

যখন কয়েকটি প্রদেশ অথবা আব্বাসী হুকুমতের শ্রেষ্ঠ বিচারকের পদে ইমাম সাহেবকে নিয়োগ করিতে চলিয়াছিলেন, বোধ হয় তখন ইমাম সাহেব এ কথা বলিয়াছিলেন। তখনকার দিনে প্রাদেশিক শাসন-কর্তা বা ফৌজী পদস্থ কর্মচারী সাধারণত শাহী পরিবারের লোকেরাই হইতেন। তাই তিনি খলীফা ছাড়াও শাহী পরিবারের কথা উল্লেখ করিয়াছিলেন। অন্যথায় খলীফা এবং তাহার দরবারী লোক তো রাজধানী পর্যন্তই সীমিত। কিন্তু যিনি ক্যাযীউল কুযাত তিনি রাষ্ট্রের সর্বস্তরের লোকের পক্ষে বা বিপক্ষে রায় প্রদান করার ক্ষমতায় ক্ষমতাবান থাকেন।

আব্বাসী হুকুমতের প্রতি ইমামের অনাস্থা

এই ভাষণে ঐ সমস্ত কথার প্রতি ইঙ্গিত করিতে গিয়া লিখিয়াছেন যে, পরিশেষে তিনি অনাস্থা ও অসন্তুষ্টি প্রকাশ করিলেন। হুকুমতের পক্ষের কাযী এবং সরকারী চাকুরেদের মনের অবস্থার প্রতি ইঙ্গিত করিয়া ইমাম সাহেব বলিলেন, 'কিন্তু আমার অবস্থা তো আমি এই দেখিতেছি যে, আপনি যখন আমাকে আহ্বান করেন তখন আপনার দরবার হইতে বাহির না হাওয়া পর্যন্ত আমার দেহে প্রাণ ফিরিয়া আসে না।

ইহার অর্থ তো এই দাঁড়ায় যে, স্বেচ্ছাচারী রাজতন্ত্রের অবস্থা এমন যে যখন কোন ব্যক্তিকে দরবারে আহ্বান করা হয় তখন সে কিছুই

বুঝিতে পারে না যে, তাহার সহিত কিরূপ ব্যবহার করা হইবে। সে কি জীবন লইয়া ফিরিবে, না তাহার প্রাণহীন লাশ ফিরিয়া আসিবে। বেসরকারী লোকের অবস্থাই যখন এমন তখন সরকারী কর্মচারীদের মনের অবস্থা কি হইতে পারে তাহা সহজেই অনুমেয়।

পরিষ্কার কথা এই যে, যতক্ষণ পর্যন্ত হুকুমতের পক্ষ হইতে এই আস্থা না আসে যে, যে কোন অবস্থায়ই স্বেচ্ছাচারিতা নয়—বরং আইন-কানুন মানিয়া চলাই সরকারী কর্মচারীদের কর্তব্য-তখন পর্যন্ত খলীফা বা তাহার পরিবারবর্গের বিরুদ্ধে ফয়সালা করার শক্তি কোন্ ব্যক্তির থাকিতে পারে? ইহারা তো দূরের কথা খলীফার একজন চাপরাশী বা দাসীর বিরুদ্ধেও রায় দেওয়া সম্ভবপর হয় না। এই অবস্থায় এমন শক্তিহীন বিচারককে কাযীউল কুযাতই বলুন বা রাষ্ট্রের সর্বশ্রেষ্ঠ বিচারকই বলুন না কেন উহার কোন অর্থ হয় না।

ইমাম সাহেবের একথার উত্তরে মনসুর কি বলিলেন উহা কেহই উল্লেখ করেন নাই। শুধু এইটুকু উল্লেখ করিয়াছেন যে অতঃপর মনসুর জিজ্ঞাসা করিলেন—"কিন্তু আপনি আমার দেওয়া টাকা পয়সা কেন গ্রহণ করেন না?"

মনে হয় মনসুর ইমাম সাহেবের এই শর্ত গ্রহণযোগ্য নয় মনে করিয়া কথার মোড় ঘুরাইয়া দিলেন। অথচ আমি কোন মতেই বুঝিতে পারিতেছি না যে, মনসুর কেন এই শর্ত গ্রহণ করিলেন না। মনসুরের উদ্দেশ্য তো ছিল যে কোন মতে ইমামকে আয়ত্বে আনা। শর্ত কবুল করিলেই হয়ত ইমাম সাহেব কাবুতে আসিয়া যাইতেন। পরে সেই শর্ত পালন করা না করা খলীফার ইচ্ছাধীনে ছিল। ওয়াদা করিলে এমন কি ক্ষতি হইত? আমরা পূর্বে দেখিয়াছি কাযী শরীফও এমন শর্ত আরোপ করিয়া কাযীগিরী গ্রহণ করিয়াছিলেন। মনসুর বলিয়াছিলেন—'আপনি আমার এবং আমার সন্তান-সন্ততিদের বিরুদ্ধে ফয়সালা করিতে পারিবেন।''

সুতরাং এ কথা কি করিয়া বুঝিব যে, ইমাম সাহেবের সঙ্গত শর্তের উত্তরে ঐ কথা কেন বলিলেন না। যতদূর আমার ধারণা কাযী শরীফকে যে কথা বলিয়া সান্ত্বনা দিয়াছিলেন ইমাম সাহেবকেও ঠিক সেই কথাই বলিয়াছিলেন। কিন্তু অন্যান্য আংশিক ব্যাখ্যায় জড়িত হইয়া এমন বহু প্রয়োজনীয় কথা বাদ গিয়াছে। উহাদের সাথে খলীফার এই উত্তরও তলাইয়া গিয়াছে। সত্য বলিতে কি কাযীউল কুযাতের প্রস্তাব

পেশ করার মধ্যেও তো এই শর্ত ছিল। যেমন পূর্বে বলা হইয়াছে যে, পূর্ণ করা না করা অন্য কথা। কিন্তু এই পদে বহাল করার অর্থই তো ইহাই যে—আইনগতভাবে তুমি কাযীউল কুযাতের সমস্ত ক্ষমতা প্রয়োগ করিতে পারিবে। এই পদের প্রস্তাব দেওয়ার পর ইমাম সাহেবের এই প্রশ্ন ওঠানোরই বা কি প্রয়োজন ছিল যেমন তিনি চাকুরী গ্রহণ না করা হইতে বাঁচিয়া থাকার জন্য উঠাইয়াছিলেন। এমন তো তিনি বহু ওজরই পেশ করিয়াছিলেন। মুফিক আলী ইবন আলী হামীরী হইতে বর্ণনা করেন—কাযীর পদ গ্রহণ করার প্রস্তাব মনসুর কয়েক বারই ইমাম সাহেবকে দেন। কিন্তু তিনি ওযর পেশ করিতে এবং ক্ষমা চাহিতেই থাকেন এবং যত প্রকার টালবাহানা করা সম্ভবপর উহার সব কিছুই তিনি প্রয়োগ করিয়াছিলেন।

প্রকৃতপক্ষে ইমাম সাহেবও এই প্রশ্নই উঠাইয়াছিলেন। কিন্তু ইহা এমনই আপত্তিকর ছিল যাহার উত্তর মনসুর সম্মতিসূচকভাবে দিয়া অনায়াসে ইমামকে চুপ করিয়া দিতে পারিতেন। তাঁর চুপ করিয়া থাকার কোন কারণই ছিলনা।

তাই আমি মনে করি কাযীউল কুযাতের পদের সাথে ইমাম সাহেব সেই শর্তের নিরাপত্তা প্রকাশ্যভাবে মনসুরের নিকট হইতে লইতে চাহিয়াছিলেন—উহা নিশ্চয়ই দেওয়া হইয়াছিল। যেমন কাযী শরীফকে দেওয়া হইয়াছিল। কিন্তু প্রশ্ন হইল অতঃপর ইমাম সাহেব কি বলিলেন? কিন্তু সে বিষয় কোথাও কিছু পাওয়া যায় নাই।

অবশ্য একটি কথা, শেষ বার যখন ইমাম সাহেব বাগদাদ যান—ইহার পর তিনি আর জীবনে কুফা ফিরিয়া আসেন নাই। বাগদাদেই তিনি ইনতিকাল করেন। মৃত্যুর বিবরণ দেওয়ার পূর্বে ইমাম সাহেবের কুফায় একটি বিশেষ অবস্থার কথা বলিব।

সপ্তদশ অধ্যায়

ইমাম সাহেবের গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক ভাষণ

মুফিক বর্ণনা করিয়াছেন, ইমাম সাহেবের বিশিষ্ট ছাত্রগণ একদিন তাহার নিকট সমবেত হইলেন। কিন্তু মুজিমুল মুসান্নিফীনের গ্রন্থকার বলেন, 'ইমাম সাহেব কুফার জামে মসজিদে এক সভার আয়োজন করেন। সেখানে তাহার এক হাযার ছাত্র সমবেত হইলেন। তাহাদের মধ্যে চল্লিশ জন এমন ছিলেন যাহারা ইজতিহাদ করার ক্ষমতা রাখিতেন। ইমাম সাহেব তাহাদিগকে নিকটে ডাকিয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিতে আরম্ভ করিলেন।'

জানা যায় নাই মুজিমুল মুসান্নিফীনের গ্রন্থকার একথা কোথায় পাইলেন। তবে তাঁহার কথাদৃষ্টে মনে হয় ইমাম সাহেব নানাদিকে অবস্থানরত ছাত্রদের আহ্বান করিয়া আনিয়াছিলেন। যখন সংখ্যায় এক হাযার হইল তখন তাহাদের লইয়া কুফার জামে মসজিদে গমন করেন। অতঃপর তাহাদের মধ্যে হইতে চল্লিশ জনকে ডাকিয়া নিকটে বসাইয়া ভাষণ দান করিয়াছিলেন।

তিনি যে ভাষণ দান করিয়াছিলেন, উহার গুরুত্ব মুজিমের গ্রন্থকারের কথায় আরও বাড়িয়া যাইতেছে। ইমাম আবু হানীফা ছাত্রদের সমাবেশে ভাষণ দিয়াছিলেন, এই পর্যন্ত মুফিক এবং মুজিমের গ্রন্থকার একই মত পোষণ করেন। প্রশ্ন হইল, তাহারা স্বেচ্ছায় না ইমাম সাহেবের আহ্বানে আসিয়াছিলেন। মুজিমের গ্রন্থকারের মতে দূর-দূরান্ত হইতে তাহাদের আহ্বান করিয়া আনিয়াছিলেন। সে যাহাই হউক প্রথমে ইমাম সাহেবের ভাষণের অনুবাদ লিপিবদ্ধ করিতেছি। ছাত্রদের উদ্দেশ্য করিয়া তিনি বলিলেন, 'তোমাদের অস্তিত্বই আমার অন্তরের সমস্ত আনন্দের উৎস। তোমাদের অস্তিত্বের মধ্যে আমার চিন্তা-ভাবনা দূর হওয়ার প্রতিষেধক নিহিত রহিয়াছে।'

অতঃপর বলিলেন, 'ফিকাহ্‌র (ইসলামী আইন) গদী তোমাদের জন্য আমি কষিয়া বাঁধিয়া দিয়াছি, এবং উহার মুখে তোমাদের জন্য লাগামও সংযুক্ত করিয়া দিয়াছি। তোমাদের ইচ্ছামত তোমরা উহাতে আরোহণ করিতে পার। আমি এমন এক পরিবেশ সৃষ্টি করিয়া দিয়াছি তোমাদের লোকে পদাঙ্ক অনুসন্ধান করিবে, এবং সে মতে চলিবে।

তোমাদের এক একটি কথা লোকে তালাশ করিবে। আমার ব্যবস্থামত তোমাদের নিকট মাথা নত করিয়াই থাকিবে।'

তারপর সেই বিশিষ্ট চল্লিশ জন ছাত্রকে উদ্দেশ্য করিয়া বলিলেন—

'অতঃপর তোমাদের আমাকে সাহায্য করার সময় আসিয়াছে। অর্থাৎ তোমাদের চল্লিশ জনের প্রত্যেকেই কাযীর পদ গ্রহণ করার সামর্থ্য নিজের মধ্যে সৃষ্টি করিয়া লইয়াছে। তোমাদের মধ্যে এমন দশ-জন আছ যাহারা শুধু কাযীই নয় বরং কাযীগিরির ট্রেনিং দেওয়ার ক্ষমতা অর্জন করিয়াছ।'

আবার বলিলেন, 'আল্লাহ্‌র মধ্যস্থতা দিয়া এবং তোমরা যতটুকু ইলমই অর্জন করিয়াছ সেই ইলমের মধ্যস্থতা দিয়া বলিতেছি ও তোমাদের নিকট হইতে আমি এই আশা পোষণ করি যে, ইলমকে দাবাইয়া যাওয়া হইতে রক্ষা করিবে। তোমাদের কাহারও যদি কাযী-গিরী করিতে বাধ্য হইতে হয় তবে আমি একথা বলিয়া দিতে চাই যে, লোকচক্ষুর অন্তরালে গোপন থাকিলেও কোন প্রকার অন্যায় ফয়সালা করিবে না। এমন ফয়সালাকারীর কাযীগিরি এবং এই উপলক্ষে বেতন গ্রহণ করা জায়েয হইবে না। যতক্ষণ পর্যন্ত না কাযীর বাহির ভেতর এক সমান থাকিবে ততক্ষণ পর্যন্তই কাযীগিরী এবং উহার বেতন ভোগ করা জায়িয হইবে।

যাহা হউক, প্রয়োজনবোধে তোমাদের যে কেহই কাযীর পদ গ্রহণ করিবে তাহাদিগকে আমি উপদেশ দিতেছি যে, আল্লাহ্‌র সৃষ্টি মানুষ এবং তোমাদের মধ্যে যেন কোন প্রকার অন্তরাল সৃষ্টি না হয় অর্থাৎ দারওয়ান ইত্যাদি রাখিয়া তোমাদের নিকট আগন্তুকদের বাধা দেওয়ার কোন প্রকার ব্যবস্থা করিও না। তোমার কর্তব্য হইবে শহরের জামে মসজিদে জামায়াতের সাথে পাঁচ ওয়াক্ত সালাত আদায় করা এবং একথা প্রত্যেক সালাতের সময়ই প্রচার করাইবে যে, কাহারও কোন ফরিয়াদ থাকিলে করিতে পার। এশার সালাতের পর বিশেষ ভাবে একথাগুলি তিনবার বলাইবে। একাজ হইতে অবসর হওয়ার পর বাড়ী ফিরিবে। অসুস্থতা বশতঃ যতদিন কাজ করিতে না পারিবে ততদিনের বেতন গ্রহণ করিবে না"।[১]

১। ইহা শর্তসাপেক্ষ। নিয়োগের সময় যদি একথা উল্লেখ থাকে যে, অসুস্থতাবশতঃ কাজে যোগদান করিতে না পারিলে বেতন কাটা যাইবে তখন ইহা প্রযোজ্য। আর যদি শর্ত থাকে যে এই অবস্থায় অর্ধেক বা পূর্ণ বেতন গ্রহণ করা যাইবে তখন অর্ধেক বা পূর্ণ বেতন গ্রহণ করা যাইবে।

অতঃপর বলিলেন—

"স্বয়ং খলীফা বা তাহার প্রতিনিধি যদি লোকের সাথে কোন প্রকার অন্যায় আচরণ করে তবে নিকটবর্তী কাযীর উচিত স্বয়ং খলীফা বা প্রতিনিধিকে সাবধান করিয়া দেওয়া।"

এই ভাষণের ঐতিহাসিক গুরুত্ব ইহা দ্বারাই করা যাইতে পারে যে, মুফিক লিখিয়াছেন, এই ভাষণের নকল আমি নিশাপুর হইতেই পাইয়াছি, হামদান হইতেও পাইয়াছি। নিশাপুর হইতে শায়খ সালিহ আবু সাঈদ মুহাম্মাদ ইবন জামে এবং হামদান হইতে সাইয়িদুল হুফ্ফাজ আবু মনসুর দারুদ দায়লামী পাঠাইয়াছেন। ভাষণের প্রথম বর্ণনাকারী কাযী আবু ইউসুফ হইতে হাসান ইবন যিয়াদ শুনিয়া লোকের নিকট বর্ণনা করিতেন। মুফিক লিখিয়াছেন, জহিরুল ইসলাম হাসান ইবন আলী মারগিয়ানানীও একথা তাহার গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন।

পূর্বেও বলা হইয়াছে যে, ইমাম সাহেব কখন এবং কোন অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে একথা লিখিয়াছেন উহার সন্ধান পাওয়া যায় নাই। যদি ইহা সত্য হয় পরিশেষে মনসুর আব্বাসী হুকুমতের বিচার বিভাগীয় সম্পূর্ণ দায়িত্ব ইমামকে অর্পণ করিতে চাহিয়াছিলেন তবে একথা কেন বলিব না যে ব্যাপারটি চরম পর্যায় আসিয়া পেঁাছার পরই ইমাম সাহেব তাঁহার ছাত্রদিগকে অবগত করাইয়াছিলেন যে, যে লক্ষ্যস্থলে পেঁাছার জন্য এত সাধ্য-সাধনা উহার সফলতায় পেঁাছার সময় হইয়া গিয়াছে। ইমাম সাহেবের কৌশলময় ইশারা যে, ঘোড়ার গদি আটিয়া দেওয়া হইয়াছে, মুখে লাগাম লাগানো হইয়াছে, রাস্তা পরিষ্কার, দুনিয়া তোমাদের সাথে চলার জন্য প্রস্তুত, তোমাদের জ্ঞান লোকের উপকারের জন্য প্রয়োজন, একথা সকলেই বুঝিয়াছে, এখন শুধু তোমাদের চলার প্রয়োজন। একথাও বলিয়াছিলেন যে, তোমাদের চল্লিশ জনের ত্রিশ জন কাযী এবং অবশিষ্ট দশ জনের কাযীদের শিক্ষা দেওয়ার ক্ষমতা আছে।

অন্য কথায়—কাযীউল কুযাতের পদ সৃষ্টি করার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করিয়া যাহাদের মধ্যে এই মর্যাদাসম্পন্ন পদ গ্রহণ করার ক্ষমতা ছিল ইমাম সাহেব তাহাদিগকেও নির্দিষ্ট করিয়া দিয়াছিলেন। মনে হয় ইসলামী ফিকাহ্‌র মর্যাদা ও ভবিষ্যত পরবর্তীকালে ইতিহাসের পাতায় যেভাবে স্বর্ণাক্ষরে লিখিত থাকিবে ইমাম সাহেব তাহা জানিতেন। তাই তিনি বলিয়াছিলেন। 'উহার জন্য আমি ক্ষেত্র তৈয়ার করিয়া রাখিয়াছি।'

চিন্তা করিয়া দেখুন, হুকুমত ও ইমামের মধ্যে যখন কাযীউল কুযাত সম্পর্কে কথাবার্তা হইতেছিল তখন ব্যতীত আর কখনও ইমামের এই মনোভাব প্রকাশ করার সময় হইতে পারে? এরূপ কথোপকথন হওয়ার পর ইমাম সাহেব কখন কূফায় আসিলেন এবং কখনই বা তাহার ছাত্রদিগকে দূর-দূরান্ত হইতে একস্থানে সমবেত করিলেন—ইহাও একটি প্রশ্ন হইতে পারে। কিন্তু জীবনচরিত রচয়িতাগণ আংশিক ঘটনা বর্ণনার সময়ে যে উল্লাসে উল্লসিত হইয়া পড়িয়াছিলেন উহা হইতেই এই প্রশ্নের উত্তর বাহির করা ব্যতীত অন্য অন্য কোন পথ আর আমাদের জন্য খোলা নাই।

যতদূর মনে করি দেড় শত বৎসর ইসলামী শাসনের পর পর কাযীউল কুযাত পদের সৃষ্টি করা একেবারে নতুন ছিল। যাহারা এই সমস্ত ঘটনা সম্বন্ধ অজ্ঞাত এবং ইসলামী ফিকাহ্‌র ইতিহাস সম্পর্কে কোন জ্ঞান রাখে না—আজও তাহাদের জন্য এই বিষয়টি একটি জটিল ধাঁধাঁয় পরিণত হইয়া রহিয়াছে যে, এই পদ সৃষ্টির খেয়াল কেন হইল এবং কোথা হইতে আসিল? মিসরের এক গ্রন্থকার 'ইসলামী কাযা' সম্বন্ধে লিখিত পাশ্চাত্যের বহু গ্রন্থ ঘাটিয়াছেন। তিনি তাহার রচিত 'আলকাযায়া ফিল ইসলাম'-এ ইসলামী ইতিহাস ছাড়াও পাশ্চাত্যের গ্রন্থকারদের মতবাদ ও টিকা-টিপ্পনী হইতেও বহু কিছু গ্রহণ করিয়া এ সম্বন্ধে বহু আলোচনা করিয়াছেন। এতদসত্ত্বেও তিনি লিখিয়াছেন—

"বহু অনুসন্ধান করার পরও এ সম্বন্ধে কোন সঠিক সিদ্ধান্তে পৌঁছা যায় নাই। কেননা খোলাফায়ে রাশেদীন এমন কি বনী উমাইয়াদের শাসনকালেও কাযীউল কুযাত শব্দটি পাওয়া যায় না। উমাইয়াদের যুগে রাজধানীর কাযী নিয়োগ স্বয়ং খলীফার হাতে হইত। কিন্তু অন্যান্য স্থানের কাযী এবং রাজধানীর কাযীর মধ্যে কোন প্রকার পার্থক্য পরিলক্ষিত হইত না। অর্থাৎ কাযীদের নিয়োগ ক্ষমতা কখনও রাজধানীর কাযীর হাতে দেওয়া হইত না।" পরে লিখিয়াছেন,

'হঠাৎ বনী আব্বাসের যুগে কাযীউল কুযাত পদের সৃষ্টি হয় এবং উহার ক্ষমতা সম্বন্ধেও বিস্তারিতভাবে আলোচনা দেখা যায়। বলা হয় যে, কাযীউল কুযাত অন্যান্য স্থানের কাযীদের নিয়োগ ও অপসারণ করিবে, রাষ্ট্রের সমস্ত কাযীদের কার্যকলাপ পরিদর্শন করিবে, কাযী লোকের সাথে কিরূপ আচার-ব্যবহার করে—বিশ্বস্ত লোকের নিকট উহা জ্ঞাত হইবে এবং অবস্থা অনুযায়ী ব্যবস্থা করিবে।'

পরে বলেন—'এ কথা সত্য যে সর্বপ্রথম বাগদাদেই এই নয়া পদের সৃষ্টি হয়।'

কিন্তু বাগদাদে কেন সৃষ্টি করা হইল। ইহা কাহার পরিশ্রমের বিনিময় ছিল? ইহা সম্মুখে সর্বপ্রথম ইহা গ্রহণ করার প্রস্তাব করা হইয়াছিল এবং কেন করা হইয়াছিল? যেহেতু গ্রন্থকার বহুদর্শী হওয়া সত্ত্বেও এ সম্বন্ধে অজ্ঞাত ছিলেন এই জন্য পরিশেষে যেমন এই যুগের নিয়মানুযায়ী মানুষ সাধারণ একটু সামঞ্জস্য দেখিয়াই ফলাফল বলিয়া দেয় যে, মানুষের আকৃতি-প্রকৃতি বানরের আকৃতি-প্রকৃতির সহিত মিলিয়া যায় শুধু এই সামান্য পরিমাণ সামঞ্জের জন্যই মানুষকে বানরের বংশধর বলিয়া থাকে, তেমনি গ্রন্থকারও সামান্য একটু ইঙ্গিত পাইয়া বলিয়া দিয়াছেন ইরানীদের মধ্যে কাযীউল কুযাত হইত এ সেখান হইতেই এই শব্দটি লওয়া হইয়াছে।

পাঠক অবাক হইবেন যে, 'কাযীউল কুযাত' শব্দটি আরবী। সুতরাং ইরানীদের নিকট হইতে কিভাবে লওয়া যাইতে পারে? এই সন্দেহ নিরসন করার জন্য গ্রন্থকার বলিয়াছেন—'ইরানী বাদশাহ শাপুরখুল আফতাকের সময় যখন মুবিক মুবযান মারা গেলেন তখন লোকে শাপুরকে বলিল—আস্তাখার জিলায় একজন লোক আছে যাহাকে মুবিক মুবখানের স্থানে নিয়োগ করা যাইতে পারে।'

গ্রন্থকার জাহিরের বিখ্যাত গ্রন্থ 'আত্তাজ' হইতে এ বিষয়টি উদ্ধৃত করিতে গিয়া বলিয়াছেন—'জাহিজ মুবিক মুবযান এর পদের জন্য মুবেখ মুবযান এর পরিবর্তে লিখিয়াছেন যে 'কাযীউল কুযাত' শব্দটি অধিক যুক্তিসঙ্গত হইবে। সুতরাং মনে হয় মুবিখ মুবযানই 'কাযীউল কুযাত' ছিলেন।' আল্লাহই জানেন গ্রন্থকার যাহা জানিতে চায় আপনি তাহা বুঝিয়াছেন কি? সূত্র এই যে জাহিজ এক স্থানে মুবেখ মুবযান এর পরিবর্তে 'কাযীউল কুযাত' লিখিয়াছেন।' এই ভিত্তির উপর নির্ভর করিয়াই সমস্ত ইমারত তৈরী করা হইয়াছে যে বনী আব্বাস ইরানীদের নিকট হইতে 'কাযীউল কুযাত' শব্দটি ধার লইয়াছিলেন। মনে হয় জাহেয 'মুবেখ মুবযান' টির অনুবাদ' যদি 'কাযীউল কুযাত' শব্দ দ্বারা অনুবাদ না করিতেন তবে হয়ত এই মিসরী গ্রন্থকারের এমন একটি অলৌকিক আবিষ্কারের পথ বন্ধ হইয়া যাইত।

প্রকৃতপক্ষে ইরানবাসী পুরোহিতকে 'মুবিখ' বলিত। মুবিখ ছিল ধর্মীয় নেতা, তাহার তত্ত্বাবধানে যাবতীয় ধর্মীয় কাজ সমাধা হইত। বিচার-আচারের সাথে তাহার কোন সম্পর্কই ছিল না। সামান্য কিছু করিলে উহা ছিল গৌণ। তাহার মুখ্য কাজ ছিল ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদি পরিচালনা করা বা উহার রীতিনীতি বলিয়া দেওয়া। কিন্তু কি করা

যায় ভুল হউক বা শুদ্ধ জাহিষ যখন 'কাযীউল কুযাত' বলিয়াছেন তখন আর কথা কি ! শত্রুদের জন্য আগুন তৈরী করার জন্য অগ্নিস্ফুলিঙ্গই তো যথেষ্ট। মনে হয় ইহা গ্রন্থকারের নিজস্ব চেষ্টাপ্রসূত কোন কিছু নয় বরং ইউরোপীয়দের ওহীর মধ্যে ইহাও একটি ওহী।

আল-কাযায়া ফিল ইসলাম'—এর গ্রন্থকারকে বাদ দিন। ইসলামী ইলমে 'আলিমদের মধ্যেই বা কয়েকজন অবগত আছেন যে কাযী আবু ইউসুফ 'কাজীউল কুযাত' হওয়ার বহু পূর্বেও ইমাম আবু হানীফাকে এই পদ গ্রহণ করার আমন্ত্রণ জানাইয়াছিলেন। মু'ফিক এই সম্বন্ধে বিভিন্ন বর্ণনা সন্নিবেশিত করিয়াছেন যাহা আমরা পূর্বে বর্ণনা করিয়া আসিয়াছি। কিন্তু বর্ণনাকারিগণ এমনভাবে বর্ণনা করিয়াছেন যে পাঠক-বর্গ সহজে উহার গুরুত্ব উপলব্ধি করিতে পারে না। যে ব্যক্তি প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত ইমাম সাহেবের সাধ্য-সাধনায় প্রত্যেকটি আংশিক ঘটনাও মনোযোগের সহিত লক্ষ্য করিয়াছেন যে, ইমাম সাহেব কত সতর্কতা ও সাবধানতা সহকারে এই পথে অগ্রসর হইয়াছেন দেখা যাইবে সে নিজেই এমন একস্থানে আসিয়া পৌঁছিবে যেখানে ইমাম সাহেব দাঁড়াইয়া আছেন।

অর্থাৎ স্থানীয় কাযী পরে কয়েকটি প্রদেশের কাযী এবং পরিশেষে আব্বাসী হুকুমতের বিচার সম্পর্কীয় যাবতীয় ক্ষমতার প্রশ্ন ইমাম এবং হুকুমতের মধ্যে ছড়াইয়া রহিয়াছে। ইমাম সাহেবকে বশে আনার জন্য হুকুমত এই শেষ টোপ ফেলিতেও তৈয়ার ছিলেন, কিন্তু হুকুমতে নিজের বশে রাখার জন্যই ইমাম সাহেব কখনও এই পদ গ্রহণ করেন নাই। এই পর্যন্ত লিখিত সাক্ষী কোন-না-কোন মতে পাওয়াই যায়। কিন্তু পরে কি হইল ? যে রূপ বলা হইয়াছে যে ইমাম সাহেব যখন এই আপত্তি উত্থাপন করিলেন যে, হুকুমতের সম্মুখে সর্বদা নিজের এবং শাসকদের মান-মর্যাদার প্রশ্ন আসিয়া থাকে। 'কাজীউল কুযাতের' পদ ঐ ব্যক্তিই গ্রহণ করিতে পারেন যিনি সব কিছু হইতে বেপরওয়া হইয়া স্বয়ং খলীফা, পরিবারবর্গ এবং ফৌজি কর্মচারীদের বিরুদ্ধেও রায় প্রদান করিতে পারেন। কিন্তু যাহার অশান্তির এই অবস্থা যে দরবারে আসার পর সে বলিতে পারে না এখান হইতে সে জীবিত ফিরিয়া যাইবে না মৃত সেই বেচারাকে শুধু লোক-দেখানো 'কাযীউল কুযাত' বানাইয়া রাখার অর্থ কি ? 'কাযীউল কুযাত' তো দূরের কথা সাধারণ কাযীর কর্তব্যও সে পালন করিতে সক্ষম হইবে না।

ইমাম সাহেবের এই আপত্তি শুনিয়া মনসুর কি বলিয়াছিলেন উহা কোথাও পাওয়া যায় না। কিন্তু কাযী শরীফ এমন আপত্তি করিলে

মনসূর তাঁহার শর্ত মানিয়া লইয়াছিলেন। সুতরাং ইমাম সাহেবের আপত্তির উত্তরেও যে মনসূর এমন কিছুই বলিবেন উহাতে আপত্তির কি আছে; অতঃপর নিশ্চয়ই ইমাম সাহেব তখন বিপদাপন্ন হইয়া পড়িয়াছিলেন। ইহার পর কাযীর পদ গ্রহণ না করার মত আপত্তিই বা কি থাকিতে পারে? কি ইমাম সাহেব তো স্থির সিদ্ধান্ত করিয়াই রাখিয়াছিলেন যে কোন প্রকার চাকুরীই তিনি গ্রহণ করিবেন না। কারণ চাকুরী গ্রহণ করিলে তিনি আল্লাহ ও আল্লাহর রাসূলের জন্য মুসলমানদের জন্য যে খিদমত করিয়াছিলেন সেই খিদমত কমপক্ষে দুনিয়াবাসীদের চোখে এই চাকুরী গ্রহণ করার একটি উপকরণ বলিয়াই প্রতীয়মান হইত এবং তাহাদের সমালোচনার একটি বিষয়বস্তু হইয়া থাকিত।

ইহা ছিল ইমাম সাহেবের প্রকাশ্য দিক। কিন্তু তাহার ভিতরের কথা যাঁহারা জানিতেন তাঁহাদের বর্ণনা আজ তো বিশ্বাস করাই কঠিন। ইমাম বুখারীর প্রসিদ্ধ উস্তাদ ইসহাক ইবন রাহওয়াইর পুত্র 'আলী বলেন—'আমার পিতা ইমাম সাহেবের এই ঘটনা বর্ণনার সময় নিজের মতবাদ এইভাবে বলিয়াছেন—নিজের শিক্ষা এবং মুসলমানদের পথ প্রদর্শনের ব্যাপারে ইমাম সাহেবের সম্মুখে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি বিধান ব্যতীত আর কিছুই ছিল না।'

যাহার অর্থ ইহা ব্যতীত আর কি হইতে পারে যে, চাকুরী গ্রহণ করিলে পার্থিব লালসায় পাইয়া বসার ভয় ছিল তাই তিনি শপথ করিয়া একাজ গ্রহণ করা হইতে বিরত ছিলেন। তদ্রূপ নিজের 'ইলমকে বিশুদ্ধ রাখার মানসে নিজে আর কি পারিশ্রমিক গ্রহণ করিবেন বরং যাঁহারা তাঁহার নিকট জ্ঞানার্জন করিতেন তাঁহাদিগকেই সাহায্য করিতেন। নিজেকে স্বার্থহীন বলিয়া পরিচয় দেওয়া তো অতি সহজ কথা, কিন্তু জীবনের শেষ নিশ্বাস পর্যন্ত যথার্থভাবে পবিত্র থাকা ইমাম সাহেবের ন্যায় স্বচ্ছল লোকেরই প্রয়োজন।

এই সাথে আরও একটি বিষয় লক্ষ্য রাখিতে হইবে যে প্রত্যেকটি সমস্যারই পরিণতি সম্বন্ধে বিশেষভাবে সতর্ক থাকা ইমাম সাহেবের ইজতিহাদের একটি বিশেষ নীতি। এমন অনেক ইজতিহাদী বিষয়বস্তু আছে যেখানে তিনি এই নীতি পূর্ণভাবে পালন করিয়া গিয়াছেন। এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা একখানা পূর্ণ গ্রন্থের বিষয়বস্তু হইতে পারে। এ বিষয়ে আলিমগণ অবগত এবং উহার উদাহরণও দিয়া থাকেন। চিন্তা করিলে দেখা যাইবে যে, কুরআন ও হাদীছের আলোকে

যে ইজতিহাদ করা হয় উহাতে তো এইরূপ সতর্কতা অবলম্বন করা যায়। কিন্তু আকস্মিক ঘটনা সম্পর্কে যখন বিভিন্ন প্রকার দাবী-দাওয়া লইয়া লোক উপস্থিত হয় তখন কাহার দাবীকে যথার্থ বলিয়া প্রতিপন্ন করা যায়। অর্থাৎ বিবাদ-মীমাংসা বিষয়ে যে কাজ লোকের করিতে হয় উহাতেও যদি সেরূপ সতর্কতা অবলম্বন নীতি পালন করার ইচ্ছা করে তবে উহা ভয়ানক কঠিন হইয়া দাঁড়ায়।

হুযুর (সঃ) এর দরবারে যখন এরূপ মামলা-মুকদ্দমা উপস্থিত হইত এবং উভয় পক্ষ যখন স্ব-স্ব দাবীর সমর্থনে বর্ণনা দিত তখন হুযুর (সাঃ) ও উভয় পক্ষের বয়ান ও সাক্ষী-সাবুত লইয়া ফয়সালা করিতেন। কিন্তু ফায়সালা করার সাথে সাথে একথাও এরশাদ করিতেন যে—"তোমাদের মধ্যে কেহ কেহ উদ্দেশ্য প্রকাশার্থে যবান বন্দীর শক্তি দ্বারা কার্যোদ্ধার করিয়া থাক, আর আমি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিলে সে সত্যবাদী এবং সে মতেই রায় দিয়া থাকি। আর যদি মিথ্যা রায় হয় (তোমাদের কথামতে) তবে তাহার বুঝা উচিত যে, আমি তাহাকে আগুনের টুকরা দিতেছি।

যাহা হউক মনে হয় ইমাম সাহেবের সতর্কতা অবলম্বন করার যে বিশেষ প্রবণতা ছিল উহাতে মনে হয় উহার প্রতি লক্ষ্য করিয়াই নিজেকে ফয়সালা করার উপযুক্ত মনে করিতেন না। আর যে ঘটনা সম্মুখে আসিতেছে উহা দ্বারা ইহার সত্যতাও প্রমাণিত হইবে। বলখের[১] প্রসিদ্ধ হানাফী ইমাম খাল্লাফ ইবন আইয়ুব যিনি নিজেও বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করিতেন—ইমাম সাহেব সম্বন্ধে বলেন—

"ইমাম সাহেবের স্বভাব ও প্রকৃতির মধ্যে দুইটি বস্তু আমার খুবই পসন্দ হইত। একটি হইল অমানুষিক জুলুম ও যবরদস্তি সত্ত্বেও তিনি কাযীর চাকুরী গ্রহণ করেন নাই। দ্বিতীয় কুরআনের তাফসীর করায় কখনও অংশ গ্রহণ করেন নাই।"

১। তিনি ইমাম সাহেবের নয় বরং কাযী আবু ইউসুফ এবং আসাদ ইবন আমর প্রমুখের ছাত্র। তিনি প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিসদের নিকট হাদীস পাঠ করেন এবং হযরত ইবরাহীম ইবন আদহাসের সাহচর্য লাভ করেন। কথিত আছে, আযান দেওয়ার সময় এক ব্যক্তি কোন কিছু লিখিতেছিল। সেই ব্যক্তিকেই কোন বিষয়ে সাক্ষী হাযির করা হইলে তিনি তাহাকে সাক্ষী হিসাবে গ্রহণ করেন নাই। তিনি বলিয়াছেন—"যে ব্যক্তি মসজিদে ভিক্ষা দেয় তাহার সাক্ষী গ্রহণযোগ্য নয়।" তাহাদের মতে মসজিদে ভিক্ষা করাই শুধু পাপ নয় বরং যে ব্যক্তি দেয় তাহারও পাপ হয়।"

এ কথাটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। ইজতিহাদী মাসআলা সম্বন্ধে একথাও তো প্রথম হইতেই স্থিরিকৃত যে সবই ধারণাপ্রসূত, তাই ইহা তত কঠিন নয়। কারণ কুরআন ও হাদীস মতে যাহা অধিক সতর্কময় লোকে উহাই গ্রহণ করিয়া থাকে। কিন্তু বিবাদ-মীমাংসা তো ঘটনা পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ দ্বারা হইয়া থাকে; উভয় পক্ষের বর্ণনা ও সাক্ষী প্রচুর পরিমাণে সংগ্রহ করা হয়। সতর্কতামূলক ফয়সালা কি হইবে—ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে উহা স্থির করা সহজ নয়। কুরআন এরূপ ধারণালব্ধ কিতাব নয় বরং কুরআনলব্ধ বিষয় অবশ্য পালনীয়। প্রকৃত কথা হইল ধারণা-প্রসূত রায় অধিকন্তু একই রওয়ায়েত, যাহা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ফলপ্রসূ, উহা দ্বারা কুরআনের বক্তব্য বিষয়কে স্থির করা বড়ই দুঃসাহসিক কাজ। তাফসীরের মধ্যে সহীহ হাদীস যে খুব কম পাওয়া যায় ইহাও তাহার একটি রহস্য। ইমাম আবু হানীফার প্রতি কুরআনের আয়াতের তাফসীর সম্পর্কেও কাজ না করার মূল কারণ এই যে, ঐ বিষয়েও তিনি খুব সতর্কতা অবলম্বন করিতেন। তাই তিনি কাযী হওয়ার উপযুক্ত ছিলেন না বলিয়া যে দাবী করা হইয়াছিল—ইহা দ্বারাই তাহার মর্মার্থ উপলব্ধি করা যায়। বরং ইহা ব্যতিত অন্য কোন কারণ আছে কি না বাহির করা খুবই মুশকিল।

যাহা হউক বিষয়বস্তু হইতে বহু দূরে চলিয়া আসিয়াছি। আলোচ্য বিষয় ছিল যে হুকুমতের পক্ষ হইতে যদিও ইমামকে নিশ্চয়তা দেওয়া হইয়াছিল যে, তিনি খলিফা বা তাহার পরিবারবর্গের বিরুদ্ধে ফয়সালা করিতে পারিবেন, অন্যান্য লোকের ন্যায় শাহী পরিবার বা স্বয়ং খলীফাও তাহার সেই ফয়সালা মানিয়া লইবেন তখনও কেন তিনি চাকুরী গ্রহণ করিতে অস্বীকার করিলেন, উহার সঠিক সন্ধান পাওয়া যায় না। কাযী হওয়ার সামর্থ আমার নাই' এই কথার কারণ নানা লোকে নানাভাবে দেখিয়াছেন। কিন্তু ইমাম সাহেবের ন্যায় লোকে প্রথমেই যে এই আপত্তি উত্থাপন করিয়াছিলেন তাহা মনে হয় না।

ইহা আলোচিত হইয়াছে যে, ইমাম সাহেব আবু জাফর মনসুরের সম্মুখে বিস্তারিতভাবে ব্যাখ্যা করিয়াছেন এবং সকাল হইতে সন্ধ্যা পর্যন্ত সরকারী কাযীদের ফয়সালা সম্পর্কে সমালোচনা করিয়াছেন তাছাড়া লোক চেনার মত ক্ষমতা মনসুরের ছিল। যে কোন সাধারণ লোককেও একথা বুঝানো কঠিন ছিল যে "আমি কাযী হওয়ার

উপযুক্ত নই।" তবে একথা সত্যই বলিয়াছেন। কিন্তু কখন বলিয়াছেন? যখন কাযীর পদ গ্রহণ করার কোন ওযর-আপত্তি আর অবশিষ্ট ছিল না, তখনই বলিয়াছেন। ইহাই তাঁহার শেষ প্রচেষ্টা। ইহাকে ইমাম সাহেবের খেয়ালও বলা যাইতে পারে।

ইমাম সাহেবের এই খাম-খেয়ালী দেখিয়াই মনসুর ক্রোধান্বিত হইয়াছিলেন। মনে করিয়াছিলেন এই ব্যক্তি ইচ্ছা করিয়াই ভুল কথা বলিয়া রেহাই পাওয়ার চেষ্টায় আছে। তাই তিনি বেত্রাঘাত করার আদেশ দিয়াছিলেন। আর এখানেই সমস্ত কিছু শেষ হইয়া গিয়াছিল।

কিন্তু যে পর্যায়ে পৌঁছিয়া ইমাম সাহেব এবং হুকুমতের মধ্যে আলাপ-আলোচনা হইয়াছিল আমার মনে হয় ইমাম সাহেব সেই পর্যায়ে এমন কথা বলিয়াছিলেন উহার পূর্বে নয়। এমন একটি আপত্তি পেশ করার শক্তি তাঁহার ছিল না যাহা শুনার পর প্রত্যেক শ্রবণকারীই উহাকে ভুল প্রতিপন্ন করিতে বাধ্য থাকিত। ইমাম সাহেব এমন অজ্ঞ ছিলেন না যে মুক্তির অন্যান্য পথ খোলা থাকা সত্ত্বেও তিনি এমন কথা বলিবেন যাহার সম্বন্ধে লোকে তাঁহাকেই দোষী সাব্যস্ত করিবে। যেমন বলা হইয়াছে যে, অবস্থাভেদে যদিও উহা ভুল ছিল না তথাপি প্রত্যেক ব্যক্তির উপলব্ধিতে এমন সূক্ষ্মবোধ কোথা হইতে আসিত যে, সাধারণ লোকও যে বিবাদ-বিসম্বাদের ফয়সালা করিতে সক্ষম ইমাম সাহেবের ন্যায় প্রখ্যাত 'আলিম ও বিচার-বুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তি উহা করিতে অক্ষম। তাই আবার সেই প্রশ্ন আসে যে, ইমাম সাহেব এই সময় কি বলিয়াছিলেন এবং উহার পর কি করিয়াছিলেন? কিন্তু আমার নিকট এমন কোন প্রমাণই নাই যাহার সাহায্যে আমি এই প্রশ্নের সঠিক উত্তর দিতে পারি। তথাপি আমি পুনরায় 'আলী ইবন আলী আল-হামীরীর বর্ণনাই লিপিবদ্ধ করিব যে—'আবু হানীফা 'কাযীউল কুযাতের' পদ গ্রহণ না করার জন্য সাধ্যমত ওযর-আপত্তি পেশ করিতে লাগিলেন।'

এই বর্ণনার পর তিনি আরও যাহা কিছু সংযোযিত করিয়াছেন উহা এই আলোচনার বিষয়বস্তু নয়, তথাপি উহা লিপিবদ্ধ করিতেছি। তিনি বলেন—টাল-বাহানা করিয়া তিনি কার্যোদ্ধারের চেষ্টা করিতে থাকেন। তাহাদের মধ্যে যতক্ষণ পর্যন্ত 'কাযীউল কুযাত সম্বন্ধে আলাপ-আলোচনা হইতেছিল ততক্ষণ পর্যন্ত ইমাম সহেব নম্রভাবেই কথা-বার্তা বলিতেছিলেন। ইমাম সাহেব ও মনসুরের মধ্যে এমন কোন কঠিন ভাষায় কথা-বার্তা হয় নাই যে জন্য মনসুর ক্রোধান্বিত হইয়া

চাবুক বাহির করিতে পারেন। বরং এ সম্বন্ধে যতক্ষণ কথাবার্তা হইতেছিল ততক্ষণ ইমাম সাহেব নম্র এবং ভদ্রভাবেই কথা বলিতেছিল। এই গ্রন্থকারের ধারণাও তাই।

আহমাদ ইবন বুদায়ল হইতে 'আলমগীর গ্রন্থকার যে বর্ণনা লিপি-বদ্ধ করিয়াছেন উহাতে আরও কিছুটা বিস্তারিত ঘটনা পাই। মুহাম্মাদ ইবন হাসান হইতে আহমাদ ইবন বুদাল বলেন—'ইমাম সাহেবের ঘটনায় মনসুর-মন্ত্রীসভার সদস্য এবং দরবারীগণও ইমামের পক্ষ হইয়া মনসুরের নিকট সুপারিশ করেন।'

যদিও এই ভিন্ন ভিন্ন অংশ ভিন্ন ভিন্ন বর্ণনাকারিগণ বর্ণনা করিয়াছেন তবুও সব কিছু একত্রিত করিয়া এ কথা বলা যাইতে পারে যে, ইমাম সাহেবের বিনম্র কথাবার্তা এবং মন্ত্রী ও দরবারীদের চেষ্টা ও সুপারিশের ফলে কমপক্ষে ইমাম সাহেব আর একবার কুফায় গিয়াছিলেন এবং ছাত্রদের সাথে পরামর্শ করার সুযোগ পাইয়াছিলেন। হয়ত তখনই তিনি কুফায় পৌঁছিয়া দূর-দূরান্ত হইতে ছাত্রদিগকে আহবান করিয়া এ অধ্যায়ের প্রথমে বর্ণিত ভাষণ দান করিয়াছিলেন। এই ভাষণের বিষয়বস্তুর প্রতি লক্ষ্য করিবার পর এই ধারণায় উপনীত হওয়া যায় যে, 'কাযীউল কুযাতের' যে দায়িত্ব ইমামের উপর অর্পণ করার মনস্থ করা হইয়াছিল এবং হুকুমত তাহাকে যেমন ক্ষমতা অর্পণ করিতে ইচ্ছুক হইয়াছিল—উহার পরই এমন ভাষণ দেওয়া যাইতে পারে। এমনও মনে হয় যে ভাষণে ইমাম সাহেব সংক্ষেপে যে-সমস্ত বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত করিয়াছিলেন—অতঃপর সে সমস্ত আলোচনাও হয়ত হইয়াছিল।

সেই ধারণার অর্থ এই যে, হুকুমতের অধীনে চাকুরী না করার যে দৃঢ় সিদ্ধান্ত ইমাম সাহেব নিয়াছিলেন উহার পরিণতি যাহাই হউক না কেন—এই কথা প্রকাশ করার পর ছাত্রদের মধ্যে যাহারা কাযীউল কুযাত হওয়ার যোগ্যতা অর্জন করিয়াছিলেন যদি ইমাম সাহেব তাহাদিগকে এইভাবে তৈয়ার করিয়া থাকেন যে, হুকুমত যখন এই পদের মনজুরী দিয়াছেন এবং বিচার বিভাগীয় সমস্ত ক্ষমতা নিজেদের হাত হইতে আলিমদের হাতে দেওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন, তখন উহা আয়ত্তে আনার জন্য তোমাদের তৈয়ার থাকা দরকার; যে শুধু কাযী হওয়ার উপযুক্ত তাহাকে সেই জন্যই তৈয়ার থাকিতে হইবে। যদি এই সমস্ত কথা ইমাম সাহেব ছাত্রদের সমাবেশে বলিয়া থাকেন এবং প্রত্যেকের যিম্মাদারী সম্বন্ধে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করিয়া থাকেন তবে তখন তিনি যে ভাষণ দিয়াছিলেন উহার শব্দগুলির প্রতি লক্ষ্য করিলে জানা

একথাই বলিবে যে, এমন কিছু অবশ্যই সংঘটিত হইয়াছিল। মু'জিমের গ্রন্থকার বলেন—'ইমাম সাহেব তাঁহার ভাষণের শেষে বলিয়াছিলেন—লক্ষ্যস্থলে পেঁাছার জন্য লোক আমাকে পুল বানাইয়া লইয়াছে। তাহাদের তো শাস্তির উপর শাস্তি, আর যত বোঝা তা আমার উপর।

আল্লাহ্ জানেন একথার যথার্থ তাৎপর্য কি? কিন্তু ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে যদি এই তাৎপর্য লওয়া হয় যে—এই সমস্ত বড় বড় চাকুরী পাওয়ার জন্য ইমাম সাহেব সেতু স্বরূপ ছিলেন এবং প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত যত বিপদ-আপদ তাহার উপর দিয়া গিয়াছিল,—কিন্তু চাকুরী পাওয়ার পর সেই সমস্ত ছাত্রগণই আরাম উপভোগ করিবেন তবে স্থান কাল ভেদে—মনে করা যায় না ইহা ছাড়া ইহার অন্য কোন প্রকার ব্যাখ্যা হইতে পারে।

মনে হয় এই সমস্ত কাজেই ইমাম সাহেব কিছু দিন ব্যস্ত ছিলেন। কিন্তু আবু জাফরের মনে শান্তি ছিল না। তাহার মতে তাঁহার শাস্তির প্রতিবন্ধক ইমাম সাহেববে এইভাবে মুক্ত থাকিতে দেওয়া কোন মতেই সঙ্গত নয়। তাই পুনরায় তাঁহাকে বাগদাদ পেঁাছার নোটিশ দেওয়া হইল। আমার মতে কুফা হইতে ইহাই ছিল ইমাম সাহেবের শেষ যাত্রা যাহার পর তিনি আর কুফাবাসীদের মুখ দেখার সুযোগ পান নাই। কিভাবে ডাকা হইল? কেন ডাকা হইল? এবং কত দিন পর ডাকা হইয়াছিল?—এমন অনেক প্রশ্ন আছে। কিন্তু উহার উত্তর বিক্ষিপ্ত ভাবে ছড়ানো রহিয়াছে—উহা হইতেই যতটা অনুমান করা যাইতে পারে।

ইমামের উল্লিখিত ঐতিহাসিক ভাষণ যাহা তিনি সম্ভবত ছাত্রদের সবচেয়ে বড় সমাবেশে দান করিয়াছিলেন, যদিও উহার যথার্থ সময় নির্ধারণ করা কঠিন। কিন্তু আমরা দেখিতে পাই যে, পরবর্তী লোকেরাও এই ভাষণের গুরুত্ব বেশ ভালভাবেই উপলব্ধি করিয়াছেন। উহার একটি প্রমাণ এই যে—এই সভায় ইমাম সাহেবের যে চল্লিশজন বিশিষ্ট ছাত্র ছিলেন, যেমন দাউদ তাঈ, আফিয়া উদী, কাসিম ইবনে হাসান মাসুউদী, হাফস ইবনে গিয়াস নাখঈ, ওয়াকী ইবন জারাহ, মালিক ইবন মাগুন, জাফর ইবন হুযায়ল প্রমুখ হযরতের কথা হানাফী যে সমস্ত কিতাবেই বর্ণনা করা হইয়াছে সেখানেই তাহাদের প্রথম পরিচিতি দেওয়া আছে যে ইহারা ইমাম সাহেবের সেই ঐতিহাসিক ভাষণ দানের সময় উপস্থিত ছিলেন। ইহাদের লক্ষ্য করিয়াই ইমাম সাহেব বলিয়াছিলেন—"তোমরা আমার অন্তরের শান্তি, তোমাদের দ্বারাই আমার চিন্তা দূর হয়।"

তবকাত ও অন্যান্য কিতাব খুলিয়া দেখুন যেখানে তাহাদের বর্ণনা আছে সেখানে প্রথমেই লেখা রহিয়াছে—ইহারা এমন ব্যক্তি তাহাদের সম্বন্ধে ইমাম আবু হানীফা (রঃ) বলিয়াছেন—তোমরা আমার অন্তরের শক্তি, তোমাদের দ্বারাই আমার চিন্তা দূর হয়। ইহা কোন সাধারণ বক্তৃতা এবং সাধারণ ঘটনা ছিল না। এই সভায় গুরুত্বের ভিত্তির উপর খেয়াল হয় যে, ইমাম ও মনসুরের মধ্যে তো তিক্ততা ছিলই এমন কি অসম্ভব নয় যে কেহ হয়ত মনসুরকে সংবাদ দিয়াছিল—ইমাম সাহেব তাহার ছাত্রদিগকে একত্রিত করিয়া তাহাদের সাথে আলাপ আলোচনা ও যুক্তি-পরামর্শ করিতেছেন। মনসুর সংবাদ শুনিয়াই হয়ত মনে করিয়াছিল যতশীঘ্র তাহাকে কুফা হইতে বাগদাদ লইয়া আসা উচিত। এমনিই তো কয়েকবার তাহাকে আহ্বান করিয়াছিলেন। কিন্তু একবার কুফার শাসনকর্তা ঈসা ইবন মুসাকে নির্দেশ দিলেন—"আবু হানিফাকে সত্বর আমার নিকট পাঠাও।"

কোন কোন বর্ণনায় দেখা যায় ডাকবাহী ঘোড়ায় তাঁহাকে পাঠানোর ব্যবস্থা করা হইল। ঘোড়ায় আরোহণ করিয়া তিনি শাসনকর্তার সাথে দেখা করিতে যান এবং সেখান হইতে আর তাহাকে বাড়ী ফিরিয়া যাইতে দেওয়া হয় নাই—বাগদাদ রওনা করিয়া দেওয়া হইয়াছিল। মুহাম্মদ ইবন উছমান বলেন—"আমি সংবাদ শুনিয়া ইমাম সাহেবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে গেলাম, দেখিলাম তিনি ঘোড়ায় আরোহণ করিয়া শাসনকর্তার সহিত সাক্ষাত করিতে যাইতেছেন।"

এই অবস্থাতেই ইমাম সাহেব বাগদাদ রওয়ানা হইয়া গেলেন। পনের দিন পর সংবাদ আসিল—ইমাম সাহেব আর ইহজগতে নাই (ইন্নালিল্লাহে ওয়া ইন্না ইল্যায়হে রাজেউন)। এই ব্যাপারে যতসব আংশিক বর্ণনা আছে আমার মতে উহা এই শেষ যাত্রা সম্পর্কেই। কেহ কেহ বলেন—"শেষ বারের মত ইমাম সাহেব যখন বাগদাদ রওয়ানা হন তখন তাহাকে বেশ উদাস দেখাইতেছিল।" আবার কেহ কেহ বলেন—"তাহার মুখমন্ডল কালো হইয়া গিয়াছিল।"

ইহা ছাড়া আরও এমন সব বর্ণনা আছে যাহা ইমাম সাহেবের দুর্বলতার প্রতিই ইঙ্গিত করা হইয়াছে। অথচ ইহা তাহার চরিত্র ও কার্যাবলীর বিপরীত বর্ণনা। মানবসুলভ চরিত্র হিসাবে ইহা মানিয়া লওয়া হইলেও—তখনই ইহা বিশ্বাসযোগ্য হইবে যখন একথা মানিয়া লওয়া হয় যে মনসুর ইমাম সাহেবের সাথে যে ব্যবহার করিয়াছিলেন ইহা যদি তিনি বাগদাদ পেঁাছার আগে কুফা থাকিতেই জানিতে পারিয়া থাকেন। কিন্তু ইহা প্রমাণ করা দুঃসাধ্য। কমপক্ষে আমি এখনও

এমন কিছু পাই নাই—যাহা দ্বারা একথা প্রমাণিত হইতে পারে। তবে একথা সত্য যে আবু জাফরের পক্ষ হইতে এমন কিছু হওয়ার আশঙ্কা এমাম সাহেবের মনে ছিল। আর তিনি এরূপ আশঙ্কা আছে জানিয়াও ইবরাহীমের সথে যোগ দিয়াছিলেন; সৈন্যদের মধ্যেও ভাঙন ধরাইয়া দিয়াছিলেন।

ইমাম সাহেব জানিতেন হাসান ইবন ফাহতাবাহ্ হঠাৎ সৈন্য-বাহিনী হইতে পৃথক হইয়া গেলেন—একথা গোপন থাকিবে না যে, হাসানকে সরাইয়া লওয়ার ব্যাপারে কোন্ কোন্ লোকের হাত ছিল। ইহার পরিণতি যে কি হইবে ইমাম সাহেব ব্যতীত উহার সঠিক পরিমাণ আর কে অনুভব করিতে পারিত ? ইহা তো ঐ সময়কার ঘটনা যখন ইবরাহীমের বিপ্লবের পর খলীফার সহিত তাহার সাক্ষাত হয় নাই। কিন্তু সাক্ষাতের পর মনসুর ইমাম সাহেবের সঙ্গে যে ব্যবহার করিয়াছিলেন তাহা পূর্বে বর্ণিত হইয়াছে। ইহার পরও কি ভয়ের কোন কারণ বিদ্যমান ছিল! ইহার পর তো মনসুর তাহাকে হুকুমতের কাজে অংশীদার করার জন্য সম্পূর্ণ শক্তি নিয়োগ করিয়া-ছিলেন। সুতরাং ভয়ের তো কোন কারণই ছিল না। কথা তো ছিল এই শেষ প্রস্তাব যখন আমি গ্রহণ করিতে অস্বীকার করিব তখন মন-সুর কোন পন্থা অবলম্বন করিবে ? এই সময়টা ছিল সন্দেহ পোষণ করিবারই অবস্থা।

অনেক ঘটনা ও প্রমাণে ইমাম সাহেবের স্বভাবের পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। তাই এক অনির্দিষ্ট পরিণতির কথা চিন্তা করিয়া বাগদাদ রওয়ানা হওয়ার সময় তাঁহার মুখমন্ডল ভয়ে রক্তশূন্য হইয়া গিয়াছিল অথবা মুখ কালো বর্ণ ধারণ করিয়াছিল, এরূপ হওয়ার কোন উপযুক্ত কারণই তো পাওয়া যায় না। এই ধারণাপ্রসূত কারণ ছাড়াও ইবন সাদ্দি তাহার উস্তাদ ওয়াকিদী হইতে বর্ণিত বর্ণনা যাহা তিনি ইমাম সাহেবের বাগদাদ রওয়ানা হওয়ার সময় উপস্থিত থাকিয়া দর্শন করিয়াছিলেন—আমার মতে উহাই গ্রহণযোগ্য এবং অন্যান্য বর্ণনা মিথ্যা প্রতিপন্ন করার জন্য যথেষ্ট। ওয়াকিদী[১] বলেন, "যেদিন ইমাম

১। বেচারা ওয়াকিদী এই যুগে বেশ বদনাম কুড়াইয়াছেন। ঐতিহাসিক কোন ঘটনায়কে মিথ্যা প্রতিপন্ন করিতে হইলে ওয়াকিদীর নাম করাই যথেষ্ট, ইহা মারাত্মক ভুল। মুসলমানদের মধ্যে জিহাদী উদ্দীপনা বজায় রাখার ব্যাপারে এক হাযার বৎসর যাবত ওয়াকিদীর গ্রন্থসমূহ বিরাট কাজ করিয়া আসিতেছে। পাক-ভারতের মুসলিমদের

সাহেব ইনতিকাল করেন আমি সেদিন কূফায়ই ছিলাম। আমরা তাঁহার প্রত্যাবর্তনের অপেক্ষায় ছিলাম। হঠাৎ সংবাদ আসিল তিনি মৃত্যুবরণ করিয়াছেন।"

এই বর্ণনা মতে মনে হয় ইমাম সাহেবের মৃত্যুর সময় ওয়াকেদী কূফায় ছিলেন। কূফা হইতে যাওয়ার দশ পনের দিন পরই ইমাম সাহেব ইনতিকাল করেন। সুতরাং মনে করিতে হইবে রাওয়ানা হওয়ার সময়ও তিনি কূফায় ছিলেন। অতঃপর ওয়াকিদী বলিয়াছেন —"আমরা ইমাম সাহেবের প্রত্যাবর্তনের অপেক্ষায় ছিলাম, এমন সময় তাহার মৃত্যু সংবাদ আসিল।" ইহাতে মনে হয় মনসূরের শেষ আহবানের সময় ইমাম সম্বন্ধে কোন প্রকার আশংকার আভাষ পাওয়া যাইতেছিল না। বরং সকলেরই ধারণা ছিল তিনি নিরাপদে ফিরিয়া আসিবেন। এই ধারণার বিপরীত মৃত্যু সংবাদ কূফায় আসিয়া পৌঁছিল। যদি তিনি আশংকাজনিত অবস্থায় বাগদাদ রওয়ানা হইতেন তবে ওয়াকিদী কখনও একথা বলিতেন না, "আমরা তাঁহার ফিরিয়া আসার অপেক্ষায় ছিলাম।"

সে যাহাই হউক এই গ্রন্থকারের মতে ইমাম সাহেবের ভয়-ভাবনা সম্পর্কিত বর্ণনা এমন মিথ্যা যেমন মিথ্যা তাহাকে বেত্রাঘাত করার পর বাজারে ঘুরানো বা লোক ডাকিয়া তাহাদের সম্মুখে ইমামকে বেত্রাঘাত করার বর্ণনা।

আল্লাহ জানেন কেন লোকে এই সমস্ত ঘটনা বর্ণনার সময় সত্য পরিত্যাগ করিয়া মিথ্যার আশ্রয় লইয়া থাকে। বিশেষভাবে ইমাম সাহেবের এই সমস্ত ঘটনা বর্ণনা প্রসঙ্গে লোকে আর বেশী মিথ্যার আশ্রয় লইয়াছে। এই সমস্ত বিষয় বিশদভাবে আলোচনা করিয়া অনেকে তাহাদের অতিশয়োক্তিকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করিয়াছেন। আমিও ইহাকে অতিশয়োক্তি মনে করিয়া থাকি। সামান্য একটু আলোচনাই তাহাদের মুখোশ খুলিয়া দিয়াছে।

মধ্যে যে জিহাদী প্রেরণা পাওয়া যায় উহার মূলেও ওয়াকিদীর গ্রন্থের উর্দু অনুবাদ। তবে সুখের বিষয় যে, মানুষের এই ভুল ধরা পড়িয়াছে। প্রকৃতপক্ষে ওয়াকিদী মোটেই তত অবিশ্বাসী নন লোকে যতটা ধারণা করিয়া থাকে। তাহার বর্ণনা অন্যান্যদের বর্ণনার চেয়ে কোন অংশেই কম মূল্যবান নহে। আসমাউল রিজালে তাঁহার সম্বন্ধে যাহা কিছু লিখিত আছে উহা শরীয়ত সম্বন্ধে প্রযোজ্য হইতে পারে। কিন্তু ঐতিহাসিক হিসাবে পৃথিবীর কোন ঐতিহাসিকের চেয়েই তাঁহার মর্যাদা কম নহে।

যাহা হউক, ইমাম সাহেব কূফা হইতে রওয়ানা হওয়ার সময় যতদূর ধারণাপ্রসূত দলীলে এবং সাক্ষ্য-প্রমাণ দ্বারা আগত হওয়া গেল উহাতে দেখা যায় পরবর্তীকালে মনসূর তাহার সহিত যে নির্দয় ব্যবহার করিয়াছিল—উহার আশংকা তাঁহার মনে ছিল না। এখন কথা হইল ইমাম সাহেব এইবার কিরূপ মনোভাব লইয়া বাগদাদ যাইতেছিলেন? অর্থাৎ হুকুমত যত বড় সুযোগ-সুবিধাই দিউক না কেন তিনি কোন মতেই চাকুরী গ্রহণ করিবেন না। তবে কি তিনি নিজের পরিবর্তে কোন ছাত্রের নাম পেশ করিতে ইচ্ছুক ছিলেন যাহাদিগকে তিনি উপরোক্ত ভাষণে বিশেষভাবে চিহ্নিত করিয়াছিলেন! অথবা একথাও বলা যাইতে পারে ইমাম সাহেবের মৃত্যুর পর যেরূপ ঘটিয়াছিল অর্থাৎ তাহারই ছাত্র কাযী আবূ ইউসুফ 'আব্বাসী হুকুমতের প্রথম 'কাযীউল কুযাত' নিযুক্ত হইলেন এবং অল্পদিনের মধ্যে সমস্ত 'আব্বাসী হুকুমতের প্রায় প্রত্যেকটি আদালতই যে হানাফী বিচারক দ্বারা পরিপূর্ণ হইয়াছিল প্রমাণশ্বরূপ একথাই তিনি উল্লেখ করিতে চাহিয়াছিলেন। এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার মত কোন প্রমাণ আমি পাই নাই।

সত্য বলিতে কি এমন কোন পরামর্শ দিলে হুকুমতই বা উহা মানিত কেন? আসল উদ্দেশ্য কাযী এবং আদালতের পরিবর্তন সাধন করা নয়। বরং মনসূরের উদ্দেশ্য ছিল এমন ব্যক্তিকে জালে আবদ্ধ করা যাহাকে এক মুহূর্তের জন্যও বাহিরে রাখা আব্বাসী হুকুমতের পক্ষে ভয়ানক চিন্তার কারণ ছিল। ছাত্রদিগকে কাযীর পদে বহাল করিলে সে উদ্দেশ্য কিভাবে সাধন হইত? আমি তো মনে করি যে, এই প্রস্তাব পেশ করায় যদি ইমাম সাহেব এই ধারণা করিয়া থাকেন যে, বর্তমান অবস্থা যে উদ্দেশ্য সাধন করাকে সম্ভবপর করিয়া তুলিয়াছে- না জানি উহা অসম্ভব হইয়া দাঁড়ায় কি না। ইমাম সাহেবের সুদূরপ্রসারী জ্ঞান অবশ্য ইহা চিন্তা করিয়া রাখিয়াছিল। যাক যাহার স্বপক্ষে বা বিপক্ষে কোন প্রমাণ নাই—উহা লইয়া মাথা ঘামানো বৃথা। এখন শুনুন বাগদাদ পৌঁছার পর ইমাম সাহেবের সম্মুখে কি অবস্থা পেশ হইয়াছিল।

বাগদাদ পৌঁছার পর ইমাম সাহেব খলীফার দরবারে পৌঁছিলেন। অন্যান্যবারের ন্যায় এবারও খলীফা প্রশ্ন করিলেন—যে কাজের জন্য হুকুমত আপনাকে নিয়োগ করিতে চায় সে সম্বন্ধে আপনি কি ফয়সালা করিয়াছেন। ঐতিহাসিকগণ বলেন,—ইমাম সাহেব বিভিন্ন প্রকার ওযর-আপত্তি পেশ করিতে থাকেন এবং চাকুরী গ্রহণ করিতে অস্বীকার

করেন। ইমাম সাহেবের উত্তর সম্পর্কে বিভিন্ন ঐতিহাসিক বিভিন্ন কথা লিখিয়াছে। (আমার বিশ্বাস আমি সব উত্তর সুশৃংখলভাবে লিপিবদ্ধ করিয়াছি) এই উত্তর সম্পর্কে কেহ কেহ ইহাও লিখিয়াছেন, যে ইমাম সাহেব একবার একথাও বলিয়াছেন—'আমি এ কাজের উপযুক্ত নই।' লোকে যেমনভাবে লিখিয়াছেন—ইহাতে মনে হয় উহা খুবই মামুলী কথা ছিল যাহা তিনি অন্যান্য কথার সাথে অতি সহজভাবে প্রকাশ করিয়াছিলেন।

কিন্তু একটু গভীরভাবে চিন্তা করিলে দেখা যাইবে যে, যে কথাকে তাহারা গুরুত্বহীনভাবে বর্ণনা করিয়াছেন—প্রকৃত ঘটনায় উহা মোটেই গুরুত্বহীন ছিল না। চিন্তার বিষয় একথা কে বলিতেছেন? ইসলামী আইনের প্রবর্তক ইমাম আজম বলিতেছেন এবং কি বলিতেছেন? সম্পূর্ণ যিম্মাদারীর সাথে তখনকার খলীফার সম্মুখে যেন দাবীস্বরূপ এক প্রকৃত ঘটনা বর্ণনা করিতেছেন। আবুল হাসান মারগিয়ানানীর মধ্যস্থতায় মুফিক লিখিয়াছেন, খলীফার দরবার হইতে বাহির হইয়া আসার পর তাহার সাথী 'আলী-হামীরী যিনি কুফা হইতে বাগদাদ আসিয়াছিলেন-তাহাকে বলিলেন—اصلح لا انى اعلمه।

'মনসুরকে জানাইয়া দিয়াছি যে আমি কাজের উপযুক্ত নই।'

অন্য এক বর্ণনায় দেখা যায় উভয়ের মধ্যেই তর্ক-বিতর্ক ও কথার কাটাকাটি হইতে ছিল এবং ইমাম সাহেব বলিতেছিলেন—

اصلح لا—আমি উপযুক্ত নই!

আবার মনসুর বলিতেছিলেন—

بل انت اصلح 'অবশ্যই আপনি উপযুক্ত।

আসল প্রশ্নোত্তরের এই ব্যাপারে ইমাম সাহেব ইহার আগে যত বলিয়াছিলেন—উহা এমনই ছিল যে, আবু জাফরের কথা শুনার পর যে অবস্থায়ই তাহার হউক না কেন কিন্তু ভিতর হইতে তাহার অন্তর দুর্বলতাকে জ্ঞাত অবস্থায়ই হউক আর অজ্ঞাত অবস্থায়ই হউক যে দিক ইমাম সাহেব ইঙ্গিত করিতেছিলেন—উহা জানিতে পারিয়াছিল। কিন্তু এইবার ইমাম সাহেবকে যে উত্তর দেওয়া হইয়াছিল আবু জাফরই বা কেন, সে স্থলে যদি আমি হইতাম বা আপনি হইতেন অথবা অন্য কেহ হইলেও বুকে হাত রাখিয়া ইনসাফ করা উচিত যে, মানুষের উপর উক্ত জওয়াবের প্রতিক্রিয়া কি হইতে পারে?

নিজের জ্ঞান ও গুণ নিজের আইন ও ফিকাহ সম্পর্কীয় বিচক্ষণতাকে নিজেই পরোক্ষ ও প্রত্যক্ষভাবে মনসুরের কান পর্যন্ত পৌঁছাইয়া দিলেন—এই জ্ঞানলব্ধ শক্তি অর্জন করিয়া মনসুর যদি শাহী ক্ষমতা প্রয়োগ করার সনদ নিজের হাতে লইতেন তবে বিস্ময়ের কিছুই ছিল না। আর এখানেই যদি কথার পরিসমাপ্তি ঘটিত তবে ঘটনা আর সম্মুখে অগ্রসর হইতে পারিত না। কিন্তু নিজের সন্দেহাতীত জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার উপর নির্ভর করত ইমাম সাহেবের এই উত্তর শুনিয়া মনসুর পরিষ্কার ভাষায় বলিলেন—

كذبت انت تصلح -

'আপনি মিথ্যা বলিতেছেন, নিঃসন্দেহে আপনি কাযী হওয়ার উপযুক্ত।' কিন্তু ইমাম সাহেব চুপ করিয়া রহিলেন না। মনসুরের দোষারোপ করার সাথে সাথেই তিনি উপস্থিত বুদ্ধিতে বলিয়া ফেলিলেন —'এই দেখুন! আপনিই আপনার বিরুদ্ধে ফয়সালা করিয়া ফেলিলেন। যে ব্যক্তি মিথ্যাবাদী তাহাকে কাযী বানানো কি আপনার পক্ষে উচিত।"

অন্য রওয়ায়েত মতে ইমাম সাহেব বলিয়াছিলেন,—

'আপনি যখন জানেন আমি কাযী হওয়ার উপযুক্ত আর আমি বলিতেছি যে আমি অনুপযুক্ত—ইহার অর্থ এই যে আপনার সম্মুখে আমি মিথ্যা বলিতেছি। এই অবস্থায় আমাকে কাযী নিয়োগ করা কিভাবে বৈধ হইতে পারে?'—কথা যেমনই হউক সার বস্তুতে কোন পার্থক্য ছিল না।

আবু জাফরের শপথ

আবু জাফর ইমাম সাহেবের প্রারম্ভিক উত্তরেই চটিয়াছিলেন। এই সমস্ত উত্তরের মধ্যে মনসুরের মানসিক অবমাননাও ছিল। ইহাতে তিনি আরও অগ্নিশর্মা হইয়া গিয়াছিলেন। আমি বলিয়াছি যে ইমাম সাহেবের প্রথম উত্তরের পরই শাহী ক্ষমতা প্রয়োগ করার সনদ মনসুরের অন্তর মনসুরকে দিয়া দিয়াছিল। তর্ক-বিতর্ক যখন তাহাকে সহ্যের সীমা অতিক্রম করিয়া দিয়াছিল তখন তিনি শপথ করিয়া বসিলেন। বসীর ইবন ওয়ালীদ আলকানদী হইতে খতীব 'তারীখে বাগদাদে' লিখিয়াছেন—

لحلف المنصور ليقتلن -

মনসুর শপথ করিয়া বলিলেন,—তোমাকে কাযীর পদ গ্রহণ করিতেই হইবে।'

ইমামের পালটা শপথ

একদিকে আব্বাসী হুকুমতের একচ্ছত্র অধিপতি শপথ করিলেন অন্য দিকে সেই দরবারে দাঁড়াইয়া খলীফার শপথের উত্তরে ইমাম আবু হানীফাও শপথ করিলেন—'আল্লাহ্‌র কসম! আমিও গ্রহণ করিব না। ঐতিহাসিকগণ বর্ণনা করিয়াছেন যে, আবু জাফর মনসুর ইমাম সাহেবকে বেত্রাঘাত করিয়াছিলেন। সেই বর্ণনাকে চমকপ্রদ করার জন্য বেশ রং লাগানো হইয়াছিল। কিন্তু বেত্রাঘাত যে করিয়াছিল উহাতে কোন সন্দেহ নাই। আমার মনে হয় এই প্রশ্নোত্তরের সময়ই মনসুরের ক্রোধ বাড়িতে থাকে এবং জ্ঞাতসারেই যে ইমাম সাহেব বাহানা করিতেছেন এবং নিজের সিদ্ধান্তই যে ঠিক মনে করিতেছেন একথা বুঝিতে পারেন। তারপর ইমাম সাহেব যে মনসুরকেই দোষারোপ করিতেছিলেন উহাতেও তাহার মনের অবস্থা খারাপ হইয়া গিয়াছিল। তদুপরি খলীফার শপথের সাথে সাথে ইমাম সাহেবের পাল্টা শপথ করায় খলীফার দেহরক্ষী আর সহ্য করিতে না পারিয়া বলিল,—তোমার এত বড় দুঃসাহস খলীফার শপথে প্রত্যুত্তরে তুমিও শপথ করিতেছ?'

ইহার পরও ইমাম সাহেব দেহরক্ষীর দিকে বক্র দৃষ্টিতে তাকাইয়া বলিলেন—'আমীরুল মু'মিনীন শপথের কাফফারা দেওয়ায় আমার চেয়ে অধিক ক্ষমতাবান।'

অর্থাৎ শপথ তো আমরা উভয়েই করিয়াছি। আমি আমার শপথ কেন ভঙ্গ করিব? খলীফা কেন ভঙ্গ করেন না! তিনি তো সম্পদশালী! তিনি শপথ ভাঙার কাফফারা দিতে পারিবেন। এই অবস্থায় আশ্চর্য নয়নে ক্রোধান্ধ হইয়া পরিণতি কি হইবে চিন্তা না করিয়া মনসুরের মুখ হইতে চাবুকাঘাতের কথা বাহির হইয়া গিয়াছিল।

আমি যেমন পূর্বে বলিয়াছি যে বেত্রাঘাত করার বর্ণনা সংখ্যায় অগণিত। কিন্তু উহার অধিকাংশই গ্রহণযোগ্য নয়। আমার মতে উহাদের জন্য মধ্যে প্রত্যক্ষাদর্শী আবদুল আযীযের বর্ণনাই গ্রহণযোগ্য তিনি প্রশ্নের উত্তরে বলিয়াছিলেন,—'সামনা-সামনি দেখার মত সুযোগ আমার ছিল না, কারণ খলীফার প্রাসাদের মধ্যে এই ঘটনা সংঘটিত হইয়াছিল যেখানে আমাদের মত সাধারণ লোকদের প্রবেশাধিকার ছিল না। অবশ্য সেখান হইতে বাহিরে আসার সময় ইমাম সাহেবকে

শুধু পায়জামা পরিহিত অবস্থায় খালি গায়ে এবং গা' বাহিয়া রক্ত প্রবাহিত হইতে দেখিয়াছিলাম।' যাহা হউক এই সম্পর্কীয় সমালোচনা পূর্বেই করিয়াছি।

বেত্রাঘাত সম্পর্কে সঠিক বর্ণনা

আমার শুধু বক্তব্য এই যে, 'আবদুল 'আযীযের বর্ণনাই অধিক শুদ্ধ। তিনি নিজে দেখিয়াছিলেন না বরং সে পথে উপস্থিত থাকিয়া নির্ভরযোগ্য লোকের নিকট শুনিয়াছিলেন। তিনি চাবুকের আঘাতের সংখ্যা ত্রিশ বর্ণনা করিয়াছেন। এই সংখ্যা বলিতে গিয়া মনসুর যে হঠাৎ ক্রোধান্ধ হইয়া গিয়াছিলেন তৎসম্পর্কে বলিয়াছেন,—

'ইমাম সাহেব যখন পাল্টাভাবে মনসুরকে দোষী সাব্যস্ত করিলেন যে আমাকে মিথ্যাবাদী প্রতিপন্ন করিয়া আপনিই ফয়সালা করিয়া দিলেন যে আমি কাযী হওয়ার উপযুক্ত নই, ইহাতে আবু জাফর ক্রোধান্ধ হইয়া বলিয়াছিলেন,—

ان يغير الكلام بانى كذا -

'এ ব্যক্তি কথা বদলায় এবং বলে যে আমিই ফয়সালা করিয়াছি যে আমিই দোষী।'

অতঃপর আযীয বলিয়াছেন—আবু জাফর ইমাম সাহেবকে যা'তা বলিতে লাগিলেন এবং চাবুক আনাইয়া ত্রিশটি চাবুকাঘাত করিলেন।'

আবদুল আযীযের এই বর্ণনাকে যদি বিনা কারণে এদিক সেদিক না করা হয় তবে উহার প্রকৃত অর্থ এই দাঁড়ায় যে—আবু জাফর অন্য লোক দ্বারা ইমাম সাহেবকে বেত্রাঘাত করান নাই—বরং ক্রোধান্ধ হইয়া নিজেই কয়েক বেত্রাঘাত করিয়াছিলেন। ইমাম সাহেবের মত এমন মহান লোক, তাও আবার তিনি হুজুরের উপরে পা রাখিয়াছেন, তাঁহার সাথে এমন ব্যবহার করা বাস্তবিকই নির্দয়তার কাজ। এ সম্বন্ধে আবু জাফরের অবশ্য দোষারোপ করা যায়। কিন্তু আমার মতে ইহাই ছিল বেত্রাঘাতের যথার্থ কাহিনী।

লোকে ইবন হুবায়রার ঘটনার উপর আবু জাফরের এই ঘটনাকে অনুমান করিয়া লইয়াছে। অথচ তখন ইমাম সাহেব কূফায় একজন সম্পদশালী ব্যবসায়ী ব্যতীত আর কিছুই ছিলেন না। কিন্তু খলীফা আবু জাফরের সময় তাহারই চাচা 'আবদুস সালামের মতে তিনি ছিলেন ইরাক ও পূর্ব দেশীয় লোকদের ফকীহ—ইমাম

যাহা হউক এই ঘটনা বর্ণনা করা হইয়াছে। উহা আল্লাহ্‌র হাতে ছাড়িয়া দিন। কিন্তু এখনও দুইটি প্রশ্ন বাকী রহিয়া গিয়াছে। 'অবস্থা যখন বেত্রাঘাতের পর্যায়ে পৌঁছিল অতঃপর কি হইল ? তাহার চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন হইল—ইমাম সাহেবের একথার অর্থ কি যে, আমি বিচারক বা কাযী হওয়ার উপযুক্ত নই।' তিনি মিথ্যার আশ্রয় লইয়া কার্যোদ্ধার করিবেন—ইহা হইতে তিনি অবশ্য পবিত্র ছিলেন। বিশেষ করিয়া ইমাম সাহেবের মত জ্ঞানবান ব্যক্তি অবশ্যই একথা জানিতেন যে, মনসুর কেন—একজন অতি সাধারণ লোকও একথা বিশ্বাস করিবে না যে ইমাম সাহেব কাযী হওয়ার যোগ্য নহেন।

এই সমস্ত বিক্ষিপ্ত বর্ণনা দ্বারা এই প্রশ্নদ্বয়ের যে উত্তর আমার উপলব্ধিতে আসে—উহাই পেশ করিতেছি।

শুধু বেত্রাঘাত করিবার পর এতটা তো প্রথমেই অবগত হওয়া গিয়াছে যে শাহী প্রাসাদ হইতে বাহির করিয়া আনার পর খলীফার চাচা 'আবদুস সামাদ খলীফাকে ধমকান এবং ইহার পর ইমাম সাহেবকে কাপড় পরিধান করাইয়া বাড়ী পাঠাইয়া দেন। চাচার ধর্মকে খলীফা নিজের ভুলও বুঝিতে পারিয়াছিলেন। তাই তিনি প্রত্যেকটি বেত্রাঘাতের পরিবর্তে হাযার দিরহাম জরিমানা দেওয়ার জন্য প্রস্তুত হইয়াছিলেন। আবদুল আযীযের বর্ণনায়ই অবগত হওয়া যায় যে আবু জাফরের আদেশে ত্রিশ হাযার দিরহামের তোড়া ইমাম সাহেবের সম্মুখে উপস্থিত করা হইয়াছিল। কি ইমাম সাহেব পয়সা দিয়া কি করিবেন। আবু জাফর ইমাম সাহেবকে হয়ত নিজের সাথেই তুলনা করিয়াছিলেন এবং সেই বিশ্বাসেই তিনি ধারণা করিয়াছিলেন যে এই বেত্রাঘাতে সাধারণ মুসলমানদের উপর যে প্রতিক্রিয়া হইতে পারে টাকা দিয়াই হয়তো উহা বন্ধ করা যাইবে।

কিন্তু ইমাম সাহেবও যদি মনসুরের ন্যায় হইতেন এবং তাহার অর্থ গ্রহণ করিতেন তবে এই বেত্রাঘাত ইমাম সাহেবকে তাহার লক্ষ্যস্থলে পৌঁছিতে যে সাহায্য করিয়াছিল—উহা কখনও হইত না।[১] বরং এই পথে

১। এই সম্পর্কিত একটি ঘটনা আমি নিজে দেখিয়াছি। একবার বিহারে হিন্দু-মুসলমানে লড়াই বাধে। ঘটনাক্রমে এই শহরেরই একজন মুসলিম সেশন জজের ছেলে হিন্দুদের হাতে মার খায়। কোর্টে মামলা দায়ের করা হইলে হিন্দুদের অবস্থা কাহিল হইয়া পড়ে। বিপদে পড়িয়া একদিন সকল হিন্দু মিলিয়া জজ সাহেবের বাংলায় উপস্থিত হইয়া ওযর আপত্তি পেশ করিয়া ক্ষমা চাহিল।

তিনি জীবনে যত কষ্ট সহ্য করিয়াছিলেন উহা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হইত। আমার মনে হয় এই ঘটনার পরই ইমাম সাহেবকে নজরবন্দী করিয়া রাখা হইয়াছিল।

ইমাম সাহেবকে মুফতি করার প্রস্তাব

আহমদ ইবন বুদায়ল বলেন, চাবুকের শাস্তি দেওয়ার পর মনসুর ইমাম সাহেবকে বলিলেন,—

তোমাদের নির্দেশ দেওয়া হইতেছে যে কুফার কাযীর পদ গ্রহণ না কর তো না কর, কিন্তু এখন হইতে রাজধানীর সিংহদ্বারে বসবাস কর এবং তোমার নিকট যে ফতওয়া পাঠানো হবে উহার উত্তর দিও।" আরও বর্ণিত আছে—"ইমাম সাহেবের পক্ষে জামিন গ্রহণ করা হইল।"

মনে হয় দরবারীদের মধ্যে ইমাম সাহেবের প্রতি যাহাদের সহানুভূতি ছিল যেমন খলীফার চাচা আবদুস সামাদ এবং যাহারা ইমাম সাহেবের জন্য সুপারিশ করিয়াছিলেন তাহাদিগকে ডাকিয়া বলিলেন —"আমি তাহাকে রাজধানীর সিংহদ্বারে থাকার নির্দেশ দিতেছি এবং এখান হইতে যেন কোথাও পালাইয়া না যায় তজ্জন্য তোমাদের জামিন হইতে হইবে।" মনে হয় তাহারা জামিন হইয়াছিল। কিন্তু তাহাকে সেখানে থাকার ব্যবস্থা করিয়া দেওয়া হইল। উহার পর আবু জাফর তাঁহার নিকট মাসআলা জিজ্ঞাসা করিয়া পাঠাইল। ইমাম সাহেব উহার উত্তর না দিয়া চুপ করিয়া থাকেন।

কারাগারে

অতঃপর মনসুর ইমাম সাহেবকে কয়েদ করার নির্দেশ দিলেন। মনসুর আরও নির্দেশ বিলেন, "তাহার সংগে যেন কঠিন ব্যবহার করা হয়।"

কৃপণ জজ সাহেব বলিলেন—"আমার ছেলেকে বিলাতে পড়ার খরচ যাহা লাগে উহা যদি একসাথে আমাকে দিতে পার তবে মামলা উঠাইয়া লওয়া হইবে।" হিন্দুরা অগত্যা মোটা টাকা খেসারত দিয়া সেই বিপদ হইতে রক্ষা পাইল। জজ সাহেবের ছেলে সেই টাকা দিয়া বিলাতের পড়া সারিল। কিন্তু ইহার পর হইতে কোন মুসলমানই জজ সাহেব বা তাহার ছেলেকে মানুষ বলিয়া পসন্দ করিত না। বাপ-বেটাও ভুল বুঝিতে পারিল, কিন্তু তখন আর শোধরাইবার পথ খোলা ছিল না।

আল্লাহই জানেন এই কঠোরতার প্রকার কি ছিল। কেহ বলেন পানাহারে কষ্ট দেওয়া হইত। দাউদ ইবন রাশেদ ওয়াসেতী বলেন, —"আমি তখন বাগদাদে ছিলাম। ইমাম সাহেবকে পানাহারে কষ্ট দেওয়া হইত এবং সংকীর্ণ স্থানে রাখা হইত।"

অন্তরীণ

মনে হয় ইমাম সাহেব বেশী দিন কয়েদখানায় ছিলেন না। লিখিত আছে, আমীরুল মুমেনীনের মন্ত্রী ও অন্তরঙ্গ লোকগণ ইমাম সাহেব সম্বন্ধে তাহার নিকট সুপারিশ করিয়া জেলখানা হইতে বাহিরে আনিয়া নির্দিষ্ট একটি বাড়ীতে থাকার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন।

একদিকে যেমন ইমাম সাহেব কাযীর চাকুরী গ্রহণ করিয়া তাঁহার জীবনের সমস্ত সাধনা ধ্বংস করিতে প্রস্তুত ছিলেন না, তেমনি অন্য দিকে আবু জাফর মনসুরও তাঁহার হুকুমতের সর্বপ্রধান শত্রুকে স্বাধীনভাবে চলাফেরা করিতে দিতে রাযী ছিলেন না। লোকের সুপারিশ এতটাই করিলেন যে কারাগার হইতে বাহির করিয়া অন্য একস্থানে অন্তরীণ রাখিলেন।

অতঃপর ঐতিহাসিকগণ লিখিয়াছেন—"এই বাড়ীতে সরাইয়া আনার পর মনসুর নির্দেশ দিলেন—কোন ব্যক্তিকে মাসআলা জিজ্ঞাসা করার জন্য তাহার নিকট আসিতে বা তাহার নিকট কাহাকে বসিতে বা তাঁহাকে বাড়ীর বাহির হইতে দেওয়া হইবে না।"

যেন পৃথিবী হইতে ইমাম সাহেবকে এবং ইমাম সাহেব হইতে পৃথিবীকে বিচ্ছিন্ন করিয়া রাখা হইল। অন্তরীণ অবস্থায় মনসুর প্রায়ই ইমাম সাহেবের নিকট সংবাদ পাঠাইতেন—

ان اجبت لا خرجتک من الحبس و کرمتک ۔

"এখনও যদি তুমি আমার কথা মানিয়া লও তবে তোমাকে মুক্তি দেওয়া হইবে এবং সাথে সাথে মর্যাদাও দান করা হইবে।"

রুসাফার কাযীর পদ গ্রহণ

আবদুর রহমান ইবন মালিক বলেন—"এই কঠোরতা ভোগ করা সত্ত্বেও ইমাম সাহেব সরকারী কোন কাজ করিতেই রাযী হইলেন না। সাধারণ বর্ণনা মতে এই অবস্থাতেই ইমাম সাহেব ইন্তেকাল করেন।"

কিন্তু আব্বাসী যুগেরই এক বর্ণনায় দেখা যায় এই নজরবন্দী অবস্থায় মনসুরের পক্ষ হইতে যে লোক আসিত সে ইমাম সাহেবকে বুঝাইতে লাগিল যে—"আপনি কতক্ষণ আর কষ্ট সহ্য করিবেন। খলীফাও শপথ করিয়াছেন—তাহার কথা না মানিলে তিনি আপনাকে কোন মতেই রেহাই দিবেন না।"

তখন হযরত ইমাম সাহেব মনে করিয়াছিলেন—খলীফার শপথও পূর্ণ হইয়া যায় এবং চাকুরী গ্রহণ করায় তাহার যে ভয় ছিল যে তাহার সমস্ত চেষ্টার ফলে ইহাই বুঝানো যায় যে এই টানা-হেচড়া হুকুমতের বড় পদ গ্রহণ করার জন্যই ছিল—এই ভয়ের ও সন্দেহ সৃষ্টি না হয়। কথিত আছে, ইমাম সাহেবের পক্ষ হইতে প্রস্তাব করা হইল "যে রাজধানীতে নয় এবং তাইগ্রীসের অপর তীরে যে ছোট একটি জনপদের সৃষ্টি হইতেছে যাহা মেহদীর সময় সেনানিবাস পরিণত হইয়া পরবর্তী কালে রুসাফাহ।[১] নামে স্থায়ী নগরের সৃষ্টি হইয়াছিল উহার কাজীগিরি আমাকে দিলে আমি খলীফার শপথ পূর্ণ করিয়া দিতে পারি।'

প্রকাশ থাকে যে, এত বড় কঠিন ঘাত-প্রতিঘাতের পর ইমাম সাহেবের এই ছোটখাট চাকুরী গ্রহণ করাও হুকুমত বিরাট একটা কিছু মনে করিয়া লইয়াছিল। আবু জাফরকে ইমাম সাহেবের সম্মতির কথা জানানো হইল। তিনি খুবই সন্তুষ্ট হইলেন। তিনি তাহাকে সেখানকার

১। সেনানিবাস স্থাপন করার পর রুসাফাহ বাগদাদের অপর দিকে একটি স্থায়ী শহরে প্রতিষ্ঠিত হইল। ইহা হিজরী ১৫১ সনের ঘটনা যখন মেহদী খোরাসান হইতে ফিরিয়া আসেন। আর ইমাম সাহেব ইন্তিকাল করেন ১৫০ হিজরীতে। মৃত্যুর পূর্বে ইমাম সাহেব এই ছোট জনপদেরই কাযী হইয়াছিলেন। সেখানে লোকসংখ্যাও খুব কম ছিল। আর যাহা ছিল তাহাও গরীব শ্রেণীর। ইমাম সাহেব এখানকার কাযীর পদ এই জন্য গ্রহণ করিয়াছিলেন যে কাযীউল কুযাতের পদ গ্রহণ করিলে যে দায়িত্ব ও সন্দেহ ছিল এখানকার কাযীগিরিতে তাহা ছিল না। অপরপক্ষে মনসুরও এই প্রস্তাব গ্রহণ করিলেন। কারণ, ইচ্ছা করিলে তিনি এমন আরও অনেক স্থানে বহাল করিতে পারিতেন যেখানকার লোকসংখ্যা কম ছিল। কিন্তু ইমাম সাহেব যাহাতে চোখের আড়াল না হন তাই তাহাকে এখানকার কাযীর পদে বহাল করিয়াছিলেন।

কাযীই নিয়োগ করিলেন। ইমাম সাহেব নজরবন্দী হইতে মুক্তি পাইয়া তাইগ্রীসের অপর পার রুসাফায় উপস্থিত হইলেন।

ইমাম সাহেবের আদালতে মামলা

দু দিন পর্যন্ত ইমাম সাহেবের আদালতে কোন মামলাই দায়ের হইল না। তৃতীয় দিনে এক গরীব কাংস্যকার একজন লোক সঙ্গে লইয়া আসিয়া বলিল—"এক ব্যক্তির নিকট দুইটি দিরহাম আমার পাওনা আছে। আমি তাহাকে একটি তামার পাত্র বানাইয়া দিয়াছিলাম। উহারই দাম বাকী রহিয়া গিয়াছে।"

ইমাম সাহেব আসামীকে বলিলেন—'ভাই! আল্লাহকে ভয় কর। এই কাংস্যকার যাহা বলিতেছে তাহা ঠিক কিনা?'

আসামী পরিষ্কার ভাষায় বলিল—'না, সে আমার নিকট কিছুই পায় না।' অভিযোগকারীর কোন সাক্ষী ছিল না। তাই সে-ইসলামী আইন মতে আসামীকে শপথ করানোর প্রার্থনা করিলেন।। ইমাম সাহেব আসামীকে উদ্দেশ্য করিয়া বলিলেন—'আচ্ছা, তুমি বল 'যে আল্লাহ ব্যতীত কোন উপাস্য নাই, তাহার শপথ।'

আসামী এদিকে কোন প্রকার চিন্তা-ভাবনা না করিয়াই শপথের কথাগুলি উচ্চারণ করিতেছিল। ঈমানের যে সূক্ষ্ম রহস্য দ্বারা ইমাম সাহেবের অন্তর ভরপুর ছিল—আসামীর এই বাহাদুরী দেখিয়া তিনি আর ঠিক থাকিতে পারিলেন না। আসামীর কথার মধ্যে তিনি তাহাকে থামাইয়া দিলেন। পরে দেখা গেল তিনি তাহার পকেট হইতে একটি থলে টানিয়া বাহির করিয়া উহার মধ্য হইতে দুইটি দিরহাম কাংস্যকারের দিকে বাড়াইয়া দিতে দিতে বলিলেন— এই লও ভাই! তুমি যে দাবী করিতেছ আমার নিকট হইতে লও।'

এই ভাবে তিনি আসামীকে বেপরোয়াভাবে আল্লাহর নামে শপথ করা হইতে বিরত রাখিলেন। তাহার সমস্ত জীবনে মামলা সংক্রান্ত ব্যাপারে এই তাহার প্রথম অভিজ্ঞতা। আমি বলিতে পারি না যে এই বর্ণনা কতদূর সত্য। যদি সত্যই হয় ... তবে ইহা আল্লাহর ঐ কথারই একটি প্রত্যক্ষ প্রমাণ ছিল যে কথা ইমাম সাহেব বার বার বলিতেন যে, 'আমি বিচারক হওয়ার উপযুক্ত নই।'

আমি একথা প্রথমেই বলিয়াছি যে, অসমর্থ হওয়ার এই দাবী কোন সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। তিনি তাহার নিজের সম্বন্ধে জ্ঞাত

ছিলেন। বোধ হয় ঈমানের এই সূক্ষ্ম রহস্যই তাহার প্রধান বাধা ছিল—যেদিন তিনি ইঙ্গিত করিয়াছিলেন। তিনি জানিতেন যে আইন জানা ঘটনা অনুযায়ী আইন প্রয়োগ করা এই সমস্ত সব কিছুই তো আমি জানি, কিন্তু একথা কিভাবে জানিতে পারিব যে আসামী বা ফরিয়াদী যে কথা বলিতেছে উহার কোনটি সত্য বা কোনটি মিথ্যা। ইহা তখনই একটি ঘটনা যে স্বয়ং হুজুর (সাঃ)ও একথা বলিতেন 'আমার ফয়সালায় কেহ যেন ধোকা না খাও যে—ঘটনা অনুযায়ী যে হকদার তাহাকেই আমি হক দিয়াছি।'

এই অবস্থায় ইমাম সাহেব মনে করিতেন এমন অনেক ঘটনা আসিবে যাহা আমার স্বভাববিরুদ্ধ। এমনই আমরা দেখিলাম যে শপথের সব কয়টি শব্দ শুনার ধৈর্যও তাহার হইল না, পকেট হইতে ফরিয়াদীর পাওয়া আদায় করিয়া দিলেন।

ইমাম সাহেবের ইন্তেকাল

আব্বাস দাওরীর বর্ণনায় দেখা যায় কাযীর পদ গ্রহণ করার পর তিন দিন এই অবস্থায় কাটিল। তারপর আরও দুই দিন অতিবাহিত হইল যে দুই দিন কোন মামলা-মোকদ্দমাই ছিল না। অতঃপর আব্বাস দাওরী বলেন ঃ—

'দু দিন পর ইমাম আবু হানিফা রোগাক্রান্ত হইলেন। ছয় দিন অসুস্থ থাকার পর তিনি ইনতিকাল করিলেন।'

আব্বাস দাওরী একজন বিশ্বস্ত হাদীস বর্ণনাকারী ছিলেন। তাঁহার সততা সম্বন্ধে কেহ কোন প্রকার সমালোচনা করেন নাই। তিনি

১। এই প্রকার মহান ব্যক্তিদের সম্বন্ধে এমন সব ঘটনা আছে যাহা আমাদের মত পাপীদের পক্ষে বুঝা অসম্ভব। ইমাম সাহেব প্রথম শ্রেণীর আইনজ্ঞ ছিলেন। অথচ সেই আইনকে যথাযথভাবে প্রয়োগ করিতে অপারগ ছিলেন বলিয়া মনে করিতেন। একথা সহজে কোন লোক বুঝিতে চাহিবে কি? মনসুরও এরূপ বুঝিতে চাহেন নাই। ইমাম মালিক সম্বন্ধে বর্ণিত আছে যে, মৃত্যুর কিছুদিন পূর্বে তিনি জামায়াত ও জুমুআতে যাওয়া পরিত্যাগ করিয়া দিয়াছিলেন। লোকে কারণ জিজ্ঞাসা করিলে বলিতেন—'সব কথার উত্তর দেওয়া যায় না।' অথচ সুন্নাতকে পুনর্জীবিত করাই ছিল তাঁহার জীবনের শ্রেষ্ঠ সাধনা। জামায়াতে যাওয়া সুন্নাতকে তিনি কোন অপরিহার্য কারণবশতই পরিত্যাগ করিয়াছিলেন।

কোন এক ব্যক্তির কথা শুনিয়া কোন কিছু বর্ণনা করেন নাই বরং একই প্রকার বর্ণনা যখন অনেকের মুখে শুনিয়াছেন—তখনই উহা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন।

মৃত্যুর কারণ

যাহা হউক, তাহার বর্ণনায় বুঝা যায় রোগাক্রান্ত হইয়া ইমাম সাহেব মৃত্যুবরণ করিয়াছেন। আমার বিশ্বাসও তাই। তার অর্থ এই নয় যে আবু জাফর নির্দোষ ছিলেন। অবশ্যই একথা মানিতে হইবে যে আবু জাফর বেত্রাঘাত করিয়াছিলেন। ইমাম সাহেবের জীবন একজন আলিমের জীবন ছিল। বয়স সত্তুরের উপর হইয়াছিল। একটা দুইটা নয়—ত্রিশটি বেত্রাঘাত করা হইয়াছিল, ইহা সাধারণ কথা নয়। বেত্রাঘাত ও কয়েদের কাঠিন্য তাঁহাকে রোগাক্রান্ত করিয়াছিল। ইহাতে বিস্ময়ের কিছুই নাই। কেহ কেহ বলিয়াছেন—'আবু জাফরের নির্মমতায় অসন্তুষ্ট হইয়া তিনি—الدعاء عليه। বহু দুয়া করিতেন।

কিন্তু কিরূপ দোআ করিতেন ? উহার বিস্তারিত ব্যাখ্যা না থাকিলেও বর্ণনাকারী বলেন—'ইহার কয়েকদিন পরই তিনি ইন্তিকাল করেন।

মনে হয় অত্যাচারীর অত্যাচার হইতে নাজাত পাওয়ার জন্যেই তিনি অধিকাংশ সময় দোআ করিতেন। আল্লাহ মৃত্যু দিয়াই তাঁহার মুক্তির পথ খুলিয়া দিলেন।

গোসল

ইমাম সাহেব ১৫০ হিজরীর শাবান অথবা শাওয়াল মতান্তরে রজব মাসে ইনতিকাল করেন। মনে হয় ইমাম সাহেবের একমাত্র পুত্র হাম্মাদ তখন কুফা হইতে বাগদাদ আসিয়া পৌঁছিয়াছিলেন। ইমাম সাহেবের মৃত্যু সংবাদ প্রথমে কয়েকজন বিশিষ্ট লোক যেমন শহর কাজী হাসান ইবন আম্মারাহ প্রমুখের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল।

১। ইমাম বুখারীর সঙ্গে বুখারার শাসনকর্তাও যখন নির্দয় ব্যবহার আরম্ভ করেন তখন তিনি সমরকান্দের খয়তং নামক একটি গ্রামে তাহার আত্মীয়ের বাড়ীতে আশ্রয় গ্রহণ করেন। একদিন এশা'র পর তিনি দোআ করিতেছিলেন—'আল্লাহ তোমার পৃথিবী এত বিরাট হওয়া সত্ত্বেও আমার উপর সংকীর্ণ হইয়া গিয়াছে। আমাকে তোমার নিকট ডাকিয়া লও।' ইহার ৪/৫ দিন পরেই তিনি মারা যান।

লিখিত আছে, মৃত্যুর সময় আসন্ন জানিয়া ইমাম সাহেব সিজদাহ্ রত হইলেন এবং সেই অবস্থায়ই তাঁহার প্রাণবায়ু বাহির হইয়া গেল।

আবদুল্লাহ্ ইবন রাফিদ বলেন, 'গোসলের পানি আমিই ঢালিতে-ছিলাম এবং কাযী হাসান ইবন আম্মারাহ্ তাঁহাকে গোসল দিতে-ছিলেন। শরীরের কাপড় পৃথক করার পর বেত্রাঘাতের দাগ দেখিয়া সকলেই কাঁদিয়া ফেলিল। কাযী সাহেব গোসল করাইয়া দিতেছিলেন এবং কাঁদিতেছিলেন।

জানাযায় লোক সমাবেশ

জানাযায় উপস্থিত লোক সংখ্যা সম্পর্কে কেহ কেহ বলিয়াছেন—প্রথমে চার পাঁচ জন লোকের বেশী ছিল না। এই বর্ণনাকারীই বলেন, 'আমরা খোরাসানী সদর দরজা দিয়া অতিক্রম করিতেছিলাম। এমন সময় কে যেন সমস্ত শহরে বিদ্যুৎ প্রবাহিত করিয়া দিল। ইমাম আবু হানীফার জানাযা হইতেছে, এই সংবাদ কানে পৌঁছিতেই যে যেখানে ছিল সেখান হইতে সেই অবস্থায়ই জানাযায় অংশগ্রহণ করিয়া পুণ্যের ভাগী হইতে রওয়ানা হইল। পুলের দেউড়ি পর্যন্ত পৌঁছিতে পৌঁছিতে লোকের এত ভীড় হইল যে আসরের পরও জানাযার নামায শেষ হইতেছিল না।' পূর্বে বর্ণিত হইয়াছে যে, ছয় বার জানাযার নামায পাঠ করা হয়। লোক সংখ্যা পঞ্চাশ হাযারেরও অধিক ছিল। আবু রেযা বলেন, 'ইমামের মৃত্যুতে আমি যত লোককে কাঁদিতে দেখিয়াছি অন্য সময় কখনও আমি এত লোককে কাঁদিতে দেখি নাই।'

২। হাসান ইবন আম্মারাহ্ সম্বন্ধে বিভিন্ন স্থানে উল্লেখ করা হইয়াছে। একবার ইমাম সাহেব ভরা মজলিসে তাহারই কোন কথাকে শুদ্ধ করিতে গিয়া নিজের ভুল স্বীকার করিয়াছিলেন। আবু জাফর মনসুরের সময় তিনি বাগদাদের কাযী ছিলেন।

আবু জাফর মনসুরের পর মেহদী খলীফা হন। যৌবন কালে মেহদী মাকাতিল ইবন সুলায়মানকে অধিক পসন্দ করিতেন। কারণ মাকাতিল খুব কেচ্ছা-কাহিনী বলিতে পারিতেন। একদিন মনসুর মেহেদীকে বলিলেন—'যদি ভবিষ্যতে সফল নরপতি হইতে চাও তবে হাসানের নিকট ফিকাহ এবং মুহাম্মাদ ইবন ইসহাকের নিকট ভ্রমণ ও যুদ্ধ-বিদ্যা সম্পর্কীয় জ্ঞানার্জন কর।' ইহা হইতে বুঝা যায় যে তখনকার খলীফাগণ কোন্ কোন্ বিষয় শিক্ষার প্রতি উৎসাহী ছিলেন।

দাফন

যে যমীনটুকরা ইমাম সাহেবের শেষ শয্যা-রচিত হওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করিয়াছিল আবু জাফর অবগত হইতে পারিলেন যে, সেখানে দাফন করার জন্যই তিনি ওসীয়ত করিয়া গিয়াছেন। ইমাম সাহেব এই যমীনটুকরাকেই পবিত্র মনে করিতেন এবং বলিতেন, 'যেখানে বাগদাদ নগরী উহা জবর দখল করিয়া লওয়া হইয়াছে।'[১]

ইমাম সাহেবের এই ওসীয়ত যখন মনসুরকে পেঁাছান হইল তখন আপনা-আপনি তাহার মুখ হইতে বাহির হইয়া পড়িল, 'ইমাম আবু হানীফার জীবদ্দশায় বা মৃত্যুতে কে আমাকে অপারগ বলিয়া তাঁহার নিকট প্রতিপন্ন করিবে ?'

ইমাম সাহেবের মৃত্যুর এই বিশেষ অবস্থায় শুধু মনসুরকেই নয় বরং আব্বাসী হুকুমতের পক্ষে এক কঠিন সমস্যা হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। হুসায়নের শাহাদত যেমন ইয়াযীদের মৃত্যুর পূর্বাভাস। ইতিহাস এই নজীর আবার যে কার্যকরী করিয়া তুলিতেছিল একথা কে অবগত ছিল ? জানাযায় অংশগ্রহণকারী পঞ্চাশ হাযার লোকের প্রতিটি পদক্ষেপ যে মনসুরের অন্তরের উপর পড়িতেছিল—একথা মনসুর ব্যতীত আর কে বুঝিতে পারে ? মনসুরের অভিজ্ঞ ও দূরদর্শী চাচা আবদুস সামাদ যখন তাহাকে এক লক্ষ লোকের উন্মুক্ত তরবারির করাল মূর্তি দেখাইয়াছিলেন তখন কে বলিতে পরিত যে ইমাম সাহেবের জানাযা যখন শান-শওকতের সাথে খায়যুরান সমাধিস্থানের দিকে যাইতেছিল তখন উহার ছবিই নয় বরং কার্যত সেই তরবারিই কি তাহার মাথার উপর চমকাইতেছিল না ?

মেহদী তাহার খেলাফতের সময় সুফইয়ান ছাওরীর ব্যাপারে রবীকে ধমকাইয়া বলিয়াছিলেন, 'ইহারা তো এমন ব্যক্তি যে, যাহারা মৃত্যুর সৌভাগ্য লাভ করিয়া আমাদের দুর্ভাগ্যকে আরও বাড়াইয়া তুলিতে চায়।'

১. ঐতিহাসিক বালাযুরী বলেন, 'বাগদাদ নগর তৈয়ার করার জন্য বিভিন্ন লোকের নিকট হইতে যমীন খরীদ করিয়া লওয়া হইয়াছিল। এই অবস্থায় ইমাম সাহেবের উক্তির অর্থ ছিল যদিও যমীনের দাম মালিককে দেওয়া হইয়াছিল তথাপি মালিকের অমতে জবর দখল করা হইয়াছিল।' আজও দেখা যায় রাষ্ট্রের কাজের জন্য এরূপ বহু যমীন দখল করা হইয়া থাকে।

ইমামের মৃত্যু মেহদীর পিতা মনসুরের উপর যে দুর্ভাগ্যের সীল মোহর লাগাইয়া দিয়াছিল—সেই নজীরই বোধ হয় মেহদীর অন্তরে গাঁথা ছিল।

ইমামের মৃত্যুর কারণ সম্পর্কে সমালোচনা

ইমাম সাহেব কেন মৃত্যুবরণ করিলেন, কিভাবে মৃত্যুবরণ করিলেন ইহা লইয়া সেই যুগেই নানাজনে নানা মত প্রকাশ করিয়াছেন। 'আমি আব্বাস কাওরীর মতবাদকে বিশ্বাস করিয়া উহাই লিপিবদ্ধ করিয়াছি। কিন্তু মুফিক বলেন—'অতঃপর লোকজন মতভেদ আরম্ভ করিল। কেহ বলেন, বেত্রাঘাতের চোটে মারা গিয়াছেন, আবার কেহ বলেন, ইমামকে বিষপান করানো হইয়াছিল।'

ইহা তো ছিল কেন মৃত্যুবরণ করিলেন উহার উত্তর। এখন অবশিষ্ট রহিল কিভাবে মারা গেলেন তাহার উত্তর। এই প্রশ্নের যে সব উত্তর আছে উহা সত্য হউক বা মিথ্যা হউক-উহা শুনিয়া লোকের মন উদ্দীপ্ত না হইয়া পারে না। লোকে আবু জাফর সম্বন্ধে বলিয়াছে—মনসুর ইমাম সাহেবকে ডাকিয়া বিষ মিশ্রিত এক পেয়ালা শরবত তাহাকে পান করিতে বলিলেন। ইমাম সাহেব বলিলেন, 'আমি পান করিব না।' মনসুর বলিলেন—'পান করিতেই হইবে।' মনসুর পান করানোর জন্য জিদ করিতেছিলেন—ইমাম সাহেবও পান না করার জিদ করিলেন অবশেষে ইমাম সাহেব বলিলেন—'আমি জানি এই পাত্রে কি আছে? আমি জানিয়া শুনিয়া কোন মতেই আত্মহত্যা করিতে পারি না।' তখন ইমাম সাহেবকে জোরপূর্বক মাটিতে ফেলিয়া দিয়া..... মুখ হাঁ করাইয়া ধরিল। আবু জাফর তাহার মুখের মধ্যে বিষ মিশ্রিত শরবত ঢালিয়া দিলেন।' (ইন্নালিল্লাহ)! অতঃপর বর্ণনাকারী বলেন —'ইহার পর ইমাম সাহেব উঠিয়া দাঁড়াইয়া সামনের দিকে পা বাড়াইলেন। মনসুর জিজ্ঞাসা করিলেন, কোথা যাইতেছ।' ইমাম সাহেব বলিলেন,—'যেখানে আমাকে পাঠাইতে মনস্থ করিয়াছ।'

আসল ঘটনা একমাত্র আল্লাহ ব্যতীত আর কেহ জানে না। কিন্তু বেচারা মনসুরের উপর আমার করুণা হয়। এই সংবাদ যখন তাহার কানে পৌঁছিয়াছিল যে, মুসলমানদের মধ্যে এই সংবাদ যখন প্রচারিত হইয়াছে—সে ইরাক ও প্রাচ্যের ইমামকে মাটিতে ফেলিয়া জোরযবরদস্তি বিষ পান করাইয়াছে—চিন্তা করুন তখন তাহার অবস্থা কি হইয়াছিল? শুধু কি বিষ পান করানোই? কিছুক্ষণ পূর্বে বেত্রাঘাতের কথাও

বর্ণিত হইয়াছে। কয়েদখানা হইতে বাহির করিয়া দশ দিন পর্যন্ত দেহের কাপড় খুলিয়া লোকের সম্মুখে বেত্রাঘাত করা, ইমাম সাহেবের ক্রন্দন করা, সর্ব শরীর বাহিয়া রক্তধারা প্রবাহিত হওয়া, ইত্যাদি কথাও বর্ণনা করা হইয়াছে। তারপরও খাওয়ারিযম লিখিয়াছেন—'সমস্ত শরীরে বিশেষ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করার জন্য বেত্রাঘাত করা হইয়াছিল যেন উহা রক্তের সাথে মিশ্রিত হইয়া সমস্ত শরীরে ছড়াইয়া পড়ে।' (ইয়া আল্লাহ!)

চিন্তা করুন—এইসব কাহিনীর মূল্য কতটা হইতে পারে? কিন্তু যাহারা এইসব বর্ণনা করিয়াছেন তাঁহারা ইমাম সাহেবের মৃত্যু সময়কার প্রায় কাছাকাছি সময়েরই লোক ছিলেন। ইহার অর্থ তো এই যে—আবু জাফরের জীবদ্দশাতেই এইসব কথা তাহার প্রতি প্রয়োগ করা হইয়াছিল। বেচারা আবু জাফর মনসুর ইমাম সাহেবকে করায়ত্ত করিতে চাহিয়াছিলেন। কিন্তু ইহাতে যে কি বিপরীত ফল হইয়াছিল উহার অনুমান আমরা কিভাবে করিতে পারিব?

ইমাম আবু হানীফা (রঃ) যে বৎসর মারা যান ঠিক সেই বৎসরই মনসুর চুপচাপ হজ্জ করার মানসে মক্কার পথে কুফা গিয়া উপস্থিত হন। মনসুর যখন কুফার শহরতলীতে পৌঁছেন তখনই কুফার শাসনকর্তা খলীফার আগমনবার্তা জানিতে পারেন। কুফা পৌঁছিয়া গভীর মনোযোগ ও সতর্কতার সাথে তিনি কুফাবাসীদের মনোভাব পরীক্ষা-নীরীক্ষা করেন। এই সময়ই তিনি সুফইয়ান ছাওরী 'ইবাদ ইবন কাসীর ইবন জরীহ প্রমুখ মনিষীবৃন্দকে বন্দী করা, যদিও ইমাম সাহেবের মৃত্যুর সাথে সম্পূর্ণ যুক্ত নয় বলিয়া বর্ণনা করা হয় নাই কিন্তু বর্ণনা না করাও এই কথার প্রমাণ নয় যে, উহা সংঘটিত হয় নাই। কিন্তু অতিরঞ্জিতকারীদের উপাখ্যানের স্তূপ ইহার পর বাড়িয়াই চলিয়াছিল। এক দিকে তো ইহা হইতেছিল—অন্য দিকে আল্লাহর মহিমায় ইমাম সাহেবের ক্রমবর্ধমান সৌভাগ্য আরও বাড়িয়া চলিল।

দ্বন্দ্বের এই পথে ইমাম সাহেবের যেই কুরবানীর তামাশা পৃথিবী প্রত্যক্ষ করিয়া আসিতেছিল অবশ্য উহার মূল্য কখনও অপচয় হইতে পারে না। পরিশেষে বাদশাহী ছাড়া আর কোন টোপ বাকী ছিল না যাহা ইমাম সাহেবের সম্মুখে রাখা হইয়াছিল। তিনি হুকুমতের সাথে যে ভাবে পাল্লা দিয়া চলিয়াছিলেন নিঃসহায়তা ও শাহাদতবরণ করা উহাকে আরও প্রদীপ্ত করিয়া দিয়াছিল। কাযী হাসান ইবন আম্মারাহ

তাহাকে গোসল দেওয়ার সময় একথাও বলিতেছিলেন যে, 'আপনার পরবর্তীদিগকে আপনি খুবই বিপদে ফেলিয়া গেলেন। আলিমদেরকে তো আপনি একেবারেই লজ্জিত করিয়া দিলেন।'

কাযী সাহেবের কথার অর্থ এই ছিল যে—ইলম বিশেষভাবে ইলমে দ্বীনের যে প্রকৃত দাবী-দাওয়ার কার্যকরী নমুনা আপনি পৃথিবীতে রাখিয়া গেলেন—উহার চেয়ে বেশী কিছু করার পথ আর কোন আলিমের জন্যই খোলা রাখিল না।

বাস্তবিক পক্ষে ঘটনাও এইরূপ যে—হুযুর (সাঃ)-এর প্রচলিত ধর্মের জন্য যখন প্রয়োজন হইয়াছে তখন ধর্মের পাগলগণ হাসিতে হাসিতে নিজের জীবন উৎসর্গ করিয়া দিয়াছেন। এই গ্রন্থেই আপনারা হযরত ইমাম মালিক সুফইয়ান ছাওরী, ইবরাহীম ইত্যাদি মনীষীদের কুরবানীর সংক্ষিপ্ত বিষয় পাঠ করিয়াছেন। ইমাম সাহেবের কিছু দিন পরই ইমাম আহমাদ ইবন হাম্বল, ইমাম শাফিঈ প্রমুখ মহান ইমামগণের কে বাকী ছিলেন, যাহাকে কঠোরভাবে যাচাই করা হয় নাই। তাহারা কঠোর বিপদাপদ বরণ করিয়া লইয়াছিলেন। কিন্তু কথা হইল তাহারা পরীক্ষার পর নমরূদের অগ্নিকুন্ড হইতে বাহির হইয়া আসিয়াছিলেন। এরথাও সত্য যে প্রয়োজনবোধে তাহারাও জীবন দান করিতে কুন্ঠিত ছিলেন না। তবুও একটু পার্থক্য এই যে, 'তাহারা বাহির হইয়াছিলেন—আর ইমাম সাহেব বাহির হইতে পারেন নাই।

ইসমাঈল ইবন সায়েম বাগদাদী বলেন, 'ইমাম আবু হানীফা (রঃ)-এর শেষ জীবনের বিপদাপদের আলোচনা যখন ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল করিতেন তখন তিনি কাঁদিতেন এবং তাহার জন্য দুআ করিতেন।'

মুফিক বলেন—'আবদুল্লাহ ইবন ইয়াযীদ যখন ইমাম সাহেব সম্বন্ধে কোন কথা আলোচনা করিতেন—তখন বলিতেন—'পুরুষদের বাদশাহ বা সিংহপুরুষ আমাকে বলিয়াছেন।' আবু আবদুর রহমান মুকরীর নিয়ম ছিল তিনি ইমাম সাহেবের নাম না বলিয়া বলিতেন—'শাহানশাহ আমাকে এরূপ বলিয়াছেন।' বোধ হয় ইহা ইমাম সাহেবের গৌরবোজ্জ্বল মৃত্যুর পরের কথা। ইমাম সাহেব যে, সিংহ বিক্রম দেখাইয়াছিলেন এবং হুকুমতের সম্মুখে যেভাবে ইলমের মর্যাদা রক্ষা করিয়া গিয়াছিলেন—বাগদাদ, ইরাক, এবং কুফাবাসীদের মধ্যেই উহার প্রশংসা সীমিত ছিল না বরং যেখানকার ভাষা আরবী

ছিল না তথাকার লোকেরাও উহা উপলব্ধি করিয়াছিল।

যদিও কোন কোন ঘটনা অতি সংক্ষপ্ত ও সাধারণভাবে লিপিবদ্ধ আছে উহা না থাকিলেও আমার নিকট ইমাম সাহেবের ত্যাগের যে সমস্ত গৌরবোজ্জ্বল প্রমাণ আছে উহা পাঠ করিলেও লোকে বুঝিতে পারিত যে যাহা কিছু সংঘটিত হইয়াছিল উহা হওয়াই উচিত ছিল। অর্থাৎ মুফিক অথবা আলকারুরী এই প্রকারের যে ঘটনা বর্ণনা করিয়াছেন যেমন প্রসিদ্ধ আরবী ভাষাবিদ নযর ইবন শুমায়েল ইমাম সাহেব এবং তাহার ছাত্রদের প্রতি বিদ্বেষভাবাপন্ন ছিলেন। নযর খোরাসান পৌঁছিয়া মামুনার রশীদের মন্ত্রী ফযল ইবন সহলের সাথে বন্ধুত্বের সম্পর্ক গড়িয়া তোলেন। সুযোগ বুঝিয়া একদিন নযর ফযলকে বলিলেন—"আদালতের ফয়সালা ইমাম সাহেবের আইন-কানুন মুতাবিক না হওয়াই ভাল।" ফজল প্রথমে তাহার কথায় গুরুত্ব দিলেন না। কিন্তু বলিতে বলিতে ফজল সে দিকেই ঝুঁকিয়া পড়িলেন। ফযল একদিন বিশিষ্ট আলিমদিগকে এ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিলেন। অনেক তর্ক-বিতর্কের পর সকলেই বলিলেন—"ইহা অসম্ভব? ইমাম আবু হানীফার আইন বাদ দেওয়ার অর্থই সমস্ত দেশবাসী রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়া উঠিবে।" তাহারা ফযলকে আরও বলিলেন—"যে ব্যক্তি আপনাকে এই পরামর্শ দিয়াছে সে একটা অপদার্থ।

বিজ্ঞ আলিমগণই ফযলকে একথা বলিয়াছিলেন যে, আদালতে ইমাম আবু হানীফার আইন মোতাবিক কাজ হইলে 'আব্বাসী হুকুমতের অবস্থা কাহিল হইয়া পড়িবে। দেশে বিপ্লব আরম্ভ হইবে। ইহা কি ইমাম সাহেবের মৃত্যুর দুই শত আড়াই শত বৎসরের পরের কথা ছিল? ইহা তো পঞ্চাশ বৎসর পরের কথাও নয়। কারণ, মামুন যখন খোরাসানের শাসনকর্তা ছিলেন ইহা তখনকার কথা। ইমাম সাহেবের মৃত্যুর মাত্র ত্রিশ-বত্রিশ বৎসর পরের কথা। প্রসিদ্ধ সুফী

১. নযর ইবন শুমায়লের মজলিসে কোন একটি বিষয় আলোচনা প্রসঙ্গে এক ব্যক্তি বলিয়াছিল, 'ইহা ইমাম সাহেবের ছাত্র কাযী আবু ইউসুফের অভিমত।' কাসিম ইবন শিবাহ নামক একজন বুযর্গ ব্যক্তি বলিলেন, "জনাব! আপনি যখন কাযী ছিলেন তখন এই অধমের নিকট হইতেই ইমাম সাহেবের মাসআলার কিতাব চাহিয়া পাঠ করিতেন। তখন আপনার এই সুস্থ অভিমত কোথায় ছিল?' একথায় নযর একেবারে চুপ করিয়া রহিলেন।

হারিছ মুহাসিবী [১] বলেন—নযর স্বয়ং মামুনকেও একথা বলিয়াছিলেন। ফযল নযরকে বলিয়াছিলেন—"তোমার একথা মামুনও পসন্দ করিবেন না। আর তিনি যাহা পসন্দ না করেন আমার নিকট উহা অসহনীয়।"

নযর একজন সাহিত্যিক ছিলেন। তাই মামুন তাঁহাকে ভালবাসিতেন। এই ভালবাসার সুযোগ গ্রহণ করাই ছিল নযরের উদ্দেশ্য। নযর ফজলের কথা না শুনিয়া নিজেই মামুনকে বলিয়াছিলেন, 'হানাফী মতবাদী সমস্ত কাযীদিগকে পদচ্যুত করিয়া দিন।'

কিন্তু মামুন তাঁহার কথায় কর্ণপাত করেন নাই। কারণ খোরাসানে ইমাম আবু হানীফার ছাত্র এবং মতবাদী লোকসংখ্যাই ছিল বেশী।

খতীব যিনি হানাফী বুযর্গদের কোন বিষয় বর্ণনা করিতে গিয়া খুব সাবধানতার সাথে অগ্রসর হইতেন—তিনি তাঁহার গ্রন্থ 'তারীখে বাগদাদে লিখিয়াছেন—'খলীফা হওয়ার পরও মামুন উযীর ফযলের সাথে মার্ভ আগমন করেন। ঐ সময় ইমাম মুহাম্মাদ ইবন হাসানের ছাত্র ইবরাহীম ইবন রুস্তম চামড়া পাকাকারীদের মহল্লায় থাকিয়া তাহাদের ছেলে সন্তানদিগকে ইলমে দ্বীন শিক্ষা দিতেন। যে সময় মামুন মার্ভ পেঁাছেন তখন ইবরাহীমের ইলম ও ফযীলতের কথা তথাকার লোকদের মুখে মুখে ছিল। মামুন তাঁহাকে ডাকিয়া বহুক্ষণ আলাপ-আলোচনা করার পর তাঁহাকে কাযীর দায়িত্বে দেওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। কিন্তু তিনি স্বীকার না করিয়া পূর্ব কাজেই মনোনিবেশ করিলেন।'

একদিন উযীর ফযল ইবন সহল তাঁহার সাথে দেখা করার জন্য তাঁহার গৃহে আসিয়া পেঁাছিলেন। ঐ সময় তিনি তাঁহার ছাত্রদিগকে পাঠ দান করিতেছিলেন। খতীব বলেন—'ইবরাহীম না তাহার আসন

১. হারিছ মুহাসিবী একজন প্রসিদ্ধ ওলী ছিলেন। কিন্তু তাহার পিতা ছিলেন একজন বড় ধনী। পিতা-পুত্রের আকীদা বিভিন্ন থাকায় হারিছ মুহাসিবী তাহার পিতার এক কড়া সম্পত্তিও গ্রহণ করেন নাই সারাটা জীবন অভাব-অনটনে কাটাইয়াছেন। মৃত্যুর পূর্বক্ষণে তিনি তাহার শিষ্যদিগকে বলিয়াছিলেন, 'প্রাণ-বায়ু বাহির হইবার সময় আমার মুখে হাসি দেখিলে বুঝিবে যে, আমি নাজাত পাইব। অন্যথায় মনে করিবে সারাটা জীবন অযথা কাজেই কাটাইয়াছি।' লোকে তাহাকে হাসিতেই দেখিয়াছিল।

ছাড়িয়া উঠিলেন, আর না তাহার ছাত্রদিগকে বিদায় দিলেন।'[১] উযীরের একজন সাথী বলিলেন—'ইবরাহীম তোমার নিকট খলীফার উযীর আসিয়াছেন—আর তুমি চামড়া পাকাকারীদের ছেলেদের পড়া বিরত রাখিয়া তাহাকে সম্মান প্রদর্শন করিলে না।'

ইবরাহীম কিছু বলার পূর্বেই তাঁহার একজন ছাত্র বলিয়া উঠিল—'হাঁ জনাব! আমরা এখন আর চামড়া পাকাকারী নই। বরং ঐ দ্বীনকে মযবূত করিতেছি, যাহা ইবরাহীমকে এতটা মর্যাদাসম্পন্ন করিয়াছে যে, খলীফার উযীরও আজ তাঁহার দ্বারস্থ।'

অথচ এই ইবরাহীম ইমামদের প্রথম পংক্তির লোকও ছিলেন না। অথচ ইবরাহীমেরই যখন এই অবস্থা তখন অনুভব করা উচিত যে, ইমাম সাহেবের মৃত্যুর পর আব্বাসী হুকুমতের কার্যী পদে চল্লিশজন ঐ লোক ছিলেন যাঁহাদের সম্বন্ধে ইমাম সাহেব তাঁহার ঐতিহাসিক ভাষণে উল্লেখ করিয়াছেন তাঁহাদের জ্ঞান-গরিমার মর্যাদা কতটা ছিল। বুঝিবারই বা কি আছে, তাঁহাদের কথাতো গ্রন্থের পাতায়ই স্বর্ণাক্ষরে স্থান পাইয়াছে। সুতরাং ভিন্নভাবে বলার কোন প্রয়োজন নাই। এখানে বক্তব্য বিষয় ছিল—একই ঘটনায় মনসূরের দুর্ভাগ্য এবং ইমাম সাহেবের মর্যাদা একই সমতালে বর্ধিত হইয়াছিল। আবূ জাফরের সব কিছুই ছিল, কিন্তু আপনি দেখিতে পাইলেন ইমাম সাহেবের স্থলাভিষিক্ত এবং ওয়ারিছদিগকে তাঁহার প্রজা হওয়া সত্ত্বেও কিছুই করিতে পারেন নাই।

ইমাম সাহেবের ত্যাজ্য সম্পত্তি

ইমাম সাহেব নিঃস্ব এবং গরীব ছিলেন। তাঁহার নিজস্ব সম্পত্তি বলিতে কিছুই ছিল না। অথচ তাঁহার নিকট লোকের আমানত থাকিত

১। আমার স্বচক্ষে দেখা একটি ঘটনা বলিতেছি। আমি দেওবন্দ দারুল 'উলুম মাদরাসায়ে মুহাদ্দিসে হিনদ হযরত মওলানা মুহাম্মাদ হাসানের নিকট হাদীস পড়িতাম। কয়েকবারই জিলার ইংরাজ কালেক্টর মাদরাসা পরিদর্শন করিতে আসিয়া মাওলানার ক্লাশে উপস্থিত হইয়াছিলেন। কিন্তু মওলানা পাঠ দান বন্ধ করিয়া তাঁহার দিকে ফিরিয়াও তাকান নাই। একবার প্রাদেশিক গভর্নর জেমস স্টোন আসেন। মওলানা বাড়ী ছিলেন। তাঁহাকে সংবাদ দেওয়া হইল। মওলানা বলিলেন—'আমার মত গরীবের নিকট গভর্নরের কি কাজ থাকিতে পারে।' তিনি দেখা করিলেন না।

লাখ লাখ টাকা। তাঁহার নিজস্ব সম্পদ সম্বন্ধে লিখিত আছে—'এক জিলদ কুরআন শরীফ ব্যতীত তাহার ঘরে আর কিছুই পাওয়া যায় নাই।' (মুনাফিক, ১৮১ পৃঃ, ২য় জিলদ)

আল্লাহ জানেন এই বর্ণনা কতদূর সত্য। সে যাহাই হউক আবু জাফরের সঙ্গে তাহার তুলনা কোথায় ? কিন্তু যিনি নিঃস্ব ছিলেন আজ তাঁহার স্থলাভিষিক্ত আবু জাফরেরই দেশে এমন প্রভাবসম্পন্ন ছিলেন যে হুকুমত তাহাদের দিকে চোখ তুলিয়া তাকানোর শক্তিও রাখিত না। যাঁহারা প্রকৃত অবস্থা অবগত ছিলেন তাঁহারা জানিতেন যে, তাঁহাদিগকে বিরক্ত করার অর্থই ছিল যে আবু জাফরের স্থলাভিষিক্তদিগকে হুকুমত হইতে হাত গুটাইয়া বসা।

ইমাম সাহেবের মৃত্যুর বাইশ বৎসর পর অর্থাৎ হারুনুর রশীদের খলীফা হওয়া পর্যন্ত কাযীদের নামের তালিকা খুলিয়া দেখুন—বসরা কূফা, বাগদাদ, ওয়াসিত, মাদায়েন মার্ভ মদীনা, মিসর, খাওয়ারিযম কূফা, রে; কিরমান, নিশাপুর সাজিস্তান, দামেশেক, তিরমিয, জুরজান বলখ, হামদান সান'আন শিরায আহওয়ায, তস্তর সমরকন্দ, ইস্পাহান হিরাত, রাম ইত্যাদি স্থানগুলি ছাড়াও 'আব্বাসী হুকুমতের শহরগুলির কাযীর পদগুলি ইমাম সাহেবের ছাত্রগণ ও হানাফী সম্প্রদায়ভুক্ত কাযীদের দ্বারাই দখল হইয়াছিল। তাহাদের মধ্যে কাহাকেও মনসুর কাহাকেও হাদী এবং কাহাকেও মেহদী নিয়োগপত্র দিয়াছিলেন। হারুনুর রশীদের যুগ পর্যন্ত যে বিপ্লব দেখা গিয়াছিল—উহার আলোচনা অবশ্য এই গ্রন্থেই লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

কিন্তু তাহার পূর্বে আমি একথা বলিতে চাই যে, হানাফী কাযী বা হানাফী মতবাদের সম্মুখে অতি সহজে হুকুমত মাথা নত করিয়া দেয় নাই। আবু জাফর সম্বন্ধে বলিয়াছি যে, তিনি হানাফী মতবাদকে নিশ্চিহ্ন করিয়া দেওয়ার জন্য ইমাম মালিককে বাগদাদে আসার আহ্বান করিয়াও কৃতকার্য হইতে পারেন নাই। মনসুরের পর তাঁহার পুত্র মেহদীও এ চেষ্টা হইতে বিরত থাকেন নাই। তিনি ইমাম মালিকের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। মেহদী মালিককে এতটা সম্মান প্রদর্শন করিতেন যে, তিনি যদি ভরা দরবারেও উপস্থিত হইতেন তবে তাঁহাকে ডাকিয়া নিজের পাশে বসিতে দিতেন। একবার বসার স্থান এত সংকীর্ণ ছিল যে মেহদী এক পা উঠাইয়া না বসিলে ইমাম মালিকের বসার স্থানের সংকুলান হইত না! কিন্তু পরিশেষে বাগদাদ আসার আহ্বান জানাইলে বাপকে যে, উত্তর দিয়াছিলেন পুত্রকেও সেই উত্তরই

দিয়াছিলেন। আর একটি কথা পূর্বেও হয়ত বলিয়াছি যে, মেহদী যে আশরাফী তাঁহার নিকট পাঠাইয়াছিলেন ইমাম সাহেব উহার সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন—'উহা সেই ভাবেই রাখা আছে, লইয়া যাইতে পার। কিন্তু আমি মদীনা পরিত্যাগ করিতে পারি না'। একথাও অবগত হওয়া যায় যে, হারুন-উর রশীদও তাঁহাকে বাগদাদ আগমনের আহবান করিয়া কৃতকার্য হইতে পারেন নাই।

তাই দেখা যায়—হারুন-উর রশীদের শাসন যুগের প্রারম্ভিক সময় পর্যন্ত হানাফী মতবাদকে দুর্বল করার চেষ্টা সমানভাবেই চলিতেছিল। ইমাম সাহেব যে বৎসর মারা যান ঠিক সেই বৎসরই অর্থাৎ ১৫০ হিজরীতে সুফইয়ান ছাওরী কূফা হইতে উধাও হইয়া যান। তাঁহাকে ধর-পাকড় করার চেষ্টা চলিল। আবু জাফর জীবনভর চেষ্টা করিয়াছিলেন সুফইয়ান ছাওরীকে কাযীর পদে বহাল করিতে। ...পূর্বে বর্ণিত হইয়াছে, মেহদী একবার তাঁহাকে ধরিয়া আনিয়া নিয়োগপত্রও দিয়াছিলেন। কিন্তু সুফইয়ান সেই নিয়োগপত্র তাইগ্রীসের পানিতে নিক্ষেপ করিয়া দিয়া গা ঢাকা দিয়াছিলেন। এই পলায়নরত অবস্থায়ই ১৬০ হিজরীতে মেহদীর শাসনকালেই তিনি কূফায় প্রাণত্যাগ করেন। ইহাও যে উক্ত ঘটনার সাথে সম্পর্কযুক্ত ছিল উহাতে বিস্ময়ের কিছুই নাই।

সেই যুগে ইমাম মালিকের পর ফিকাহ ও হাদীস শাস্ত্রের প্রখ্যাত আলিম ছিলেন হযরত সুফইয়ান ছাওরী। কিন্তু ইমাম আবু হানিফার সৎ নিয়তের বদৌলতেই উক্ত ইমামদ্বয়ের উপর হুকুমতের কোন জোর-যবরদস্তী কার্যকরী হইতে পারে নাই। একবার ইমাম আওযাঈ সুফইয়ানকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'আপনি কেন তাহাদের সাহচর্য হইতে পৃথকতা অবলম্বন করিয়া থাকেন?' সুফইয়ান বলিলেন, 'আমি তাহাদিগকে প্রহার করিতে পারি না, তাই এইভাবে তাহাদিগকে শিষ্টতা শিক্ষা দিতেছি।'

রাষ্ট্রপতিদের ধারণা আল্লাহ্‌র পৃথিবীতে তাহারাই একমাত্র শক্তিশালী—সকলেই তাহাদের মুখাপেক্ষী, তাহারা কাহারও মুখাপেক্ষী নয়। তাই দুনিয়ার সকলেই তাহাদের সম্মুখে মাথানত করিয়া থাকুক—এই তাহাদের ধারণা। তাহাদের এই কথা বুঝাইয়া দেওয়া উচিত যে আল্লাহ্‌র বান্দাদের মধ্যে কিছু সংখ্যক এমন লোকও আছেন—তাঁহারা তোমাদের নিকট প্রয়োজনীয়, অথচ তাঁহারা তোমাদের ঘৃণার দৃষ্টিতে দেখিয়া থাকেন। সুতরাং ইহাই যাঁহাদের ধারণা তাহারা কিভাবে রাষ্ট্রের অধীনে চাকুরী গ্রহণ করিতে পারেন? ইমাম সাহেবের

সম্মুখে যে সমস্যা ছিল সুফইয়ান ছাওরীর সম্মুখেও যে সেই সমস্যা ছিল না—একথা নিঃসন্দেহে কে বলিতে পারে? এই সমস্ত বুযর্গদের মধ্যে মতভেদ থাকিলেও পরিণামে দেখা যায় সকলে একই পথের পথিক ছিলেন।[১]

হারুন-উর-রশীদ সম্বন্ধে তাশ কবরীর 'মিফতাহুস সাআদাত' গ্রন্থে লিখিয়াছেন—ইমাম মালিককে কুফায় আনিতে অপারগ হইয়া তিনি মক্কার প্রধান আলিম সুফইয়ান উয়ায়নীর সাথে সাক্ষাৎ করেন। আলাপ-আলোচনার পর হারুন হুকুম দিলেন—তাঁহার লিখিত গ্রন্থরাজী আমার সহিত লইয়া চল। তাহাই হইল ইরাক পৌঁছিয়া সেই গ্রন্থসমূহ গভীর মনোযোগের সহিত পাঠ করিয়া নিরাশ হইয়া বলিয়াছেন, আল্লাহ সুফইয়ানের প্রতি মেহেরবান হউন। আমাদের সঙ্গে কঠিন ব্যবহার করিলেও তাঁহার গ্রন্থে এমন কিছু পাওয়া গেল না যাহা দ্বারা আমরা উপকৃত হইতে পারি। অর্থাৎ প্রতিশোধ গ্রহণ করার মত কোন কিছুই পাওয়া গেল না।

কি ভাবেই বা উপকৃত হইবে। সেই সমস্ত বুযর্গদের নিকট ইলমের যে ভান্ডার ছিল উহা ছিল হাদীস, সাহাবা ও তাবিঈদের বর্ণনা। কিন্তু উহার উপর নির্ভর করিয়া হুকুমতের আইন প্রণয়ন করা তাঁহাদের সামর্থ ছিল না। ইহা ছিল ইমাম আবু হানীফার কাজ।

---

১. ইবন সা'আদের বর্ণনায় দেখা যায়, কুফার প্রসিদ্ধ আলিম ইবরাহীম নখঈ এবং ইবরাহীম তামিমীর মধ্যে কোন কোন বিষয়ে মতভেদ ছিল। তথাপি একটি বিষয় লক্ষ্যণীয় যে—বনী উমাইয়া শাসনকর্তা নিষ্ঠুর হাজ্জাজ একবার ইবরাহীম নখঈর নামে হুলিয়া বাহির করে। ইবরাহীম নখঈ অত্যাচারের ভয়ে আত্মগোপন করেন। অনুসন্ধান করার পর লোকে ইবরাহীম তামিমীকে ধরিয়া আনিয়া বলিল, 'ইনিই ইবরাহীম নখঈ। কিন্তু ইবরাহীম তামিমী মনে করিলেন—আমার সত্য পরিচয় দিলে আমি অবশ্য মুক্তি পাইব। অথচ নখঈকে নিরাপদে রাখার জন্য তিনি আত্মপরিচয় দিলেন না। হাজ্জাজ তাহাকে কয়েদখানায় পাঠাইয়া দিল।

কয়েদখানা ছিল ছাদবিহীন, শুধু চারদিকে দেয়াল পরিবেষ্টিত। বৃষ্টি-বাদল ও প্রখর সূর্য তাপ হইতে রক্ষা পাওয়ার কোন উপায় ছিল না। দুইজন লোককে এক সাথে শিকল দিয়া বাঁধিয়া রাখা হইত। এই দুঃখ-কষ্ঠ সহ্য করা সত্ত্বেও তিনি অন্যের নিরাপত্তার জন্য আত্ম-পরিচয় দেন নাই। এই কারাগারে ইবরাহীম তামিমী মারা যান।

মেহদীর খিলাফতকাল

ইমাম সাহেবের শিষ্যগণ

এই সমস্ত ব্যাখ্যার প্রয়োজন এই জন্য যে. ইমাম সাহেব আব্বাসী হুকুমতের বিচার বিভাগে যে প্রভাব প্রতিষ্ঠা করতে চাহিয়াছিলেন তাঁহার মৃত্যুর পনর বিশ বৎসর পর্যন্ত হুকুমত ভিতরে ভিতরে উহার বিরোধিতা করিতেই থাকে। ইমাম সাহেবের মৃত্যুতে আব্বাসী হুকুমতের পক্ষে যে ভয়ভীতির সৃষ্টি করিয়াছিল তাহারা উহা বন্ধ করিবার জন্য ইমাম সাহেবের বিশিষ্ট ছাত্রদিগকে কাযীর পদে বহাল করিতে ছিলেন। পূর্বেই বলিয়াছি যে, এই পনের বিশ বৎসরের মধ্যেই অধিকাংশ প্রসিদ্ধ শহরগুলির কাযীর পদ তাঁহার ছাত্র দ্বারা পরিপূর্ণ করা হইয়াছিল।

কাযীউল কুযাতের পদ সৃষ্টি

ইমাম সাহেবের জীবদ্দশাতেই এই প্রশ্ন উঠিয়াছিল যে, বিচার বিভাগের সম্পূর্ণ দায়িত্ব হুকুমতের হাত হইতে আলিমদের উপর ন্যস্ত করা হইবে। অর্থাৎ 'কাযীউল কুযাত' পদ প্রতিষ্ঠার কথা চিন্তা করিতে-ছিলেন। কিন্তু ঘটনাদৃষ্টে যতদূর মনে হয়—হুকুমত টাল-বাহানা করিতে থাকে। কাযী আবু ইউসুফ এবং যুফার ইবন হুযায়ল সম্বন্ধে ইমাম সাহেব তাঁহার ঐতিহাসিক ভাষণে বলিয়াছিলেন, 'ইহারা শুধু কাযী হওয়ার যোগ্যই নয় বরং কাযীদের শিক্ষা দেওয়ার ক্ষমতাও রাখেন।' এই দুইজনকে হাত করার জন্য হুকুমত আপ্রাণ চেষ্টা করিতেছিল।

ইমাম যুফারকে কাযীউল কুযাত পদে বহালের প্রস্তাব

ইমাম যুফারকে 'কাযীউল কুযাতের' পদ গ্রহণ করিতে বলায় তিনি স্পষ্ট ভাষায় অস্বীকার করিলেন। তাশ কুবরাযাদা বলেন, 'ইমাম যুফারকে কাযীউল কুযাত পদ গ্রহণ করার জন্য হুকুমত চাপ দিতে লাগিল। তিনি স্পষ্ট ভাষায় অস্বীকার করিলেন এবং গা ঢাকা দিলেন। হুকুমতের আদেশে তাঁহার বাড়ীঘর ধ্বংস করিয়া দেওয়া হইল। ইহার পরও তিনি বহুদিন যাবত পলায়নরত অবস্থায়ই রহিলেন। কয়েকদিন পর ফিরিয়া আসিয়া তিনি বাড়ী-ঘর মেরামত করাইলেন। আবার তাঁহাকে চাপ দেওয়া হইল। তিনি এবারও অস্বীকার করিলেন। অবশেষে অপারগ হইয়া হুকুমত তাঁহার পিছন ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হইল।'

ইমাম আবু ইউসুফ

ইমাম আবু ইউসুফ (রঃ) সরকারী চাকুরী গ্রহণ করিলেন। কিন্তু তাঁহার চাকুরী গ্রহণ করার পরও 'কাযীউল কুযাত' পদটি বহুদিন পর্যন্ত অনিশ্চিতের মধ্যে রহিয়া গেল। কাযী আবু ইউসুফ নিজে বলিতেন 'মেহদী আমাকে বাগদাদের পূর্ব ভাগের কাযী নিযুক্ত করিলেন। অতঃপর মেহদী মারা গেলেন। হাদী ১৬৯ হিজরীতে খলীফা হইয়া আমাকে কাযীর পদেই বহাল রাখিলেন। পরে ১৭০ হিজরীতে খলীফা হইলেন এবং আমাকে সেই পদেই বহাল রাখিলেন।'

এই বর্ণনায় মনে হয় আবু জাফরের পরবর্তী তিনজন খলীফার শাসনকালে আবু ইউসুফ কাযীই ছিলেন। ইবন সা'দ বলেন, 'মেহদী তাহার পুত্র হাদীর সহিত কাযী আবু ইউসুফকে খোরাসান পাঠাইয়া দিয়াছিলেন।[১] হাদী নিজে জুরজানে থাকিতেন। মেহদী মারা যাওয়া পর্যন্ত তিনি হাদীর সহিত জুরজানেই ছিলেন। হাদী খলীফা হইয়া বাগদাদ আসাকলীন আবু ইউসুফও তাঁহার সঙ্গে আসেন এবং হাদী তাঁহাকে বাগদাদের কাযী নিযুক্ত করেন।" (মুফিক, ৭৪ পৃঃ, ৭ম জিলদ)।

সে যাহাই হউক বাগদাদে হউক বা জুরজানেই হউক কাযী আবু ইউসুফ একজন সাধারণ কাযী ব্যতীত আর কিছুই ছিলেন না। অর্থাৎ বহুদিন পর্যন্ত অন্যান্য কাযীদের নিয়োগ বা অপসারণ ক্ষমতা তাঁহাকে হস্তান্তর করা হয় নাই। অথচ ইমাম সাহেবের জীবদ্দশায় শেষ দিকে আবু জাফর এই ক্ষমতা হস্তান্তর করিতে তৈয়ার হইয়াছিলেন। ইহাতে মনে হয় ইমাম আবু হানীফা ও তাঁহার ছাত্রদের বিরুদ্ধে অন্য মতাবলম্বী কোন লোককে যে দাঁড় করাইতে পারিবেন এই আশা তাঁহারা পরিত্যাগ করিতে পারে নাই। পরিশেষে হারুন-উর রশীদ এই সিদ্ধান্তে পেঁাছিয়াছিলেন যে—'যে লোককে দাঁড় করাইয়া জনসাধারণের মনকে হানাফী

১. এ সম্বন্ধে কোন নির্ভরযোগ্য প্রমাণ পাওয়া যায় নাই। কিন্তু তিনি ইমাম আবু হানিফার খলীফা স্বরূপ ছিলেন। কোন রাজনৈতিক কারণেই হয়ত মেহদী তাহাকে হাদীর সাথে খোরাসান পাঠাইয়াছিলেন। কারণ খোরাসানবাসী অনেকেই ইমাম সাহেবের বড় ভক্ত ছিলেন। তাহা ছাড়া খোরাসানের অধিকাংশ শহরেও ইমাম সাহেবের অসংখ্য ছাত্র ছিল। ইমাম আবু হানীফার মৃত্যুতে দেশব্যাপী যে প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হইয়াছিল- উহা চাপা দেওয়ার জন্যই হয়ত কাযী আবু ইউসুফকে খোরাসান পাঠানো হইয়াছিল।

মতবাদ হইতে ফিরাইয়া লওয়া যায়—তেমন লোক বাগদাদে আসিতে রাযী নহেন। আর যাঁহারা বাগদাদ আসিতে চান তাঁহাদের মধ্যে হানাফী মতবাদের বিরোধিতা করার সামর্থ ছিল না। সুফইয়ান ইবন 'উওয়ায়নার চেয়ে প্রভাবশালী লোক আর কে হইতে পারে? কথিত আছে, সুফইয়ান ইবন 'উওয়ায়না প্রত্যক্ষভাবে আশী জন তাবিঈর নিকট ইলম শিক্ষা করিয়াছিলেন। ইমাম শাফিঈ বলিতেন, "ইমাম মালিক এবং সুফইয়ান ইবন উওয়ায়না না থাকিলে—হেজাযের ইলম অন্য লোকে শিক্ষা করিতে পারিত না।" অর্থাৎ হেজাযে যে হাদীস সম্পদ রহিয়াছিল উহা এই দু'জন মনীষী দ্বারাই প্রচারিত হইয়াছিল। হারুন উর রশীদ ইবন উওয়ায়না খুব সম্মান করিতেন। মক্কা শরীফ হইতে কোন লোক আসিলে প্রথমে হাশিমী বংশের সংবাদ লওয়ার পর জিজ্ঞাসা করিতেন "وما فعل سند الناس লোকের নেতা কেমন আছেন?"

বর্ণনাকারী বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'আপনি থাকিতে লোকের নেতা আবার কে?" হারুন বলিলেন "সুফইয়ান ইবন 'উওয়ায়না।" এতদসত্ত্বেও হারুন তাঁহার লিখিত সমস্ত গ্রন্থ যাচাই করিয়া দেখিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার কাজে আসার মত কিছু পান নাই।

আবু জাফর ইমাম আবু হানীফাকে যে কাযীউল কুযাতের পদ গ্রহণ করার প্রস্তাব করিয়াছিলেন তাহার পর হারুনের শাসনকাল পর্যন্ত কেহই এই পদের কথা উল্লেখ করে নাই। অধিকন্তু আমরা দেখিতে পাই তাহারা হানাফী শক্তিকে নির্মূল করার চেষ্টাতেই নিযুক্ত ছিলেন। যেই হজ্জের সময় হারুন ইমাম মালিক এবং সুফইয়ান ইবন উওয়ায়না হইতে নিরাশ হইয়া ফিরিয়া আসিলেন—উহার পরই তাহার দৃষ্টি পড়িল কাযী আবু ইউসুফ এবং ইমাম যুফারের উপর। ইমাম যুফার তো কোন মতেই স্বীকার করেন নাই। এখন বাকী ছিলেন আবু ইউসুফ, যিনি মেহদীর আমল হইতেই কাযীর পদ গ্রহণ করিয়াছিলেন।[১]

১। কাযী আবু ইউসুফ বলেন "আমার অবস্থা যখন এই পর্যায়ে পৌঁছিল যে—জীবনধারণের কোন উপায় বাকী রহিল না, তখন আমি একদিন শ্বশুর বাড়ীর একটি কড়িকাঠ বিক্রয় করার জন্য বাজারে পাঠাইয়া দিলাম। ইহা জানিতে পারিয়া আমার শ্বাশুড়ি বলিলেন "জামাই আমার মেয়েকে রোজগার করিয়া খাওয়াইবে, ইহা তো দূরের কথা—নিজে বাঁচার জন্য আমারই বাড়ীর কড়িকাঠ বিক্রয় করার জন্য বাজারে পাঠাইয়াছে।"

হারুন-উর রশীদের যুগ

কাযীউল কুযাত পদে আবু ইউসুফ

হাদীর সঙ্গে কাযী আবু ইউসুফের সম্পর্ক খুব ভাল ছিল। পরিশেষে এই কারণেই হারুন তাঁহার ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে ইচ্ছুক হইয়াছিলেন। মাকরিযী বলেন "হারুন-উর রশীদ খলীফা হওয়ার পর কাযী ইউসুফের হাতে বিচার বিভাগের দায়িত্ব অর্পণ করেন। এই আবু ইউসুফ ইমাম আবু হানীফার ছাত্র ছিলেন। ইহা ১৭০ হিজরীর পরের ঘটনা। ফলে ইরাক, খোরাসান, মিসর, সিরিয়া ইত্যাদি স্থানের কাযী ইমাম আবু ইউসুফের সম্মতি ব্যতীত নিয়োগ করা যাইত না।"

হাফিয ইবন আবদ রাবি হইতে ফারসা বর্ণনা করেন "প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের কাযী নিয়োগ করা কাযী আবু ইউসুফের এখতিয়ারভুক্ত ছিল।"

ইমাম আবু ইউসুফ বলেন "খলীফা মেহদীর উযীর আমাকে খলীফার নিকট লইয়া গেলেন। সলাতুল খওফ সম্বন্ধে আমাদের মধ্যে আলাপ-আলোচনা হইল। অতঃপর মেহদী আমাকে বাগদাদের পূর্ব ভাগের কাযী নিযুক্ত করিয়া আমাকে দশ হাজার দিরহাম দান করিলেন। মেহদীর পর হাদীর যুগেও আমি কাযী ছিলাম। হাদীর পর হারুন-উর রশীদের যুগ আসিলে তিনি আমাকে রাষ্ট্রের সর্বপ্রধান বিচারকের পদে নিয়োগ করিলেন।"

কাযীউল কুযাতের ক্ষমতা

হারুন-উর রশীদের শাসনকালেই কাযীউল কুযাতের পদ সৃষ্টি করা হয়। এই পদটির কথা আবু জাফর মনসুর চিন্তা করিয়া থাকিলেও সমস্ত ঐতিহাসিক একমত যে, হারুনুর রশীদের সময়ই উহা কার্যকরী

শ্বাশুড়ীর মুখে একথা শুনিয়া আমার ধৈর্যের বাঁধ ভাঙিয়া গেল। অতঃপর আমি কাযীর চাকুরী গ্রহণ করিলাম।

কিন্তু কাযী আবু ইউসুফও প্রথমে সরকারী চাকুরী গ্রহণ করিতে ইচ্ছুক ছিলেন না। কিন্তু অপারগ হইয়াই কাযীর পদ করিয়াছিলেন। ইমাম সাহেবের অন্য ছাত্র হাফসা ইবন গিয়াছেন "মুরদার মাংস খাওয়া যখন আমার জন্য হালাল হইয়াছে তখনই আমি কাযীর পদ গ্রহণ করিয়াছিলাম।"

হয়। এথাও সর্বজনসম্মত যে, এই পদের অর্থ উহাই ছিল যাহার ব্যাখ্যা মাকরিযী এবং 'আবদ বার' করিয়াছেন। অন্যার্থে বিচার বিভাগীয় যাবতীয় ক্ষমতা কাযী আবু ইউসুফের উপর ন্যস্ত করা হইয়াছিল। আবুল ওয়ালিদ তাজালিসীর বর্ণনামতে কাযীউল কুযাতকে আইন মন্ত্রীও বলা হইত। কিন্তু হারুন-উর রশীদ যখন এই পদের প্রতিষ্ঠা করেন এবং কাযী আবু ইউসুফের হাতে উহার যাবতীয় দায়িত্ব অর্পণ করেন তখনকার ঘটনাবলীর বিস্তারিত বর্ণনা থাকিলে লোকের সম্মুখে উহা আরও স্পষ্টতর হইয়া উঠিত। এতটা অবশ্য মনে হয় যে, কাযী আবু ইউসুফের অত্যাধিক সম্মান এবং সীমাহীন ক্ষমতার অধিকারী দেখিয়া কোন কোন লোক হারুনের নিকট অভিযোগ করিয়াছিল।

হারুন তাহাদের অভিযোগের উত্তরে বলিয়াছিলেন "আমি যাহা কিছু করিয়াছি দেখিয়া শুনিয়াই করিয়াছি। অনেক অভিজ্ঞতা অর্জনের পরই আমি এই সিদ্ধান্তে পৌঁছিয়াছি। আল্লাহর কসম! এই ব্যক্তিকে যেভাবেই যাঁচাই করিয়াছি তাঁহাতেই তিনি উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছেন।"

ইহার সাথে হারুন তাহার ছাত্রাবস্থার কোন কোন অভিজ্ঞতার কথাও বলিলেন। বোধ হয় সেই সময় হইতেই তাঁহার প্রতি হারুনের টান ছিল। পরিশেষে তিনি কাযী আবু ইউসুফের ধর্মীয় ব্যাপার সম্পর্কে তাঁহার যে অনুভূতি ছিল উহার সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন "এই জ্ঞান ও বিদ্যাবুদ্ধির চরম উৎকর্ষতার সাথে সাথে ধর্মীয় ব্যাপারেও আমি তাহাকে সঠিক পাইয়াছি। তাহার ধর্ম-বিশ্বাসে কোন প্রকার ভেজাল নাই। তাহার মত কোন লোক থাকিলে আনিয়া উপস্থিত কর।" (মুনাফিক, ২৩২ পৃঃ, ২য় জিলদ)।

বিচার বিভাগের উপর ইমামের সাধনার প্রতিক্রিয়া

কাযী আবু ইউসুফ এবং হারুন সম্বন্ধে যে বহু চিত্তাকর্ষক ঘটনা বর্ণিত আছে এবং দরবারে তাঁহার সহিত যে সম্মানিত ব্যবহার করিতেন উহাতে মনে হয় কাযী সাহেব খলীফার উপর বিরাট প্রভাব বিস্তার করিয়াছিলেন। বনী উমাইয়ার শাসনকালের একটি যুগ এমনও ছিল যে কাযী হওয়ার জন্য লেখাপড়া শিখারও প্রয়োজন ছিল না। চল্লিশজন শায়খ সাক্ষী দিয়াছিলেন—'খলীফা আইন-কানুন ও কৈফিয়তের বাহিরে।' 'আব্বাসী হুকুমতেও দেখিয়াছিলেন, কাযী শরীফের সাথে প্রতিশ্রুতি দেওয়ার পরও শাহী মহলের এক দাসীর মামলা সংক্রান্ত ব্যাপারে তাঁহাকে বরখাস্ত করা হইয়াছিল।

কিন্তু ইমাম আবু হানীফার সাধনা এবং তাঁহার মৃত্যুর বিশেষ কারণের পরই যদিও বিচার বিভাগের বহু প্রকার সংশোধনের নজীর দেখা গিয়াছিল—একদিকে হুকুমতও বিশেষভাবে প্রভান্বিত হইয়াছিল, অন্যদিকে সমস্ত রাষ্ট্রব্যাপী ইমাম সাহেবের ছাত্রদের চারিত্রিক ও কার্যাবলীর নমুনা এমনভাবে বিস্তৃত হইয়া রহিয়াছিল যে, বিচারকগণ খেয়াল-খুশীমত কোন ফয়সালা করিতে পারিতেন না।

আবু জাফর মনসুরের পরই মেহদী খলীফা হন। সেই যুগের একটি কাহিনী বর্ণিত আছে যে—বুখারার কাযী ছিলেন আবু ইউসুফের ছাত্র মুজাহিদ ইবন আমর। মেহদী একটি বিশেষ মাসআলার জওয়াবের জন্য তাহার নিকট লোক পাঠাইলেন। মেহদী যে জওয়াব চাহিয়া পাঠাইয়াছিলেন মুজাহিদ তাহা দিলেন না। অধিকন্তু সংবাদ-বাহক কাযীর নামে মেহদীর নিকট একটি উস্কানীমূলক মিথ্যা কথা বলিল। এই সংবাদবাহক ছিল বোখারারই লোক। এদিকে কাযী মুজাহিদও তাহার মিথ্যা কথার সংবাদ অবগত হইতে পারিয়াছিলেন। সংবাদবাহক ফিরিয়া আসিলে মিথ্যা কথার দায়ে মুজাহিদ তাঁহাকে চাবুক মারিলেন। মুজাহিদের ছাত্রগণ চিন্তায় পড়িয়া গেলেন। শাহী সংবাদদাতাকে চাবুক মারা হইয়াছে—না জানি কি হয়। কিন্তু হাওয়া পরিবর্তন হইয়া গিয়াছিল। মেহদী যখন সংবাদ পাইলেন যে, মিথ্যা বলার দায়ে সংবাদবাহককে চাবুক মারা হইয়াছে তখন তিনি ক্রুদ্ধ হওয়ার পরিবর্তে আনন্দ প্রকাশ করিয়া কাযী মুজাহিদকে পুরস্কৃত করিলেন।

হাদীর সময়ের ঘটনা। কাযী আবু ইউসুফকে তখন বাগদাদের কাজী একজন প্রজা ও খলীফার মধ্যে একটি বাগান লইয়া বিরোধ দেখা দিল। হাদী আদেশ দিলেন—'কাযীর কোর্টে মামলা দায়ের করা হউক।' খলীফার পক্ষ হইতে সাক্ষীরা যে সাক্ষী দিল—যদি উহার উপর ভরসা করা হইত তবে বাগান খলীফারই হইয়া যাইত। অথচ কাযী সাহেব অনুসন্ধানে জানিতে পারিয়াছিলেন—বাগান যথার্থ পক্ষে প্রজার। সুতরাং কি করা যায়—এই চিন্তায় তিনি মুকদ্দমা মুলতবী করিয়া রাখেন।

খলীফার সহিত সাক্ষাত হইলে জিজ্ঞাসা করিলেন—'আমার মামলায় আপনি কি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন ?'

কাযী বলিলেন, 'জীহাঁ! আপনার সাক্ষীরা সাক্ষী দিয়াছে। কিন্তু আসামী পক্ষ আরয করিয়াছে যে—খলীফা শপথ করিয়া বলিবেন যে—তাহার সাক্ষীদের কথা সত্য।'

হাদী চিন্তিত হইয়া বলিলেন, 'আপনি কি বলেন ?' অথচ হানাফী মতে ফরিয়াদীর শপথ করিতে হয় না এবং আবু ইউসুফও সে মত পোষণ করিতেন। কাযী সাহেব বলিলেন—'কাযী ইবনে আবী লায়লার এই মতই ছিল। হাদী বলিলেন', 'না আমি শপথ করিব না। আপনি তাহাকেই বাগান দিয়া দেন।'

ইহা একটি সাধারণ ঘটনা হইলেও তখনকার খলীফাদের যে পরিবর্তন হয়াছিল উহা সহজেই ধরা যায়। মেহদী হউক বা হাদী উভয়েই একচ্ছত্র অধিপতি ছিলেন। বনী উমাইয়া খলীফাদের কাহিনী অবশ্যই তাহারা জানিতে পারিয়াছিলেন। কিন্তু আমরা দেখিতে পাই যে—মুজাহিদ আইন মুতাবিক কাজ করায় ক্রুদ্ধ হওয়ার পরিবর্তে আনন্দ প্রকাশ করিয়াছিলেন। তদ্রূপ হাদীর পক্ষে বড় কথা এই যে, তাহার মামলা তিনি কোর্টে দায়ের করিয়াছিলেন। ইহার চেয়েও বিস্ময়কর কথা এই যে—যে বাগান তিনি নিজে ভোগ করিয়া আসিতে-ছিলেন—ইহা তিনি হস্তান্তর করিয়া দিয়াছিলেন।

খলীফাদের চরিত্র ও কার্যধারার উপর ইমামের সাধনার প্রতিক্রিয়া

হারুন-উর রশীদের আমলেও একটি কাহিনী উল্লেখ করিতেছি। ইমাম আবু হানীফারই ছাত্র হাফস ইবন গিয়াস তখন বাগদাদের কাযী। হারুনের বেগম যুবায়দার জায়গীরের এক মাজুসী নায়েব কোন খোরাসানীয় নিকট হইতে ত্রিশ হাযার দিরহাম মূল্যের কয়েকটি উট খরীদ করিয়া উহার দাম দিতে টাল-বাহানা করিতেছিল। বিক্রেতা অবশেষে কাযীর কোর্টে মামলা দায়ের করিল।

মাজুসীকে কোর্টে তলব করা হইলে সে ঘটনা স্বীকার করিল এবং বলিল, 'দাম বাকী রহিয়াছে।' কাযী হাফস বলিলেন, 'তবে পরিশোধ করিয়া দাও।' মাজুসী বলিল, 'আমি তো বেগমের নায়েব; দাম বেগমের নিকট চাওয়া উচিত।' কাযী সাহেব বলিলেন, 'খরীদ করিয়াছ তুমি—দাম কেন বেগম দিবেন ?' অতঃপর বিক্রেতার দিকে চাহিয়া বলিলেন, 'বল! তুমি কি করিবে ?' বিক্রেতা বলিল, 'আমার টাকা যদি সে না দেয় তবে তাহাকে কয়েদখানায় পাঠাইয়া দিন।'[১]

কাযী সাহেব মাজুসীকে বলিলেন, 'দেখ, এখন তুমি কি করিবে ?'

১. ইসলামী কানুন মতে দাবীদার পাওনাদারকে কারাগারে পাঠাইতে পারে।

মাজ্‌সী একই কথা বলিল, 'টাকা বেগম সাহেবা দিবেন।' ইহার পর কাযী সাহেব তাহাকে কয়েদখানায় পাঠাইয়া দিলেন।

বেগম যুবায়দা একথা শুনিয়া তাঁহার দাস সিনদীকে আদেশ করিলেন, 'আমার নায়েবকে কয়েদখানা হইতে লইয়া আস।' তাহাই হইল।

কাযী আবু হাফস এই সংবাদ পাইলেন। তিনি ছিলেন ইমাম আবু হানীফার কাছে শিক্ষা পাওয়া কাযী। তিনিও বলিলেন, 'বেগমের নায়েবকে কয়েদখানায় ফিরাইয়া দিতে হইবে। তাহা না হইলে আমিও আর এজলাসে গিয়া বসিব না।'

এই সংবাদ সিনদী জানিতে পারিয়া মনে করিল সমস্ত তুফান আমার মাথার উপর দিয়া যাইবে। সে কাঁদিতে কাঁদিতে বেগমকে গিয়া বলিল, 'হুযুর! ইহা কাযী হাফসের কারবার। আমীরুল মুমিনীন যদি জিজ্ঞাসা করেন—কাহার আদেশে তুই মাজ্‌সীকে কয়েদখানা হইতে বাহির করিয়া আনিয়াছিস? তখন আমি কি উত্তর দিব? আমার মাথার উপর যে আকাশ ভাঙিয়া পড়িবে। আপনি আদেশ করুন আমি মাজ্‌সীকে পুনরায় কয়েদখানায় রাখিয়া আসি।' বেচারা সিনদীর অবস্থা দেখিয়া যুবায়দার করুণা হইল। তিনি বলিলেন, 'আচ্ছা যাও, তাহাকে কয়েদখানায় রাখিয়া আস।' ইত্যবসরে হারুন বেগমের কুঠিতে আসিলেন। বেগম বলিলেন—

'হারুন! তোমার এই কাযী বড়ই নাদান! সে আমার নায়েবকে কয়েদখানায় পাঠাইয়া আমার অসম্মান করিয়াছে। তুমি তাহাকে পদচ্যুত কর।'

হারুন দারুন সমস্যায় পড়িলেন। যুবায়দার মলিন মুখ তাহার পক্ষে অসহনীয়। তিনি কাযীকে লিখিলেন, 'এই মাজ্‌সীর ব্যাপারটা ক্ষমা করুন।' এদিকে কাযী সাহেবের গোয়েন্দা সংবাদ দিল, খলীফার এইরূপ নির্দেশ আসিতেছে।

কাযী হাফস এই সংবাদ শুনিয়া বিক্রেতাকে বলিলেন, 'এখনই তোমার সাক্ষী হাযির কর। খলীফার নির্দেশ পৌঁছার আগেই যেন অবশিষ্ট কাজ সমাধা করিয়া আদালতের সীলমোহর লাগাইয়া দিতে পারি।' তাহাই করা হইল। কাযী সাহেব ফয়সালায় সীলমোহর লাগাইতেছিলেন এমন সময় খলীফার ফরমান লইয়া হাযির হইয়া বলিল, 'এই যে আমীরুল মুমিনীনের ফরমান।' কাযী সাহেব বলিলেন,

'একটু দাঁড়াও হাতের কাজ শেষ হইয়া যাক।' ফরমানবাহক বার বার বলিতেছিল 'আমীরুল মুমিনীনের ফরমান! কাযী সাহেবও বলিতেছিলেন, 'একটু অপেক্ষা কর হাতের কাজ শেষ হইয়া যাক।'

ফয়সালার কাগজে সীলমোহর লাগানোর পর খলীফার ফরমান হাতে লইয়া পাঠ করার পর বলিলেন, 'আমীরুল মুমিনীনকে আমার সালাম দিয়া বলিও তাঁহার ফরমান পাওয়ার পূর্বেই আমি কাজ শেষ করিয়া ফেলিয়াছি।'

ফরমানবাহক বলিল, 'আপনি যে ইচ্ছা করিয়াই ফরমান পাঠ করেন নাই এবং কাজের ফয়সালা করিয়া ফেলিলেন উহা আমি স্বচক্ষে দেখিয়াছি। ইহা আমি খলীফার কর্ণ-গোচর করিব।' কাযী হাফ্‌স বলিলেন—'তোমার যাহা খুশী তাহাই বলিও।'

ফরমানবাহক ফিরিয়া আসিয়া খলীফাকে তাহাই বলিল—বর্ণনাকারী বলেন—'আমরা দেখিয়া অবাক হইয়া গেলাম যে খলীফা ইহা শুনিয়া হাসিয়া ফেলিলেন। এইখানেই শেষ নয়। অধিকন্তু তিনি কোষাধ্যক্ষকে আদেশ দিলেন—'ত্রিশ হাযার দিরহামের একটি থলে এখনই কাযী হাফ্‌সের খেদমতে পাঠাইয়া দাও।'

হারুনের মন্ত্রী ইয়াহইয়া তখন দরবারে ছিলেন। তিনি জানিতেন না কোন্ কথা খলীফা লিখিয়াছিলেন আর কাযী হাফ্‌স কি উত্তর দিলেন শুধু এতটাই দেখিলেন যে—'খলীফা ত্রিশ হাযার দিরহামের একটি থলে কাযী সাহেবকে দেওয়ার নির্দেশ দিলেন। তিনি সেখান হইতে কাযী হাফ্‌সের নিকট আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'আজ আপনি এমন কি কাজ করিয়াছেন যে—খলীফা আপনার প্রতি এত সন্তুষ্ট।'

কাজী সাহেব পূর্বাপর সকল ঘটনা খুলিয়া বলিলেন। কিন্তু যুবায়দা এই সংবাদ অবগত হইতে পারিয়া অগ্নিশর্মা হইয়া রহিলেন। হারুন প্রাসাদে ফিরিয়া আসার পর বেগম ক্রোধে কাঁপিতে কাঁপিতে বলিলেন—'কাযী হাফ্‌সকে পদচ্যুত না করা পর্যন্ত না তুমি আমার, আর না আমি তোমার।'

তখন হারুনের উপরও খেলাফত ও ব্যক্তিত্বের নেশা চাপিয়া বসিয়াছিল। তিনি বলিলেন—'প্রাণ দিব তবুও ঈমান দিব না।'

খলীফার কথা শুনিয়া যুবায়দার হুঁশ ফিরিয়া আসিল। ভাবিলেন অভিমানে আজ আর কাজ হইবে না। নিজের হিংসা চরিতার্থ করার জন্য তিনি এবার তোষামোদের পথ ধরিলেন। কাজ এতটা উদ্ধার

করিলেন যে, কাযী হাফ্‌সকে বাগদাদ হইতে কূফা বদলী করিলেন। (খতীব, ১৯৮ পৃঃ, ৮ম জিলদ)

কাযী আবূ ইউসুফ যখন 'কাযীউল কুযাত' পদে বহাল হন নাই এই ঘটনা তখনকার। তিনি 'কাযীউল কুযাত' হওয়ার পর হুকুমত ও আইনের মধ্যে যে সম্পর্ক গড়িয়া উঠিয়াছিল—উহা আজও বিস্ময়কর হইয়া রহিয়াছে। বনী উমাইয়াদের আমল হইতে যে একটি জঘন্য নিয়ম চলিয়া আসিতেছিল উহাকে নির্মূল করত ইসলামী বিচার বিভাগের শক্তি ও আদর্শ যে কত উন্নত হইয়াছিল উহা নিম্ন ঘটনায় উপলব্ধি করা যাইতে পারে। কাযী আবূ ইউসুফ কোন এক উযীরকে পূর্ণ এজলাস চলার সময় বলিয়াছিলেন—'তোমার সাক্ষী গ্রহণযোগ্য নয়।'

উযীর একথায় অপমানিত হইয়া এজলাস হইতে সোজা খলীফার নিকট আসিয়া পেঁাছিলেন এবং কাযী আবূ ইউসুফের নামে অভিযোগ করিলেন। হারূন কাযী সাহেবকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—'কেন ইহার সাক্ষী গ্রহণযোগ্য নয় ?' কেহ বলেন—কাযী সাহেব বলিয়াছিলেন—'আমি নিজের কানে শুনিয়াছি আপনার উযীর বলেন—যে, তিনি খলীফার বান্দা অথবা দাস।'[১] অন্য বর্ণনায় দেখা যায়—কাযী বলেন—এই ব্যক্তি জামাআতের সাথে নামায আদায় করে না সুতরাং এরূপ লোকের সাক্ষী গ্রহণ করা শরীয়তবিরোধী কাজ।'

হারূন একথা শুনিয়া শুধু চুপ করিয়াই রহিলেন। পরে আরও বর্ণিত আছে যে এই ঘটনার পর উক্ত উযীর নিজের বাড়ীতে মসজিদ তৈয়ার করাইয়া রীতিমত জামাআতের সাথে নামায আদায় করিতেন। আমি তো মনে করি যে, হারূনের ইঙ্গিতেই মসজিদ তৈয়ার করানো হইয়াছিল বলিয়া বিশ্বাস করিলে, আশ্চর্য হওয়ার কিছুই নাই।

কাযীদের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব

ইহাতো ছিল একজন উযীরের কথা। হারূনের সময় পর্যন্ত আইনের শক্তি এতটা বর্ধিত হইয়াছিল যে, খলীফার পক্ষ হইতে কাযী আবূ

১। ইহাতে বুঝা যায় তৎকালীন কিছু আমীর উমরাহ খলীফাকে তোষামোদ করার জন্য নিজকে খলীফার বান্দা বলিতেন। আসলে তাহারা ছিলেন খলীফার কোষাগারের টাকা-পয়সার দাস। কাযী আবূ ইউসুফ এই জাতীয় লোকের সাক্ষী গ্রহণ করিতেন না। একজন পদস্থ ফৌজী কর্মচারী এরূপ কথা বলায় কাযী ইউসুফ তাহার সাক্ষী গ্রহণ করেন নাই।

ইউসুফ বলেন, 'আমার দুর্বলতার কথা মনে হইলে আমারই কষ্ট হয়। আর সেই ঘটনাও ছিল একটি বাগান সম্পর্কীয়।' হারুনের একটি বাগান ছিল। শহরতলীর এক বৃদ্ধ দাবী জানাইল—উহা তাহারই বাগান। খলীফা জোরপূর্বক দখল করিয়া রহিয়াছেন। যেদিন হারুন নিজে বিচার-কার্য পরিচালনা করিতে বসিয়াছিলেন—বৃদ্ধ সেদিনই কাযী আবু ইউসুফের সম্মুখে এই দাবী পেশ করিল। কাযী সাহেব চাহিয়াছিলেন—মালীদের নামে মামলা দায়ের করা হউক। কিন্তু বৃদ্ধ বলিল, 'না, স্বয়ং আমীরুল মুমিনীন দখল করিয়াছেন—তাঁহার নামেই মামলা হইবে।'

কাযী সাহেব হারুনকে বলিলেন, 'বৃদ্ধ আপনার নামেই নালিশ করিয়াছে—আদেশ করিলে তাহাকে হাযির করিতে পারি।' হারুন বলিলেন, 'তাহাই হউক।' বৃদ্ধকে হাযির করা হইল। কাযী সাহেব জিজ্ঞাসা করিলেন, 'তোমার কি নালিশ'। হারুন যে আসনে বসা ছিলেন তাহার ডান পাশে অন্য আসনে বসা ছিলেন উযীর ইয়াহইয়া ইবন খালিদ বারমাকী।

বৃদ্ধ বলিল, 'আমীরুল মুমিনীন অন্যায়ভাবে আমার বাগান দখল করিয়াছেন।

কাযী, 'তোমার প্রমাণ কি ?'

বৃদ্ধ, 'আমীরুল মুমিনীন শপথ করুন—উহাই আমার প্রমাণ।' কাযী সাহেব খলীফাকে বলিলেন, 'তবে তো আপনাকে শপথ করিতে হয়।'

হারুন শপথ করিয়া বলিলেন, 'আমার পিতা আমাকে এই বাগান দান করিয়াছেন। আমি সেই সূত্রেই ইহার মালিক।'

বৃদ্ধ বলিলেন, 'ছাতু খাওয়ার মত সহজভাবেই শপথ করা হইল।' একজন সাধারণ প্রজার মুখে একথা শুনিয়া হারুন ক্রোধে লাল হইয়া গেলেন।

কিন্তু ইয়াহইয়া কাযীকে বলিলেন—

ইউসুফ, 'তুমি দেখিয়াছ কি একজন সাধারণ প্রজার সঙ্গে আমীরুল মুমিনীন কি ব্যবহার করিলেন ? এইরূপ আদালত ও ইনসাফের নজীর দুনিয়ার ইতিহাসে খুঁজিয়া পাইবে কি ?'

কাযী আবু ইউসুফ বলিলেন, 'সুবাহাল্লাহ্। সে কি আর বলতে ?

আরও বলিলেন, 'ইনসাফ ব্যতীত আর পথও তো ছিল না।' ইয়াহইয়া বলিলেন, 'হযরত ফারুকে আযম হইতে এরূপ আশা করা যাইত।'

তাহাদের উভয়ের আলাপ-আলোচনায় হারুনের ক্রোধ স্তিমিত হইয়া গেল। হুকুমত আইনের সম্মুখে কেমনভাবে মাথা নত করিয়া দিয়াছিল। এই ঘটনার পর কাযী আবু ইউসুফ বলিতেন, 'এই ঘটনার কথা যখনই আমার স্মরণ হয় তখনই আমার ভয় হয়—এই ইনসাফ সম্পর্কে আমি যে দুর্বলতা দেখাইয়াছি আল্লাহ্‌র নিকট উহার কি উত্তর দিব?

লোকে জিজ্ঞাসা করিত, 'আপনি আপনার দুর্বলতা কোথায় দেখাইলেন। খলীফাকে পর্যন্ত শপথ গ্রহণ করাইলেন—ইহার চেয়ে বেশী করারই বা কি ছিল?'

কাযী আবু ইউসুফ পরিতাপ করিয়া বলিতেন, 'ভাই! আমি আমীরুল মুমিনীনকে একথা বলিতে পারি নাই যে, আপনি আসন ছাড়িয়া উঠিয়া আসিয়া ফরিয়াদীর সমস্থানে দাঁড়ান অথবা আপনার ন্যায় ফরিয়াদীর জন্যও আসনে বসার ব্যবস্থা করিয়া দিন। আফ্‌সোস! আমি একথা বলিতে পারি নাই।' (মুফিক, ২৪৪ পৃঃ, ২য় জিলদ)

এখন দেখুন, এই কাযী আবু ইউসুফই হাদীর সময় কাযী ইবন আবী লায়লার আশ্রয় গ্রহণ করিয়া যথার্থ মালিককে তাহার বাগান ফেরত দেওয়াইয়া ছিলেন। অথচ স্পষ্ট কথায় বলিতে পারেন নাই—ফরিয়াদীরই বাগান। কিন্তু ক্রমবর্ধমান অবস্থায় হারুনের সময় আইনের শক্তি এতটা উন্নত হইয়াছিল যে, হারুনও একজন সাধারণ প্রজার মধ্যে সমতা রক্ষা করিতে না পারায় সারাটা জীবন পরিতাপ করিয়া গিয়াছেন। তিনি আশা করিয়াছিলেন যে, হারুনকে এই ব্যাপারটা বুঝাইয়া দিলে তিনিও বিনা প্রতিবাদে ফরিয়াদীর সমপর্যায়ে আসিয়া দাঁড়াইতেন। কাযী আফিয়া উদী তখন বাগদাদের কাযী। কোন মামলার একপক্ষ খলীফার নিকট নালিশ করিল, কাযী সাহেব অন্য পক্ষের প্রতি পক্ষপাতিত্ব করিয়াছেন। এই অভিযোগকারীও ছিলেন একজন বিখ্যাত ধনী। হারুন একথা শুনিয়া খুবই বিরক্ত বোধ করিলেন। তিনি আফিয়াকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। কাযী আফিয়া আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

আহবানের কারণ বলার পূর্বেই হারুনের হাঁচি আসিল। ইয়ারহামুকাল্লাহ্ দুআর শব্দে দরবার কক্ষ গুঞ্জরিত হইয়া উঠিল। এই দুআ

করাকে তাশমিয়াত বলা হয়। হাঁচি-দাতা হাঁচি দেওয়ার পর আলহামদুলিল্লাহ বলিলেই 'ইয়ারহামুকাল্লাহ' (আল্লাহ তোমাকে রহম করুন) বলিতে হয়। কিন্তু হারুন 'আলহামদুলিল্লাহ' বলেন নাই। অথচ তোষামোদকারী দরবারীর দল মনে করিল খলীফার 'আলহামদুলিল্লাহ' বলার আবার প্রয়োজন কি? তাহার হাঁচি দেওয়াইতো উক্ত দুআ করার জন্য যথেষ্ট।

হারুন দেখিলেন সকলেই 'তাশমিয়াত' বলায় ব্যস্ত অথচ কাযী আফিয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিয়াছেন। কারণ জিজ্ঞাসা করায় কাযী আফিয়া বলিলেন, 'আপনি কখন 'আলহামদুলিল্লাহ' বলিলেন যে, আমি 'ইয়ারহামুকাল্লাহ' বলিব।' এই প্রসঙ্গে একখানি হাদীসে বলা হয়েছে যে, "নবীজীর দরবারে দুইজন সাহাবা হাঁচি দিলেন। নবীজী একজনের জন্য তাশমিয়া বলিলেন। অন্যজন জিজ্ঞাসা করিলেন, 'ইয়া রসুলুল্লাহ! আমার জন্য কেন তাশমিয়া বলিলেন না।' নবীজী এরশাদ করিলেন, 'তুমি 'আলহামদুলিল্লাহ' বল নাই তাই।'

কাযী সাহেবের কথা শেষ হইলে হারুন বলিলেন, 'যান আপনি আপনার কাজ করুন গিয়া। যে ব্যক্তি আমার হাঁচি দেওয়ার কোন প্রকার রেয়ায়াত করিল না সে যে মামলা-সংক্রান্ত ব্যাপারে কি রকম পক্ষপাতিত্ব করিবে উহা আমার জানা আছে।'

খলীফার মুখে একথা শুনিয়া অভিযোগকারী মাথা নীচু করিয়া রহিলেন।

ইমাম সাহেবের মৃত্যুর পর আব্বাসী হুকুমতের অধিকাংশ কাযীর পদগুলি তাহার ছাত্রদ্বারা পরিপূর্ণ করা হইয়াছিল। খলীফাই হউন আর প্রাদেশিক শাসনকর্তাই হউন প্রত্যেকেই তাহাদের বিচার কার্যের এমন অভিজ্ঞতা অর্জন করিয়াছিলেন।

কাযী আবু ইউসুফের গ্রন্থ কিতাবুল খারাজের ভূমিকার পর্যালোচনা

হারুনের সময় পর্যন্ত আইন ও শরীয়তের মূল হুকুমতের মুকাবিলায় কতদূর মযবুত হইয়াছিল—আবু ইউসুফের প্রসিদ্ধ গ্রন্থ 'কিতাবুল খারাজ'-এর ভূমিকা পাঠ করিলেই উহা উপলব্ধি করা যায়। উহা এমনই প্রমাণ যাহাতে কোন প্রকার সন্দেহের অবকাশ নাই। উদাহরণস্বরূপ কিছুটা অংশের অনুবাদ লিপিবদ্ধ করিতেছি। প্রমাণের জন্য ইনশাআল্লাহ উহাই যথেষ্ট হইবে।

একথা সকলেই হয়ত অবগত যে, হারুণের নির্দেশমত আবু ইউসুফ রাজস্ব-দাতা, রাজস্ব নির্ধারণ ও আদায়ের শরীয়ত মুতাবিক বিধি-ব্যবস্থা ও আইন-প্রণয়ন করিয়াছিলেন। অতঃপর হুকুমতের আমদানী ও উহার প্রকার-ভেদ সম্পর্কীয় একখানা গ্রন্থ লিখিয়া দেওয়ার অনুরোধ করিলে ইমাম আবু ইউসুফ খলীফাকে উদ্দেশ্য করিয়া লিখিয়াছিলেন—

আমীরুল মুমিনীন! আল্লাহর শুকরিয়া যে, আপনাকে একটি মহান দায়িত্ব অর্পণ করা হইয়াছে। ইহার পুণ্যও যেমন অধিক শাস্তিও তেমনি কঠিন। মুসলমানদিগকে আপনার উপর সোপর্দ করা হইয়াছে। আপনাকে দায়িত্ব দেওয়া হইয়াছে যে, আপনি আল্লাহ্‌র সৃষ্টির অধিকারসমূহের বুনিয়াদ মযবুত করিয়া দিবেন। আপনি উহার রক্ষক। এই দায়িত্ব অর্পণ করিয়া আল্লাহ আপনাকে পরীক্ষা করিতেছেন। আমি একথা বলিয়া দিতে চাই যে—যাহার বুনিয়াদ আল্লাহ্‌র ভয়ের উপর নয় উহার সম্বন্ধে ভয় রাখিতে হইবে যে, না জানি কখন আল্লাহ উহাকে ধ্বংস করিয়া দেন।'

অতঃপর বহু প্রকার নসীহত করার পর লিখিয়াছেন, 'যে নরপতি প্রজাপতিদিগকে সন্তুষ্ট রাখার জন্য সর্বদা সচেষ্ট তিনিই কেয়ামতের দিন অধিক ভাগ্যবান হইবেন। আপনি পথভ্রষ্ট হইলে প্রজাসাধারণও পথভ্রষ্ট হইবে। দ্বীন ও দুনিয়ায় যখন যুদ্ধ আরম্ভ হইবে তখন দ্বীনকেই শ্রেষ্ঠত্ব দিতে হইবে এবং উহাই বাকী থাকিবে।'

অতঃপর কেয়ামতের চিত্র অঙ্কিত করিয়া হারুনকে বলেন,—'আপনি যেন আল্লাহ্‌র সাথে এই অবস্থায় সাক্ষাত না করুন যাহারা আল্লাহ্‌র নির্ধারিত সীমা লঙ্ঘন করিয়া অপরাধী হইয়াছে। প্রতিটি লোকই তাহার কার্যফল পাইবে। দুনিয়ায় কে কি ছিল সেই দিন উহার প্রতি দৃকপাত করা হইবে না।'

অতঃপর হারুনের নিকট এই আকাংক্ষা প্রকাশ করিয়াছেন—'আপন হউক বা পর লোকের সাথে আল্লাহ্‌র কানুন মত সম ব্যবহার করাই আপনার কর্তব্য। ইহাতে কে কি বলিবে—সেদিক আপনি ভ্রুক্ষেপও করিবেন না।' গ্রন্থের বিষয়বস্তু আরম্ভ করার পূর্বে লিখিয়াছেন—

'আপনি যে নির্দেশ দিয়াছিলেন সে মতে আমি এই গ্রন্থ লিখিয়া দিলাম। আপনার জন্য যেমন হওয়া উচিত তেমনিভাবে আমি উহার ব্যাখ্যা করিয়া দিয়াছি। এখন আপনার কাজ উহা বার বার পাঠ করা, উহার সম্বন্ধে চিন্তা করা। তাহা হইলে এই গ্রন্থ আপনার কণ্ঠস্থ

হইয়া যাইবে। আপনার ও মুসলমানদের যাহাতে মঙ্গল সাধন হয় উহাতে আমি কোন কোন প্রকার আলস্য করি নাই।'

আব্বাসী শাহযাদাদের হানাফী ফিকাহ অধ্যয়ন

কাযী আবু ইউসুফের গ্রন্থ 'কিতাবুল খারাজ' এবং উক্ত গ্রন্থের ইঙ্গিতের আকার-প্রকার দেখিলে একথা কখনও অবিশ্বাস করা যায় না যে, অন্যান্য বিষয় শিক্ষার সাথে সাথে তিনি হানাফী ফিকাহ শাস্ত্রও অধ্যয়ন করিতেন। এবং কোন প্রকার অধ্যয়ন? হারুনের পুত্র মামুন যিনি খোরাসানের শাসনকর্তা ছিলেন নজর ইবন শামায়েল মার্ভ পেঁছার পর মামুনের দরবারে বেশ আধিপত্য বিস্তার করেন। নজরের ইচ্ছা ছিল হুকুমতের মধ্যে হানাফী ফিকাহ এবং ফিকাহবিদগণ যে প্রভাব বিস্তার করিয়াছিলেন উহা নির্মূল করিয়া দেন। হানাফী বিরুদ্ধ মারভের একদল আলিমও তাহার সাথী হইলেন।

মামুন যখন এই বিরুদ্ধাচারণের সংবাদ পাইলেন তখন উভয় দলের 'আলিমদের আহবান করিয়া নিজেই ইহার মীমাংসা করিতে চাহিলেন। সকলে উপস্থিত হইলে মামুন নযরকে জিজ্ঞাসা করিলেন—'হানাফী ফিকাহর বিরুদ্ধে কেন আপনারা লাগিয়াছেন?'

নযর ইবন শামায়েল তো কোন কিছুই বলিতে পারিলেন না। তাহার দলীয় আহমাদ ইবন মুহায়র দাঁড়াইয়া বলিলেন—'অনুমতি হইলে আমি বলিতে পারি।'

মামুন বলিলেন—'আমি তো সে কথাই শুনিতে চাই।' আহমাদ বলিলেন—'ইমাম আবু হানীফা অমুক অমুক মাসআলার কুরআন ও হাদীসের স্পষ্ট বিরোধিতা করিয়াছেন।

মামুন—আপনি কিভাবে বুঝিতে পারিলেন? অতঃপর তিনি দরবারে উপস্থিত কাযী খালিদ ইবন সাবাহ হানাফীকে জিজ্ঞাসা করিলেন—'আচ্ছা, আপনি বলুন তো আহমাদ বর্ণিত মাসআলাসমূহে ইমাম আবু হানীফা কি ফতওয়া দিতেন?'

কাযী সাবাহ ইমাম সাহেবের ফতওয়ার উল্লেখ করিলেন। আহমাদ বলিলেন—'এই মাসআলাসমূহে হুযুর (সঃ) এমন বলিয়াছেন আর ইমাম সাহেব উহার বিরুদ্ধে ফতওয়া দিয়াছেন।' আহমাদের কথা শেষ হইলে কাযী খালিদ কিছু না বলিতেই স্বয়ং মামুন এমন কয়েকখানা হাদীস বর্ণনা করিলেন—যাহার বিরুদ্ধে কেহ আর কোন কথা বলিতে পারিলেন না। (মুনাকিফ, ৫২ পৃঃ, ২য় জিলদ)

শুধু একটি মাসআলায়ই নয় বরং যে যে মাসআলায় তাহারা বিরোধিতা করিতেছিলেন, মামুন উহা জিজ্ঞাসা করিতেছিলেন আর হানাফী 'আলিমগণ উহার স্বপক্ষে দলীল পেশ করিতেছিলেন। বহুক্ষণ এরূপ আলাপ-আলোচনা করার পর মামুন বলিলেন,—'হানাফী ফিকাহ্‌কে যদি আমরা কুরআন ও হাদীছের পরিপন্থী পাইতাম তবে উহাকে আমরা কখনও রাষ্ট্রের আইনরূপে প্রবর্তন করিতাম না।'

অতঃপর মামুন নযর এবং তাহার দলকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন—'খবরদার? তোমরা যেন কেহই ভবিষ্যতে এইরূপ কান্ড-কারখানা না কর। তোমাদের দলে যদি নযর ইবন শামায়েল না থাকিতেন তবে তোমাদের প্রত্যেককে এমন শাস্তি দিতাম যাহা জীবনে কখনও ভুলিতে না।'

চিন্তার বিষয় যাহারা মামুনের সাথে কথাবার্তা বলিতেছিলেন তাহাদের মধ্যে জ্ঞানী নযর ইবন শামায়েলও ছিলেন। তাহাকে উপেক্ষা করুন। কারণ সে তো হাদীস ও কুরআনের চেয়ে সাহিত্য ও কবিতার বেশী পন্ডিত ছিলেন। কিন্তু বিস্ময়ের কথা আহমাদ ইবন যুহায়র যিনি মামুনের আদেশ লইয়া কথা বলিতেছিলেন—তিনি তো হাদীসের হাফিজদের মধ্যে পরিগণিত ছিলেন।' হাদীস সম্বন্ধে তাঁহার এত জ্ঞান ছিল যে, ইয়াহইয়া ইবন মুঈন এবং ইমাম আহমাদ ইবন হাম্বল (রঃ)-এর প্রিয় ছাত্রদের মধ্যে পরিগণিত হইতেন। তাঁহার লিখিত প্রসিদ্ধ ইতিহাস সম্বন্ধে খতীব বলেন—'ইতিহাস সম্বন্ধীয় আমি যত গ্রন্থ দেখিয়াছি তন্মধ্যে আহমাদ ইবন যুহায়রের ইতিহাস একটি বিশিষ্ট গ্রন্থ।'

কিন্তু আমরা দেখিতেছি, হানাফী মাসায়েল যে সব হাদীস ও আছারের উপর প্রতিষ্ঠিত, মামুনুর রশীদকে যাহা শিক্ষা দেওয়া হইয়াছিল—উহা আহমাদ অবগত ছিলেন না। আমার কথাও তাই যে, হানাফী ফিকাহ্‌ সঠিকভাবেই 'আব্বাসী শাহযাদাদিগকে শিক্ষা দেওয়া হইত।

ইমাম সাহেব তাঁহার রচিত ফিকাহ্‌ এবং সেই ফিকাহ্‌ সম্বন্ধে এমন সব লোক রাখিয়া গিয়াছিলেন যাঁহাদের দ্বারা হুকুমত অভিজ্ঞতা অর্জন করিতেছিলেন এবং এরূপ অভিজ্ঞতা অর্জন করার প্রয়োজনীয়তাও ছিল।

ইমাম আবু ইউসুফের ইন্তিকাল

কাযী আবু ইউসুফের মৃত্যুর পর প্রশ্ন উঠিল কোন পর্যায়ের আলিম দ্বারা কাযীউল কুযাতের পদ পূর্ণ করা যায়। আবু ইউসুফ তো 'আব্বাসী হুকুমতের কাযীর পদগুলির অধিকাংশ হানাফী কাযীদের দ্বারা পরিপূর্ণ করিয়া রাখিয়াছিলেন। স্বয়ং হারুনও হানাফী ফিকাহ্ এবং ফিকাহবিদদের দ্বারা প্রভাবান্বিত হইয়া পড়িয়াছিলেন। উহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ এই যে, তিনি তাহার পুত্র মামুনকে রীতিমত হানাফী ফিকাহ্ শিক্ষা দিয়াছিলেন। তবুও একই দলের লোক হুকুমতের সমস্ত ক্ষমতায় ক্ষমতাবান থাকিবে হারুন ইহা পসন্দ করিতে পারিলেন না। আবু ইউসুফ পর্যন্ত তো চুপ করিয়াই ছিলেন। কিন্তু তাহার মৃত্যুকে একটি সুবর্ণ সুযোগ মনে করিয়া এমন এক ব্যক্তিকে কাযীউল কুযাত করিলেন যিনি কুরায়শ বংশোদ্ভব ছিলেন।

কাযীউল কুযাত পদে কাযী ওয়াহাব

কাযী ওয়াহাব ইবন আল কুরায়শী আবুল বখতারী নামে জনসাধারণের নিকট পরিচিত ছিলেন। খতীব এবং হানাফী ঐতিহাসিকগণ বলেন—"আবু ইউসুফের মৃত্যুর পর হারুন কাযীউল কুযাত পদে আবুল বখতারী ওয়াহাব ইবন ওয়াহাবকে নিয়োগ করেন।"

কাযী ওয়াহাবের হীন কার্যাবলী

এই কুরায়শী কাযীর দ্বারা হারুন যে সব অভিজ্ঞতা অর্জন করিয়াছিলেন আজও ইতিহাসের পাতা উহা দ্বারা পরিপূর্ণ রহিয়াছে! হারুন কোন কাজ করা সম্বন্ধে জায়েয না-জায়েয হওয়ার সন্দেহ হইলে কাযী ওয়াহাবকে জিজ্ঞাসা করিতেন। কাযী ওয়াহাব তাহার উর্বর মস্তিষ্ক দ্বারা এমন হাদীস বর্ণনা করিতেন যে, সে কাজ জায়েয ব্যতীত না-জায়েয হওয়ার কোন কারণই থাকিত না।

একবার খলীফা হারুন মদীনায় পৌঁছিলেন। সে যুগের নিয়ম মত খুতবাহ এবং ইমামতী স্বয়ং খলীফাও করিতেন। খুতবাহ দেওয়ার মানসে মিম্বরে নববীতে উঠার সময় খলীফার মনে হইল দরবারী কালো পোশাক পরিহিত অবস্থায় নবীজীর মিম্বরে উঠা ঠিক হইবে কিনা—তিনি ইতস্তত করিতে লাগিলেন। কাজী ওয়াহাব একটি হাদীস শুনাইলেন—

'একবার হযরত জিবরাঈল (আঃ) নবীজীর নিকট আসিলেন। তখন তাহার পরিধানে কালো পোশাক এবং কোমরে কোমরবন্দ এবং উহাতে খঞ্জর ঝুলানো ছিল।' কাযী ওয়াহাব হারুনকে বুঝাইয়া দিলেন 'আপনি এখন যে পোশাক পরিহিত অবস্থায় আছেন, উহা তো জিবরাঈল (আঃ)-এরই পোশাক।' হারুন নিজেও হাদীস সম্বন্ধে জ্ঞান রাখিতেন। তিনি বুঝিলেন, আমার মনোরঞ্জন করার মানসেই কাযী ওয়াহাবের এই হাদীস। তিনি তখনকার মত চুপ করিয়া রহিলেন।

কিছুদিন পরের ঘটনা। হারুন বাগদাদে কবুতর উড়াইতেছিলেন। কাযী ওয়াহাব সেখানে আসিয়া পৌঁছিলেন। হারুন জিজ্ঞাসা করিলেন 'কবুতর উড়ানো সম্বন্ধে কোন রওয়ায়েত আপনার জানা আছে কি?'

কাযী ওয়াহাব পূর্বাপর চিন্তা না করিয়াই বলিতে লাগিলেন, 'আমাকে হিশাম ইবন ওরওয়াহ বলিয়াছেন, হিশামকে তাহার পিতা ওরওয়াহ বলিয়াছেন—ওরওয়াকে হযরত আয়েশা (রাঃ) বলিয়াছেন যে, 'হুযুর (সঃ)-ও কবুতর উড়াইতেন।' হারুন ক্রোধে লাল হইয়া বলিলেন, 'আমার সম্মুখ হইতে দূর হইয়া যাও। তুমি কুরায়শী না হইলে এখনই তোমাকে পদচ্যুত করিতাম।'

প্রায় সময়ই এমন হইত যে, প্রয়োজনবোধে হাদীস বর্ণনা করিয়া ফেলিতেন। কিন্তু মিথ্যাবাদীর স্মরণশক্তি কম—ভুলিয়া যায়। এই ব্যাপারে হারুন তাহাকে ধরিয়া ফেলিলে লজ্জিত হইতেন।

হানাফী ব্যতীত অন্য কোন মতাবলম্বী কাযী নিয়োগ করিয়া হারুন যে অভিজ্ঞতা অর্জন করিলেন উহা বর্ণনাতীত। হানাফীগণ প্রথমে কাযী হইতে চাহিতেন না। আর হইলেও তাহারা চরিত্র ও কার্যাবলীর এমন নমুনা পেশ করিতেন—যাহা কাযী আফিয়া এবং হাফ্স ইবন গিয়াছের ঘটনায় বর্ণিত হইয়াছে। আর হানাফী ব্যতীত অন্যান্য কাযীদের দ্বারা যাহা কিছু হইত উহার আরম্ভ মনসুরের সময় হাজ্জাজ ইবন আরতাত এবং পরিশেষে কাযী ওয়াহাম দ্বারা সম্পন্ন হইল।

লোকে হযরত আহমাদ ইবন হাম্বল সম্বন্ধে বলেন, 'তিনি বিনয় স্বভাবের জন্য স্পষ্টভাবে কাহাকেও মিথ্যাবাদী বলিতে পারিতেন না। কিন্তু কাযী ওয়াহাবের মিথ্যা বলার বহর দেখিয়া তিনিও তাহাকে স্পষ্ট ভাষায় মিথ্যাবাদী বলিয়াছেন। কাযী ওহাব মদীনার লোক।

কখনও বাগদাদ হইতে মদীনায় আসিলে বদনামীর জন্য ঘর হইতে লোকসম্মুখে বাহির হইতেন না। 'একদিন ইমাম মালিক ওয়াহাবের

উপস্থিতিতে বলিয়াছিলেন, 'কোন কোন লোক মদীনা হইতে অন্য কোথাও যাইয়া বলে যে, আমার নিকট মদীনার আলিম জাফর ইবন মুহাম্মাদ অথবা হিশাম ইবন ওরওয়া এই হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন। কিন্তু বিদেশ হইতে মদীনায় আসার পর আর ঘর হইতে বাহির হয় না।'
(খতীব, ৪৫৫ পৃঃ, ১৪ জিলদ)

গুরুত্বপূর্ণ পরীক্ষার সম্মুখীন

ইমাম আবু হানীফা (রঃ)-এর মৃত্যুর পর তাহার ছাত্রদের একটি দল যাহারা কাযীর পদ গ্রহণ করিয়াছেন—তাহাদের মধ্যে কেহ বেতন গ্রহণ করিতেন, আবার কেহ-বা বিনিময়ে কোন কিছু গ্রহণ করিতেন না। যেমন সাহাবী হযরত আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ (রঃ)-এর পৌত্র কূফার কাযী ছিলেন, অথচ বেতন গ্রহণ করিতেন না।

অন্য আর একটি দল ছিল হুকুমত যত চাপই দিয়াছে তাহারা তাঁহাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়াই গিয়াছেন। পরে তাহাদের সম্বন্ধে কিছু বলিব।

ইমাম মুহাম্মাদ

তাহাদের মধ্যে একজন ছিল ইমাম মুহাম্মাদ ইবন হাসান শায়বানী। বহুদিন পর্যন্ত তিনি চাকুরী গ্রহণ করা হইতে দূরে থাকেন এবং সর্বদা ইমাম সাহেবের আইন-প্রণয়ন সমিতির কাজে ব্যস্ত থাকেন।

বর্ণিত আছে সমস্ত মাসআলা এবং আইনগুলিকে ইমাম মুহাম্মাদ ছোট-বড় হাযার কিতাবে সম্পাদনা করিয়াছেন।[১] এখন যে ফিকাহ্‌র কিতাবে কিতাবুস্ সালাত, কিতাবুস্ যাকাত, সালাত (হজ্জ অধ্যায়) পাওয়া যায় ইহা ইমাম মুহাম্মাদেরই পরিশ্রমের স্বাক্ষর। এই সমস্ত কাজ হইতে অবসর গ্রহণ করার পর জীবনের অবশিষ্ট দিনগুলি তিনি হারুনের প্রিয় শহর 'রাকা'-এর কাযীর পদ গ্রহণ করিয়াছিলেন।

ইয়াহইয়া ইবন আবদুল্লার সংগ্রাম

ইমাম মুহাম্মাদ যখন রাকার কাযী ছিলেন ঠিক তখনই দায়ালামের পার্বত্য এলাকা হইতে আর্ববাসীদের বিরুদ্ধে এক নতুন বিপদ মাথা

১. ইমাম মুহাম্মাদ দশজন শরীয়তসিদ্ধ ইউরোপীয় দাসীকে ভাষা ও লিখন-পঠন শিখাইয়াছিলেন। কিতাব সম্পাদনায় তিনি তাহাদের সাহায্য গ্রহণ করিতেন।

চাড়া দিয়া উঠিল। অর্থাৎ নফসে যাকিয়ার এক ভাই ইয়াহইয়া ইবন আবদুল্লাহ তাহার ভাই নফসে যাকিয়ার পরাজয়ের পর পলাতক অবস্থায় বিভিন্ন স্থান ঘুরিয়া ফিরিয়া অবশেষে দায়লাম আসিয়া পেঁাছেন। এখানে আসার পর জনগণের সমর্থন পাইয়া তিনি বেশ ক্ষমতাশালী হইয়া উঠেন। আব্বাসী হুকুমত বেশ ভয় পাইয়া গেল। তাবারী বলেন, 'হারুন-উর রশীদ ইয়াহইয়া ইবন আবদুল্লার সংবাদ পাইয়া এমন কঠিন চিন্তায় পড়িয়া গিয়াছিলেন যে, সেই চিন্তায় তিনি 'নবীয' পান করা পরিত্যাগ করিয়াছিলেন।'

পরিশেষে ইয়াহইয়াকে দমন করার জন্য হারুন-উর রশীদ পঞ্চাশ হাযার সৈন্যের একটি বাহিনী দায়লাম প্রেরণ করেন। এই বাহিনীর সেনাপতি ছিলেন ফযল ইবন ইয়াহইয়া বারমাকী। ফযল যুদ্ধ করার পরিবর্তে সন্ধি স্থাপন করার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। এই উদ্দেশ্যে তিনি দায়লামের নেতৃস্থানীয় লোকদিগকে যথেষ্ট পরিমাণ টাকা-পয়সা দিলেন। ইয়াহইয়া জানাইলেন, হারুনুর রশীদ স্বয়ং নিজের হাতে লিখিত ও 'নিরাপত্তা-নামা' দিলে আমি তাহার সাথে সাক্ষাত করিতে রাযী আছি। সেনাপতি হারুনকে একথা জানাইলেন।'

হারুনের নিরাপত্তা-নামা

খলীফা হারুন-উর রশীদ এই সংবাদ অবগত হওয়ার সাথে সাথেই নিজের হাতে 'নিরাপত্তা-নামা' লিখিলেন এবং উহাতে দরবারী প্রধানদের ছাড়া হাশেমী বংশের প্রধান ও বুযর্গ ব্যক্তিদের দস্তখত এবং বহু মূল্যবান উপঢৌকনসহ ফযল ইবন ইয়াহইয়ার নিকট পাঠাইয়া দিলেন। ফযল যথাযোগ্য মর্যাদার সাথে ইয়াহইয়াকে সাথে লইয়া খলীফার দরবারে পেঁাছিলেন। হারুন-উর রশীদও তাঁহাকে যথাযোগ্য মর্যাদা সহকারে গ্রহণ করিলেন এবং তাহার থাকা-খাওয়ার সুব্যবস্থা করিয়া দিলেন।

ঐতিহাসিক রাবাতী, বলেন 'হারুন নিজে তাঁহার তত্ত্বাবধান করিতেন এবং যে প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন উহা পালন করিতে লাগিলেন।'

শরীয়ত মতে ছিদ্রান্বেষণ

কিন্তু কিছু সংখ্যক ঈর্ষাপরায়ণ ব্যক্তির বুদ্ধি-পরামর্শে হারুন-উর-রশীদের মধ্যে পরিবর্তন দেখা দিল। পরিণামে তাঁহার অবস্থা এই দাঁড়াইল যে, তিনি ইয়াহইয়া ইবন আবদুল্লাহকে হত্যা করারই

সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিলেন। ইচ্ছা করিলে তিনি যখন তখন এবং যে কোন অবস্থায়ই নিহত করিতে পারিতেন। কিন্তু আল্লাহ্‌র ভয়েই হউক কিংবা লোক-নিন্দার ভয়েই হউক একাজ করার পূর্বে শরীয়তের সাহায্য গ্রহণ করাকেই বিধেয় মনে করিলেন। এই ঘটনা বোধহয় 'রাকা' নামক স্থানেই হইয়াছিল। সেখানকার কাযী ছিলেন ইমাম মুহম্মাদ। কাযীউল কুযাত অর্থাৎ রাষ্ট্রের সর্বপ্রধান বিচারক ওয়াহাব ইবন ওয়াহাবও শাহী তাঁবুতে ছিলেন। হারুন-উর রশীদ কাযী এবং ফিকাহ্‌-বিদদিগকে আহ্বান করিলেন।

অন্যান্য রওয়ায়েত মতে দেখা যায়, ইমাম আবু হানীফার একজন শাগরিদ কাযী হাসান ইবন যিয়াদও সেই মজলিসে ছিলেন। কিন্তু তাবারীর মতে, কাযী হাসান সেখানে ছিলেন না। তাছাড়া তিনি সেখানে থাকার কোন কারণও পাওয়া যায় না।

ইমাম মুহাম্মাদের উত্তর

যাহা হউক, হারুনুর রশীদের প্রসিদ্ধ মন্ত্রী জাফর ইবন ইয়াহইয়া বারমাকীর মধ্যস্থতায় তাবারী বলেন—

'হারুন ইয়াহইয়া ইবন আবদুল্লাকে 'আমান-নামাহ'সহ, যাহা তিনি স্বহস্তে লিখিয়া দিয়াছিলেন, দরবারে হাযির হওয়ার জন্য নোটিশ দিলেন। হারুন ইমাম মুহাম্মাদকে উদ্দেশ্য করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—'যে আমান-নামাহ এই ব্যক্তিকে দেওয়া হইয়াছে উহা সহীহ কিনা? অর্থাৎ উহা পালন করা আমার পক্ষে কর্তব্য কি না?'

ইমাম মুহাম্মাদ বলিলেন—'সহীহ না হওয়ার সন্দেহ কোথায়? নিশ্চয়ই সহীহ।' অতঃপর হারুন তাহার সাথে তর্ক-বিতর্ক আরম্ভ করিলেন।

মনে হয় ইয়াহইয়া ইবনে 'আবদুল্লাহর পূর্বকৃত বিদ্রোহকে উপলক্ষ করিয়াই তিনি তাঁহাকে দোষী সাব্যস্ত করার সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন। সম্ভবত এই সিদ্ধান্তের উত্তরেই ইমাম মুহাম্মদ বলিয়াছিলেন—'আমি জিজ্ঞাসা করি, যে ব্যক্তি রাষ্ট্রের বিরোধিতা করিয়া অস্ত্রধারণ করে, সে যদি পরে তাহার কাজ হইতে বিরত থাকে এবং তাহাকে 'আমান-নামা' দেওয়া হয় তবে কি সে নিরাপদ নয়?'

উহার অর্থ এই ছিল যে 'আমান-নামা' দেওয়ার পর যদি ইয়াহইয়া ইবনে 'আবদুল্লাহ কোন প্রকার বিদ্রোহ করিয়া থাকে তবে হয়ত এমন

কিছু করা যায়। কিন্তু আমান-নামা' দেওয়ার পূর্বকৃত অপরাধের জন্য তাহাকে দোষী সাব্যস্ত করা যায় না।

কাযী ওয়াহাবের উত্তর

তাবারী বলেন, অতঃপর হারুন ইমাম মুহাম্মাদকে আর কিছু জিজ্ঞাসা না করিয়া কাযীউল কুযাত ওয়াহাব ইবন ওয়াহাবকে এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন। ওয়াহাব তো আর শরীয়তের দাস নন, তিনি ছিলেন হারুনের বেতনভুক্ত দাস। তাই নির্লজ্জের মত বলিতে লাগিলেন—'এই আমান-নামা বিভিন্ন কারণে নাকচ হইয়া গিয়াছে। যেমন এই কারণ।'

তাবারী এই পর্যন্ত লিখিয়াই বিরত হইয়াছেন। কিন্তু হানাফী ঐতিহাসিকগণ ইহার পরও লিখিয়াছেন—'কাযী ওয়াহাব তাহার মোযার মধ্য হইতে একখানি ছুরি বাহির করিয়া 'আমান-নামা' খানি টুকরা টুকরা করিয়া ফেলিলেন এবং বলিলেন—'এই আমান-নামা, নাকচ হইয়া গিয়াছে।'

অতঃপর হারুনকে উদ্দেশ্য করিয়া বলিলেন—'আপনি এই ব্যক্তিকে নিহত করুন। ইহাকে নিহত করার অপরাধ আমি নিজের কাঁধে লইলাম।'

হারুন বলিলেন—আপনি কাযীউল কুযাত। এই ব্যাপারে আপনিই অভিজ্ঞ। অতঃপর হারুন আমান-নামা ছিঁড়িয়া উহাতে থুথু দিয়া ফেলিয়া দিলেন।'[১]

ইমাম মুহাম্মাদের শাস্তি ভোগ

আল্লাহই জানেন হানাফী ঐতিহাসিকদের এই বর্ণনা কতটা শুদ্ধ যে, ইহার পর হারুন রোষ—কষায়িত নেত্রে মুহাম্মদের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ

১। কাযী ওয়াহাব যখন এই ফতওয়া দিলেন তখন ইয়াহইয়া হারুনকে উদ্দেশ্য করিয়া বলিয়াছেন—'আমীরুল মোমেনীন! এই ব্যক্তির বাপ তো মদীনার বিখ্যাত তবলচী ছিল। আপনি তাহার ফতওয়া মত কাজ করিবেন? ইহার পিঠের কাপর উঠাইয়া দেখুন সমস্ত পিঠটা চাবুকের দাগে জর্জরিত। মদীনার সমস্ত হাম্মাম খানার (গোসল খানার) দালান ইহাকে চিনে। পৃথিবীর বিখ্যাত মুফতী মুহাম্মদের ফতওয়াকে আপনি অগ্রাহ্য করিতেছেন?'

করিয়া বলিলেন—'তোমাদের মত লোকের পরামর্শ মতই ইহারা বিদ্রোহ করিয়া থাকে।' ক্রোধ সংবরণ করিতে না পারিয়া হারুন তাহার সম্মুখস্থ দোয়াত মুহাম্মাদের প্রতি নিক্ষেপ করেন। সেই আঘাতে তাহার মুখমন্ডল যখমী হইয়া রক্তধারা প্রবাহিত হইতে লাগিল।

ইমাম মুহাম্মদ সভা ত্যাগ করিয়া বাহিরে আসিলেন। মুহাম্মদ ইবন সামা নামক একজন ছাত্র তাহার সাথে ছিলেন। তিনি বলেন—আমি লক্ষ্য করিয়া দেখিলাম, ইমাম সাহেব ইমাম সাহেব কাঁদিতেছেন আর পথ চলিতেছেন। আমি উস্তাদজীকে বলিলাম—'আল্লাহ্‌র পথে যখমী হইয়াছেন—ইহাতে কাঁদিবার কি আছে ?'

ইমাম মুহাম্মদ বলিলেন—'আমি আঘাত পাইয়াছি তজ্জন্য কাঁদি না। বরং আমি আমার এই দুর্বলতার জন্য কাঁদিতেছি যে, কাযীউল কুযাত যখন 'আমান-নামা' নষ্ট হইয়া গিয়াছে বলিয়াছে যে সমস্ত ভুল দলীল পরিবেশন করিতেছিল তখন আমি উহার বিরুদ্ধে কেন কথা বলিলাম না, সেই দুঃখেই আমি কাঁদিতেছি।'

ঘটনাদৃষ্টে যত দূর মনে হয়, হারুন-উর রশীদ যদিও ইমাম মুহাম্মাদের ফতওয়া মানিয়া লন নাই এবং ওয়াহাবের ফতওয়াকেই গুরুত্ব দিয়াছিলেন—তথাপি ইমাম মুহাম্মদের বিরোধিতার কারণে ইহা হইয়া ইবন আবদুল্লাহকে নিহত করার দুঃসাহস নাই। খতীব হারুনের এই উক্তিও বর্ণনা করিয়াছেন—'আল্লাহ্‌র শপথ! এ ব্যক্তিকে হত্যা করা জায়েয হইলে অবশ্যই আমি হত্যা করিতাম। আর আমি শপথ করিয়া বলিতে পারি যে, না আমি তাহাকে বিষ পান করাইয়াছি—না অন্য কাহাকেও দিয়া বিষ দেওয়াইয়াছি।'

সুতরাং মনে হয়—হারুনুর রশীদ প্রকাশ্যে যাহা কিছুই করুন না কেন, শেষ পর্যন্ত ইমাম মুহাম্মদের ফতওয়াই মানিয়া লইয়াছিলেন।

বরং এই ঘটনার পর এই ইয়া হইয়া এবং 'আবদুল্লাহ ইবন মাসআব সম্পর্কে রশীদের দরবারে যে ঘটনা হইয়াছিল উহার সংক্ষিপ্ত সার এই এই যে 'আবদুল্লাহ ইবন মাসআব ইয়াহইয়ার নামে রশীদের নিকট কুৎসা করে। ইয়াহইয়া অস্বীকার করিলে শপথ করার পর্যায় আসিয়া পৌঁছিল। ইয়াহইয়ার দাবী মত হারুন আবদুল্লাকে শপথ করিতে বাধ্য করিলেন। শপথ করার দিন বা উহার পর দিনই আবদুল্লাহ মারা যায়। খতীব বলেন—'শপথের এমন প্রতিক্রিয়ার কথা যখনই হারুনের মনে হইত তখনই তিনি বলিতেন—'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্‌। 'আবদুল্লাহ হইতে ইয়াহইয়া কত শীঘ্র প্রতিশোধ গ্রহণ করিলেন।'

কথিত আছে, দরবার হইতে বাড়ী ফিরিবার পথে 'আবদুল্লাহ ঘোড়া হইতে পড়িয়া মারা যায়। আবার কেহ বলেন,—পক্ষাঘাতে আক্রান্ত হইয়া কয়েকদিনের মধ্যেই মৃত্যুবরণ করে।

কাযী ওয়াহাবের পরিণতি

আশ্চর্যের বিষয় এই যে,—কাযী ওয়াহাব সম্বন্ধেও লিখিত আছে,—'পড়িয়া গেলেন এবং একদিকে ঝুঁকিয়া গেলেন।' যদিও কাযী ওয়াহাবের মৃত্যু তারিখ সম্বন্ধে মতভেদ রহিয়াছে, তথাপি অবগত হওয়া গিয়াছে যে,—পক্ষাঘাতে আক্রান্ত হওয়ার পর তাঁহাকে কাযীউল কুযাতের পদ হইতে অপসারিত করা হয়। কাযী আবু ইউসুফের পর হারুন-উর রশীদ হানাফী মতাবলম্বী ছাড়া অন্য মযহাবের কাযীদের সম্পর্কে যে অভিজ্ঞতা অর্জন করিতে চাহিয়াছিলেন—কাযী ওয়াহাব দ্বারা এমন সব অভিজ্ঞতা অর্জন করিলেন—যাহার পর হানাফী মতাবলম্বী ব্যতীত অন্য মযহাবের কাযীউল কুযাত নিয়োগ করা যুক্তিসঙ্গত মনে করিলেন না। ইমাম মুহাম্মদ প্রথম হইতেই রাকাহর কাযী ছিলেন। যদিও কাহারও কাহার মতে ইয়াহইয়ার ঘটনার পর মুহাম্মদকে কাযীর পদ হইতে অপসারণ করিয়া দিয়াছিলেন, তথাপি তিনি মুহাম্মদের ফতওয়া অনুযায়ীই কাজ করিয়াছিলেন।

ইমাম মুহাম্মাদের কাযীউল কুযাত পদে নিয়োগ

কাযী ওয়াহাবের পর কাযীউল কুযাত পদে নিয়োগ করার জন্য হারুনের দৃষ্টি স্বভাবতই ইমাম মুহাম্মদের উপর পড়িয়াছিল। যুবায়দা খাতুন যাহাদের পক্ষে সুপারিশ করিয়াছিলেন, হারুন তাহাদের বিরুদ্ধে হয়ত কোন বাহানা তৈয়ার করিয়া রাখিয়াছিলেন। হারুন ইমাম মুহাম্মদকে আহ্বান করিয়া কাযীউল কুযাতের পদে নিয়োগ করিলেন। ইমাম সাহেবের ছাত্র ইবন সামায়াহ বলেন—'অতঃপর হারুন মুহাম্মদ ইবন হাসানকে সান্নিধ্য দান করেন। তিনি দরবারে সম্মান লাভ করিলেন। খলীফা তাহাকে কাযীউল কুযাতের পদে নিয়োগপত্র দান করিলেন।'

ইমাম মুহাম্মদের ইন্তিকাল

মনে হয় ইমাম মুহাম্মদের সাথে তাহার বয়স সহযোগিতা করিল না। কাযীউল কুযাত হওয়ার পর তিনি প্রথমবার খলীফার সাথে খোরাসান সফরে রওয়ানা হন এবং পথিমধ্যে 'রে' নামক স্থানে ইন্তিকাল করেন।

তাই কাযীউল কুযাত হিসাবে তিনি প্রসিদ্ধ লাভ করিতে পারেন নাই। তবুও এই সংক্ষিপ্ত সময়ে হারুনের সাথে এমন কয়েকটি ঘটনা সংঘটিত হইয়াছিল—যাহা ঐতিহাসিকগণ লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন।

একটি ঘটনা 'আল্লামা আবু জাফর তাহ্তাবী ইমাম সাহেবের ছাত্র কাযী ইবন সামায়াহ হইতে বর্ণনা করেন। কাযী ইবন সামায়াহ বলেন, "আমরা অনেকেই ইমাম মুহাম্মদের সাথে শাহী প্রাসাদে বসা ছিলাম। হঠাৎ হারুনুর রশীদ সেখানে আসিয়া উপস্থিত হন। হারুনকে সম্মান প্রদর্শনের জন্য একমাত্র ইমাম মুহাম্মদ ব্যতীত আমরা সকলেই উঠিয়া দাড়াইলাম। তাহার এই আচরণ দেখিয়া খলীফা ক্রুদ্ধ নেত্রে তাহার দিকে চাহিয়া রহিলেন। এবং পরক্ষণেই ভিতরে প্রবেশ করিয়া ইমাম মুহাম্মদকে ডাকিয়া পাঠাইলেন।"

ইবন সামায়াহ বলেন, "ইহা শুনিয়া তো আমি বেহুঁশ প্রায়। মনে করিলাম সম্মানার্থে না দাঁড়ানোর অপরাধেই এই আহ্বান। কঠিন শাস্তি দেওয়ার জন্যই একা ডাকিয়া পাঠাইয়াছেন। কিন্তু পরক্ষণে দেখিলাম তিনি হাসিতে হাসিতে বাহির হইয়া আসিলেন।" আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, 'ব্যাপার কি?' ইমাম মুহাম্মদ বলিলেন, আমাকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'সকলে দাঁড়াইয়া আমাকে সম্মান প্রদর্শন করিল আর আপনি কেন বসিয়া রহিলেন?" আমি বলিলাম, আপনি আমাকে যে স্তরে স্থান দিয়াছেন আমি স্বেচ্ছায় উহা পরিত্যাগ করিয়া অন্য স্তরে যাওয়ার ইচ্ছা করি নাই। আপনি আমাকে 'আলিম-দের মর্যাদায় স্থান দিয়াছেন। আমি চাহি না যে, যাহারা আপনার চাকুরী ও খেদমত করে তাহাদের পর্যায়ে আমাকেও পরিগণিত করি। আপনারই চাচাতো ভাই (ইবন 'আস) হইতে আমি জানিতে পারিয়াছি যে, যে ব্যক্তি চায় যে লোক তাহার সম্মানার্থে দন্ডায়মান হউক সে যেন তাঁহার স্থান দোযখে করিয়া লইল।" (খতীব, ১৭৩ পৃঃ, ২য় জিলদ)

অতঃপর ইমাম মুহাম্মাদ খলীফা হারুনুর রশীদকে বুঝাইয়া বলিলেন, "সাধারণ দরবারীদের পক্ষে আপনাকে দেখিয়া দাড়ানো অবশ্য কর্তব্য। ইহাতে খলীফার প্রতিপত্তি সুদৃঢ় হয়। শত্রুপক্ষ ইহা দেখিয়া মনে করে যে, দরবারিগণ আপনাকে কত কত সম্মান এবং কত ভয় করে। কিন্তু 'আলিমগণ আপনাকে দেখিয়া দাঁড়াইবে—এই আশা পোষণ করিলে উক্ত হাদীছের বিরুদ্ধে কাজ করা হয়।" হারুন একথা শুনিয়া বলিলেন, "আপনি—সত্য বলিয়াছেন।"

ইমাম মুহাম্মদ বলেন, "অতঃপর তিনি আমার নিকট বনী তাগলীবের খৃস্টানদের সম্পর্কে ফতওয়া জিজ্ঞা করিলেন। হারুনের মতে বনী তাগলীব খৃস্টানগণ ইসলামের সাথে যে চুক্তিপত্র করিয়াছিল —তাহারা উহার বিরুদ্ধে কাজ করিয়াছে। সুতরাং তাহাদের সাথে আমি যে ভাল ব্যবহার করিব এই প্রশ্নই এখন উঠিতে পারে না; যাহা তাহারা হযরত ওমর (রাঃ)-এর যুগ হইতে পাইয়া আসিতেছিল।"[১]

হারুনের একথা শুনিয়া ইমাম মুহাম্মদ বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, এমন কোন্ অঘটন ঘটিল যে আপনি এরূপ করার মনস্থ করিয়াছেন ?

হারুন বলিলেন তাহার সাথে চুক্তি ছিল, তাহারা তাহাদের ছেলে-সন্তানদিগকে খৃস্টান মতে দীক্ষিত করিতে পারিবে না। কিন্তু দেখা যাইতেছে - প্রকাশ্যেই তাহারা এরূপ করিতেছে।

ইমাম মুহাম্মদ বলিলেন—এরূপ তাহারা হযরত ওমর (রাঃ)-এর যুগেই করিত। তজ্জন্য হযরত ওমর (রাঃ) তাহাদিগকে দোষী সাব্যস্ত করেন নাই। সুতরাং মনে হয় এই শর্ত তখনই কার্যতঃ নাকচ হইয়া গিয়াছিল। হারুন বলিলেন, হয়ত হযরত ওমর তাহাদের সম্পর্কে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতেন। কিন্তু তাহার শাসনকালের সংক্ষিপ্ত সময়ের জন্য উহা হইয়া উঠে নাই। সুতরাং কার্যতঃ সেই শর্ত নাকচ হইয়া গিয়াছে, একথা আমরা বলিতে পারি না।"

১। বনী তাবলীগ বিশুদ্ধ আরব্ ছিল। কিন্তু তাহারা আরব মরুভূমি ত্যাগ করিয়া ফুরাত নদীর পূর্ব ও পশ্চিম কুলে বসতি স্থাপন করিয়াছিল। মদ্যপান ও ব্যভিচারী ব্যতীত আর কোন খৃস্ট মতবাদ তাহাদের মধ্যে ছিল না। হযরত ইবন 'আব্বাস তাহাদের সম্বন্ধে ফতওয়া দিয়াছিলেন—বনী তাগলীবদের যবেহ করা জন্তু এবং তাদের মেয়েদের বিবাহ করা জায়েয নয়। ইহারা না মুসলমান আর না আহলে কিতাব। ফোরাত নদীর তীরবর্তী স্থানসমূহ যখন হযরত ওমর (রাঃ)-এর যুগে অধিকার করা হয় তখন তাহাদের উপর জিযিয়া ধার্য করা হয়। কিন্তু জিযিয়া দেওয়া অপমানজনক মনে করিয়া তাহারা ইসলামী আওতা ছাড়িয়া অন্যত্র চলিয়া যাওয়া আরম্ভ করে। হযরত ওমর (রাঃ)-এই সংবাদ পাইয়া তথাকার প্রতিনিধিকে বলিয়া পাঠাইলেন, 'তাহাদিগকে যাইতে দিও না, বরং জিজ্ঞাসা কর তাহারা কি চায়।' বনী তাগলীব বলিল, 'আমরা স্বাধীন—আরব, জিযিয়া দিব

ইমাম মুহাম্মদ বলিলেন, 'হইতে পারে হযরত ওমর (রাঃ) সময় অভাবে কিছু করিতে পারেন নাই। কিন্তু তাহার পরও দুইজন ন্যায়-পরায়ণ খলীফা হযরত উছমান ও আলী (রাঃ) তো বহুদিন পর্যন্ত খলীফা ছিলেন। তাঁহারা তো উহার কোন রদবদল করেন নাই। সুতরাং উহার অর্থ এই হইতে পারে যে, 'এই দুইজন ন্যায়পরায়ণ খলীফাও কোন প্রকার রদবদল না করিয়া বনী তাগলীবদের চুক্তি বলবৎ রাখিয়া-ছিলেন।'

হারুন ইমাম মুহাম্মদের একথা শুনিয়া চুপ করিয়া রহিলেন। অন্য বর্ণনাতে দেখা যায় তিনি ইমাম মুহাম্মদকে চলিয়া যাইতে বলেন। কিন্তু যমীরীর বর্ণনায় দেখা যায়, ইহার পর ইমাম মুহাম্মদ বলিয়াছিলেন, 'এই চুক্তি হযরত ওমর (রাঃ) এবং তাহার পরবর্তী দুইজন খলীফা বলবৎ রাখিয়া গিয়াছেন। সুতরাং আপনি ইহাতে হস্তক্ষেপ করিতে পারেন না। যাহা সত্য তাহা বলিলাম—এখন উহা রাখা না রাখা আপনার ইচ্ছা।'

একথা শুনিয়া হারুন বলিয়াছিলেন, 'উক্ত খলীফা এর যে কাজ করিয়া গিয়াছেন আমিও তাহাই করিব ইনশআল্লাহ।' পরিশেষে হারুণ ইমাম মুহাম্মদকে বলিলেন—

'হুযুর (সাঃ)-কেও আল্লাহ তাআলা পরামর্শ করার অধিকার দিয়া-ছিলেন। তাই তিনি পরামর্শ করিতেন এবং কি ফয়সালা হইবে উহা হযরত জিবরাঈল (আঃ) তাহাকে অবগত করাইতেন। (তাই আমিও আপনার সাথে পরামর্শ করিলাম) এখন আপনি ঐ ব্যক্তির জন্য দুআ করুন যাহার হাতে আপনাদের সম্পর্কীয় দায়িত্ব দেওয়া হইয়াছে।

না। বরং মুসলমানদের নিকট হইতে যেরূপ কর আদায় করা হয় আমরা উহা বা উহার দ্বিগুণ দিতে রাযী আছি।' হযরত ওমর (রাঃ) তাহাদের শর্ত মানিয়া লইলেন। অবশ্য তিনিও একটি শর্ত দিলেন যে, তোমাদের ভবিষ্যত সন্তান-সন্ততিদিগকে এসতেবাগ অর্থাৎ খৃস্ট ধর্ম গ্রহণ করিতে বাধ্য করিতে পারিবে না; তাহারাও এই শর্ত মানিয়া লইল।

কিন্তু হযরত ওমর (রাঃ)-এর খিলাফতকালেই তাহারা এই শর্ত লঙ্ঘন করিয়াছিল। হযরত উসমান (রাঃ) এবং হযরত আলী (রাঃ)-এর খিলাফতকালেও বনী তাগলীব সেই শর্ত মুতাবিক চলে নাই। কিন্তু কোন খলীফাই এই জন্য তাহাদিগকে অপরাধী সাব্যস্ত করেন নাই।

হুযুর (সাঃ)-কেও আল্লাহ তাআলা পরামর্শ করার অধিকার দিয়াছিলেন। তাই তিনি পরামর্শ করিতেন এবং কি ফয়সালা হইবে উহা হযরত জিবরাঈল (আঃ) তাহাকে অবগত করাইতেন। (তাই আমিও আপনার সাথে পরামর্শ করিলাম) এখন আপনি ঐ ব্যক্তির জন্য দুআ করুন যাহার হাতে আপনাদের সম্পর্কীয় দায়িত্ব দেওয়া হইয়াছে। (যেন আল্লাহ তাহাকে সৎসামর্থ দান করেন এবং ফয়সালা সম্পর্কে এলহাম করেন)। আপনি নিজে দুআ করুন এবং আপনার বন্ধু ও ছাত্রদিগকেও দুআ করিতে বলুন।'

অতঃপর হারুন তাহার জন্য একটি বিরাট অংকের পুরস্কার মনজুর করিলেন। হানাফী ঐতিহাসিকগণ ছাড়াও খতীব তাঁহার বাগদাদের ইতিহাসে এই ঘটনা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। বুলুগুল আমানীর গ্রন্থকার ইমাম মুহাম্মাদের জীবনীতে এই ঘটনা বর্ণনার পর যথার্থই বলিয়াছেন যে, এই ঘটনা দ্বারা প্রমাণিত হয় যে এই সমস্ত ফকীহ্দের ফয়সালা কত নিরপেক্ষ হইত। মুসলমান হউক কিংবা খৃস্টান যে কেহই হউক না কেন সত্য প্রকাশের বেলায় ইঁহারা কাহারও পক্ষাবলম্বন করিতেন না।

প্রকৃতপক্ষে এই সময় ঐ সমস্ত বিষয়ের গুরুত্ব আমরা উপলব্ধি করতে পারি না। হারুন, যিনি সেই সময়কার শ্রেষ্ঠ নরপতি ছিলেন, তিনি নিজের ইচ্ছা এমন এক সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে প্রকাশ করিতেছিলেন, কিন্তু সত্য প্রকাশে হারুনের এই একনায়কত্ব শাসন ক্ষমতায়ও বাধা দিতে পারিল না। এমনকি বনী তাগলীব যে সুযোগ-সুবিধা ভোগ করিয়া আসিতেছিল উহাও রহিত করিতে পারিল না।

বয়স এবং সমাধি

'রে'-এর শাহী তাবুতে ৫৮ বৎসর বয়সে ইমাম মুহাম্মদ শেষ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিলেন। আরও বিস্ময়কর কথা এই যে সেই সফরে হারুনের সাথে যেমন বিশিষ্ট আইনজ্ঞ ইমাম মুহাম্মদ ছিলেন, তেমনি আরবী অভিধান বিশেষজ্ঞ ইমাম আল-কাসারীও ছিলেন। তিনি ইমাম মুহাম্মদের মৃত্যুর একদিন বা দুই তিন দিন আগে-পিছে মারা যান।[১]

১। কথিত আছে, হারুনের এই শাহী তাঁবু বারো মাইল পরিমিত স্থান জুড়িয়া রহিয়াছিল। কাসারীর আসল নাম আলী ইবনে হাসান হামযাতুল আসাদি। শাহী দরবারে ইমাম মুহাম্মদ ও তাহার মধ্যে বেশ রসালো আলাপ-আলোচনা হইত। একবার কাসারী বলেন—"কোন এক ইলমের বিশেষজ্ঞ অন্যের ইলমের রহস্য পথ ও মানুষের নিকট

ইমাম মুহাম্মদের মৃত্যুতে হারুনের উপর প্রতিক্রিয়া

এই আকস্মিক ঘটনায় হারুন বার বার বলিতেন—" 'রে'-এর ময়দানে আমি ফিকাহ্ এবং অভিধান উভয়কেই দাফন করিয়া রাখিলাম।" এই ঘটনা ১৮৯ হিজরীতে সংঘটিত হইয়াছিল। হাফিজ ইবন আবদুল্লাহ "ইনতকায়" লিপিবদ্ধ করিয়াছেন যে, হারুন ইমাম মুহাম্মদকে স্মরণ করিয়া এই কবিতা পাঠ করিতেন—

اصبحت حالی قاضی القضاۃ محمد

فذرفت دمعی والفواد عمید

"কাযীউল কুযাত ইমাম মুহাম্মদের মৃত্যুতে আমি শোকাতুর। আমার অশ্রু প্রবাহিত হইতেছে এবং অন্তর বিমর্ষ হইয়া রহিয়াছে।"

ইমাম মুহাম্মদ হারুনের কিরূপ প্রিয় ছিলেন উক্ত কবিতায় শুধু উহাই প্রকাশ করে না অধিকন্তু যাহারা ইমাম মুহাম্মদ কাযীউল কুযাত ছিলেন কিনা সন্দেহ করিয়া থাকেন, তাহাও দূর হইয়া যায়। স্বয়ং খলিফা তাঁহাকে 'কাযীউল কুযাত' বলিয়াছেন। উহা অপেক্ষা বড় প্রমান আর কি হইতে পারে ?

কাযীউল কুযাত পদে ইয়াহইয়া ইবন আকছাম

ইমাম মুহাম্মদের পর এই কাহিনীর সমাপ্তি নয়। বরং হারুন-উর রশীদের পর হইতে কাযীউল কুযাত পদের গুরুত্ব দিনের পর দিন বাড়িয়াই চলিল। মামুন-উর রশীদের শাসনকালের কাযীউল কুযাত ইয়াহইয়া ইবন আকছামের ক্ষমতা সম্বন্ধে ঐতিহাসিকগণ বলিয়াছেন—

"কাযী ইয়াহইয়া ইবন আকছামের প্রভাব মামুন-উর রশীদের উপর মুক্ত করিয়া দেয়।" ইমাম মুহাম্মদ বলিলেন—"সিজদাহ সাহ্ওয়াতে যদি ভুল করে তবে তজ্জন্যওকি সিজদা সাহ্ও করিব ?" ইমাম কাসারী বলিলেন—"আরবী ব্যাকরণের নিয়ম কোন নাম একবার তাসগীর (ছোট করণ) হয় পরে সেই তাসগীরের আর তাসগীর হয় না সুতরাং আমার মনে হয় এক সিজদাতেই সব কাজ চলিয়া যাইবে।"

ইমাম কাসারী কেরাত, আরবী এবং অভিধানেরও ইমাম ছিলেন। কথিত আছে, হারুন-উর রশিদের দুর্ভাগা পুত্র আমীন-উর রশীদ কাসারীর ছাত্র ছিলেন। আবার কেহ বলেন হারুনও তাহার ছাত্র ছিলেন। সিয়ারুল কবীরে লিখিত আছে, ইমাম কাসারী ইমাম মুহাম্মদের খালাতো ভাই ছিলেন। কথিত আছে, মাসআলা-সংক্রান্ত বিষয়ে ইমাম মুহাম্মদ ইমাম কাসারী হইতে বহু সাহায্য গ্রহণ করিয়াছেন।

এমনভাবে বিস্তার লাভ করিল যে তিনি তাহাকে কাযীউল কুযাত পদে বরিত করিলেন। এমন কি রাষ্ট্রীয় অন্যান্য কাযেও তাঁহাকে ডাকিতেন। ফল এই দাঁড়াইল যে,—ইয়াহইয়ার অগোচরে অসম্মতিতে কোন মন্ত্রীই কোন কাজ করিতে পারিতেন না।

কাযী ইয়াহইয়ার ধর্মীয় খিদমত

মামুন এবং ইয়াহইয়ার মধ্যস্থিত সম্পর্ক এবং বন্ধুত্বের কাহিনীতে ইতিহাসের পাতা ভরপুর। কাযী ইয়াহইয়া এই পার্থিব ক্ষমতায় ক্ষমতাবান থাকাকালীন তিনি ধর্মের এক সন্ধিক্ষণে যে খিদমত করিয়াছিলেন আজ পর্যন্ত মুসলমান কৃতজ্ঞতাসহকারে সেকথা স্মরণ করিয়া থাকে। আসল ঘটনা হইল মামুন যখন খলীফা, তখন কিছু সংখ্যক লোক মামুনকে বুঝাইল যে,—ইসলামে মুতা'[১] জায়েয—এসম্বন্ধে আপনার মহান দাদা হযরত 'আবদুল্লাহ ইবন 'আব্বাস ফতওয়া দিয়াছিলেন।' মামুনও চাহিলেন যেভাবে হউক মুতার প্রচলন করিতে হইবে।

কাযী ইয়াহইয়া এই সংবাদ অবগত হইতে পারিয়া ম্লান বদনে খলীফার দরবারে উপস্থিত হইলেন। খলীফা জিজ্ঞাসা করিলেন—"আপনার মুখমণ্ডল ম্লান কেন ?" কাযী সাহেব বলিলেন—"মুসলমানদের জন্য ব্যভিচার বৈধ হওয়ার ফতওয়া দিলে কিভাবে আর হাসি খুশি থাকিতে পারি ?"

মামুন বলিলেন, "ব্যভিচার জায়েয হওয়ার ফতওয়া ?"

কাযী সাহেব বলিলেন, "তা নয়তো কি ? আপনি মুতাকে জায়েয করিতেছেন। অথচ বিবাহিতা স্ত্রী এবং শরীয়ত-সিদ্ধা দাসী ব্যতীত আর সব রমণীকেই ভোগ করা কুরআন হারাম করিয়াছে।"

কাযী সাহেব এই সম্বন্ধে আরও বিস্তারিত দলিলাদি দ্বারা মুতা যে হারাম উহা বুঝাইয়া দিলেন। অতঃপর হযরত 'আলী (রাঃ) বর্ণিত হাদীস দ্বারা বুঝাইয়া দিলেন যে হুযুর (সঃ) মুতা হারাম করিয়া গিয়াছেন। যথা সময় মামুনকে এই বিষয় অবগত করায় তিনি কাযী ইয়াহইয়াকে খুব ধন্যবাদ দিলেন।

২। আরবে জাহিল লোকেরা তৎকালে বিদেশ অবস্থানকালে কোন রমণীর সহিত চুক্তি করিয়া লইত এতদিন আমি তোমার সাহচর্যে থাকিব, পরিবর্তে তোমাকে আমি এত দীনার দিরহাম দিব। মুদ্দত শেষ হইয়া গেলে নতুনভাবে চুক্তিবদ্ধ না হওয়া পর্যন্ত কাহারও সহিত কাহারও কোন সম্পর্ক থাকিত না। ইহাকে মুতা বলা হয়।

খোদা না করুন কাযী ইয়াহইয়া যদি সেদিন জীবনের মায়া পরিত্যাগ করিয়া সত্যের প্রচার না করিতেন তবে আল্লাহই জানেন উহার পরিণতি কি হইত? অন্যান্য সম্প্রদায়ের নিকট আজ মুসলিম জাতি এক ব্যভিচারকারী জাতি ব্যতীত অন্য কিছু হিসাবে পরিগণিত হইত না।

আল্লাহ কাযী ইয়াহইয়াকে শান্তিতে রাখুন, ইহাই আমাদের আল্লাহ্ পাকের দরবারে আরব।

মুতাসিম, মুতাওয়াক্কিল এবং ওয়াসিকের যুগ

কাযী উল কুযাত পদে আবু আবদুল্লাহ

মামুনের রশীদের পর মুতাসিম, মুতাওয়াক্কিল এবং ওয়াসিকের শাসন আমলে কাযীউল কুযাত আবু আবদুল্লাহ আহমাদও শান-শওকতে কাহারও চেয়ে কম ছিলেন না। কিন্তু দুঃখের বিষয়, এই দুর্ভাগা কাযী এমন একটি কাজ করিয়াছিলেন—যাহাতে দ্বীন ও দুনিয়ায় তাহার মুখ কালো হইয়া গিয়াছিল এবং সমস্ত সৌন্দর্যকে তাহার একটি ভুলেই অসুন্দরে পরিণত করিয়াছিল। অন্যথায় তিনি মুসলিম সমাজের যে উপকার সাধন করিয়াছিলেন—তজ্জন্য তাঁহার নাম শ্রেষ্ঠ মুসলিম মনীষীদের নাম তালিকায় স্থান পাইত।[১]

(১) 'খলকে কুরআনের' মাসআলায় কাযী আবু আবদুল্লাহ্ আহমাদের পরামর্শেই ইমাম আহমাদ ইবন হাম্বলের উপর বিপদের পাহাড় ভাঙিয়া পড়িয়াছিল। এইজন্যই তিনি সমস্ত লোকের বদনাম কুড়াইয়াছিলেন। অন্যথায় হুকুমতের টাকায় এবং নিজে লোকের বহু উপকার করিয়াছিলেন। তাঁহার উপকার সমন্ধে একটি কাহিনী বর্ণিত আছে যে—মুতাসিম কোন এক ব্যক্তিকে মৃত্যুদন্ডাদেশ দিয়াছিলেন। জ্বাল্লাদ তাহার প্রাণ সংহারের জন্য তরবারী উদ্যত করিয়াছে—এমন সময় আবু আবদুল্লাহ চিৎকার করিয়া বলিলেন—"আমীরুল মুমিনীন! তরবারিকে ইনসাফের সীমা অতিক্রম করিতে দিবেন না। খলিফা তাহার দিকে তাকাইলেন।"

কাযী সাহেব বলিলেন—"তখন আমার খুব জোরে পেশাব লাগিয়াছিল। চিন্তা করিয়া দেখিলাম, পেশাব করিতে গেলে আর এই বেচারা

তিনি যে হুকুমতের নিকট কত বড় প্রভাবশালী ব্যক্তি ছিলেন নিম্নের একটি উদাহরণেই উহা বুঝা যায়। খলিফার দরবারে নিয়ম ছিল খলীফার নাম উচ্চারণ করার পূর্বে আর কাহারও নাম উচ্চারণ করা হইত না। এই নিয়ম আবু আবদুল্লাহ আহমদই উঠাইয়া দেন। কথিত আছে— মামুনের মৃত্যুর সময় ঘনাইয়া আসিলে তিনি তাঁহার পুত্র মুতামিকে ডাকিয়া বলিলেন —"আবু আবদুল্লাহ আহমাদকে কোন অবস্থায়ই পরিত্যাগ করিও না। প্রত্যেক ব্যাপারে তাঁহার সাথে পরামর্শ করিবে।"

ইবন আবী শাওয়ারিব এবং দাগোন পরিবার

এই দুইজন কাযীউল কুযাতের পর ইবন আবী শাওয়ারিব এবং দামেগান পরিবারের লোকেরাই বহুদিন পর্যন্ত আব্বাসী হুকুমতের কাযীর পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। এখানে এই সম্পর্কে কিছু বলার প্রয়োজন নাই যে, ইহারা আব্বাসী হুকুমতের আদালতে কোন নীতি অনুসরণ করিয়াছিল। এখানে আমার বক্তব্য বিষয় হইল, শেষ পর্যন্ত আব্বাসী হুকুমত বিচার বিভাগীয় সম্পূর্ণ দায়িত্ব আলিমদের হাতে ছাড়িয়া দিয়াছিলেন। যেদিন হইতে এই দায়িত্ব আলিমদের হাতে আসিল সেদিন হইতে সেই ভয়ে উহা উন্নত হইতে লাগিল। এই বিষয়ে বিভিন্ন মতবাদের কোন স্থান ছিল না।

কিন্তু আব্বাসীগণ যে পাঁচ শতাব্দী পর্যন্ত হুকুমত করার সুযোগ পাইয়াছিলেন — এই বিরাট সময়ের মধ্যে তাঁহাদের কাযী বিশেষ করিয়া কাযীউল কুযাতের পদে হানাফী মতবাদীদের উপরই ন্যস্ত করা হইত। তবে বিশেষ কারণবশতঃ অন্য মতাবলম্বী আলিমকেও উক্ত পদে নিয়োগ করা হইত। দামেগান পরিবার নিঃসন্দেহে হানাফী ছিলেন। এই বংশের কমপক্ষে বিশ জনের নাম আব্বাসী কাযীউল কুযাতের তালিকায় দেখা যায়। আর তাহারা সকলেই ছিলেন হানাফী। বাকী রইল

প্রাণে বাঁচিবে না। গায়ের জামা কাপড় খুলিয়া নীচে রাখিয়া উহাতে পেশাব করিতে লাগিলাম এবং বেচারার রেহাই সম্বন্ধে প্রমাণ দিতে লাগিলাম। বেচারা রেহাই পাইল আমি ওঠার পর দেখা গেল সেস্থান ভিজিয়া গিয়াছে। খলীফা কারণ জিজ্ঞাসা করিলে আমি সব বলিলাম তিনি আমার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া এক লক্ষ দিরহাম পুরস্কার দেওয়ার আদেশ দিলেন।

ইবনে আবী শাওয়ারিব পরিবার।[১] ইবনে আবী শাওয়ারিব পুত্র আবদুল মালিক বলেন—যখন তাঁহারা বসরায় ছিলেন তখন একটি মাসআলা সম্বন্ধে আলোচনা করিতে গিয়া তাঁহার বংশধরের পুরানো বাড়ী 'কসরে আতীক'—এর প্রতি ইঙ্গিত করিয়া বলিয়াছেন—এই বাড়ী হইতে এমন সত্তরজন আলিম হইয়াছিলেন যাঁহারা হানাফী মতে কাজ করিতেন।" দারে কুতনী কাযী ইয়াহইয়া ইবন আকসামকে শাফিঈ মতাবলম্বী বলিয়াছেন। কিন্তু হানাফী ঐতিহাসিকগন তাঁহাকে হানাফী বলিয়াছেন। তবে আবদুল্লাহ আহমাদ কোন মযহাবী ছিলেন উহার প্রমাণ এখনও পাওয়া যায় নাই।

ইবন আবু 'আবদুল্লাহ্‌র ভুল

ইমাম আহমাদ ইবন হাম্বলের 'খলকে কুরআন' সম্পর্কে আবু আবদুল্লাহ যে বাড়াবাড়ি করিয়াছিলেন তজ্জন্য কোন মযহাবই তাঁহাকে আপন করিয়া স্বীকার করিয়া লইতে ইচ্ছুক নহে। অথচ তিনি যে একাই এরূপ করিয়াছেন তাহা কিছু নয়। আলিমগণ জানেন—আলিম দেরই একটি দল, যাঁহারা চারি ইমামের কোন ইমামেরই মতবাদে বিশ্বাসী নহে। এমন কি তাহাদের ধর্ম-বিশ্বাসও সুন্নী নহে। যেমন মুতাযিলা কারামাতিয়া, জাহমিয়া ইত্যাদি। বিশেষ করিয়া হানিফা ইতিহাসে তো ইহার ভুরি ভুরি দৃষ্টান্ত রহিয়াছে।

এই চার পাঁচ শত বৎসরের এই দীর্ঘ সময়ের মধ্যে অন্যান্য মযহাবের লোক আব্বাসী হুকুমতের কাযীউল কুযাত পদে নিয়োগ হইলেও অধিকাংশ লোকই হানাফী ফিকাহ ও ইজতিহাদের সাথে সম্পর্কযুক্ত ছিলেন। যদিও তাহারা প্রকাশ্যে নিজদিগকে হানাফী বলিতেন না। আল-ইয়াফী বলেন—"খলিফা মুকতাদি বিল্লাহ্‌র সময়

১। সাহাবা ইবন উসাইদ সম্বন্ধে বর্ণিত আছে যে হুযুর (সঃ) সর্বপ্রথম তাঁহাকে মক্কার কাযির পদে নিয়োগ করিয়াছিলেন। তাই ইসলামের কাযীর তালিকায় সর্বপ্রথম তাঁহার নাম পাওয়া যায়। তাঁহারই ভাই খালিদ ইবন উমাইদ-এর বংশধরই ইবন আবী শাওয়ারিব পরিবার। ইহারা ছিলেন বনী উমাইয়া। আব্বাসী হুকুমতের বিচার বিভাগ নিজেদের দায়িত্বে আনিতে পারায় তাঁহারা তাঁহাদের লুপ্ত গৌরব পুনরুদ্ধার করিতে পারিয়াছিলেন।

শাফিঈ আলিম আবু আলী ইবন খায়যুরানকে বাগদাদে কাযী হইতে বলায় তিনি অস্বীকার করেন।'

আল-ইয়াফী আরও বলেন, 'আমাদের মধ্যে কেহ কখনও কাযী হন নাই। ইহাতো হানাফী মতবাদীর মধ্যেই সীমিত রহিয়াছে।'

চতুর্থ শতাব্দীর প্রথম দিকের একজন শাফিঈ আলিমের সাক্ষী যে আব্বাসী হুকুমতের কাযী হানাফী মতবাদের লোকেরাই ছিলেন। মাকরিযী বলেন, ৩৯৩ হিজরীতে শাফিঈ আলিম আবু হামেদ আসফারাইনীর চেষ্টায় খলীফা কাদির বিল্লাহ হানাফী কাযী আবু মুহাম্মাদ ইবন আল-আফফানীর স্থানে এক শাফিঈ আলিম আহমাদ ইবন মুহাম্মাদকে কাযীউল কুযাতের পদে নিয়োগ করেন—ফলে আব্বাসী হুকুমতে এক ভয়াবহ তুফানের সৃষ্টি হইল। পরিশেষে নিশাপুরের কাযী আবুল আলা-সায়েদ ইবন মুহাম্মাদ ইহাতে হস্তক্ষেপ করেন এবং শাফিঈ কাযীকে বিদায় দিয়া পুনরায় হানাফী কাযী আবু মুহাম্মাদ ইবন আল-আফফানীকে নিয়োগ করিতে হয়।'

তখন জনসাধারণকে শান্ত করার জন্য শাহী-প্রাসাদ হইতে যে ইশতেহার বাহির হইয়াছিল উহা দৃষ্টে মনে হয় কিছুটা ভুল বুঝাবুঝির দরুণই এরূপ করিতে হইয়াছিল এবং এখন হইতে রাষ্ট্রের পক্ষ হইতে ঘোষণা করা হইতেছে যে, আমীরুল মুমিনীনের পূর্ব-পুরুষগণ যেমন হানাফীদিগকে কাযীউল কুযাতের পদে নিয়োগ করিতেন; তিনিও ভবিষ্যতে তাঁহাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া চলিবেন।'—এই রীতির ভিত্তিতেই আহমাদ ইবন মুহাম্মাদকে অপসারণ করা হইল। একথাও ঘোষণা করা হইতেছে যে, এই পর্যন্ত হানাফীগণ যেমন সম্মান পাইয়া আসিয়াছেন ভবিষ্যতে তেমনি সম্মান পাইতে থাকিবেন।'

এখন অনুমান করিয়া দেখুন—হানাফী মতবাদ রাষ্ট্রের উপর কতটা প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। হানাফী আলিমদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে এক-জন কাযী নিযুক্ত করায় আব্বাসী হুকুমতের উপর কি ভয়ানক বিপদ নামিয়া আসিয়াছিল। হুকুমত নিজের ভুল স্বীকার না করা পর্যন্ত এবং সেই ভুলের প্রতিকার না হওয়া পর্যন্ত সেই বিপদ দূর হয় নাই।

মামুন-উর-রশীদ যখন মার্ভ-এর শাসনকর্তা ছিলেন তখন খালিদ ইবন সাবাহ তথাকার কাযী ছিলেন। খালিদ বলেন, 'আমি ইমাম আবু হানীফার মত ব্যতীত আবু ইউসুফের মতে কোন একটি মামলার রায় প্রদান করি। মামুন এই সংবাদ অবগত হইয়া আমাকে নির্দেশ দিলেন

'যতক্ষণ পর্যন্ত আবু হানীফার মত দিয়া কাজ হয় ততক্ষণ তাহাই করিবে।'

পাঠক লক্ষ্য করিতেছেন কি, হানাফী ফিকাহ ও ইজতিহাদ-এর মান-মর্যাদা আব্বাসী প্রাথমিক খলীফাদের মনে এতটা স্থান পাইয়াছিল যে, তাঁহার ছাত্রের মতামত গ্রহণ করাও নিষেধ ছিল। সুতরাং অন্যান্য আলিমদের মান-মর্যাদা ক্রমবর্ধমান অবস্থায় চলিতেছিল তখন অন্য মতবাদীদের কাযী হওয়ার সুযোগই বা কোথায় ছিল? তবে হানাফী আলিমগণ রাযী থাকিলে দুই একটি পদে অন্য মতাবলম্বী লোক নিয়োগ করা হইত। আহমাদ এবন মুহাম্মদকে কাযী আফফানীর সাথে পরামর্শ ব্যতীত নিয়োগ করা হইয়াছিল বলিয়াই পরে অপসারণ করিতে হইয়াছিল। সময় সময় অন্য মতাবলম্বী আলিমকে কাযী পদে নিয়োগ করিতে হইলে হানাফী কাযীউল কুযাতের মতামত লইয়াই করিতে হইত।

ইমাম সাহেব যেই চিন্তা করিয়া আইন-প্রণয়ন সমিতি গঠন করিয়াছিলেন এবং নিজের সাহায্যে রাখিয়া যাহাদিগকে তৈয়ার করিতেছিলেন —আল্লাহ্ তাঁহার সেই সংনিয়তকে সফলকাম করিয়াছিলেন যে, 'তাঁহার প্রণীত আইনসমূহ রাষ্ট্রের আইন হিসাবে পরিগণিত হইয়াছিল। বনী উমাইয়াদের খামখেয়ালীর দরুন যে ইসলামী সমাজ-ব্যবস্থা নির্মূল হইয়া গিয়াছিল—ইমাম সাহেবের অক্লান্ত চেষ্টায় আব্বাসী হুকুমতের সময় উহা আবার পূর্ণরূপে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। উহা সহ ইমাম সাহেবের যে চরিত্র গঠন ও কার্যক্ষম করার অপূর্ব শক্তি ছিল উহার বদৌলতে শুধু প্রারম্ভিক যুগেই নয় বরং উহার পরও সেই সমস্ত আইন যথাবিধি প্রয়োগ করার জন্য হুকুমত এমন সব লোক পাইত, সব না হইলেও অধিকাংশকেই ইমাম সাহেব সচ্চরিত্র ও কার্যক্ষমের ছাঁচে ঢালাই করিয়া রাখিয়াছিলেন।

হুকুমতের বিচার বিভাগ রাষ্ট্রের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিভাগ ছিল। ইমাম সাহেবের নির্দেশ ও ছাত্রদের পর যাহারা কাযীউল কুযাত পদে নিযুক্ত হইতেন তাঁহারা সকলেই যে সমভাবে কার্যক্ষম ছিলেন এ দাবী করা অন্যায় হইবে, আর ঘটনায়ও উহা প্রমাণিত হয় না। অন্য সম্প্রদায়ের ইতিহাস হইতে সম্ভবত ঘটনা গোপন করিয়া রাখা হইত। আমার তো মনে হয় ভাল ঘটনার সাথে মন্দ ঘটনা সংযুক্ত করিতে হয় বলিয়া কোন কোন সম্প্রদায় ইতিহাসই লিখে নাই। তাই তাহাদের পূর্ববর্তী প্রসিদ্ধ ব্যক্তিদের মনগড়া কিস্সা কাহিনী দ্বারা কাহাকেও

দেবতা, আবারও ফেরেশতা করিয়া লইয়াছে, কিন্তু মুসলমানদের ইতিহাস হাতে গড়া নয় বরং প্রকৃত ঘটনাবলীর সমাবেশ।

আর সেই যুগটাই এমন ছিল যে, আলিম ব্যতীত বিশেষ করিয়া ইমাম সাহেবের প্রচেষ্টার পর অন্যের সেখানে কোন স্থানই ছিল না। তাই বলিয়া তাহাদের জীবনের প্রকৃত ঘটনাগুলি কোথাও লুকাইয়া রাখা হয় নাই। কাযীদের ইতিহাসের পাতা উল্টাইয়া দেখুন উহাতে সব রকম লোকই দৃষ্টিগোচর হইবে। দাবেগান পরিবারের যেমন ভাল কাযী ছিলেন, তেমনি ইবন আবী শাওয়ারিব পরিবারের কাযী মুহাম্মাদ ইবন হাসান যেমনি একদিকে দানশীল ছিলেন, তেমনি অন্যদিকে তাহার সম্বন্ধে লিখিত আছে, 'যে দায়িত্বপূর্ণ পদেই তাঁহাকে নিয়োগ করা হইত লোকে মন্দের সাথে তাঁহার নাম স্মরণ করিত। ঘুষ গ্রহণ এবং অবৈধ কাজ করা ছিল তাঁহার বড় দোষ। তাঁহার মন্দ স্বভাব সম্পর্কে সকলেই অবগত ছিল।'

দামেগান পরিবারস্থ কাযী হুসায়ন ইবন আহমাদ দামেগানী সম্বন্ধেও লিখিত আছে, 'ফয়সালা সম্পর্কে তাহার রীতিনীতি প্রশংসনীয় ছিল না।' (জাওয়াহির মুফিক, ২০৮ পৃঃ, ১ম জিলদ)

কাযীদের দুর্বলতাপূর্ণ কাজের ব্যাখ্যা সেই যুগে এই ভাবেই করা হইত, যাহার ইঙ্গিত ছিল ঘুষ গ্রহণ করার প্রতি। কিন্তু তৎসহ নিঃসন্দেহে একথা বলা যাইতে পারে যে, আলহামদুলিল্লাহ! বহুদিন পর্যন্ত উহারাই কাযীর পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন—যাঁহারা তাঁহাদের পূর্ববর্তী বুযুর্গদের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া গিয়াছেন। শুধু ইহাই নয় ইমাম সাহেব যাঁহাদের শিক্ষা দিয়াছিলেন—তাঁহাদের পদাঙ্কও অনুসরণ করা হইত। প্রত্যেক যুগেই এমন একটি ফকীহ্‌র দল পাওয়া যায় যাঁহারা ইমাম সাহেবের নীতিতে অটল থাকিয়া কোন দিন সরকারী চাকুরী গ্রহণ করেন নাই।

আমি পূর্বে উল্লেখ করিয়াছি যে, ইমাম সাহেবের ছাত্রদের মধ্যে যাঁহারা কাযী হইয়াছিলেন তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ বেতন গ্রহণ করিতেন। ইবন জাওযী হানাফী কাযী আহমাদ ইবন বুদায়ল সম্বন্ধে বলেন, 'মুতাসিমের প্রসিদ্ধ সেনাপতি বাগার পুত্র মুসা ইবন বাগা মার্ভের কোন একটি সম্পত্তির মামলা দায়ের করেন।' মুসার ব্যক্তিগত সহকারী উবায়দুল্লাহ্ বলেন, মুসা একটি সম্পত্তি হস্তগত করার আশা করেন যাহাতে কোন য়াতীমেরও অংশ ছিল। ইবন বুদায়লকে বহুবার

অনুরোধ করিলাম যেভাবেই হউক মূসাকে এই সম্পত্তি দেওয়াইয়া দিন। কিন্তু তিনি কোন মতেই রাযী হইলেন না। আমি রাগান্বিত হইয়া বলিলাম, 'আপনি জানেন ইহা কাহার ব্যাপার—ইহা মূসা ইবন বাগার ব্যাপার।'

ইবন বুদায়ল বলিলেন—اعزك الله ابارك تعالى

আল্লাহ তোমার সন্তানকে অক্ষুণ্ণ রাখুন। এদিকেও তো আল্লাহ্‌র ঘটনা।'

উবায়দুল্লাহ বলেন, 'একথা শুনিয়া লজ্জায় আমার মাথা নত হইয়া গেল ফিরিয়া আসিয়া আমি মূসাকে একথা বলিলাম। মূসা একথা শুনিয়া এতই অভিভূত হইয়া পড়িলেন যে, বার বার তিনি উচ্চারণ করিতে লাগিলেন—اابارك تعالى অতঃপর কাযী সাহেবকে বলিয়া পাঠাইলেন, 'আপনার কোন কিছুর প্রয়োজন হইলে চাহিয়া পাঠাইবেন।'

কাযী সাহেব বলিয়া পাঠাইলেন, 'আমার নির্ধারিত বেতন এখনও দেওয়া যাইতেছে না। ইহা ব্যতীত আমার আর কিছুরই প্রয়োজন নাই।'

ইহাতো গেল একজন বেতনভুক্ত কাযীর কাহিনী। ইমাম সাহেবেরই ছাত্র কাসিম ইবন মুঙ্গল বিনা বেতনেই কাজ করিতেন। এখানেই শেষ নয় পরবর্তীকালেও এরূপ ঘটনার উদাহরণ পাওয়া যায়। ইবনে জাওযীই কাযী হাসান ইবন আবদুল্লাহ্‌ সম্বন্ধে লিখিয়াছেন কাযী হাসান কাযীগিরি এবং অধ্যাপনা দুইটি কাজই একসাথে করিতেন অথচ সরকার হইতে একটি পয়সাও গ্রহণ করিতেন না। তাঁহার নিয়ম ছিল—প্রত্যহ দশ পাতা করিয়া লিখিতেন এবং উহার পরিবর্তে দশটি দিরহাম উপার্জন হইত। উহাতে তাঁহার স্বচ্ছন্দে চলিয়া যাইত। প্রত্যহ একাজ সমাধা করার পর তিনি অন্য কাজের জন্য বাড়ী হইতে বাহির হইতেন।

যাঁহারা কাযীর পদ গ্রহণ করিয়াছিলেন ইহাতো গেল তাঁহাদের কথা। কিন্তু প্রত্যেক যুগেই এমন কিছু সংখ্যক হানাফি আলিম ছিলেন যাঁহাদিগকে কেহ কোনমতেই সরকারী চাকুরী গ্রহণ করাইতে পারে নাই। প্রথম যুগে তাঁহারা সংখ্যায় অনেক বেশী ছিলেন। পঞ্চম শতাব্দীর আলেম মুহাম্মদ ইবন মূসা সম্বন্ধে ইবন জাওযী লিখিয়াছেন—তিনি তাঁহার সময়ে হানাফী আলিমদের মাথার মণি ছিলেন কোন মতেই তিনি সরকারী চাকুরী গ্রহণ করেন নাই।"

আব্বাসী হুকুমতকে প্রভাবান্বিত করায় ইমাম সাহেব কতদূর সফলকাম হইয়াছিলেন উহা বর্ণনায় এতটা সময় ব্যয় হইলেও অনেক স্থলে সংক্ষেপ করা হইয়াছে। বিশেষভাবে কাযীদের সম্পর্কে বিস্তারিত ভাবে আলোচনার প্রয়োজন থাকা সত্ত্বেও গ্রন্থের কলেবরের দিকে লক্ষ্য করিয়া উহা সম্ভব হইল না।

অন্যান্য হুকুমতের বিচারালয়ের হানাফী প্রভাব

আব্বাসী হুকুমতের পর অন্যান্য রাষ্ট্রে ইমাম সাহেবের প্রচেষ্টা কতটা কার্যকরী হইয়াছিল উহা আলোচনা করার পর এই গ্রন্থের যবনিকা টানার আশা রাখি।

ঠিক ঐ সময় যখন হারুনের সম্মুখে আব্বাসী হুকুমতের বিচার বিভাগের যাবতীয় দায়িত্ব কাযী আবু ইউসুফের উপর ন্যস্ত করা ব্যতীত কোন উপায় ছিল না, তখন ইসলামী জগতের পাশ্চাত্য হুকুমত অর্থাৎ স্পেনে বনী উমাইয়া হুকুমত আব্বাসীদের দেখাদেখি হানাফীদের পরিবর্তে ইমাম মালিকের ছাত্র ইয়াহইয়া ইবন ইয়াহইয়া মাসূদীকে বিচার বিভাগের দায়িত্ব অর্পণ করেন। এই সম্বন্ধে আল-মাকরিযী লিখিয়াছেন—হারুন খলীফা হওয়ার পর ইমাম আবু হানীফার ছাত্র কাযী আবু ইউসুফ ইয়াকুব ইবন ইবরাহীমের হাতে বিচার-বিভাগীয় যাবতীয় দায়িত্বভার অর্পণ করেন। ফলে ইরাক, খোরাসান, সিরিয়া, মিসর প্রভৃতি স্থানের কাযী নিয়োগ করা আবু ইউসুফের সাথে সম্পর্ক-যুক্ত হইয়া গেল। এই সমস্ত স্থানে তাহারাই কাযী নিযুক্ত হইতে পারিতেন যাহাদের সম্পর্কে কাযী আবু ইউসুফ সম্মতি দান করিতেন।

তদ্রূপ স্পেনে আল-হাকাম আল-মুরতাযা ইবন হিশাম ইবন আবদুর রহমান ইবন মুআবিয়া ইবন হিশাম ইবন আবদুল মালিক ইবন মারওয়ান তাঁহার পিতার মৃত্যুর পর খিলাফতের আসনে সমাসীন হন। ১৭০ হিজরীতে ইয়াহইয়া ইবন ইয়াহইয়া ইবন কাছিরের সাথে তাহার জানাশুনা হয়। ইয়াহইয়া হজ্জও করিয়াছিলেন। ইমাম মালিকের নিকট তাঁহার রচিত গ্রন্থ পাঠ করেন। অতঃপর ইমাম মালিকের ছাত্র ওয়াহাব এবং ইবন কাছিমের নিকটও অধ্যয়ন করেন। শিক্ষা সমাপনের পর স্পেনে ফিরিয়া আসেন। তাহার পর তিনি বনী উমাইয়া হুকুমতে এমন প্রভাব বিস্তার করিলেন যে, যাহা আজও কাহার ভাগ্যে ঘটিয়া উঠে নাই। খলীফা হইতে জনসাধারণ সকলেই তাঁহার ভক্ত ছিল। সম্পূর্ণ অধিকার তাঁহাকে দেওয়া হইয়াছিল। তাঁহার সম্মতি ব্যতীত স্পেনে কোন কাযী নিয়োগ করা হইত না।

ইহার অর্থ এই দাঁড়ায় যে, স্পেনের বনী উমাইয়া হুকুমত সকল কাজেই আব্বাসী হুকুমতের অনুসরণ ও অনুকরণ করিতেছিল। তাই স্পেনের এই বিপ্লবকেও আমি ইমাম সাহেবের প্রচেষ্টার পরিণতি বলিব। যদিও উহা তাহাদের নেক নিয়ত ছিল। কিন্তু আমার মনে হয় ইমাম আবু হানীফার প্রভাব ও প্রতিপত্তিকে আব্বাসী হুকুমত হইতে দূর করার জন্য মনসুর হইতে আরম্ভ করিয়া হারুন পর্যন্ত সকল খলীফা যে চেষ্টা করিয়াছিলেন এবং এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য ইমাম মালেক তাঁহার বিরুদ্ধে দাঁড় করাইতে আহ্বান করিয়াছিলেন এবং ইমাম সাহেব স্পষ্ট ভাষায় অস্বীকার করিয়াছিলেন—সম্ভবত তাঁহার এই সৎ নিয়তের পরিবর্তেই আল্লাহ্ তাআলা য়ুরোপের স্পেনে তাঁহার ফিকাহ্কে হুকুমতের আইন হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করিয়া দিয়াছিলেন।

এখানে প্রশ্ন হইল স্পেনে মালিকী আইন প্রতিষ্ঠিত হওয়ার মধ্যে ইমাম মালিক (রাঃ)-এর প্রত্যক্ষ হাত ছিল কিনা? একথা সত্য যে হজ্জ উপলক্ষে স্পেন পাশ্চাত্যের সীমান্তবর্তী মুসলিম দেশগুলির লোক মক্কা যাতায়াত করিতেন। ইমাম মালিক তখন সমস্ত হেজাযে প্রখ্যাত ফকীহ মুহাদ্দিস ছিলেন। স্বভাবত বহিয়াগত লোক ইমাম মালিকের সাথে দেখা করিতে আসিত। তাছাড়া যুবকদের মধ্যে যাহারা জ্ঞানার্জনে ইচ্ছুক ছিলেন তাহারাও হজ্জ করিতে আসিয়া ইমাম মালিকের নিকট অধ্যয়ন করিতেন। এই কারণেই ইমাম মালিকের শিক্ষালয়ে পাশ্চাত্যের ছাত্রসংখ্যা সর্বদা অধিক থাকিত। এই পাশ্চাত্যের ছাত্রগণ যখন শিক্ষা সমাপ্তে দেশে ফিরিয়া যাইতেন তখন ইমাম মালিক এমন সব কথা বলিতেন—যাহাতে বুঝা যাইত সেই দেশে যেন তাঁহার আইন প্রবর্তিত হয়।

স্পেনীয় বনী উমাইয়া খিলাফতের কাযীউল কুযাত ইয়াহইয়া বলেন—"আমার শিক্ষা সমাপ্তে আমি ইমাম মালিকের নিকট হইতে বিদায় লইবার সময় বলিলাম, আমাকে কিছু উপদেশ দিন।"

আমার অনুরোধে ইমাম সাহেব বলিলেন— আল্লাহ্র, আল্লাহর কিতাবের; মুসলমান শাসকদের এবং মুসলমাদের মঙ্গল কামনাকে জীবনের প্রধান কর্তব্য হিসাবে গ্রহণ করিবে।"

ইহা স্বয়ং ইয়াহইয়ার বিবৃতি। আমার মনে হয় লোকে ইমাম মালিকের আকাঙ্ক্ষা সম্বন্ধে যাহা বর্ণনা করেন, আল্লাহ যাহা পূর্ণ করিয়াছিলেন, সেই আশার ঝলক ইমাম সাহিবের এই উপদেশের মধ্যে নিহিত রহিয়াছে। ইমাম আবু হানীফাও ইহা ছাড়া আর কি

আশা পোষণ করিতেন. মুসলিম রাষ্ট্রে কুরআনের আইন মুতাবিক পরিচালিত হউক। ইমাম মালিকও তাঁহার উক্তিতে উহাই প্রকাশ করিয়াছিলেন।

পরিশিষ্ট

কুফার ইমাম সাহেব যে উদ্দেশ্য সাধন মানসে কাজ আরম্ভ করিয়াছিলেন কোন-না-কোন মতে প্রাচ্য ও পাশ্চাতের মুসলমানদের জীবনধারা সেই আইনের আওতায় আসিয়া গিয়াছিল পার্থক্য শুধু এতটা ছিল যে, প্রাচ্যে হানাফী এবং পাশ্চাত্য মালিকী বিধি-ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। উভয় অবস্থাতেই আসল উদ্দেশ্য সাধন হইয়াছিল অর্থাৎ খলীফা, গভর্ণর এবং আমীর—উমরাদের নিজস্ব খেয়াল হইতে রেহাই পাইয়া মুসলমানগণ ধর্মীয় রীতিনীতিতে জীবন যাপন করার সুযোগ পাইয়াছিল।

এই ইসলামী বিধি-ব্যবস্থা শুধু এই দুইটি কেন্দ্রীয় হুকুমতের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না বরং উক্ত হুকুমতদ্বয়ের আওতাধীন বা উহাদের হইতে স্বাধীন হইয়া যাহারা ভিন্ন রাষ্ট্র কায়েম করিয়াছিলেন অথবা এই হুকুমতদ্বয় বিধস্ত হইয়া যাওয়ার পর যে বিভিন্ন রাষ্ট্রের পত্তন হইয়াছিল সমস্ত প্রতিষ্ঠানগুলিই প্রাচ্য অথবা পাশ্চাত্য হুকুমতের রীতিনীতিই অনুসরণ করিয়াছিল। অর্থাৎ আব্বাসী ও উমাইয়া খিলাফতের বিচার বিভাগ যেমন আলিমদের হাতে ছিল তেমনি নব প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্রগুলিও আলিমদের হাতে ছাড়িয়া দিয়াছিল। যদিও রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা এক হাত হইতে অন্য হাতে হস্তান্তর হইতেছিল, বিপ্লবের পর বিপ্লব হইতেছিল, কিন্তু ইমাম আবু হানীফা যে কৃতকার্যতা অর্জন করিয়াছিলেন বিশ্বাস করুন, শেষ পর্যন্ত অর্থাৎ পৃথিবীর রাজনীতি, শাসন পরিচালনা মুসলমানদের হাত হইতে না যাওয়া পর্যন্ত সব সময়ই উহা পরিপূর্ণ ক্ষমতার সাথে প্রচলিত ছিল।

এই ব্যাপারে ইমাম আবু হানীফার প্রভাব এতটা উজ্জ্বল ছিল যে মিসরে যখন অ-সুন্নী ফাতেমী ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল তখন যদিও তাহারা 'আহলে সুন্নতের' ইমামদের ফিকাহ গ্রহণযোগ্য মনে করেন নাই, তবুও বিচার বিভাগ আলিমদের হাতে ছিল এবং ঐ সব নিয়ম কানুন প্রবর্তন করিতে বাধ্য হইয়াছিল।

এই সম্বন্ধে একটি ঘটনা বর্ণিত আছে যে, ফাতেমীদের প্রথম খলীফা মাআয ফি দীনিল্লাহ্‌র সাথে একজন আলিম তাহাকে সাহায্য

করার জন্য আসিয়াছিলেন। আল্লাহ জানেন তাঁহার আসল নাম কি ছিল ? কিন্তু পরে তিনি আবু হানীফা নু'মান নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। আব্বাসী হুকুমতের আইনের মূল ইমাম আবু হানীফাই ছিলেন। মিসরী হুকুমত নিজেদের অসুলি আইন প্রণেতার নামও নকল করিয়াছিলেন।

কথিত আছে, ফাতেমীদের এই প্রথম কাযী মালিকী মযহাবের অনুসারী ছিলেন। কিন্তু মা'আযের সাহচর্যে থাকিয়া ইমামিয়া হইয়া গিয়াছিলেন। তিনি একজন বড় আলিম ছিলেন। হানাফী আলিমদের ইজতিহাদের মুকাবিলায় তিনিও বড়-বড় কিতাব রচনা করিয়াছিলেন। উক্ত গ্রন্থসমূহে তিনি হানাফীদের বিরূপ সমালোচনা করিয়াছেন।

যেদিন হইতে হারুন বিচার বিভাগের দায়ীত্ব কাযী আবু ইউসুফের হাতে অর্পণ করেন সেদিন হইতে ইসলামী হুকুমত শেষ না হওয়া পর্যন্ত সর্বত্রই বিচার বিভাগ আলিমদের হাতে ছিল। উহার বিস্তারিত আলোচনার জন্য বিরাট পুস্তক প্রণয়ন করিতে হয়। সংক্ষেপে ইহাই বলিতে হইবে যে, দিন যতই অতিবাহিত হইতে লাগিল কাযীউল কুযাতদের ক্ষমতাও সেই পরিমাণে বর্ধিত হইয়াছিল। খলিফা ও শাসন-কর্তাগণ সর্বদাই নিজদিগকে এই কাযীদের সম্মুখে নিরুপায় মনে করিতেন। অবশ্য কাযীদের দুর্বলতার সুযোগ লইয়া কোন কাজ উদ্ধার করিলে উহা ছিল ভিন্ন কথা। কিন্তু কাযী বাঁকা হইয়া বসিলে হুকুমত তাঁহার সম্মুখে মাথা নত করিয়া দিতে বাধ্য থাকিত।

এমনকি নও মুসলিম তাতারীদের যখন শান-শওকত চলিতেছিল তখন কাযীদের শক্তি কোন মতেই দুর্বল হইয়া যায় নাই। যতদূর মনে হয় তাতারী এবং তুর্কীদের উপর আলিমদের আধিপত্য আরবদের চেয়ে বেশী ছিল।

শাসকগোষ্ঠী পরিবর্তন হইলেও সাধারণ কাযীদের কোন পরিবর্তন হইত না। সালাহউদ্দীন আইউবী যখন দামেস্কের দুর্গ অধিকারের চেষ্টা করিয়াও কৃতকার্য হইতে পারিতেছিলেন না, তখন তিনি দামেস্কের কাযী আবুল ফযল শহরযুরীর বাড়ীর দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। সালাহউদ্দীনকে দেখিয়া কাযী সাহেবের জ্ঞান সারাইবার উপক্রম। কিন্তু সালাহউদ্দীন তাঁহাকে ডাকিয়া বলিলেন—'আপনি নিশ্চিত থাকুন। আপনার হুকুমই বলবত থাকিবে এবং শহর আপনাদের থাকিবে।

একথা সত্য যে খায়রুল কুরুন অর্থাৎ নবীজীর মৃত্যুর পর খোলাফায়ে রাশেদীনের যুগ হইতে মুসলমান যতই সরিয়া আসিতেছিল ইসলামের সজীবতা ততই ম্লান হইয়া পড়িতেছিল। জীবনের অন্যদিক যেমন এই সাধারণ নিয়ম মতে প্রভাবান্বিত হইতেছিল কাযীদের ইলম ও আমল উহা হইতে তখন কিভাবে পৃথক থাকিতে পারে। এতদসত্ত্বেও আমি ইমাম সাহেবের নেক নিয়তের ফল মনে করিব যে, নও মুসলিম তাতার ও তুর্কি আমলেও চরিত্র ও কার্যের যে নজির ক্রমাগতভাবে পাওয়া যাইতেছিল—হাকিম শহীদ এবং শামসুল আয়িম্মা সাররাখসীর[১] উদাহরণ তন্মধ্যে একটি। আলিমদের বড় একটি দল সকল যুগেই ধর্ম ও ইলমের মর্যাদা রক্ষার্থে শেষ পর্যন্ত সম্ভবমত কুরবানী দিয়া আসিতেছেন। উহার মধ্যে পাক-ভারতের ইসলামী হুকুমতের কাযীদেরই যথেষ্ট হিসসা রহিয়াছে।

পরিতাপের সঙ্গে বলিতে হয় যে, শেষ যুগে মুসলমানদের মধ্যে যে বিশৃংখলা সৃষ্টি হইয়াছিল তাহার মূলে ছিল অনারব শাসকদের সঙ্গে আনা তাঁহাদের ধর্মীয় বিশ্বাস। অন্য আর একটি কারণ ইহাও ছিল যে প্রত্যেকটি ভাল জিনিসই সীমা লংঘন করিয়া যাওয়ার পর মন্দে পরিণত হয়। আলীম এবং কাযীদের এই অবস্থা হইয়াছিল। ইহা এক স্বয়ংসম্পূর্ণ গ্রন্থের বিষয়বস্তু।

প্রকৃতপক্ষে আইনপ্রণয়নে মুসলমানগণ যে কাজ করিয়া গিয়াছেন জোরের সাথে বলা যাইতে পারে যে বর্তমান যুগের রাষ্ট্রের আইন কানুন ও তাহাদের আইন গ্রন্থ মুসলমানদের আইন গ্রন্থ হইতে অনেক পিছনে পড়িয়া রহিয়াছে। মুসলমানদের আইনের কাজ প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত আলিমদের আয়ত্তাধীন ছিল। ফিকাহ এবং উসুলে ফিকাহর নামে শুধু হানাফীই নয় বরং মালিকী, শাফিঈ এবং হাম্বলী যে কাজ করিয়া গিয়াছেন এবং আইন সম্বন্ধে যে গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন, যাহা নষ্ট হইয়া গিয়াছে উহা যাইতে দিন, গ্রন্থাগারে আজও যাহা মওজুদ রহিয়াছে—আমি জানিনা, পৃথিবীর অন্য কোন জাতি এত বড় আইন সম্পদ প্রথম যুগে তো দূরের কথা, এই যুগেও দেখাইতে পারে কিনা? আজকাল আদালতে যে সব আইন-কানুন প্রচলিত আছে উহার

১। তুর্কীদের ধার্যকৃত অন্যায় কর না দেওয়ার জন্য জনসাধারণকে উৎসাহ দেওয়ায় তাঁহাকে জুনদের কুয়ার মধ্যে বন্দী করিয়া রাখা হইয়াছিল। কুয়ার পারে ছাত্রগণ বসিতেন আর তিনি কুয়ার মধ্য হইতে পাঠ বলিয়া দিতেন।

অধিকাংশ মুসলিম আইন গ্রন্থ মন্থন করিয়া তৈরী করা হইয়াছে।

যাহা হউক ফিকাহ গ্রন্থের বিভিন্ন প্রকারের যে ছোট বড় গ্রন্থ লিখিত হইয়াছে উহা কি গণনা করা মানুষের সাধ্যের কাজ? কোন কোন গ্রন্থ তো একশত ভলিয়মে শেষ করা হইয়াছে, উহার প্রত্যেকটি ভলিয়মও বিরাটাকারের। মবসুতাত, হাদিয়াত অথবা মুহিত নামে বিভিন্ন সময়ে যে ফিকাহ্‌র ইনসাইক্লোপেডিয়া লিখিত হইয়াছে—পৃথিবীর কোন জাতির নিকট এমন আইন গ্রন্থ আছে কি?

যাহা কিছুই হউক, হইয়াছে তো ইহা শতাব্দী ব্যাপী। কিন্তু সাফের দাবী ইহাই। ঘটনা উহার সাক্ষী যে, এই সমস্ত আইন ও ফিকাহ্‌র উৎস এমন এক বরকত-বিশিষ্ট ব্যক্তি ছিলেন যাঁহার সম্বন্ধে হযরত মুহাম্মাদ (সঃ) ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিলেন ঃ

لو كان الايمان بالثريا لتناوله رجال من فارس

"ঈমান যদি সুরাইয়া তারকা পর্যন্তও উঠিয়া যায় তবে ইরানবাসী উহাকে পাইবে।" (তিরমীযী)

اللهم ارحمه واغفرله ولنا وللجميع المسلمين -

সমাপ্ত

